"মা"

হে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব প্রিয়পরম!
এ ধরাধামে যাঁহাকে তুমি
তোমারই জীবত্ব বলিয়া মনে করিতে,
যাঁহাকে ছাড়া তোমার অস্তিত্ব
কল্পনায়ও ভাবিতে পারিতে না,
যিনি ছিলেন তোমার
'সব আরাধনার প্রতীক,
সব আশার উৎস,
সব কামনার বিশ্রাম,
সব ব্যথার শান্তি-প্রলেপ,'
যাঁহাকে হারাইয়া সব-কিছু থাকিতেও
এ ছুনিয়ায় আজ তুমি সর্ব্বহারা কাঙ্গাল,

আমাদের সেই পরমারাধ্যা পুণ্যবতী
মহামহিমময়ী জননীদেবী মনোমোহিনীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ তোমার
এই চরিত-কথা উৎসর্গ করিলাম।

সৎসঙ্গ, পাবনা
আষাঢ়-সংক্রান্তি, ১৩৪৬

শ্রীচরণাশ্রিত দীন সেবক
ব্রজগোপাল

মুখবন্ধ

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি সাধন-ভজনহীন অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র! তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মোদ্দীপনা, অনন্ত-অতলস্পর্শী জ্ঞান, আজন্মসঞ্চিত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সর্ব্বোপরি বিশ্ববাসী প্রতি-প্রত্যেকের জন্য তাঁহার অফুরন্ত আপ্রাণ ভালবাসার এক-কণিকাও যদি পরিমাপ করিবার সামর্থ্য থাকিত! বিশ্ব-বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত কারণকে নিজের সমগ্র সত্তা দিয়া অনুক্ষণ অনুভব করতঃ যিনি সকলের সঙ্গে অতি সহজভাবে মিশিয়া কত-জনের কত-দিনের কত-বিচিত্র গ্রন্থি-মোচনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মানসিক স্বাস্থ্যদান করিতেছেন, যাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ দরদমাখা শুশ্রূষায় মরণ-পথের কত-যাত্রী আশা, ভরসা ও উৎসাহের অমৃতমন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া অন্তরের সম্পদে বলীয়ান্ হইয়া উঠিতেছে,—কি সাধ্য আমার, ভাষায় আমি সেই অপূর্ব্ব জীবন-মাহাত্ম্যের একবিন্দু প্রকাশ করি! বলিতে কি, দীর্ঘকাল নিয়তরূপে তাঁহার সঙ্গ করিয়া আজ ইহাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, কি শিক্ষা, কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ—মানব-সভ্যতার সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার যুগান্তরকারী অতুলনীয় দান—যাহা তদীয় আপন সময়ের অতীত বস্তু—জাতির ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগ-সৃষ্টির অমোঘ অপূর্ব্ব উপাদান! এই দীন সেবক তাঁহার অপার করুণালাভে ধন্য—কৃতার্থ। আনন্দ-রস কেহ একাকী উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পায় না, পারিপার্শ্বিক সবাইকে লইয়া অমৃত আস্বাদনে তৃপ্তিবোধ মানব-মনের সাধারণ ধর্ম্ম। তাই শত অযোগ্যতা, সহস্র ন্যূনতা সত্ত্বেও তাঁহার অমিয় চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সকলকে জানাইবার জন্য ক্ষুধাতুর আত্মার আজ এই দীন ব্যাকুল প্রচেষ্টা! আর-কিছু না হউক, আমার স্বদেশবাসী জননী ও ভ্রাতৃমণ্ডলীর সমীপে মানবের বর্দ্ধনভিক্ষু এই দরদী বন্ধুর শুভ আবির্ভাবের বার্ত্তাটী যে বহন করিয়া আনিবার চেষ্টা পাইয়াছি, সেবকের ইহাই পরম সার্থকতা।

যাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও কথিত বর্ণনা হইতে পুস্তকের উপাদান-সংগ্রহে সাহায্য পাইয়াছি তন্মধ্যে স্বর্গগতা জননীদেবী মনোমোহিনী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, দেশবন্ধুর জীবনী-প্রণেতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর দাশগুপ্ত, বি, এস্-সি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন

সরকার, এম্-এ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এস্-সি, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ হালদার, বি-এ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় ঋত্বিকাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ও প্রতিঋত্বিক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যন্ত এবং প্রতি-নিধিনায়ক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্ ও ঋত্বিকসচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখার্জ্জি এম্-এস্-সি ইহার অংশ-বিশেষ পাঠ করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের তরুণ শিল্পীগণ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থস্থ কতকগুলি ছবির আলোকচিত্র তুলিয়া দিয়াছেন এবং ফিলানথ্রপি কার্য্যালয়ের সুযোগ্য কর্ম্মিগণ নানাবিষয়ে আমাকে সময়োচিত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র কর যেরূপ অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া বহুদূরে থাকিয়াও গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধন-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা কোন দিন ভুলিতে পারিব না। জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্যমতে এবং জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীযুক্ত তপতীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাশ্চাত্যমতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোষ্ঠীর গণনা ও বিচারাদি করিয়া দিয়াছেন। রাজসাহী-নিবাসী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ শর্ম্মা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অনুগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃকুলের বংশ-পত্রিকা এবং হিমাইতপুর-নিবাসী শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতৃকুলের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত খলিলর রহমান মহোদয়গণের অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ না করিলে গ্রন্থ-প্রণয়ন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই সকল ইষ্টপ্রাণ সুহৃদ্‌বর্গের নিকট আমি চিরঋণী থাকিব। এতদ্ব্যতীত বহু ইষ্টভ্রাতা কত-জনে কত-প্রকারে যে এই পুস্তক-প্রকাশে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়া-ছেন, তাহার অবধি নাই। স্থানাভাব-বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে না পারায় আমি দুঃখিত। যাঁহাদের যত্ন, পরিশ্রম, সাহায্য, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করায় আজ আমি এই দুরূহ কার্য্যসাধনে সক্ষম হইয়াছি আমার সেই পরমাত্মীয় বান্ধবগণের প্রত্যেককে এই সুযোগে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে'র কার্য্যতৎপরতায় গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য, 'বেঙ্গল অটোটাইপ কোং' ও 'গয়া আর্ট প্রেসে'র যত্নে ছবিগুলির ব্লক-নির্ম্মাণকার্য্য এবং 'গয়া আর্ট প্রেসে'র অতিশয় নৈপুণ্যে ইহার যাবতীয় ছবির মুদ্রণকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমার পুত্র শ্রীমান রজতবরণের কথাও না বলিয়া পারিলাম না। তাহার লিখিত "Life and Teachings of Sri Sri Thakur

Anukulchandra" নামক বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাকে পুস্তকখানার রচনাকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেক অংশের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন এবং বিশেষভাবে সুদীর্ঘ সূচীপত্রখানার রচনাকার্য্যে তাহার যত্ন ও পরিশ্রম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তরুণ বয়সেই ইষ্টপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যে তাহার নিকট হইতে এরূপ সাহায্যলাভ আমার পরম তৃপ্তির কারণ। পরমপিতা তাহাকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করুন—ইষ্টসেবায় তাহার জীবন সার্থক হউক—দয়ালের চরণে ইহাই একমাত্র প্রার্থনা!

সঙ্ঘভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রণ-ব্যাপারের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের সংস্করণটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইষ্টনিষ্ঠার একমাত্র পরিচয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘটনাবহুল জীবনের অতি-সামান্যই আমি প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। কতজন ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সম্বন্ধে কত বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পরিচিত আছেন তাহার অবধি নাই। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী এবং প্রকাশিত ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আমাকে দয়া করিয়া জানাইলে, আরও পূর্ণাঙ্গ আকারে ও নিখুঁত-ভাবে পরবর্ত্তী সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এজন্য ইষ্টভ্রাতা প্রত্যেকের সাহায্য কামনা কবি।

গ্রন্থখানার সঙ্গে বড়ই বিষাদের স্মৃতি জড়িত রহিযাছে। যাঁহার উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদে এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছিলাম, গ্রন্থখানা মুদ্রিত দেখিয়া আজ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইতেন—আমাদের সেই আরাধ্যা জননীদেবী মনোমোহিনী আজ আর ইহধামে নাই। পাণ্ডু-লিপিখানি প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও মাতৃদেবীর মরণাপন্ন অসুস্থতা-নিবন্ধন তাঁহাকে ইহা পড়িয়া শুনাইবারও সুযোগ পাইলাম না। সেবকের এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? আজ এই দীন আয়োজন তাঁহারই স্বর্গগত অমর আত্মার প্রীতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া এ দগ্ধহৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভের প্রয়াস পাইলাম। ইতি—

সৎসঙ্গ, পাবনা
আষাঢ়-সংক্রান্তি, ১৩৪৬ সন

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

সে অনেক দিনের কথা—১৩২৫ সালের শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা-তিথি, আজ একুশ বছর! তখন আমি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন খোক্‌সা ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার। আমি যাঁ'র সংস্পর্শ-লাভে পরম কৃতার্থতা লাভ ক'রেছি, শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত হ'য়েই তিনি ছিলেন,—আমার অন্তরের অন্তস্তলে। আজ তিনি সহস্র সহস্র আমারই মত জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা আর্ত্তের ত্রাণ ক'রে,—শুধু আমার নয়,—দশের ও দেশের জীবন্ত আদর্শরূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হ'য়ে উ'ঠেছেন। শুধু বাঙ্গালীর জীবন নয়, যে-কোন মানবের জীবনই নূতন উদ্যমে, নূতন উদ্দীপনায়, নূতন অনুপ্রেরণায় যে তাঁ'র সংস্পর্শে কতখানি ভরপূর হ'য়ে উ'ঠেছে ও উঠ্‌ছে, তা' প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কাউকে লিখে বুঝাবার ক্ষমতা আমার লেখনী রাখে না, কারুর লেখনী রাখে কি না—আমার জানা নেই!

মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় কি-ক'রে, সে তত্ত্ব আমি বুঝি না। জাতীয় জীবনের কোন্ সন্ধিস্থলে, ধর্ম্মের গ্লানির কোন্ চরমাবস্থায়, অধর্ম্মের কিরূপ অভ্যুত্থানে জগৎস্রষ্টা মানব-দেহ নিয়ে মানবের দুঃখে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেন, তা' পণ্ডিতেরাই বিচার ক'র্‌বেন। সে সব আলোচনা আমার মত মূর্খের পক্ষে ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নয়। তবে দুঃখদৈন্যপ্রবৃত্তিময় মানবের জীবনে যিনি আনন্দ ও শান্তির প্রস্রবণ খুলে দিয়ে ধৈর্য্যময় শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণার সৃষ্টি ক'রে সাধারণ মানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত কর্‌বার অলৌকিক অমানুষী ক্ষমতা রাখেন, মানবের প্রতি অসীম প্রেম ও সহানুভূতিতে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েও স্ব-মহিমায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠ র'য়েছেন, তাঁ'কে দে'খেছি, তাঁ'কে পে'য়েছি, তাঁ'কে স্পর্শ ক'রেছি, তাঁ'র সঙ্গলাভ ক'রেছি—আর আমার মত সহস্র সহস্র মানব আজ তাঁ'র সংস্পর্শে কৃতার্থ হ'চ্ছেন।

বাংলার মহাপুরুষ বাংলার মাটিতে সম্যক্ অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা পায়নি কখন। জাতির দুঃখে যাঁ'রা নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে জাতির উন্নয়নের জন্য আত্মত্যাগ ক'রে গেছেন, তাঁ'দের জীবদ্দশায় আমরা চিরদিনই তাঁ'দের অবহেলা ক'রেছি, অশ্রদ্ধা ক'রেছি, অস্বীকার ক'রেছি, বড় জোর দেহাবসানে তাঁ'দের জন্য মর্ম্মর-কঠিন সমাধি-সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে ব্যর্থ পূজার নৈবেদ্য সাজিয়েছি। তাঁ'দের আমরা বরণ ক'রে ঘরে আনিনি, নিত্য-জীবনের পরতে-পরতে তাঁ'দের অমিয় জীবনের স্পর্শলাভ ক'রে তাঁ'দের স্মৃতির স্পর্শে নূতন কর্ম্মোদ্দীপনায় তাঁ'দের অনুসরণে মেতে উঠিনি।

তাইত' আজ বাংলার এত দৈন্য, এত দুর্দ্দশা, এত হাহাকার—বুভুক্ষু পরপদানত জাতি লেলিহান কুক্কুরের মত পরপদ লেহন করবে, তবু মহাজনকে পূজা করবে না। শ্রদ্ধাহীন জাতি শ্মশানের ধ্বংস-স্তূপই রচনা করতে পারে!

আশা করি, বাংলার উদীয়মান্ নরনারী এই নূতন বাংলার নবজাগরণে, জাতির নবীন জয়যাত্রার এই পরম-শুভলগ্নে, এই নবজীবনের বোধনকালে এই নূতন মহামানুষটীর সঙ্গে আলোচনায়, সংস্পর্শে ও অনুসরণে বাংলার সোণার ভবিষ্যৎ রচনা ক'রে আমাদের এই দীন প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে তুলবেন।

এই পুস্তকের মশলা যা-কিছু গ্রন্থকার অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত সংগ্রহ ক'রে আমাদের পরম শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রেছেন। আমি আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা' নিঃশেষ ক'রে আমারই পরমারাধ্যের কৃপায় এই জীবন-চরিতখানি প্রকাশ করতে সাহসী হ'য়েছি। বাংলা যদি তাঁ'র সংস্পর্শে সার্থক হয়, সহস্র বৎসরের জড়িমা ভেঙ্গে নূতন জীবনের অমৃত-আস্বাদ পেয়ে অমৃতপথের যাত্রী হয়, তবে সকল যত্ন সার্থক হ'বে আমার—ধন্য হব আমি—এইটুকুই যা' আমার লাভ।

ইম্পিরিয়েল্ লজ্
২৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
বৈশাখী-পূর্ণিমা

বিনয়াবনত
শ্রীমণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়-নিরূপণ

দশম অধ্যায় ১৩৫—১৫৩

বাধাবিঘ্ন ও বিরুদ্ধাচরণ

কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বিদ্রোহ—

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন এবং ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার গুণগ্রামের কথা বলিতেন। এমন-কি শ্রীশ্রীঠাকুর সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যও তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন, ইহাতে তিনি ক্রমে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠেন। দুঃখের বিষয়, এই উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন ; উপকারীকে অস্বীকার করিবার দুর্ব্বুদ্ধি প্রায়শঃ তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এমন সময় অসুস্থ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কার্সিয়াং যান। ইত্যবসরে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কতিপয় শিষ্যের নিকট গোপনে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ছয় মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর ইহধাম ত্যাগ করিবেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানে তিনিই তৎস্থলবর্ত্তী হইবেন। শীঘ্রই শ্রীশ্রীঠাকুর আরোগ্যলাভ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। স্বগ্রামে ফিরিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের দারিদ্র্য দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন জনৈক শিষ্যের প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি প্রেস খরিদ করেন এবং ইহার কার্য্যপরিচালনার ভার কৃষ্ণচন্দ্রের উপর অর্পণ করিয়া তাঁহার অর্থোপায়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বৎসরাবধি কাল পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের মনে আবার পূর্ব্বপোষিত পাপপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। এইবার তিনি নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত প্রেসটিকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কতিপয় শিষ্যের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের মৃত্যু নিশ্চিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের চৈতন্যধারা এখন তাঁহারই দেহের ভিতর নামিয়া আসিয়াছে, সুতরাং সত্যপ্রচারের বাধাস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সাধারণ শরীরটা যে-কেহ নাশ করিতে পারিবেন তিনিই জগতে যথার্থ সত্যধর্ম্ম-প্রচারের সহায়ক হইবেন। এইভাবে কয়েকজনকে দলভুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা গোপনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হত্যা করিবার বিরাট ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অকৃত্রিম ভালবাসা ও সরল মধুর ব্যবহার লাভ করিয়াও কৃষ্ণচন্দ্র ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কৃষ্ণচন্দ্রেরই অনুরক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক শিষ্য তাঁহার নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পাবনা ত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করিতে থাকেন। বহুকাল নানাভাবে শত্রুতা করিয়া অবশেষে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া অতীব দুর্দ্দশায় পতিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন কিন্তু অকালেই কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৩৫—১৩৯।

'শনিবারের চিঠি'র অশ্লীল সাহিত্য-প্রচার—

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক নামে একব্যক্তি স্ত্রীপুত্র সহ সৎসঙ্গে আসেন এবং নিজেকে একজন প্রবীণ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া প্রচার করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তিনি নিত্যই নূতন দাবী উপস্থিত করিয়া অর্থ চাহিতেন, প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা পূরণ করিতেন। স্ত্রীর সহিত মল্লিকবাবু দিবারাত্র ঝগড়া করিতেন এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং পারিপার্শ্বিক সকলকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। সৎসঙ্গে

থাকিয়াই মল্লিকবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে দিন্ন যাইতে লাগিল। একদিন রাত্রে সৎসঙ্গের কাহাকেও কিছু না জানাইয়া পাবনায় যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া অর্থসংগ্রহ করতঃ মল্লিকবাবু কলিকাতায় গমন করেন এবং কিছুকাল পরে নানা কুৎসিৎ অভিযোগ করিয়া তাঁহার পরিবারকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পত্র দেন। অতঃপর শুনা গেল, মল্লিকবাবু বিশেষ একটী দল গঠন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে নিন্দাবাদ প্রচার করিতেছেন। ব্যাপকভাবে দীর্ঘকাল এই কাযা চালাইবার অভিপ্রায়ে মল্লিকবাবু দলের সকলকে লইয়া 'শনিবারের চিঠি'র শরণাপন্ন হইলেন। তখন হইতে উক্ত পত্রিকায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা অমূলক অপবাদ উপন্যাসছলে বাহির হইয়া দেশে একটা বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে থাকে। এইরূপ অশ্লীল সাহিত্য ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিবার অপরাধে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় গ্রেপ্তার হন এবং সমুচিত দণ্ডিত হন। ১৩৯—১৪২।

প্রতিবেশীর মিথ্যা অভিযোগ—

প্রতিবেশী মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বাড়ীর নিকট দিয়া সৎসঙ্গের ইলেক্ট্রিক-তার চালান হইল এবং বিনা খরচে তাঁহার আলোর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। একবার উক্ত মজুমদার মহাশয়ের জমির দুইটা বাঁশ আসিয়া তারের উপর পড়ায় তড়িৎ-চলাচলের বাধা হয়। মূল্য লইয়া বাঁশ দুইটা কাটিবার অনুমতি দিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করা হইল, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। উপায়ান্তর না থাকায় কর্ম্মিগণ বাঁশ দুইটার অগ্রভাগের কিয়দংশ কাটিয়া তার চালাইবার পথ সুগম করিয়া লন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকটা তাঁহার বাধ্য লোকজন ডাকিয়া তার কাটাইয়া এবং কতকগুলি খুঁটি উঠাইয়া ফেলেন। তখন তড়িৎশক্তির সাহায্যে সৎসঙ্গের নানা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ উদ্যমে কাজ চলিতে-ছিল। তড়িৎ-শক্তির অভাবে এই সকল কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। এত ক্ষতি করিবার পরেও ভদ্রলোকটা একদিন আদালতে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিলেন যে, সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণ তাঁহার জমি হইতে প্রায় পাঁচশত বাঁশ কাটিয়া নিয়াছে। আদালতের বিচারে উক্ত অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং তজ্জন্য তিনি নিজেই অভিযুক্ত হন। ১৪২—১৪৩।

লুঠ-তরাজের অমূলক অপবাদ—

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন গ্রামের কয়েকটা ছেলে জমিদার...সাহা চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিনায়কত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয় ও পাবনা কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সম্মুখে কুৎসিৎ ভাষায় নিন্দা করে। ইহাতে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুক্রমে উক্ত জমিদারবাবুকে সকল বিষয় জানান হইল। দুঃখের বিষয় ইহার পর হইতে সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণের উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ হইল। একদিন গ্রামের জমিদারের চক্রান্তে সৎসঙ্গের তিনজন বিশিষ্ট কর্ম্মীকে লুঠ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহারা জামিনে খালাস পান। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হইল—"সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র গ্রেপ্তার—জামিনে খালাস।"

সৎসঙ্গ-কর্ম্মিগণের বিরুদ্ধে লুঠ-তরাজের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতে লাগিল। অবশেষে পুলিশপক্ষ এই মর্ম্মে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিলেন যে, সৎসঙ্গ-কর্ম্মিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং তাহা নিতান্ত ষড়যন্ত্র ও ঈর্ষামূলক। ১৪৩—১৪৬।

পারিপার্শ্বিকের হীন আক্রমণ—

বৎসর দুই পূর্ব্বের কথা। আর একটি অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল জমি-'একোয়ার' লইয়া। সৎসঙ্গের চতুর্দ্দিকের কতকগুলি কদর্য্য স্থান 'একোয়ার' করিয়া সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-সাধন করতঃ গ্রামবাসী তথা দেশবাসীর উপকার করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা চলিয়াছিল। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এই সকল জমি পরিদর্শন করিয়া সত্বর তাহার উন্নতি করা প্রয়োজন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। তদনুসারে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পঞ্চাশ বিঘা জমি 'একোয়ার' করার নোটিশ প্রচার করা হয়। এই ব্যাপার লইয়া কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকের এক দলকে উত্তেজিত করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করে। বিরুদ্ধপক্ষীয় গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক সৎসঙ্গবাসীদের উপর নানা অকথ্য অত্যাচার করিতে থাকে। অতঃপর বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বহু গ্রামবাসী এবং জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং স্থানগুলির অবস্থা তন্ন-তন্ন করিয়া পরিদর্শন করেন এবং জমিগুলি 'একোয়ার'-যোগ্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করতঃ সৎসঙ্গের অনুকূলে মোকদ্দমাটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। ১৪৬—১৪৮।

গুণ্ডার আকস্মিক উপদ্রব—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেদিন দোল-পূর্ণিমার উৎসব। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই কাশীপুরে অনন্ত মহারাজের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। এমন সময় পাবনার কতিপয় গুণ্ডা যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে। একটা মেয়ে আশ্রমের সম্মুখে নলকূপ হইতে জল তুলিতেছিল, গুণ্ডারা তাহার গায়ে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে। এই সময় তাহারা সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষককে একাকী দেখিতে পাইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার মস্তকে ছুরিকাদ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করে। গুণ্ডারা তখন আশ্রমের অন্যান্য কর্ম্মিগণকে মারিবার জন্য খুঁজিতে থাকে। ইতিমধ্যে সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণ জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল সকলে পলায়মান দুর্বৃত্তগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল—একটী যুবক ধৃত হইল। এই ঘটনায় পুলিশের জোর তদন্ত চলিতে লাগিল। ক্রমে এই ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীই ধৃত হইল সরকারপক্ষ দুর্বৃত্তদের সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য তৎপর হইলেন কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাদের মুক্তির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। তিনি বলিলেন—এইবার ক্ষমা করিলে তাহাদের অন্তরে অনুশোচনা আসিতে পারে কিন্তু শাসন করিলে হয়ত তাহাদের দুর্বুদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাইবে। নানা চেষ্টার পর অবশেষে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অপরাধী যুবকদিগের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ১৪৮—১৫০।

চিত্রকর সত্যচরণ ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতা—

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ নামে জনৈক চিত্রশিল্পী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে দীক্ষাগ্রহণান্তর সৎসঙ্গের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া সস্ত্রীক আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার সংসার-পরিচালনার যাবতী ব্যয়াদি শ্রীশ্রীঠাকুরই নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং বুদ্ধি, উপদেশ ও অর্থসাহায্যের দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহাকে সুদক্ষ কর্ম্মী করিয়া তোলেন। সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের প্রস্তুত চিত্র ও ফটো প্রভৃতির বিক্রয়লব্ধ অনেক অর্থ বহুকাল যাবত উক্ত চিত্রকর মহাশয়ের হাতে আসিতে থাকে। প্রভূত ধনসম্পদ পাইয়া সত্যচরণের মনে হীনস্বার্থমূলক নানা দুরভিসন্ধির উদয় হয় এবং এই অর্থ কি-ভাবে আত্মসা

সমস্যা-সমাধানে মতবাদ

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

	বিষয়		পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গপল্লীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রথম অধ্যায়

জন্মস্থান, বংশ-পরিচয় ও জন্ম

পাবনার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের নাম হইতে 'পাবনা' নামের উৎপত্তি। তাঁহাদের মতে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে 'পদ' নামক এক জাতি বাস করিত, গৌড়ের সঙ্গে এই রাজ্যের খুবই সম্পর্ক ছিল এবং বগুড়া জিলার অন্তর্গত 'মহাস্থান' ইহার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান পাবনা জিলা রাজসাহী বিভাগের সর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে যমুনা এবং দক্ষিণে পদ্মানদী এই ক্ষুদ্র জিলাটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। পশ্চিম বঙ্গ হইতে রেলপথে উত্তর বঙ্গে যাইতে হইলে, পদ্মানদীর উপরিস্থ সুবৃহৎ হার্ডিঞ্জ ব্রীজ (সারা সেতু) পার হইয়া ঈশ্বরদী রেলষ্টেশনে পৌছিতে হয়। পাবনা সহর ঈশ্বরদী হইতে পূর্ব্বদিকে আঠার মাইল দূরবর্ত্তী। হিমাইতপুর পাবনা সহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী এক অতি ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রাম। ইহা পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। অনেকে বলেন, 'হিমাইতপুর' শব্দটী 'হিম্মৎপুর' শব্দের অপভ্রংশ। প্রচলিত জনপ্রবাদ—দিল্লীসম্রাট আকবরের প্রধান রাজপুত সেনাপতি মহাবীর মানসিংহ বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনের জন্য আগমন করিলে তাঁহার সাময়িক অবস্থানের জন্য তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ হিম্মৎ খাঁ এখানে একটী সেনানিবাস (ছাউনী) স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হিম্মৎপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামটীর নাম ছাতনী হইয়াছে। উক্ত সেনানিবাসের ধ্বংসাবশেষও এতদঞ্চলে অদ্যাপি "রাজা মানসিংহের বাড়ী" বলিয়া পরিচিত। রাজা মানসিংহের হাতী বাঁধার বটগাছটী কিছুদিন পূর্ব্বেও জীবিত ছিল; তাঁহার নামীয় কালী বাড়ীটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অধুনা গ্রামখানির সম্মুখে এক দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। দূরে বহুদূরে মসীমাখা অস্পষ্ট অরণ্যরাজি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুটিকয়েক ঘন-পল্লবাচ্ছন্ন কুটীর। প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে অধুনা-লুপ্ত নদীখাত রহিয়াছে তাহাতে কোথায়ও স্বল্পসলিলা তরঙ্গিণী কুল্ কুল্ করিয়া কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়া থামিয়া গিয়াছে, কোথায়ও বা জলরাশি সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও এই বিশাল প্রান্তর বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন গ্রামের কিনারা পর্য্যন্ত জল উঠে, আবার বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জল সরিয়া যায়, ধূ-ধূ-করা শুষ্ক মাঠ পড়িয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে বিশাল পদ্মানদী ভীষণ স্রোতাবর্ত্ত বক্ষে ধারণ করিয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া এই স্থান দিয়াই প্রবাহিত হইত। নদীতীরবর্ত্তী গ্রামটীও ছিল তখন হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ, আর ইহার নিকটেই ছিল পাবনা সহরের ষ্টীমার ষ্টেশন। গ্রামটী এখনও নিতান্ত জনবিরল, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব আজও এখানে তেমন বিস্তার লাভ করে নাই। এই হিমাইতপুর গ্রামেই বাং ১২৯৫ সন, ইং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

বহুদিনের কথা। এই হিমাইতপুর গ্রামে কমলাকান্ত বাগচী নামে জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কৃপাময়ী ছিলেন অতীব বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিপরায়ণা রমণী। প্রতি বিষয়ে গৃহ-বিগ্রহ 'রাধামদনমোহনের' উদ্দেশে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে গ্রামবাসী সকলে মুগ্ধ ছিল এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত। কৃপাময়ী চারিটী সন্তান লইয়া বিধবা হন,—কৃষ্ণসুন্দরী তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা। স্বামীর মৃত্যুর পর কৃপাময়ী দ্বাদশবৎসর-বয়স্কা কৃষ্ণসুন্দরীকে স্বগ্রাম-নিবাসী রামেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন। রামেন্দ্রনারায়ণ অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালে এতদঞ্চলে তিনি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজী এবং পারসী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। রামেন্দ্রনারায়ণ প্রথমতঃ সিভিলকোর্টের আমীন ছিলেন। তৎপর তিনি কিছুকাল পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করেন। অবশেষে এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি কিয়ৎকাল কুচবিহার ষ্টেটে ম্যানেজারের কার্য্য যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। হিমাইতপুর গ্রামে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তিশালী এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তখন খুব কমই ছিলেন। নির্ভীকতা ও সৎসাহসের পরিচয়ে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি কয়েকটী অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন, এজন্য গ্রামবাসী

তাঁহাকে এক-ঘরে করিলে তিনি বলিতেন—"যাক্, সব ব্যাটারাই এক-ঘরে হ'য়ে গেল!" রামেন্দ্রনারায়ণের ছয়টী সন্তান,—চতুর্থ সন্তান, মনোমোহিনী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জননী। তিনি ১২৭৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

সন্তানগণের মধ্যে রামেন্দ্রনারায়ণ মনোমোহিনীকে তাহার সুন্দর স্বভাবের জন্য সমধিক স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে রাখিয়া নীতি, ধর্ম্ম ও সাংসারিক বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। শিশুকাল হইতেই মনোমোহিনী অতীব বিনয়ী, ভক্তিমতী অথচ তেজস্বিনী ছিলেন। দিদিমা কৃপাময়ীকে গৃহ-দেবতার পূজা কবিতে দেখিয়া তিনিও পূজা করিতে চাহিতেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দিদিমা বলিতেন,—"দীক্ষাগ্রহণ না করলে যে [illegible] অধিকারী হওয়া যায় না।" এই কথা শুনিযা অবধি বালিকা দীক্ষাগ্রহণের জন্য উতলা হইয়া পড়েন। পিতার কাছে জানিলেন,—আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ তাহা অবশ্য পূর্ণ করেন। সরলা বালিকা তদবধি নাম পাইবার জন্য, ঠাকুর-ঘরে গৃহ-দেবতার সম্মুখে বসিয়া, ব্যাকুল কণ্ঠে কত ডাকিতেন, আর কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে কাতর প্রাণে ঠাকুরের চরণে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সিংহাসনে রাধামদনমোহন-বিগ্রহেব মূর্ত্তি নাই,—তৎপরিবর্ত্তে গৌরকান্তি জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘশ্মশ্রু এক দিব্যপুরুষ তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহারই সম্মুখে জ্বলন্ত স্বর্ণের ন্যায় অতিশয় উজ্জ্বল এবং বৃহদাকারে **'রা' 'ধা' 'স্বা' 'মী'** এই কয়টী অক্ষর লিখিত রহিয়াছে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট এই মহাপুরুষের শান্ত-সৌম্য-মূর্ত্তি এবং উক্ত সৎ-নাম মনোমোহিনীর অন্তরে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহের পূর্ব্বেই এইরূপ অলৌকিকভাবে তিনি সৎ-নামের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

মনোমোহিনী বিশেষ একাগ্রতার সহিত দৈবলব্ধ সৎ-মন্ত্রের সাধনা করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই আশ্চর্য্য অনুভূতি লাভ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি তাঁহার এক ভাসুর পুত্রের * নিকট পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষের পটমূর্ত্তি এবং একখানা

* ইনি মেদিনীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ। মনোমোহিনীর সহিত ঈশ্বর বাবুর বাক্যালাপ ছিল না। মনোমোহিনী দেখিতেন, ঈশ্বর বাবু প্রত্যহ স্নানান্তে ভক্তিসহকারে একখানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং তৎপরে একখানা পট পূজা করিয়া তাহা বাক্সের ভিতর সযত্নে লুকাইয়া রাখেন। ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা-বধূর এই রহস্য জানিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মিল। একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে ঈশ্বর

হিন্দী পুস্তকে প্রাপ্তনামের পুনঃ সন্ধান লাভ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হন এবং জানিতে পারেন যে, উক্ত মহাপুরুষ আগ্রা সৎসঙ্গের সন্ত সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ (রায় সালিগ্রাম সাহেব সিংহ বাহাদুর) তখনও সশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অনতিবিলম্বে মনোমোহিনী গুরুদেবের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিলেন। হুজুর মহারাজ এই ব্যাপারে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া ভজন ও সাধন-প্রণালী জানাইয়া তাঁহাকে যথারীতি দীক্ষিত করেন। তদবধি ইষ্টস্বার্থে আত্মনিয়োগ করতঃ সংসারের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং ভক্তির সহিত দেবী মনোমোহিনী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আদর্শ ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সত্যনাম-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার ন্যায় নিষ্ঠাবতী মনোমোহিনীর অন্তর ছাপাইয়া একদিন প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছিল—সদ্‌গুরুরূপী ভগবানের ন্যায় একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তিনি ধন্য হন।

প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অদম্য সাহস এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সংসার পরিচালনা করিয়া তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, খুব কম নারীর ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া থাকে। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণের তিনি আধার ছিলেন। নিজের সমূহ বিপন্ন অবস্থায়ও যথাসর্ব্বস্ব দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা, আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া অপরকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান, অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তীব্র আত্মসম্মান-বোধ প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। শত শত ঘটনার মধ্য দিয়া এই সকল গুণাবলী তদীয় জীবনে সহজ ভাবে নিত্য বিকশিত হইয়াছে। যিনিই তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার হৃদয়খানা যে কত উদার ও কত মহান্ ছিল তাহার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ১৩৪৪ সনের ৬ই চৈত্র তারিখে অনুকূলচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র ও কুমুদচন্দ্র—এই তিন পুত্র, কন্যা গুরুপ্রসাদী দেবী, বহু পৌত্র-পৌত্রী এবং অসংখ্য সৎসঙ্গী সন্তান রাখিয়া এই মহীয়সী নারী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

বাবু নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় সুযোগ পাইয়া মনোমোহিনী কোথা হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই বাক্স খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, পটখানি তাঁহারই পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষদৃষ্ট সেই মহাপুরুষের অবিকল আকৃতি। মনোমোহিনী ছবিখানি দেখিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনায় বাড়ীর মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে ঈশ্বরবাবু নদী হইতে ফিরিয়া তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করেন; একটু সুস্থ হইলে, ইহা যাঁহার প্রতিকৃতি সে বিষয়ে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন এবং উক্ত সৎ-নামের বিষয় হিন্দী পুস্তকখানায় যে সমুদয় লিখিত রহিয়াছে তাহাও বিবৃত করেন। তদবধি বালিকা বিশেষ আগ্রহের সহিত হিন্দী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই হিন্দী-পাঠে অসাধারণ দক্ষতা অর্জ্জন করতঃ বহু হিন্দী ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

মাতামহী কৃষ্ণসুন্দরী দেবী

রামেন্দ্রনারায়ণ ১২৮৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে নবমবর্ষ-বয়স্কা কন্যা মনোমোহিনীকে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেন। ইনি বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমোহরেব নিকটবর্ত্তী গুয়াখাড়া গ্রামে। বাল্যকালেই শিবচন্দ্রের পিতামাতাব বিয়োগ ঘটে। মনোমোহিনীকে বিবাহ করিবার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল চতুর্ব্বিংশ বৎসর। তখন তিনি পাবনা সহরে মাস্‌তুত ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়েব বাসায় থাকিয়া কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন, উপার্জ্জনও বেশ ভালই ছিল। অতঃপর তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা প্রভৃতি জিলায় জমিদার ষ্টেটে কাজ করিয়া যথেষ্ট সুনাম ও অর্থাদি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কন্যার বিবাহেব তিন চারি বৎসর পরে রামেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করেন। স্বামীর মৃত্যুতে কৃষ্ণসুন্দরী বড়ই নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। অংশীদারগণ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা কবিবার অভিপ্রায়ে নানা মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি করিল। রামেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তি এই ভাবে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে, শিবচন্দ্রকে আস্তে আস্তে শ্বশুর-সংসারের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তদবধি গুযাখাড়ার বাসস্থান ছাড়িয়া তিনি হিমাইতপুরে বাস কবিতে থাকেন এবং শ্বশ্রূ কৃষ্ণসুন্দরীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করেন। সরিকগণের চক্রান্তে রামেন্দ্রনারায়ণের যে সকল সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছিল, শিবচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার পুনরুদ্ধার করেন। জামাতার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা-যত্নে কৃষ্ণসুন্দরী স্বামীর শোকে পরম সান্ত্বনা লাভ করেন।

সংসার-পবিচালনায় শিবচন্দ্রের মত চৌকষ লোক খুব কমই দেখা যায়। ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁহার অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং লোকের মনোবৃত্তি বুঝিয়া চলিবাব ক্ষমতাও ছিল অদ্ভুত। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা পাছে কোন অনিষ্ট করিতে পারে এজন্য নানা কৌশলে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই নিজ ক্ষমতার অধীনে রাখিতেন, কিন্তু নিতান্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন বলিয়া নিরর্থক সে ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া কাহারও কোন দিন বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতেন না; যথেষ্ট অন্যায় করিয়াও, অনুতপ্ত হইলে অপরাধী তাঁহার নিকট ক্ষমা পাইত। শিবচন্দ্র বড়ই অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। পরেব দুঃখ দেখিবামাত্র তাহা দূর করিবাব বলবতী চেষ্টা এবং অতিথি, অভ্যাগত ও পরিজনবর্গের সেবা-শুশ্রূষায় তৃপ্তিবোধ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বীয় চরিত্রগুণে আজও তিনি গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের হৃদয় অধিকাব করিয়া আছেন। শিশুদিগকে তিনি অত্যন্ত

ভালবাসিতেন। গ্রামের সরল-প্রাণ বালক-বালিকারা দল বাঁধিয়া ইচ্ছামত তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত ও নষ্ট করিয়া কত উপদ্রব করিত, কিন্তু তিনি কাহারও উপর রাগ করিতেন না বরং তাহাদের আব্দারে খুসী হইতেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব ছিল—তিনি অত্যন্ত স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন; নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন, কখনও কোন বিষয়ে অন্ধের মত অন্যের পরামর্শে চলিতেন না। এই হিমাইতপুর পল্লীকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ইহার উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল। হিমাইতপুরের পদ্মাতীরকে তিনি এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, কোন তীর্থস্থানে যাওয়ার পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ কবিতেন না। অনেক সময় বলিতেন—"এই হিমাইতপুরই আমার কাশী, হিমাইতপুরের পদ্মাই আমার গঙ্গা।" ১৩৩০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শিবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে মনোমোহিনীর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এমন সময় একদিন মধ্যাহ্ন-কালে প্রবীণ দীর্ঘকায় জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। মনোমোহিনীর পরিচর্য্যায় আগন্তুক পরম প্রীতি লাভ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"এই বাড়ীতে এক মাযের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হ'বে এবং এমন একজন জন্মগ্রহণ কর্‌বেন, যিনি আপন চরিত্রবলে বহু লোকের অধীশ্বর হ'বেন।" কৃষ্ণসুন্দরীর ষোড়শবৎসর-বয়স্ক একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনাবায়ণ তখন জীবিত ছিলেন। মনোমোহিনীর গর্ভের একাদশ মাস পূর্ণ হইলে, যোগেন্দ্র পীড়িত হইযা মানবলীলা সংবরণ করেন। এই নিদারুণ শোকে কৃষ্ণসুন্দরীর হৃদয ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে বংশ-প্রদীপ একমাত্র পুত্রেব অকালমৃত্যু, তাহাতে আবার কন্যাব প্রসবসময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি অস্থিব হইয়া পড়িলেন। গৃহ-দেবতার নিকট অহর্নিশ প্রাণের আকুল প্রার্থনা নিবেদন কবা ভিন্ন কৃষ্ণসুন্দবীর অন্য উপায় ছিল না। রাধামদনমোহন তাঁহার করুণ আহ্বান শুনিলেন। কৃষ্ণসুন্দরীব দুঃখ-রজনীর ঘনান্ধকার তিবোহিত হইযা সুপ্রভাতের সূচনা হইল।

৩০শে ভাদ্র শুক্রবার, সংক্রান্তি দিবস, তাল নবমী তিথি। মনোমোহিনীর প্রসবসময় উপস্থিত জানিয়া জননী ও অন্যান্য বমণীগণ তাঁহাকে সূতিকাগৃহে লইয়া গেলেন, তখন উষাকাল। দিবা চারি দণ্ড বিশ পল, প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে অগ্নিচ্ছটাতুল্য জ্যোতিঃসম্পন্ন গৌরকান্তি মুণ্ডিত-মস্তক এক শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। বিশেষ আশ্চর্য্যের সহিত সকলেই লক্ষ্য করিলেন, শিশু জন্মগ্রহণের পর একটুও ক্রন্দন করিল না, মৃদু হাস্য করিয়া বিস্ফারিত

নেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধাত্রী ও অন্যান্য সকলে ইহা দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছিলেন। রূপলাবণ্যসম্পন্ন নবজাত শিশুর দিব্য দেহকান্তি অবলোকন করিয়া সকলে আনন্দে অধীর হইলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুতে পরিবারে যে শোকের ঝড় বহিয়াছিল, এই অনুপম সুন্দর শিশুটীর আগমনে তাহা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। দিন যাইতে লাগিল, শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মা ও দিদিমার স্নেহনীড়ে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈশব ও বাল্যজীবন

শৈশবকালে অনুকূলচন্দ্রের চালচলন, হাবভাব একটু অদ্ভুত প্রকৃতিরই ছিল। সাধারণ শিশুদিগের অপেক্ষা বহু কম সময়ে তিনি হাঁটিতে ও কথা বলিতে শিখিয়াছিলেন। প্রাণশক্তির অপূর্ব্ব প্রকাশ তাঁহার প্রতি কার্য্যেই লক্ষিত হইত। সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। ঠাকুর-ঘরে বিগ্রহ-সম্মুখে কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন—বালক কোথা হইতে সেখানে উপস্থিত হইয়া, বিগ্রহকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজেই তথায় উপবেশন করিলেন, আর মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী কবিরাজ মহাশয় ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছেন, কোন্ ফাঁকে বালক যাইয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন, কেহই টের পাইল না। এই মুহূর্ত্তে মার কাছে বসিয়া আছেন, পর মুহূর্ত্তেই আর নাই, এক নিমিষের মধ্যে 'বসু'দের বাড়ীর বাগানের ভিতর ঢুকিয়া গাছপালা উপ্ড়াইয়া আসিলেন। খেয়াল হইল, প্রতিবেশীর পূজার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নারায়ণশিলা লইয়া বাঁশ-ঝাড়ের নীচে পত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন, বিগ্রহের গাত্রস্থ চন্দনাদি নিজ অঙ্গে লেপন করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে শালগ্রামশিলা মন্দিরে ও আসনে রক্ষা করা প্রতিবেশীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। শিশুর এইরূপ অদ্ভুত দুরন্তপনায় সকলে অতিষ্ঠ থাকিতেন। কিন্তু অন্যের অসাক্ষাতে যখনই কিছু করিতেন, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র নিঃসঙ্কোচে তাহা বলিয়া দিতেন, কিছুই গোপন করিতেন না। বালক হাজার অত্যাচার করিলেও তাঁহাকে শাসন করিতে কাহারও যেন ইচ্ছা হইত না। তাঁহার সরল মধুর বাক্য-শ্রবণে এবং চির-হাস্যোৎফুল্ল বদনমণ্ডল-দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

শৈশব অতিক্রম করিয়া অনুকূলচন্দ্র বাল্যে পদার্পণ করিলেন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র শিরোমণি ও সূর্য্যশাস্ত্রী বালকের হাতে-খড়ি দেন। ইহার পর তাঁহাকে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কাশীপুরের হাটে কৃষ্ণচন্দ্র বৈরাগী নামক জনৈক গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। বালক প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতেন, এজন্য শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। এই পাঠশালায় তিনি দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন;

পিতৃদেব শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ছোটবেলায় কিছুকাল ৺ভবানীচরণ পাল এবং ৺ব্রজনাথ কর্ম্মকার এই দুই প্রবীণ গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকটও লেখাপড়া করিয়াছিলেন। অতঃপর পাবনা সহরে 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসন্' নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সেখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

তাঁহার আপন-ভোলা ব্যবহারে শৈশবের খেলার সাথীগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি তাহাদিগকে এত ভালবাসিতেন যে, কেহই এক মুহূর্ত্ত তাঁহার সঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারিত না। সহপাঠীরা তাঁহাকে 'প্রভু' বলিয়া ডাকিত। শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে, ক্লাসের গোলমাল শুনিয়া, অন্য ক্লাসের শিক্ষক শাসন করিতে আসিয়া যদি অনুকূলচন্দ্রের উপর হাত তুলিতে যাইতেন, তাহা হইলে ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিত—"সার্, মার্‌বেন না, আমাদের প্রভুকে মার্‌বেন না, তাহার যে কোন দোষ নাই।" তিনি ছিলেন ছেলের দলের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটিলে, সকলকে খুসী করিয়া, তিনি তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। সঙ্গীরা কত আদর করিয়া পত্রপুষ্পের মালা ও মুকুট তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে সাজাইত এবং সকলে "রাজা ভাই" বলিয়া ডাকিত। তিনিও সঙ্গীদিগকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা খেলাধুলা ও বালক-সুলভ নানা দুরন্তপনায় দিন কাটাইতেন। সে সকল ঘটনা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। শুনিয়াছি, বালক একদিন খেলার সাথীদিগকে লইয়া মায়ের ঘরের বেড়ার ছিদ্রপথে পাটখড়ির নল প্রবেশ করাইয়া দুগ্ধপাত্র হইতে চুষিয়া দলের সকলকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। ঘরের দরজাটী তালাবদ্ধ ছিল, এমতাবস্থায় দুগ্ধপাত্র শূন্য দেখিয়া জননীদেবীর প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বালককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবামাত্র বালক তৎক্ষণাৎ সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলেন।

গ্রামের প্রাচীনেরা গল্প করেন, এক বৃদ্ধার বাড়ীতে বহু আম্রবৃক্ষ ছিল। তিনি কাহাকেও একটী আমও খাইতে দিতেন না। একদিন অনুকূলচন্দ্র দলবলসহ বৃদ্ধার গৃহে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক আম্র পাড়িয়া সঙ্গীদিগকে দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আপত্তি করিলে বলিলেন —"তুমি এতগুলি আম প'চিয়ে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে, আর আমরা একটী আমও খে'তে পা'ব না?" এমন আব্দারের সঙ্গে কথাগুলি বলিলেন যে বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল। তদবধি বৃদ্ধা ছেলেদিগকে আদর করিয়া আম খাওয়াইয়া কত তৃপ্তি পাইতেন!

জননীদেবীর কাছে শুনিয়াছি, যখন তিনি স্বামীর সহিত ময়মনসিংহ গোলকপুরে ছিলেন, তখন বালক প্রায়ই বহু সঙ্গী লইয়া জমিদার-

বাড়ীতে রাণীমাতার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া গাছপালা লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতেন। বালককে বাধা দিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। একদিন তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া এইরূপ অনিষ্ট করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে বালক বলিলেন—"আমরা যে ফুল বড় ভালবাসি, আমাদের বাগানে প্রবেশ কর্‌তে দিলে, আমরা আর কিছু কর্‌ব না।" তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ছেলেদের হাতে সেইদিন হইতে বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, ছেলেরা বাগানের আর কোন অনিষ্ট করে নাই।

তখন অনুকূলচন্দ্র মাত্র কয়েক বৎসরের বালক। পিতৃদেব কিছুকাল অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। উপার্জ্জন-অভাবে সংসারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অনশনে, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, জননীদেবী এই দুর্দ্দিনে কত কষ্টে যে স্বামীর চিকিৎসা এবং পরিবারের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেন তাহা ভাবনারও অতীত! ক্ষুদ্র বালক মায়ের এই দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"মা, ভয় করিস্‌ নে, তুই খুব মুড়ি ভাজ্‌বি, আর আমি বেচ্‌বো। দেখিস্‌ তখন তোর কত টাকা হ'বে।" এই অল্প বয়সেই পিতার জন্য ঔষধ আনিতে প্রতিদিন আড়াই মাইল পথ হাঁটিয়া তাঁহাকে পাবনা যাইতে হইত। একদিন পথে নদী পার হইতে গিয়া খেয়া নৌকায় তাঁহার ছাতাটী হারাইয়া যায়। জননীদেবী ইহা শুনিয়া দুঃখ করিলে বালক বলিয়া উঠিলেন—"মা, এজন্য তুই মোটেই ভাবিস্‌ নে, আমার ছাতা লাগ্‌বে না, ছাতা ছাড়াই আমি যে'তে পার্‌ব।"

গুরুজনের কথায় বালকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি জানিতেন মাতা, পিতা বা শিক্ষক যাহা বলেন তাহা কখনই অন্যথা হইতে পারে না। একদিন বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বালককে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্কুলে আসিতে বলিয়াছিলেন। বালক তখন উত্তর করিলেন—"যদি ভুলবশতঃ কোন দিন না আস্‌তে পারি?" তাঁহার ধারণা, ভুলেও গুরুজনের আদেশ অমান্য করিলে অপরাধ হইবে। আর একটী ঘটনা। সেদিন বালকের অঙ্ক-পরীক্ষা। স্নানাহার সারিয়া তাঁহার স্কুলে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়। মা বলিলেন—"এত দেরীতে যাচ্ছিস্‌, আজ আর তুই অঙ্কের পরীক্ষা পার্‌বি না।" বালক স্কুলে গিয়া অঙ্কের প্রশ্ন হাতে করিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। শিক্ষক মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"আমার মা ব'লেছেন, আজ আমি অঙ্কের পরীক্ষা পার্‌ব না। যদি আমি উত্তর কর্‌তে পারি, তবে যে মায়ের কথা মিথ্যা হ'য়ে যা'বে। এখন কি করি?" বালকের কথা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় অবাক হইয়া রহিলেন।

আর একটী ঘটনা। একদিন তাঁহার পা ভীষণভাবে কাটিয়া যায়, তাহাতে যন্ত্রণায় খুবই কাতব হইয়া পড়েন। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব। এমন সময় জননী আসিয়া বলিলেন—"ও কিছু নয়, বেশী কিছু হয় নাই, স্কুলে তোকে যেতেই হবে।" মায়ের কথা শুনিবামাত্র বালকের মনে হইল, মা যখন ব'লেছেন বেশী কিছু হয় নাই, তখন বাস্তবিকই বেশী কিছু হয় নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষতযুক্ত পদেই প্রফুল্লচিত্তে বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। এই মাতৃনিষ্ঠা তাঁহার অতি বাল্যের অনেক ঘটনায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে আরও দুই একটা এখানে উল্লেখ করিতেছি। মা যখন নাম করিতে বসিতেন, তিনিও কাছে বসিয়া থাকিতেন; ভাইয়েরা কেহ কাছে আসিতে চাহিলে কিংবা কান্নাকাটি করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করিলে, বালক তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাদিগকে সাম্‌লাইয়া রাখিতেন।

পিতৃদেব বালকের গায়ে কোন দিন হাত তুলিতেন না, কিন্তু জননী দেবী তাঁহাকে খুবই কড়া শাসনে রাখিতেন, সর্ব্বক্ষণ ভৎর্সনা করিতেন এবং কারণে অকারণে প্রহার করিতেন। একদিন সামান্য কোন বিষয়ে বিরক্ত হইযা বালককে শাস্তি দিবার মানসে মা একখানা বাঁশের কঞ্চি হাতে করিয়া তাঁহার পিছন পিছন ছুটিতে থাকেন। তখন মধ্যাহ্ন-কাল। মা আপ্রাণ দৌড়িয়াও কিছুতেই ক্ষিপ্র বালককে ধরিতে পারিতেছেন না। এমন সময় হঠাৎ অনুকূলচন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, রৌদ্রতাপে মায়ের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অবিরল ধারে ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। মায়ের ঈদৃশ কষ্ট তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল; আর পলাইতে চেষ্টা করিলেন না, তাড়াতাড়ি যাইয়া মায়েব কাছে নিজেই ধরা দিলেন।

অপবেব কষ্টকে আপনার বলিয়া বোধ করিবার সহজ বুদ্ধিব পরিচয় তাঁহার বাল্যের বহু ঘটনায় দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন বিদ্যালয়ে সমপাঠিগণের সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন; তখন শীতকাল, খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। খালি বেঞ্চে বসিতে সকলের কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া বালক অবিলম্বে নিজেব গাত্রস্থ শীতবস্ত্রখানা লম্বালম্বি বেঞ্চের উপর পাতিয়া দিয়া তাহাদের বসিবার সুবিধা করিয়া দিলেন।

প্রায়ই তিনি বাড়ী হইতে টাকা পয়সা লইয়া গিয়া সমপাঠীদিগের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া দিতেন। গরীব বন্ধুদিগকে দোকানে লইয়া গিয়া কত আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেন। মাঝে মাঝে কাহাকেও এত বেশী অর্থাদি দান করিয়া ফেলিতেন যে, পিতামাতা ভৎর্সনা না করিয়া পারিতেন না। কোনদিন কাহাকে গায়ের জামাটী দান করিয়া খালি গায়ে

বাড়ী ফিরিতেন, কোনদিন বা নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত অপরকে দিয়া গৃহে আসিতেন।

তখন বাড়ীর নিকটেই ষ্টীমার-ঘাট ছিল। বালক প্রায়ই সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বেড়াইতে যাইতেন। কোন যাত্রী কুলীর অভাবে বিপদাপন্ন হইযাছেন দেখিবামাত্র বালক দৌড়াইয়া গিযা জিনিষপত্র নিজে মাথায় লইয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন, কিন্তু পয়সা দিতে চাহিলে ছুটিয়া পলাইতেন। মাল বহিয়া আনিতে তাঁহার প্রাণান্ত কষ্ট হইত, তবু ছাড়িতেন না। মাঝে মাঝে এখনও বলেন,—"এক একটা ভারী বোঝা নেওয়ার সময় মনে হ'ত যেন মাথাটা গলার ভিতব ঢু'কে গেল।"

তাঁহার কোমল হৃদয়ের কথা বলিলে শেষ হয় না। একদিন বিদ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হয়। বালক মাথায় শ্লেট্ দিয়া ভিজিতে ভিজিতে আসিতেছেন। এমন সময় রাস্তার নর্দ্দামায় জলপ্রবাহের ভিতর এক বৃদ্ধ পড়িয়া আছে দেখিতে পান। ঈদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়া লোকটী ভয়ে জড়িতকণ্ঠে 'আল্লা—আ—ল্লা' বলিতেছিল। বালক ইহা লক্ষ্য করিবামাত্র ক্ষিপ্রপদে দৌড়াইয়া গিয়া বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং সস্নেহ সম্ভাষণে অভয় প্রদান করিযা তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। বিপন্মুক্ত বৃদ্ধ আনন্দের আতিশয্যে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি বৃদ্ধকে নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতঃ তাহার পরিচর্য্যা করিয়া সুস্থ করিলেন।

তাঁহার এই পরদুঃখকাতরতা যেমনি মানুষের প্রতি তেমনি ইতরপ্রাণীর প্রতিও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। এখানে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিন বৃদ্ধকে সুস্থ করিয়া বালক এক বাঁশ-ঝাড়ের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন একটী বাজপক্ষী ঝড়বৃষ্টিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর আসিয়া বসে। পাছে পাখীটীর কষ্ট হয় এই মনে করিয়া অশেষ ধৈর্য্যের সহিত বালক তথায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পক্ষীটী অনেকক্ষণ বিশ্রামলাভের পর সুস্থ হইয়া প্রস্থান করিলে তিনিও পথ চলিতে লাগিলেন।

গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে, তাহাদের অনুরোধে, তিনিও একদিন পদ্মানদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাব বড়্শীতে একটী বৃহৎ মাছ বিদ্ধ হইল। অন্যান্য ছেলেরা আসিয়া মাছটীকে উপরে উঠাইয়া দিল। মাছটী আসন্ন মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাটীর উপর ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তিনি ইহার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং মাছটীকে বড়্শী হইতে ছাড়াইয়া দিবার জন্য নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন রাস্তার

লোকজন আসিয়া মাছটাকে মুক্ত করিয়া দেয়, তিনিও শান্ত হইয়া গৃহে গমন করেন।

ছোটবেলা হইতেই তাঁহার কঠোর সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে আমরা একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক ময়রার দোকানে প্রায়ই তিনি রসগোল্লা খাইতেন। তাঁহার নিকট ময়রার অনেক পাওনা হয়। ময়রা একদিন তাঁহাকে পাওনা টাকার জন্য নানা অপমানজনক কথা বলে। আত্মসম্মানে আঘাত পাইয়া বালক তৎক্ষণাৎ বাড়ী গিয়া অতিকষ্টে টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেনা শোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর কোন দিন মিঠাই খাইবেন না। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে আর একদিন আবার তাঁহার রসগোল্লা খাওয়ার ভীষণ ইচ্ছা হইল। হাতে সাড়ে পাচ আনা পয়সা ছিল, তাহাই লইয়া সেই ময়রার দোকানের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল এবং মনের মধ্যে বিষম যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রসগোল্লার লোভ তাঁহাকে দোকানের দিকে লইয়া যাইতে চায়, বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে যাইতে বাধা দেয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আত্মজয় করিবার জন্য, বালক রাস্তার ধারে অড়হর ক্ষেতে মাটীর উপর শুইয়া পড়িলেন, আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--"আমি কিছুতেই উঠ্‌ব না, আর দোকানে যা'ব না,—দেখি কে আমায় উ'ঠিয়ে নিয়ে যায়?" এইরূপ কিছুক্ষণ তীব্র চেষ্টার পর মনের বল সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া পয়সাগুলি নিকটবর্ত্তী পদ্মাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন; তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

এইবার আমরা তাঁহার বাল্যজীবনের একটী উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। অতি শৈশব হইতেই তিনি 'নাম' করিতেন। এই নামজপে এত বিভোর থাকিতেন যে, অনেক সময় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। নাম করিতে করিতে সময় সময় তাঁহার অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিদর্শন এবং শব্দাদি শ্রবণ হইত।* এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে তিনি সময় সময় কথাপ্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়াছেন, নিম্নে তাহারই একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিলাম।

সে অনেক দিনের কথা। ১৯২০ সনের ২০শে অক্টোবর—রাত্রিতে পদ্মাতীরে অনেকে তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় নদী দিয়া

---

* অনাহত নাদ বা নাম মানুষের স্নায়ুবিধানকে আলোড়ন করিয়া মস্তিষ্কের কোষগুলিতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহাতে জ্যোতিঃ ও শব্দের অনুভূতি হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে—**Perception of light and sound is due to autostimulation of the auditory and optic nerve-centres in the cerebrum.**

একখানা ষ্টীমার 'সার্চ্চ-লাইট্' ফেলিয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আমি প্রথম প্রথম এম্নি আলো দেখ্তাম। তবে তার কিরণগুলি নীল, ঠিক এম্নি উজ্জ্বল। চোখ যেন ঝল্‌সে যেত। একদিন বিষ্ণু-মূর্ত্তিও দে'খেছিলাম। তখন আমি শিশু। আমি ঘরের ভিতর ঘু'মিয়ে আছি, হঠাৎ ঘুম ভে'ঙ্গে গেল, আর ভগবানকে দেখ্‌ব এই ব্যাকুলতা এত বেশী হ'ল যে, চোখ ফে'টে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। আর ভগবানকে ডাক্‌তে হ'লে জানি, আমার নাম কর্‌তে হ'বে। তাই প্রাণে প্রাণে নাম কচ্ছিলাম। এমন সময় দেখ্‌লাম, আমার ঘরের বেড়ার উপরে একটা মানুষের সমান বড় ম্যাজিক-লেণ্টার্‌ন্-এব আলোর ন্যায় আলো প'ড়েছে আর তার ভিতরে বিষ্ণু-মূর্ত্তি। বর্ণ তার সতেজ কচি পাতার মত। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—কর্ণে কুণ্ডল, চোখ দু'টী শান্ত; এখনও সে চেহারা বেশ মনে পড়ে—মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছিল। আমি হঠাৎ এমন দে'খে অবাক হ'য়ে পড়্‌ছিলাম। প্রায় দুই তিন মিনিট অমন থে'কে থে'কে আলোটা একটু একটু ক'রে অস্পষ্ট হ'তে লাগ্‌ল, আর মূর্ত্তিটীও অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তখন মনে হ'ল, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? ভাল ক'রে ব'সে চারিদিক চে'য়ে দেখ্‌লাম, স্বপ্ন ব'লে ত মনে হ'ল না। তখন মনে মনে তাকে বল্লাম—'তুমি যদি সত্যই এসে থাক, তবে একখানা হাত দেখাও।' অমনি একখানা হাত আমার দিকে প্রসারিত হ'লো। তখনও মনে হচ্ছে—এ কি সত্যই দেখ্‌ছি, না স্বপ্ন? তখন আবার তাকে বল্লাম—'আমার যে বিশ্বাস কিছুতেই হয় না, তুমি আবার এস।' তখন সে আবার আমার দিকে হাত নাড়্‌তে লাগ্‌লো, তারপর আলোটা মিলিয়ে গেল। তখন মনে কর্‌লাম, বোধ হয় সূর্য্যের আলো ঘরেব ভিতর প'ড়েছিল, তাই দে'খেছি। এই মনে ক'রে দরজা খু'লে বাইরে এসে দেখি, ঘোর অন্ধকাব, কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই। সে মূর্ত্তি আর দেখি নি। তবে কালী-মূর্ত্তি ও কৃষ্ণ-মূর্ত্তি অনেক দে'খেছি। আমার যখনই খুব কষ্ট হ'ত, আর 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌তাম, তখনই কালীমূর্ত্তি আস্‌ত। আমার সঙ্গে কত গল্প কর্‌ত, মাথায় হাত বু'লিয়ে দিত, তখন যেন শান্তি পে'তাম। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের চাকরের সঙ্গে নারিকেলের বোঝা মাথায় ক'রে আন্‌ছি, তখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না, বোঝা ব'ইতে আর পারি না, তখন কাতরে মনে মনে 'মা' 'মা' ক'রে ডাক্‌ছি, এমন সময় মনে হ'ল, আমার শরীরের ভিতর থেকে কে যেন সে বোঝা মাথায় নিল। আমার আর কোন কষ্ট হ'ল না, আমি যে বোঝা টান্‌ছি, এ ভাবই আমার মনে হ'ল না।"

"আর একদিন অনেক কষ্টে একটা বড় যাঁতা আন্‌ছিলাম, এমন সময়

দেখ্‌লাম, কে যেন হাত বা'ড়িয়ে যাঁতাটা ধ'রে আছে, যাঁতা ব'ইতে আমার আর একটুও কষ্ট হচ্ছে না। এগুলো সাধারণ চোখেই দে'খেছি, বাইরের জিনিষগুলি যেমন দেখ্‌ছি এগুলোও ঠিক সেই সঙ্গেই দে'খেছি।"

কথাপ্রসঙ্গে আর একদিন বলিতেছিলেন,—"নাম কর্ত্তে কর্ত্তে শরীরটা যেন electrified (তড়িৎপূর্ণ) হ'যে যে'ত। এক এক দিন নাম কর্ত্তে কর্ত্তে শরীর একেবারে full-steamed engine (বাষ্পপূর্ণ ইঞ্জিন) এর মত থাকৃত। একদিন গায়ে জ্বালা হ'চ্ছিল, তখন একটা আকন্দেব গাছ চে'পে ধ'বেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আকন্দের গাছটা শিউরে উঠ্‌ল—খুব perceptible (স্পষ্ট) শিহরণ। নাম করবাব সময মনে হ'ত, বাইরের জিনিষগুলি পুঞ্জীভূত আলোকরাশি। গাছগুলি দে'খে মনে হ'ত, আলোর রশ্মি এক জায়গায জমাট হ'য়ে সেগুলোকে তৈ'রী ক'রেছে। জমায়েত আলোক-কণাগুলিকে নিজেরই অংশ ভে'বে আঁক্‌'ড়ে ধরতে যে'তাম, হাতে ঠেক্‌ত কঠিন গাছপালা সব কিছু। তখন ছেলেবেলায একদিন স্কুল থেকে বাড়ী যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখ্‌লাম electric light (বৈদ্যুতিক আলো) এর মত লাল নীল আলোদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, বিশ্বের মাঝে সে উজ্জ্বল আলোক সমুদ্রের ঢেউ খে'লে যাচ্ছে, তার মধ্যে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি যেন আলোর কোটী কোটী বুদ্বুদ্‌! যে জাযগা থেকে এমন দেখ্‌লাম, সে জায়গাটা ছিল কাদা আর জলে ভরা। আমি সেই কাদার ভিতরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লাম। এক দুধওয়ালা সেই পথে যাচ্ছিল, সে আমার চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফি'রিয়ে বাড়ী এনে দিয়ে গিয়েছিল। একদিন কাশীপুর যাচ্ছিলাম, দেখ্‌লাম, তড়িতের বিন্দুর মত জ্বলন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর বিন্দু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়ান। সেগুলো এক একটা whirlpool (আবর্ত্ত) এর মত, আর দেখ্‌লাম, যেন এইগুলি একত্র হ'য়ে সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টি ক'রেছে।" এই সহজ বোধের দরুণ তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, গভীর প্রেম ও ভালবাসা।

আর একদিন নামজপ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। কথায় কথায় তিনি বলিলেন—"ছোটবেলায় সব সময নাম-ময় হ'য়ে থাকৃতাম। দিনরাতই নাম করতাম। কোন কালেই আসনাদি ক'রে নামধ্যান করি নাই। নাম করতে খুবই ইচ্ছা হ'ত, খুবই ভাল লাগ্‌ত, তাই সর্ব্বদাই নাম চালাতাম্‌। একদিন চুপ ক'রে নাম কচ্ছি, দেখ্‌লাম, প্রকাণ্ড সূর্য্যের মত জ্বলন্ত গোলাকার পদার্থ আমার সম্মুখে ভে'সে বে'ড়াতে লাগ্‌ল। চোখ যেন ঝল্‌সে যায়। শেষে সেটা ধীরে ধীরে মি'লিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দেখ্‌তাম, শত সহস্র চন্দ্র সূর্য্য আমার চারিদিকে ঘুরছে আর শব্দ কচ্ছে, যেন সহস্র সহস্র

ইলেক্ট্রিক্ পাওয়ার হাউস্ এক সঙ্গে শব্দ কচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হ'ত প্রাণ যায় যায়, কিন্তু তবু নাম করা ছাড়ি নি। নাম কর্তে কর্তে সমস্ত শরীরটা মনে হ'ত যেন আগুন। থার্ম্মোমিটারে হাত দিয়ে দে'খেছি ১১০° ডিগ্রী উত্তাপ উ'ঠেছে। গায়ে জল ঢে'লে দিলে বাষ্প হ'য়ে যে'ত, এই অবস্থায় আমার সাধারণ জ্ঞান কিন্তু স্বাভাবিকই থাক্তো।"

সর্ব্বক্ষণ নামজপে বিভোর হইয়া থাকিবার ফলে তাঁহার যে এই সকল অবস্থা হইত, জননীদেবী তৎসমুদয় বিবৃত করিয়া পশ্চিমের তদানীন্তন গুরু সরকার সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। জননীদেবীর গুরু হুজুর মহারাজ এবং তাঁহার তিরোধানের পর মহারাজ সাহেব উভয়ই তখন স্বর্গগত। সরকার সাহেব তাঁহাদের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকার সাহেব পত্র পাইয়াই বালক অনুকূলচন্দ্রকে অবিলম্বে দীক্ষাদান করিবার জন্য মনোমোহিনীর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সরকার সাহেবও তখন অন্তিম-শয্যায়। তাঁহার পত্র পাইয়াই জননীদেবী পুত্রকে যথারীতি সত্যনামে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বালক অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্মশ্রুবিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ এক দিব্য পুরুষ-মূর্ত্তি (সরকার সাহেবের বলিয়া মনে হয়) দেখিতেছেন, বলিতে লাগিলেন। যেদিন হিমাইতপুরে বালক অনুকূলচন্দ্র দীক্ষিত হন, ঠিক সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই সরকার সাহেবও গাজীপুরে দেহরক্ষা করেন। মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি প্রিয়শিষ্য আনন্দস্বরূপকে ডাকিয়া কহিলেন—"যাও, কাম্ হো গিয়া—।" এই কথা কয়টী বলিতে বলিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যাক্, অনুকূলচন্দ্রের বর্ণিত বাল্যের অভিজ্ঞতার কথা যাহা বলিতেছিলাম—

"* * * নাম মার কাছ থেকে নেবার আগেই আমি নাম কর্ত্তাম। অতি ছোটবেলা থেকেই নাম কর্ত্তাম। মা হুজুর মহারাজকে গুরুদেব ব'লে ডাক্তেন, আমি পরমপিতা ব'লে ডাক্তাম, আর তাঁরই ধ্যান সর্ব্বক্ষণ সহজেই হ'ত। নাম কর্তে কর্তে হাত-পা সব শরীরের ভিতরে ঢু'কে যে'তে চাইত। কষ্টে প্রাণ যায় যায় হ'ত, তবু ছাড়তাম্ না। তখন নাম করা ছাড়্তে চাইলেও নাম আর আমাকে কিছুতেই ছাড়্ত না। আপনা আপনি নাম হ'তে থাক্ত। তখন এত ভীষণ কষ্টের সঙ্গে এমন আনন্দ হ'ত যে, মনে হ'ত বুঝি আনন্দের চোটেই ম'রে যা'ব। ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে সে অসীম আনন্দের হাত এড়াতে পারি না। জলে একটা বাঁশ পু'তে নিলাম। এমন হ'লে জলে ডুব দিয়ে বাঁশটা ধ'রে থাক্তাম। কিন্তু তাতেও আনন্দের খাক্তি হ'ত না, যেন ঠে'লে ঠে'লে তুল্ত।"

বাল্য-কাহিনী আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন বলিতেছিলেন,—"ছোটবেলা

জননী মনোমোহিনী দেবী

থেকে দেখ্‌তাম পৃথিবীতে নানা রকমের গাছ। মনে হ'ত, এক মাটী থেকে এতগুলো গাছ হ'লো কি করে? এই নিয়ে জঙ্গলের ভিতর ব'সে কেবল চিন্তা কর্ত্তাম্। কিছু মীমাংসা কর্ত্তে না পে'রে মাঝে মাঝে কেঁ'দে ফে'লে দিতাম, আর কেবল নাম ক'রে যে'তাম। মনে হ'ত যদি কোন দেবতা এসে আমার প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দেন!" বালক মাটী খুঁড়িয়া মূল উঠাইয়া ফুল, পাতা, ডাল—গাছের প্রত্যেকটী অংশ তন্ন-তন্ন করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন আর নাম করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার বোধে আসিল—তাইত', বীজগুলি যে স্বতন্ত্র, তাই গাছগুলিও পৃথক পৃথক রকমের হ'য়েছে। বাল্য হইতেই এই সহজ ধ্যান ও নাম-জপের ফলে বালকের মনে সৃষ্টি-রহস্যের নানা অদ্ভুত প্রশ্নের উদয় ও মীমাংসা হইত। জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, জীব-জন্তু, গাছ-পালা—দুনিয়ার যত-কিছু সমস্তই তিনি অতি গভীরভাবে আপনার মত ভাবিয়া অনুভব করিতেন। আর তাই মানুষের জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নানা সমস্যার সহজ সরল সমাধান তাঁহার জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভূতির নিকট ধরা পড়িত। প্রতিটী বিষয়ের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি এত গভীরভাবে তাহাতে মনোযোগের সহিত প্রবেশ করিতেন যে, তাঁহার তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের নিকট অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্যগুলিও বিশদভাবে প্রকট হইয়া পড়িত।* এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

* ১৩৩৫ সনের কথা। ফ্রী প্রেসের রিপোর্টার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আপনি নাকি ছোট বেলায় খুব নাম করিতেন? নাম করা মানে কি? নাম করিলে কি হয়?" শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"পাতঞ্জলে আছে 'তজ্জপস্তদর্থভাবনঞ্চ'। নাম করা মানে যাহা জপ করিতে হইবে তাহা মনে মনে উচ্চারণ করিয়া তাহার অর্থ-ধ্যান বা তাহাকে ধ্যান করা। তা'তে একটা শব্দ লইয়া মনে মনে অনবরত উচ্চারণের ফলে আমাদের স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। তার ফলে আমাদের কোষগুলি যেমনতর আছে তার চেয়ে ঢের বেশী সাড়াপ্রবণ হয়—আর এই সাড়াপ্রবণ হওয়ার দরুণই যে-সমস্ত সাড়া পূর্ব্বে বোধের অগম্য ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হইয়া উঠে। আর অনবরত অনুরাগের সহিত একচিন্তাপরায়ণতার দরুণ অর্থাৎ প্রিয়চিন্তা বা ধ্যানের ফলে ঐ সাড়াপ্রবণ কোষগুলি এমনতর ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হয় যা'তে সাড়া ত' লয়ই—আরও অটুট্‌ভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ গ্রহণক্ষম হয়। ক্লীং, ওঁ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক বা বীজযুক্ত নামগুলি জপ করিলে মস্তিষ্ককোষের সাড়াপ্রবণতা—সূক্ষ্ম বোধশক্তি—বাড়ে, আর কোন মূর্ত্তি-ধ্যানের ফলে স্নায়ুগুলি গ্রহণক্ষম হয়। তা'হলেই আমাদের পর্য্যবেক্ষণগুলি কত উন্নত, কত গভীরতর হইয়া উঠে দেখুন;—আর এগুলি-সব নাম ও ধ্যান হইতে যেমনতর ভাবে হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে বোধ হয় এমনতর ভাবে সম্ভব

২

খুব ছোটবেলায় একদিন ভাটের পাতা খাওয়ায় তাঁহার পেট-ব্যথা করিতে থাকে। একবার তাঁহার এক সঙ্গীর পেট-ব্যথা হইলে তাহাকে ভাটপাতা ভিজান জল খাইতে দিয়া দেখিলেন, তাহার যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে বালকের ধারণা হইল যে, কোন জিনিষ সুস্থ শরীরে খাইলে শরীরে যাহা যাহা হয়, কোন রোগে যদি সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তাহা ব্যবহারে উক্ত রোগ সহজেই আরাম হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের নাম তখনও তিনি শুনেন নাই, অথচ ইহার মূলসূত্র—'সমঃ সমং শময়তি' এই গভীর সত্যটী অদ্ভুত পর্য্যবেক্ষণের ফলে অতি শৈশবেই কেমন সহজে তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন!

আর একদিনের ঘটনা। পাবনা স্কুলে পড়িবার সময় একদিন তাঁহার খেয়াল হইল,—দোয়াত লইয়া স্কুলে যাইতে অসুবিধা হয়, কলমের মধ্যে কালী ভরিয়া নেওয়া যায় কি না? এই মনে ভাবিয়া একটী সরু খাগের নল কালীতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে নিব্ লাগাইয়া একটী কলম প্রস্তুত করিলেন। লিখিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, নিবে কালী আসে না, অমনি বুদ্ধি করিলেন,—কলমের উপর দিকটা বন্ধ আছে, সেখানে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে হয়। পিন্ দিয়া একটী সরু ছিদ্র করিয়া দেওয়ায় কালী আসিতে লাগিল সত্য, কিন্তু এত বেশী পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, তিনি আর এক নূতন সমস্যায় পতিত হইলেন। এইবার চিন্তা করিয়া ছিদ্রপথে একটী আলপিন্ রাখিয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া কালীর পরিমাণ নিয়মিত করিলেন। কতকাল পূর্ব্বে ফাউন্টেন্ পেন্ যখন চক্ষেও তিনি দেখেন নাই, ইহার নির্ম্মাণের এই মূল সঙ্কেতটী কেমন অনায়াসে এই বালকের মাথায় আসিয়াছিল।

আর একটী ঘটনা বলিতেছি। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় একদিন শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে বলিতেছিলেন—"এক আর এক দুই।" শুনিবামাত্র তাঁহার মনে সংশয়ের উদয় হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তাইত! এ কিরূপে সম্ভব? জগতে যত বস্তু দেখতে পাই সবই ত' পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। কোন একটী বস্তুর সঙ্গে আর একটী বস্তুর ত' পূরাপূরি মিল মোটেই দেখ্‌তে পাই না। ঠিক একই রকমের দুইটী জিনিষই যদি না থাকে তা' হ'লে এক আর এক কি ক'রে দুই হ'বে?" বালক শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কিরূপে হয়?" বালকের উত্থাপিত প্রশ্নের মর্ম্ম শিক্ষক

নয়। তবে এক কথা,—যা'তে বা যাঁহাতে এ নাম সার্থক হইয়াছে সে-ই বা তিনিই ধ্যেয় ও অনুসরণীয়,—কারণ ইহা করিলে যে যে ভাবগুলি উত্তেজিত হয় তাঁহার দেহের ভঙ্গিমায় সেগুলি প্রকটিত থাকে।"

মহাশয় বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না, বরং এই সহজ কথাটী বুঝিতে পারিল না বলিয়া বালককে তিনি প্রহার করিয়া বিদায় করিলেন।

বালক একবার পিতার সঙ্গে ঢাকা যাইতেছিলেন। ষ্টীমারের ইঞ্জিন চলিতে দেখিয়া তাঁহারও একটী ইঞ্জিন তৈয়ার করিবার সাধ হয়। বাসায় পৌঁছিয়াই একজন কারিকর ডাকিয়া জাহাজের কল-কব্জা যেমন দেখিয়াছিলেন তাহাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং সেই লোকটী দ্বারা কতক-গুলি অংশ নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। এই সকল অংশ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির সাহায্যে একটী ইঞ্জিনের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করতঃ ইহাকে চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কিছুক্ষণ ইঞ্জিন চলিল না, তারপর ইহার চাকা হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুরিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ চলার পরেই ফাটিযা গেল। এইরূপ বালক যখনই যাহা-কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, তৎসম্বন্ধে একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা তাঁহার তরুণ মনে জাগিয়া উঠিত।

"পাবনা ইনষ্টিটিউসনে" তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় ১৩১৩ সালের ২৮শে শ্রাবণ তারিখে সতের বৎসর বয়সে, ধোপাদহ-নিবাসী ৺রামগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা ষোড়শীবালা দেবীর* সহিত তাঁহাব প্রথম বিবাহ হয়। ছোটবেলায় অনুকূলচন্দ্রের একবার কঠিন অসুখ করিযাছিল ; তখন দিদিমা বালকের রোগমুক্তির জন্য তাঁহার বিবাহের সময় দেহের ওজনে বাতাসা দিযা 'হরি-লুঠ' দেওয়ার মানত্ করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ 'হরি-লুঠ' এবং গীতবাদ্য প্রভৃতি নানা আমোদ-প্রমোদের সহিত কৃষ্ণসুন্দরী পৌত্রের বিবাহ দিলেন। এই ব্যাপারে অনুকূলচন্দ্রের বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠিগণ অনেকেই যোগদান করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর কিছুদিন তিনি স্থানীয় জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর পিতার সঙ্গে থাকিয়া ঢাকায় আমিরাবাদের কাছে "রাইপুরা" স্কুলে এবং তথা হইতে নৈহাটী গিয়া আত্মীয় ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করতঃ তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে পাঠ্যাবস্থায় বালক একটী সাহায্যভাণ্ডাব স্থাপন করিয়া নিকটবর্ত্তী বহু ক্ষুধাপীড়িত দুঃস্থ ব্যক্তির অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সচ্চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

* ইঁহার গর্ভে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সন্তান-সংখ্যা চারিটী। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর, বিবাহিত), দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিবেকরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর), তৃতীয়—কন্যা শ্রীমতী সাধনা দেবী, বি-এ, (বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর, বিবাহিতা) ও কনিষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

নৈহাটী স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। মনোনীত ছাত্রদিগের মধ্যে কোন এক সমপাঠীর আর্থিক অবস্থা বড়ই অসচ্ছল ছিল। অর্থাভাবে ফিসের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বালকটী অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও হতাশ হইয়া পড়ে। সহপাঠীর এই দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া বন্ধুবৎসল অনুকূলচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হন। বাড়ী হইতে পিতৃদেব তাঁহার পরীক্ষার জন্য যে অর্থ পাঠাইয়াছিলেন তাহাই তিনি আগ্রহের সহিত বন্ধুটীকে দান করিলেন। তৎপ্রদত্ত অর্থ দ্বারা ফিসের টাকা যথাসময়ে দাখিল করিয়া বালকটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি যে পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, সে বিষয়ে আর কাহাকেও জানিতে দিলেন না। তাঁহার বাল্যের পাঠ এইখানেই পরিসমাপ্ত হয়।

অনুকূলচন্দ্র বাল্যাবধি খুবই লোকপ্রিয় এবং নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময়, ছুটীর দিনে বন্ধুদিগকে লইয়া তিনি গীত-বাদ্যের আসর জমাইতেন। নিজেই নাটক ও যাত্রার পালা রচনা করিতেন, নিজেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেন এবং দলের অন্যান্য সকলকে স্ব স্ব ভূমিকায় উত্তমরূপে অভিনয় করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন মধুর ছিল, সঙ্গীতেও তেমন অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল।

বালক অনুকূলচন্দ্র কবিতা-রচনায় খুবই আমোদ পাইতেন। এই নেশায় তাঁহার মন এমন ভরপূর থাকিত যে, অনেক সময় খেলাধূলা ভুলিয়া যাইতেন এবং রাস্তায় চলিতে ফিরিতে সমপাঠিগণের সহিত প্রায়শঃ কবিতায় উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন। "পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনে" চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্ত্তমান ৭ম মান) অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি 'দেবযানী' নামক একখানা নাটক রচনা করেন। গ্রামবাসী অনেকেই ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি বহু কবিতা ও গান এবং আরও কয়েকটী নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের অসংখ্য রচনার যৎকিঞ্চিৎ গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতায় ডাক্তারী-শিক্ষা

নৈহাটী হইতে অনুকূলচন্দ্র ডাক্তারী পড়িবার জন্য কলিকাতায় গমন করেন এবং তথায় বাবু শরৎচন্দ্র মল্লিকের 'ন্যাশন্যাল্ মেডিকেল কলেজে' ভর্ত্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন না বলিয়া, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ভর্ত্তি করিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, —"পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যদি কলেজে প্রবেশের যোগ্যতার প্রমাণ হয়, তবে আমাকেও পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অনায়াসেই ভর্ত্তি করিতে পারেন।" কর্ত্তৃপক্ষ বালকের এই ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। গৃহীত পরীক্ষায় উত্তমরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া অনুকূলচন্দ্র যথারীতি ভর্ত্তি হইলেন।

কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাক্তারী কলেজের পড়াশুনা চালাইতে হইয়াছিল। গ্রে ষ্ট্রীটে এক কয়লার গুদামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এরূপ নোংরা স্থানে বাস করিবার দরুণ তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ অসম্ভব ময়লা হইত। একটু সাবান কিনিয়া তাহা যে পরিষ্কার করিয়া লইবেন সে সঙ্গতিও তাঁহার ছিল না। বস্ত্রাদি এমন মলিন হইত যে, অঙ্গুলি দ্বারা সামান্য আঘাত করিলে তাহা হইতে ধূলিকণা নির্গত হইত। এইরূপ অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া কলেজে যাইতেন বলিয়া একদিন অধ্যাপক তাঁহাকে ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর, কত কষ্ট করিয়া দীর্ঘপথ হাঁটিয়া তিনি কলেজ করিতেন! গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রত্যহ বৌবাজার ষ্ট্রীটে কলেজ করিবার জন্য যাইতেন; ডিসেক্‌সন্ করিবার জন্য যাইতে হইত মুবারীপুকুরে। আবার রাত্রে কলেজ-সংলগ্ন হাসপাতালে রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষার কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিতেন। ট্রামে যাওয়ার পয়সা জুটিত না। পদব্রজেই সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন।

এক ব্যক্তি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ নিয়াছিলেন। এই টাকার সুদ মধ্যে মাসিক ১০৲ দশ টাকা তিনি অনুকূলচন্দ্রের কলেজে পড়িবার খরচ বাবদ পাঠাইতেন। এই সামান্য টাকা দ্বারা যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত বলিয়া, অল্প পয়সায় হোটেলে আহারাদি করিতেন। এজন্য যারপরনাই অযত্নের সহিত তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইত। কোন দিন শুধু কাঁচকলার সামান্য ঝোল, কোন দিন বা সামান্য

একটু পাত্‌লা ডাল তাঁহার ভাগ্যে জুটিত। নিতান্ত অপরিষ্কৃত স্থানে অবহেলার সহিত প্রদত্ত স্বল্পপরিমিত এইরূপ কদর্য্য আহার গ্রহণ করিয়া তিনি দিন কাটাইতেন। খাদ্যাদি অনেক সময় অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। একদিন খাইতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, ভাতের উপর খানিকটা কফ পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিন আর তাঁহার খাওয়া হইল না। সামান্য দশটী টাকার সাহায্যে যদিও অতিকষ্টে কোন রকমে খরচাদি চালাইতেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল,—ভদ্রলোকটী আর টাকা পাঠাইলেন না। এমতাবস্থায় তাঁহার আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত রহিল না। একদিন এমন হইল যে, তাঁহার হাতে সেদিন মাত্র ছয় আনা পয়সা আছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, একবেলা মুড়ি-নারিকেল ও একবেলা শুধু জল খাইয়া কোনমতে চালাইবেন। তখনই এক বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কাতরতার সহিত তিনি অনুকূলচন্দ্রকে জানাইলেন যে, অন্ততঃ আট আনা পয়সা তাহাকে না দিলে তাহার কষ্টের একশেষ হইবে। অনুকূলচন্দ্রের হাতে যে ছয আনা পয়সা ছিল তাহাই তিনি বন্ধুটীকে দান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কপর্দ্দকশূন্য হওয়ার ফলে, যখনই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইতেন, রাস্তায় গিয়া কলের জলে উদর পূর্ণ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন এবং এই অবস্থায়ও সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া কলেজ করিতেন। এই ভাবে দুই দিবস অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিন তাঁহার পেটে বায়ু সঞ্চিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সহপাঠিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কষ্টে দযাপরবশ হইয়া বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে আনিয়া দেখাইলেন। অধ্যাপক যে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন তাহা কিনিতেও অন্যূন বার আনার দরকার। অর্থাভাবে ঔষধ আনা হইল না। অনুকূলচন্দ্র তখন প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় অস্থির। এমন সময় কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীর একটী ছাত্র নিজেই অর্দ্ধ পয়সার 'সোডা বাই-কার্ব্ব' কিনিয়া আনিয়া তাহা দুই তিন মাত্রা খাইতে দিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিল, তিনি সুস্থ হইলেন।

ঈদৃশ নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হইয়াও বালক পিতামাতাকে এ সকল বিষয় কিছুই জানাইলেন না। সহরে তাঁহার অনেক আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। প্রত্যেকের বাড়ীতে একদিন করিয়া খাইলেও তাঁহার অনেক দিন কাটিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তিনি তাহা পছন্দ করিলেন না। অবিচলিত চিত্তে অসীম ধৈর্য্যের সহিত তিনি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া এই বিপদের সময় অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসু সেবা এবং সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া গুদামের কুলীরা তাঁহার

নিতান্ত আপন-জন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়লার গুদামের নিকটেই একটী মিছ্‌রীর কারখানা ছিল, সেখানেও অনেক কুলী কাজ করিত। তাঁহার সরল মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহারাও তাঁহার যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে এক ডাক্তারখানা ছিল, সেই ডাক্তারখানার ডাক্তার বাবু হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুকূলচন্দ্রকে একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স এবং একখানা পারিবারিক চিকিৎসা বহি দিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে অনুকূলচন্দ্র কুলীদিগকে অসুখ-বিসুখে ঔষধপত্র দিতে লাগিলেন। প্রত্যহ অধ্যয়ন করিয়া যে সময়টুকু পাইতেন এই সকল দরিদ্র রোগীদিগের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসায় তাহা অনেক দিন কাটিয়া যাইত। কুলীরা ইচ্ছা করিয়া যে যাহা দিত তাহাই তিনি লইতেন, নিজে কখনও কাহারও নিকট কিছুই চাহিতেন না। এই অর্থ দ্বারা তিনি সময় সময় দরিদ্র কুলীদিগকে কাহাকেও জামা, কাহাকেও বস্ত্র এবং কাহাকেও বা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া দিতেন। আপনার এই স্বভাবসিদ্ধ সেবাগুণে কুলীদিগের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি জন্মিল। তাহারা অনুকূলচন্দ্রকে ছাড়া আর কিছু বুঝিত না। তাহাদের প্রাণের যত সুখ-দুঃখ তাঁহার কাছে বলিয়া শান্তি পাইত এবং নিতান্ত আপন-জনের মত তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে কত চেষ্টা করিত। কুলীরা অনুকূলচন্দ্রের এতই বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, যখন তিনি দেশে যাইতেন তাহারা সকলে মালপত্র মাথায় করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া যাইত এবং বাড়ী হইতে ফিরিবার দিনও ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিত। পাঠ্যাবস্থা হইতেই নিরন্ন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, রুগ্ন প্রতিবেশীর সেবা করিয়া অনুকূলচন্দ্র দেশের সত্যিকার অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, আর সেবাই যে দারিদ্র্য-মোচনের অমর মন্ত্র তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র এইভাবে আহারাদি এবং বাসস্থানের নানা কষ্ট সহ্য করিয়া পড়াশুনা করিতেন, ভাবিতেন ছুটীতে বাড়ী গিয়া কিছু দিন ভাল খাওয়া-দাওয়া করিয়া শরীরটী সুস্থ করিয়া আসিবেন, কিন্তু মা ও দিদিমার কঠোর শাসনে ইহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। বিবাহিত ছিলেন বলিয়া ছেলের বাড়ী থাকা অভিভাবকেরা মোটেই পছন্দ করিতেন না। ছুটীর মধ্যে বাড়ী আসিলে কিছু দিন যাইতে না যাইতেই তাঁহারা বালককে সত্বর বাড়ী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাওয়ার জন্য অস্থির করিয়া তুলিতেন।

মেডিকেল কলেজে মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া অনুকূলচন্দ্রের খুবই সুনাম ছিল। বলবতী জ্ঞানপিপাসা থাকা সত্ত্বেও পুস্তকের অভাবে কোন দিন

তিনি সাধ মিটাইয়া পড়িতে পারেন নাই। ডাক্তারী পুস্তকের মূল্য অত্যধিক, অবশ্য-প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্যও বাড়ীতে অর্থের জন্য লিখিলে, গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন অনেকেই মাকে বলিতেন যে, বইএর দাম কখনও এত অধিক হইতে পারে না। মা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং পাছে ছেলে অর্থের অপচয় করে এজন্য কখনই উপযুক্ত অর্থ পাঠাইতেন না। প্রয়োজনমত পুস্তক ক্রয় করিতে না পারায় অধ্যয়ন-কার্য্যে বালককে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। যাহা হউক, নানা আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও বিশেষ অধ্যবসায়ের ফলে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সকল বিষয়েই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

অনুকূলচন্দ্র যখন চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার আবাল্য বন্ধু ৺অনন্তনাথ রায় তাঁহার পাঠের সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য অনন্তনাথ সার্কুলার রোডে "হোয়াইট্ হল্ ফার্ম্মেসী" নামক একটী ঔষধের দোকানে কম্পাউণ্ডার-এর কার্য্য গ্রহণ করেন এবং সেই উপার্জ্জন দ্বারা অনুকূলচন্দ্রের মেসে থাকিয়া পড়িবার কতক ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

এইবার আমরা তদীয় অপূর্ব্ব চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালীন একটী অতি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কলেজে অধ্যয়ন-কালে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, কোন দিন একটু অবসর পাইলেই তিনি গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন এবং নদীতীরে বসিয়া সূর্য্যাস্তের রমণীয় শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। পড়াশুনা এবং পারিপার্শ্বিক লোকজনের সেবা-শুশ্রূষায় প্রায়ই ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া সমবয়স্কদিগের সহিত সর্ব্বদা মিশিয়া গল্পগুজব বা আমোদ-প্রমোদে বৃথা সময়-যাপনের বড় সুযোগ পাইতেন না। কোন কোন উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীদিগের তাহা ভাল লাগিত না। তাঁহার সহপাঠী কয়েকটী ছেলে নিতান্ত কুচরিত্রের ছিল। তিনি দেখিতেন, এই সকল ছেলেরা স্নানের সময় গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের উপর কুভাবে দৃষ্টিপাত করিত এবং তাহাদের লইয়া নানা হাস্য-পরিহাস করিত। অনুকূলচন্দ্র সমপাঠিগণের এই সকল হীন আচরণে বড়ই ব্যথিত হইতেন এবং সুযোগমত তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। এই সকল কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েকজনে পরামর্শ করিল—'ইনি কিরূপ চরিত্রবান আমরা একদিন পরীক্ষা করিব।'

একদিন সন্ধ্যাকালে অনুকূলচন্দ্র গঙ্গাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় দুইটী দুশ্চরিত্র যুবক, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে, বাড়ীভাড়া আদায়ের অজুহাতে শোভাবাজার ও গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে এক বেশ্যা-রমণীর বাড়ীর নিকট লইয়া যায়। এমতাবস্থায় সঙ্গীদ্বয়ের দুরভিসন্ধি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (বাল্যে)

বুঝিবামাত্র অনুকূলচন্দ্র সেস্থান হইতে সত্বর চলিয়া আসিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন, কিন্তু সঙ্গীরা তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে ছিল না—বলপূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিয়া রাখিল। বিপন্ন অনুকূলচন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া স্নেহকঠোর দৃষ্টিতে সঙ্গীদ্বয়ের দিকে চাহিলেন এবং হাতটা ছিনাইয়া লইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীরা আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বেগতিক দেখিয়া তাহারা এখন তাঁহাকে কাঁধে লইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে একটী দ্বিতল বাড়ীর উপরে দ্রুত উঠিযা গেল। এইবাব তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভাই, তোরা আমায় কোথায নিয়ে এলি? তোদের দু'টী পাযে পড়ি, আমায ছে'ড়ে দে ভাই।" এই সময কোনমতে একবার ছাড়া পাইযা তিনি সিঁড়ি বাহিযা ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিযা যুবকদ্বয়ের একজন তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিযা তাঁহাকে ধবিয়া ফেলিল এবং উভয়ে ধরাধরি কবিয়া একটী ঘরের মেঝেতে আনিয়া ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিল।

পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত তথায দুই চারিজন বারবিলাসিনী যুবতী উপস্থিত ছিল। তাহাদেব অঙ্গভঙ্গী, আলাপ-ব্যবহার ও বাক্‌চাতুর্য্য দেখিয়া অনুকূলচন্দ্র হতভম্ব হইযা গেলেন। একটী বমণী অগ্রসর হইয়া হাস্যপরিহাসপূর্ব্বক নানা অশ্লীল বসিকতা কবিযা তাঁহাকে প্রিয় সম্ভাষণ জানাইল। ক্ষোভে ও অপমানে তাঁহার শিবায শিরায় তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সহসা আকুলকণ্ঠে চতুর্দ্দিক কম্পিত কবিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিযা উঠিলেন, আর উন্মত্ত আবেগে কত কি বলিতে লাগিলেন!—"মা, তোদের সন্তানেব অপমান হ'বে, সন্তানের অনিষ্ট হ'বে, সন্তান বিধ্বস্ত হ'বে, আর মা হ'যে তোবা আজ তাই দেখ্‌বি? তোদের সন্তান জাহান্নমে যা'বে, আর মায়ের জাত হ'য়ে, মা হ'য়ে তাই নীরবে সইবি?· ···· ·।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইযা আসিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িযা গেলেন। নিস্তরঙ্গ জলাশয়-বক্ষে সহসা কিছু পতিত হইলে যেমন তৎস্থানের জলরাশি চারিদিকে ছিট্‌কাইযা পড়ে, তেমনি তাঁহার আবেগপূর্ণ গম্ভীবনাদী পবিত্র মাতৃ-সম্বোধন ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠোচ্চাবিত মর্ম্মস্পর্শী বাক্যাবলী শুনিবামাত্র অর্দ্ধনগ্ন বমণীগণ ভীত, সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত চিত্তে ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলায়ন করিল। সংজ্ঞা ফিবিয়া আসিলে তিনি দেখিতে পাইলেন, গৃহকর্ত্রী বেশ্যা-রমণীটী দৃপ্তকণ্ঠে কর্ক্কশ বচনে যুবক দুইটীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে।

এই সময় অনুকূলচন্দ্রও চলিয়া যাইবার জন্য ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন বেশ্যা-রমণীটী আসিযা করুণকণ্ঠে বলিল,—"না বাবা, তুমি ব'স বাবা, বিছানায় বস্‌বে চল,—বড় ক্লান্ত হ'য়েছ।" অনুকূলচন্দ্রের তখন মনে পড়িল,—

সেই নিরালা গ্রামখানিতে নদীর ধারে তাঁহার মায়ের ক্ষুদ্র ঘরখানার কথা। তিনি বলিলেন—"না মা, বিছানায় ব'সে আমার ভাল লাগ্‌বে না মা।" তাঁহার পুনঃ পুনঃ মধুর পবিত্র মাতৃ-সম্বোধনে বেশ্যা-রমণীটীর অন্তরে অপূর্ব্ব সন্তান-বাৎসল্য উথলিয়া উঠিল। সে তখন কিছু খাবার এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ আনাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া কত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কিছুতেই খাইতে রাজী হইলেন না। অবশেষে অনুকূলচন্দ্র মিনতির সহিত বলিলেন,—'মা, তবে আমি এখন যাই?" ছলছল নেত্রে সে বলিল—"কি আর বল্‌ব বাবা, যদি চলেই যা'বে একবার ক'রে এস বাবা।" তিনি শুধু বলিলেন—"মা, তুই যদি সত্যি সত্যি আমায় পেটে ধর্‌তিস্‌, তবে কি একবারও এই প্রেতপুরীতে আস্‌তে তোর ছেলেকে বল্‌তে পার্‌তিস্‌?" এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। বেশ্যা-রমণীটী তখন ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া মাথা ঠুকিতে লাগিল এবং আর্ত্তনাদ করিয়া কত-কিছু বলিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, তাহার কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, ওষ্ঠ হইতে অবিরল-ধারে রক্ত পড়িতেছে, আর এই অবস্থায় উন্মত্তের ন্যায় স্বীয় জীবনের কত পাপ-কথা চীৎকার করিয়া বলিতেছে। তিনি তাহাকে সস্নেহ মধুর সম্ভাষণে ধরিয়া উঠাইলেন এবং যথোচিত সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা-প্রদানে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। অতঃপর নীচে নামিয়া আসিয়া নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে আপন গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে শুনা গেল, সেই বেশ্যা-রমণীটী তাহার সমুদয় ধনসম্পত্তি কোন সদনুষ্ঠানে দান করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তারী পড়িবার সময় কলিকাতায় অবস্থানকালীন আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিব। সে বৎসর 'করোনেশন্‌' উপলক্ষে মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতায় শুভ পদার্পণ করেন। রাজ-দর্শন প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তাহা বিশেষ পুণ্য কার্য্য মনে করিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবার প্রবল আগ্রহে অনুকূলচন্দ্র বৌবাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের নিকট বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় একজন সিপাহী আসিয়া লোকজনকে সরিয়া যাইবার কথা বলিতে বলিতে নিরপরাধ অনুকূলচন্দ্রকে অকারণে যষ্টি দ্বারা কঠিন আঘাত করে। সিপাহীর ঈদৃশ গর্হিত আচরণ নীরবে সহ্য করিয়াও তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন, অতিকষ্টে লোকের দুঃসহ চাপ সহ্য করিতে লাগিলেন এবং মাননীয় সম্রাটকে যাহাতে দর্শন করিতে পারেন তজ্জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মহামান্য সম্রাটের শকট সেই স্থান দিয়া গমন

করিল। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়, অনুকূলচন্দ্র যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, শকটখানা ঠিক সেই স্থানেই কিছুক্ষণ থামিয়াছিল। এই সুযোগে অনুকূলচন্দ্র সম্রাটকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন এবং অনুরাগের সহিত আন্তরিক অভিবাদন জানাইয়া অশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

দেহ ও মনোরোগের চিকিৎসা

ডাক্তারী কলেজের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া অনুকূলচন্দ্র স্বগ্রাম হিমাইতপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজবাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহজ সরল জীবন, সবার জন্য আপ্রাণ ভালবাসা এবং সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসী সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। রোগীদিগকে তিনি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতেন। নিজ হইতেই রোগীর বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিতেন, সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং নিতান্ত আপন-জনের মত মিষ্ট কথায় আলাপ করিয়া পীড়ার সকল কথা শুনিতেন। যাহারা অর্থাভাবে ঔষধ ক্রয় করিতে পারিত না, নিজব্যয়ে তাহাদের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। দরিদ্র রোগীদিগের জন্য তিনি অনেক সময় সাগু, বার্লি, মিশ্রী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহা নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসিতেন। অনুকূলচন্দ্রকে দিয়া একবার যে চিকিৎসা করাইত, কোনদিন তাহার রোগ হইলে, তাঁহাকে না-ডাকা পর্য্যন্ত সে কিছুতেই শান্তি পাইত না। তিনি রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই রোগী মনে করিত যে তাহার রোগ-যন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমিযা গিয়াছে।

রোগী-মাত্রের প্রতি সহজ-মমতাবশতঃ প্রত্যেকের পীড়ার অন্তর্নিহিত কারণ সবিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতেন বলিয়া তাঁহার বোধশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ হইযা উঠিয়াছিল যে, রোগী দেখিলেই সেই বোগের নির্দ্দিষ্ট ঔষধটী তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিত এবং এমন-কি ঔষধটী বাক্সের ভিতর যে স্থানে আছে, হাত দেওয়ামাত্রই তাহা সেখানে পাইতেন। ঔষধ-নির্ব্বাচন এমনই নির্ভুল হইত যে, রোগীও ঔষধ-সেবনমাত্রই আরোগ্য লাভ করিত। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ফলে কঠিন পীড়ার চিকিৎসার সময় ব্যবস্থাপত্র আপনা আপনি তাঁহার মস্তিষ্কে আসিয়া হাজির হইত বলিযা তিনিও চিকিৎসা করিয়া অত্যল্প কালমধ্যে রোগীকে আশ্চর্য্যরকমে সুস্থ করিয়া তুলিতেন; কিন্তু লোকে মনে করিত, তিনি মন্ত্র জানেন,—দৈবশক্তি ভিন্ন এমন সহজ উপায়ে কেহ রোগ সারাইতে পারে কি? এ সম্বন্ধে অনুকূলচন্দ্র একটী ঘটনার কথা গল্প করিয়া থাকেন।...... "একদিন কাশীপুরের রাস্তা দিয়া একটী রোগী দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় একটী মুসলমানকে মাথায় ধামা এবং

হাতে গোটাকতক বোয়াল মাছের বাচ্চা লইয়া পাবনা বাজার হ'তে আস্‌তে দেখ্‌লাম। তা'কে দে'খে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ 'ভিরাট্রাম এলবাম্‌'এর ছবি মনে পড়্‌ল। আমি তা'কে বল্‌লাম,—'ভাই তুমি কখনও এ মাছ খে'য়ো না, তোমার অত্যন্ত পেটের অসুখ কর্‌বে।' তা'তে সে বল্‌ল—'খোদা পয়দা ক'রেছেন, একদিন ম'র্‌তেই হ'বে।' এই ব'লে চ'লে গেল, আমিও চ'লে গেলাম। রোগী দে'খে আমি বাড়ী ফি'রেছি, কিছুক্ষণ পরেই সেই লোকটীর একটী আত্মীয় এসে আমাকে ব'ল্‌লে, 'লোকটীর দুইবার দাস্ত হ'য়েছে, হাত-পা ঠাণ্ডা, অত্যন্ত গা' বমি-বমি, খিল ধরার মত হ'য়েছে। পাবনা হ'তে এসে হাত-পা ধুয়ে ব'সে কেবল তামাক খাচ্ছে, এমন সময় পেটের ভিতর কল্‌-কল্‌ ক'রে উঠ্‌ল। একবার বাহ্যে গেল,—তার পর সমস্ত গা' ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌ল। কপালে ঘাম হ'তে লাগ্‌ল। তার কিছুক্ষণ পরেই আব একবার দাস্ত হওয়ায় তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছে।' আমি গিয়ে তা'কে ভিরাট্রাম এলবাম্‌ ৩০ শক্তি দিলাম, রোগীও আরোগ্য হ'ল,—সে বিশ্বাস ক'র্‌ল না, আমি ঔষধ দিয়ে তা'কে সা'রিয়েছি। লোকের কাছে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল,—আমি অলৌকিক বিদ্যা জানি।"

যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার অপূর্ব্ব রোগনির্ণয়-ক্ষমতা, অভ্রান্ত ব্যবস্থাদান, সস্নেহ রোগপরিচর্য্যা এবং দরিদ্রের প্রতি অপার দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলীর পবিচয় পাইয়া সকলে মুগ্ধ হইল। বাড়ীতে রোগীর ভীড় জমিযা গেল। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিতে লাগিল,—"ওর হাতে রোগী মরে না।" কেহ বলিতে লাগিল, "উনি ত' ডাক্তাব নন্‌—ফকির, ফকিরালী জানেন।" দবিদ্রেরা দেখিল, তিনি ছাড়া তাহাদের আপন আর কেহ নাই। যে কয়েক বৎসর তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, হিমাইতপুরের ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে থাকিয়াও তিনি প্রতিমাসে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

বাল্যের তাঁহার সেই নাম-ধ্যান এবং সাধন-জগতের অনুভূতি ডাক্তারী করিবার সময়েও চলিতেছিল। তৎসম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন বলিতেছিলেন,—"ডাক্তারী কর্‌তাম, রোগী দেখ্‌তে যাচ্ছি, পথে চ'লেছি, নাম ও ধ্যান সহ দর্শন-শ্রবণের অনুভূতি হ'তে হ'তে যাচ্ছি। রোগীর বুকে stethoscope (বক্ষঃ-পরীক্ষার যন্ত্র) লাগিয়ে শুন্‌ছি, heart (হৃদ্‌যন্ত্র) বা lungs (ফুস্‌ফুস)এর sound (শব্দ) পাই না। পাই যেন নাম হচ্ছে, শুন্‌ছি ত'—কতক্ষণ তাই শুন্‌ছি। হাত দেখ্‌ছি, নামের

beat (আঘাত) দিচ্ছে এইরূপ। মন সর্ব্বদাই একমুখী হ'য়ে থাকতো—যেন টে'নে নাবিয়ে বাইরের কাজ করা হ'তো, আবার যথাস্থানে আপনি চ'লে যে'ত। রোগী দে'খে এসে ব'সেছি, ঔষধ দেবার কথা ভু'লে গে'ছি। একজন বল্লে—'বাবু ঔষধ', অমনি মনে হ'ল,—তাই ত', ঔষধ দিতে হ'বে। আর যেই মনে হওয়া অম্নি ভে'সে উঠ্‌ল একটা ঔষধ বা একটা prescription (ব্যবস্থাপত্র); তা' ভে'বে চি'ন্তে ঠিক করতে হ'ত না, যেন আপনি ভে'সে উঠ্‌ত। বোধ হয় মানুষের মস্তিষ্কে অভ্যাসের ঝোঁকই অমনতর ক'রে থাকে। মনে হয় রোগের লক্ষণগুলিই আমার অভ্যস্ত practice-এর (অভ্যাসের) ঝোঁককে অমনতর glimpseএর ভিতর দিয়ে অম্‌নি ক'রে তুলত। এই ভাবে যেই ঔষধ দেওয়া, অমনি রোগ সারা; এইরূপ হ'ত। আবার কখনও কখনও ভুলে ঔষধ বেশী দেওয়া হ'য়ে যে'ত। হয় ত' যার একটা ঔষধ পাঁচ গ্রেণ বা এক ডোজ্‌ দেওয়া দরকার, তাকে হয় ত' দশ গ্রেণ বা দুই ডোজ্‌ দিয়ে ফেলা হ'ত। কিন্তু পরমপিতা যা'তে ঐ ঔষধ অতিরিক্ত ব্যবহার না হয় তা' guard (রক্ষা) করতেন। এমন ঘটত যে, সেই অতিরিক্তটা খাওয়া হ'ত না, হয় ছেলেরা ফে'লে দিলে, না-হয় প'ড়ে গেল বা আর কিছু হ'ল। যেটুকু দরকার সেইটুকুই রোগীর খাওয়া হ'ত। পরমপিতার এইরূপ দয়ায় মোহিত হ'য়ে যে'তাম।"

চিকিৎসা-ব্যাপারে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সকলশ্রেণীর লোকের সহিত তিনি বিশেষভাবে মিশিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্র এই সুযোগে নিজ অকপট সরল ব্যবহারে আস্তে আস্তে তাহাদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ করিয়া লইলেন। দেহের চিকিৎসা ছাড়িয়া এইবার তিনি মনের ব্যাধি সারাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, দেহের রোগ সাময়িক, ইহা অল্পদিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়, কিন্তু মনের রোগ লইয়া মানুষ আজীবন কষ্ট পায়। তখন হইতে তিনি লোকের মানসিক সুস্থতা-বিধানের জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন এবং মনোব্যাধির চিকিৎসায় সকল শক্তি, উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করিলেন।

এতদঞ্চলে তখন নীতিজ্ঞানহীন দুর্ব্বৃত্ত লোকের অভাব ছিল না; ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলা সর্ব্বত্র অবাধে চলিত। এই সকল পাষণ্ডের পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান প্রভৃতি এমন কোন ঘৃণিত দুষ্কার্য ছিল না, যাহাতে সুযোগ পাইলেই লিপ্ত না হইত। প্রকাশ্য দিবালোকে নারীধর্ষণ, নারীহরণ, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি প্রতিনিয়তই লাগিয়া

থাকিত। গ্রামের মধ্য দিয়া পাল্কী করিয়া কোন স্ত্রীলোক যাইতেছেন, ইহারা সংবাদ পাইলে, তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌছান প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না; পথিমধ্য হইতেই দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে লইয়া উধাও হইত। এখন যেমন গ্রাম্য বালিকা ও বধূগণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় পদ্মায় জল আনিবার জন্য যাইতে পারেন, তখনকার দিনে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কোন যুবতী বধূ বা কন্যার গৃহমধ্যেও নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইবার উপায় ছিল না, ঘরের বেড়া বা সিঁদ কাটিয়া পাষণ্ডেরা তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিত। গ্রামের এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপিশাচগণ কর্ত্তৃক হত্যা, গৃহদাহ এবং সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের ভয়ে এই সকল অত্যাচারের বিষয় কেহ কোন দিন কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে পর্য্যন্ত আনিতে সাহস করিত না।

বাধাপ্রদানপূর্ব্বক ইহাদিগকে এই সকল দুষ্কার্য্য হইতে বিরত করা অসম্ভব মনে করিয়া, ভালবাসা ও প্রেমের সহিত তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অন্তরের যোগসূত্র স্থাপন করিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। যখনই সময় পাইতেন, তখনই তিনি তাহাদের কাছে যাইতেন এবং সকল কাজে আন্তরিক সহানুভূতির সহিত যোগদান করিতেন। সময় সময় নিজে অর্থব্যয় করিয়া তাহাদিগকে মিষ্টদ্রব্যাদি খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করিতেন এবং তাহাদের আপদ-বিপদে নানা উপায়ে সর্ব্বদা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। কেহ জানিত না, কেন তিনি তাহাদের মত দুশ্চরিত্রের সঙ্গ করিতেছেন। গ্রামবাসী অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল, হয়ত বা তিনি তাহাদের দলে মিশিয়া গেলেন। অনেকে দুঃখ করিতে লাগিলেন,—আহা! এমন ভাল যুবকটী বুঝি পথভ্রষ্ট হইয়া গেল! এজন্য পিতামাতার যথেষ্ট শাসন-তিরস্কারও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল। সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, নিন্দা-অপবাদ উপেক্ষা করিয়া যুবক চিকিৎসক স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে এই সকল অসচ্চরিত্র লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে লাগিলেন।

অনুকূলচন্দ্রের অকৃত্রিম সেবা ও ভালবাসায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং দলে দলে আসিয়া অকপট হৃদয়ে তাহাদের পারিবারিক অশান্তির কথা, মানসিক অবসাদ ও পীড়ার কথা—অন্তরের গুহ্যাতিগুহ্য সকল কথা তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া বলিতে লাগিল। এইভাবে যখন তিনি তাহাদের মনোরাজ্যে অধিকার লাভ করিলেন তখন হইতে অদ্ভুত কৌশল ও বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এই সকল পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে দুই একটী অপূর্ব্ব ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন ঘোর অন্ধকার রাত্রি। দুর্ব্বৃত্তদের কয়েকজন একত্র হইয়া

পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অনুকূলচন্দ্রও তখন উপস্থিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে কিছুতেই রাজী নয়। তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে তাহারা অনুকূলচন্দ্রকে লইয়াই বাহির হইল। এক গৃহস্থের আস্তাকুঁড়ের কাছে যাইয়া তাহারা লুকাইয়া রহিল। একটী স্ত্রীলোক ঘরে বিছানার উপর শুইয়া আছেন দেখা যাইতেছে। দুর্ব্বৃত্তেরা মতলব আঁটিয়াছে, রমণী কোন কারণে ঘরের বাহির হইলেই তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। মশার কামড়ে প্রাণ অস্থির! মাঝে মাঝে মশা তাড়াইতে গিয়া অনুকূলচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক জোরে নিজের গায়ে আঘাত করিতেছেন। শব্দ শুনিয়া সঙ্গীরা ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিতেছে এবং নানা উপায়ে তাঁহাকে থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, অনুকূলচন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভীষণ বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সঙ্গীবাও ভীতমনে উর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার পিছন পিছন ছুটিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সকলে এক মাঠের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অনুকূলচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"কি শালার মশার কামড় খে'য়ে মর্‌তে গে'ছিলাম এই ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে! আমাদের কি প্রাণের মমতা নাই? জীবনটা কি এতই তুচ্ছ?"—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল। আবেগভরে অনর্গল কত কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"আমরা কি পুরুষ নই যে, মেয়ে-মানুষের পিছনে ছুট্‌ব এমনই জঘন্যভাবে? আমাদের কি লজ্জা নাই? আমরা কি এতই নীচ, এতই হীন যে, পুরুষ হ'য়ে সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য এমন ঘৃণিত কুৎসিৎ উপায়ে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিব? যদি পুরুষই হ'য়ে থাকি, আমাদের শৌর্য্যবীর্য্য, রূপগুণ দে'খে তারাই ছুট্‌বে আমাদের পিছনে, তবে ত'? ... ..." তাঁহার অগ্নিবর্ষী প্রতিটী কথা সঙ্গীগণের প্রাণের অন্তঃস্থলে গিয়া স্পর্শ করিল; তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত বাণী তাহাদের প্রত্যেকের মনে তীব্র আত্মসম্মানবোধ সজাগ করিয়া তুলিল। অনুশোচনায় কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইল। এই ঘটনার পর হইতেই সঙ্গীদের চরিত্রে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল।

* * * * *

প্রকৃতিতে পুরুষ যে কত সুন্দর, কত মহনীয়—তাহার একটি চিত্র অনুকূলচন্দ্রের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সেদিন কেমন জল্‌ জল্‌ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক দিন তাঁহাকে গল্প করিতে শুনিয়াছি। তিনি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মভূমি
(পদ্মাতীরবর্ত্তী হিমাইতপুর)

বলেন—"* * * সঙ্গীদের সহিত যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে কথা বল্‌ছিলাম, দেখ্‌তে পে'লাম, একটা সিংহ গম্ভীরভাবে রাজার মত ব'সে আছে, একটা সিংহী তার মুখের পানে চে'য়ে আছে, যেন তৃপ্ত হচ্ছে; একটা ময়ূর পেখম ধ'রে নৃত্য ক'র্‌ছে, একটা ময়ূরী তাই দে'খে আনন্দে মাতোয়ারা; একটা পুং-দোয়েল শিষ্‌ দিচ্ছে, একটা স্ত্রী-দোয়েল তাই অবাক বিস্ময়ে চে'য়ে দেখ্‌ছে;—ভাব্‌লাম, পুরুষ কত সুন্দর! পুরুষ স্ত্রীর পিছনে ছুট্‌বে কেন? এটা যে সত্যই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ!"

আর একটী দুর্ব্বৃত্ত সঙ্গীর কথা। সে মেয়ে-মানুষের প্রতি লোলুপ বাসনা লইয়া গৃহস্থের বাড়ীর আনাচে-কানাচে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাহার পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কুৎসিৎ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুকূলচন্দ্রকে প্রায়শঃ উত্যক্ত করিত। একদিন অতিষ্ঠ হইয়া তিনি বলিলেন,—"দ্যাখ্‌, মেয়ে-মানুষকে কি অমন ক'রে পাওয়া যায়? এরও মন্ত্র আছে।" লোকটী বলিল—"হাঁ, রে'খে দে তোর মন্ত্র, বাজী রাখ্‌ দেখি! কোন মেয়ে-মানুষকে যদি বশ ক'রে দেখাতে পারিস্‌, তবে ত' বুঝ্‌ব!" তখন অপরাহ্নকাল। একটী স্ত্রীলোক পদ্মা হইতে জল লইয়া কলসী-কক্ষে গৃহে ফিরিতেছিলেন, অনুকূলচন্দ্র দূর হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ্‌বি? এখনই আমি এঁ'কে কেমন আপন ক'রে ফেল্‌তে পারি। তুই শুধু দূর থেকে আমায় লক্ষ্য ক'রে যাস্‌।" এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র রমণীটীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এমনই স্বভাব-সুলভ মধুরকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিলেন যে, রমণীর অন্তঃকরণ সন্তান-বাৎসল্যে আপ্লুত হইয়া উঠিল। এমন সুমিষ্ট প্রাণারাম মাতৃ-সম্বোধন জীবনে তিনি আর কোন দিন শুনেন নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অফুরন্ত আনন্দের অমৃত-প্রস্রবণে স্নাত হইয়া উঠিল। মাতৃহৃদয়ের সুধামাখা কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"কি লক্ষ্মী ছেলে আমার! কি চাই বাবা?" অনুকূলচন্দ্র সহজ সরল শিশুটীর মত মমতা ও সোহাগভরে হাসিমাখা মুখে কত কথা বলিতে লাগিলেন। মাতা-পুত্রে দুইজনে নানা আলাপ-আলোচনায় পথ চলিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রাস্তা ছাড়াইয়া উভয়ে বাড়ী পৌছিলেন। অনুকূলচন্দ্রের প্রাণ-জুড়ান মধুর কথাবার্ত্তায় রমণীর অন্তরখানা তখন মাতৃ-স্নেহরসে ভরপুর। তিনি বলিলেন—"কিছু খে'য়ে যা'বে না, বাছা?" এই বলিয়া নিতান্ত ত্রস্ততার সহিত গৃহস্থিত সুমিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইয়া কত আদর করিয়া পরিতোষ-সহকারে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে অনুকূলচন্দ্র বন্ধুর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেখ্‌লি ত' ভাই মন্ত্রের প্রভাব!" বন্ধুটী দূর হইতে সমুদয় ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল,

সে ত' একেবারে অবাক! তখন হইতে সে অনুকূলচন্দ্রের পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং মন্ত্র শিখিবার জন্য তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। নানা অছিলায় অনুকূলচন্দ্র তাহাকে অনেক দিন প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু এক দিন সে একেবারে নাছোড়্বান্দা হইয়া এমন ধরিয়া বসিল যে, কোন অজুহাতই আর মানে না। অনুকূলচন্দ্র তখন সহসা অতি ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং বন্ধুটীকে পদ্মার চরে জলের কাছে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অনুকূলচন্দ্রের মুখমণ্ডলের তৎকালীন অপূর্ব্ব ভাব ও তাঁহার ভীষণ তেজস্বী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বিশেষ,—মন্ত্রগ্রহণের সময় আসন্ন জানিয়া, তাহার মনে যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হইল। বিমূঢ় চিত্তে লোকটী অনুকূলচন্দ্রের নিকট দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাহাকে পদ্মার এক গণ্ডূষ জল লইতে বলিলেন। সেই নির্জ্জন নদীতটে তখন অকস্মাৎ অনুকূলচন্দ্রের দৃপ্তকণ্ঠো-চ্চারিত পবিত্র উদার 'মাতৃমন্ত্র' তাহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল,—একটা অপূর্ব্ব শিহরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া গেল! ভাবোন্মত্ত চিত্তে সে বলিয়া উঠিল—"এ তুমি আমায় কি কর্‌লে ভাই?"—এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে সে ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় অনুকূলচন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সেই দিন হইতেই এই ব্যক্তির জীবনের ধারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল।

আর একটী ঘটনা। তাঁহার এক চোর বন্ধু ছিল। সে তাঁহাকে দাদা-ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। লোকটীকে অনুকূলচন্দ্র খুবই ভালবাসিতেন। তাহার ঘরে কোন দিন আহার্য্য না থাকিলে তিনি প্রায়শঃই নিজে হইতে টাকা পয়সা দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে অনুকূলচন্দ্র বাড়ীর সম্মুখে পদ্মার ধারে একাকী বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, পদ্মার চর দিয়া একটী লোক যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিলেন। লোকটী নিকটে আসিলে দেখিতে পাইলেন, সে আর কেহ নয় তাহারই পরিচিত সেই চোর বন্ধু, চুরি করিতে বাহির হইয়াছে। কথায় কথায় চুরির কথা উঠিল। চৌর্য্য-কার্য্যে সফলকাম হওয়ার নানা প্রকার অপূর্ব্ব কৌশলের বিষয়ে তিনি তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। শুনিতে শুনিতে তাহার আর আনন্দ ধরে না। অনুকূলচন্দ্রের নিকট চৌর্য্য-কার্য্যসাধনের অনেক-কিছু উপায় শিখিতে পারিবে, এই ভরসায় লোকটী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নানা কথাবার্ত্তায় সে-রাত্রে আর তাহার চুরি করিতে যাওয়া হইল না। অবশেষে অনুকূলচন্দ্র তাহার ছেলেমেয়ের আহারের জন্য সেদিন কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—"দ্যাখ্ ভাই, আর একদিন যখন তুই চুরি কর্‌তে যা'বি

তখন কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাস্, আমি যতটা পারি তোর সাহায্য করব।" লোকটী খুবই খুসী হইয়া বাড়ী গেল।

পরদিন গভীর রাত্রে চুরি করিতে বাহির হইয়া সে অনুকূলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া চলিল। আজ আর তাহার আনন্দের সীমা নাই, কারণ দাদাঠাকুরের মত বিচক্ষণ লোক আজ তাহার সহায়। দুই জনে পথ চলিতেছেন; যাইতে যাইতে অনুকূলচন্দ্র বলিলেন,—"দ্যাখ্, এ পর্য্যন্ত তুই যত চুরি ক'রেছিস্ তা' সব একত্র কর্‌লে কোন লোকের আর চুরি ক'রে খে'তে হ'ত না,— তোর হাঁড়িতে কিন্তু কোন দিনই চা'ল থাকে না। কত লোকের মনে ব্যথা, কত লোকের সর্ব্বনাশ এক লহমায় তুই ক'রে আস্‌ছিস্, এই জন্যই পরমপিতা তোর ভাগ্যে কখনও সম্পদ লিখেন নাই,—তোরও হাহাকার আর ঘুচে না।" চোর নিস্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল ভাবিয়া বলিতে লাগিল—"তা' যা' বলেছ দাদাঠাকুর, সে কথাত' খুবই ঠিক। আমি চুরি ক'রে যেদিন যা' আনি, সেইদিনই তা' নিঃশেষ হ'য়ে যায়, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় কর্‌তে পারি না। যেদিন চুরিতে গিয়ে কিছু মিলে না, তার পরের দিন প্রায়ই উপবাসে থাক্‌তে হয়।" অনুকূলচন্দ্র বলিলেন,—"তবেই ত্যাখ্, এতে এগু'লো কি? আরও ভে'বে ত্যাখ্, এই তুই যে এসেছিস্, আস্‌বার সময় তোর ঘরের দরজা জানালা বেশ ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে এসেছিস্ ত'? খালি বাড়ী জে'নে যদি তোরই মত আর কোন দুর্ব্বৃত্ত ঘরে প্রবেশ ক'রে তোর জিনিষপত্র সব নিয়ে যায়, এমন কি তোর নিদ্রিতা স্ত্রী—যার জন্য তুই এত সব অপকর্ম্ম কচ্ছিস্—তাকেই যদি নিয়ে যায়, তবে পরমপিতার দরবারে তোর বল্‌বার কি থাক্‌তে পারে?" একথা শুনিবামাত্র হঠাৎ চোর থমকিয়া দাঁড়াইল, সে একেবারে নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ! লোকটী আর পথ চলিতে পারিল না, মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া চৌর্য্য-উপকরণ যন্ত্রপাতি পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর, তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে, আমার আর চুরি করা হ'ল না।" সেই দিন হইতে লোকটী চৌর্য্যবৃত্তি এ জীবনের মত ছাড়িয়া দিয়াছিল।

শুনিয়াছি, চিরাভ্যস্ত এই চরিত্রদোষ ত্যাগ করিতে লোকটীকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি হইলেই চুরি করিবার জন্য তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিত। যখন কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারিত না তখন সে অনুকূলচন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিত এবং সারারাত্র তাঁহার সহিত নানা আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া রাত্রিশেষে বাড়ী ফিরিত। কিছুদিন এইরূপে আসা-যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন

তাহার মনে হইল—'আমি একটা চোর, সমাজের কত হীন ও ঘৃণ্য, আমার জন্য দাদাঠাকুর রাতের পর রাত না ঘু'মিয়ে কা'টিয়ে দিচ্ছেন, আর আমি তাঁকে না ঘু'মাতে দিয়ে এবং অযথা বিরক্ত ক'রে কত কষ্টই না দিচ্ছি!' সেই দিন হইতে রাত্র হইলে যখনই ঐ কুপ্রবৃত্তি তাহাকে নাজেহাল্ করিবার উপক্রম করিত, তখন সে ছুটিয়া দাদাঠাকুরের বাড়ীতে না আসিয়া পারিত না বটে, কিন্তু তাঁহার আর ঘুম ভাঙ্গাইত না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে না পারায়, নেহাৎ যেদিন কিছুতেই শান্তি না পাইত, সেদিন অতিশয় সন্তর্পণে ও অতীব মৃদুস্বরে—"দাদাঠাকুর, জে'গে আছেন, দাদাঠাকুর, জে'গে আছেন" বলিয়া মাঝে মাঝে ডাকিত আর তাঁহার শয়নগৃহের চারিদিকে সারারাত্র ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; অবশেষে পরিশ্রান্ত হইলে, যখন তাহার প্রবৃত্তির তাড়না অনেকটা কমিয়া আসিত, তখন বাড়ী যাইয়া শয়ন করিত। কিছুদিন এই ভাবে চলিবার পর তাহার এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি একেবারে লোপ পাইল। অনুকূলচন্দ্র মাঝে মাঝে তাহাকে যে অর্থাদি দিতেন তাহা দ্বারাই কারবার করিয়া সে তখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতঃ সদ্‌ভাবে সংসার করিত।

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র এই ভাবে অকৃত্রিম সেবা ও ভালবাসার প্রভাবে দুষ্কৃতকারীদিগের অন্তর জয় কবিয়া, সময় ও সুযোগ বুঝিয়া, বিশেষ কৌশলের সহিত তাহাদিগকে সৎপথে চালিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংস্পর্শ ও প্রেরণায় অজ্ঞাতসারে গ্রামস্থ দুর্ব্বৃত্তদের জীবন ও চরিত্রে শীঘ্রই অসাধারণ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কত অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। কত পশু-মানব দেব-মানবে পরিণত হইতে চলিল। শক্তিশালী চুম্বক যেমন লৌহ-খণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে চুম্বকে পরিণত করে, তদ্রূপ তিনিও তাঁহার সহজ প্রেমের বলে সকলকে আকৃষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে স্ব-আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সংকীর্ত্তন ও মহাভাববাণী

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র এইবার সঙ্গীদিগকে লইয়া একটী সংকীর্ত্তনের দল গঠন করিলেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের বহু লোক নিত্য আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিল। পদ্মাতীরবর্ত্তী লোকালয়, বনভূমি, পথ, মাঠ, ঘাট তখন দিবারাত্র শত শত লোকের সমবেত তাণ্ডব কীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, গ্রামবাসীদিগকে লইয়া তিনি এই ভাবে তুমুল কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতেন। সে অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদী কীর্ত্তনের প্রভাব ও অনুকূলচন্দ্রের প্রেম-প্রাণ চরিত্র-মাহাত্ম্যে সকলের মনে ধর্ম্মস্পৃহা ও ভগবৎ-ভক্তি বিশেষভাবে জাগরূক হইল।

ভাবাবেশে মাতোয়ারা হইয়া অনুকূলচন্দ্র যখন কীর্ত্তন করিতেন, সে সময়ের তাঁহার ভাব-ভঙ্গী অবর্ণনীয়। তখন ভাববিহ্বল অবস্থায় কখনও বাহু তুলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেন, কখনও সঙ্গীদিগকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন, কখনও নিজে কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, কখনও অন্যকে নিজের স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেন,—আবার কখনও বা ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া কাহারও মুখচুম্বন করিতেন। কীর্ত্তন-কালে কোন কোন দিন তাঁহার শরীরের লোমকূপ হইতে তীরবেগে রক্তধারা নির্গত হইত। নৃত্যকালে তাঁহার ঊর্দ্ধোত্থিত নবনীত-কোমল বাহুযুগল, সুঠাম দিব্যদেহের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা, চরণদ্বয়ের ললিত গতি এবং আরক্তিম বদনমণ্ডলে আকর্ণবিস্তৃত নেত্রযুগলের দরবিগলিত ধারা যাঁহারা দেখিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমোদ্দীপী অমৃতনিষ্যন্দী সুললিত কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তি ও আনন্দের আতিশয্যে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

অনুকূলচন্দ্রকে কেহই আর তখন একজন সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিল না। 'ডাক্তারবাবু' বলিয়া ডাকিতে কেহই আর তৃপ্তি পায় না। প্রাণের একান্ত সহজ ভক্তিতে তখন হইতে সকলে তাঁহাকে 'ঠাকুর'* বলিয়া সম্বোধন কবিতে লাগিল। আমরাও এখন হইতে তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া অভিহিত করিব।

---

* লোকের এই 'ঠাকুর'-সম্বোধন অনুকূলচন্দ্রের মোটেই ভাল লাগিত না, কত আপত্তি করিতেন, কিন্তু কেহই শুনিত না। বারংবার নিষেধ করিয়াও যখন কাহাকেও মানাইতে পারিলেন না, তখন সঙ্কোচ করিয়া আর কি করিবেন!—নিজেকে মনে মনে এই বলিয়া প্রবোধ

দিন যাইতে লাগিল। কীর্ত্তন পূর্ণবেগে চলিল। অনুকূলচন্দ্র গ্রামবাসী সকলের এত আপন হইয়া পড়িলেন যে, কেহই এখন আর একদণ্ড তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গ করিবার ফলে কত নগণ্য সাধারণ ব্যক্তি যে কি ভাবে এক একজন বিশেষ মানবে পরিণত হইয়াছে তাহা যথাযথ বর্ণনা করিবার স্থান নাই। এ সম্বন্ধে মাত্র একটী ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব।

একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের পরশ পাইয়া তাঁহারই প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে যে কত উন্নত হইতে পারে তাহার চাক্ষুষ উদাহরণ ছিলেন ৺অনন্তনাথ রায়। বাল্যে বা কৈশোরে সাধারণ সচ্চরিত্র বালকের বিশেষ কোন লক্ষণও তাঁহাতে দেখা যায় নাই; লেখাপড়ার বিদ্যাও ছিল না তাঁহার তেমন কিছুই। হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আবাল্য বন্ধু। বাল্য ও কৈশোরের এই সঙ্গীটী শ্রীশ্রীঠাকুরের যে কতখানি প্রাণপ্রিয় ছিলেন বিগত ১৩৪২ সনে অনন্তনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে সেবক-বৃন্দের নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিতেছেন,—"এই কাঙ্গাল আমাকে প্রথমেই যা'রা গ্রহণ ক'রেছিল তা'রা মাত্রই ছিল দুইজন—সে একজন আমার কৈশোরেব ছিল খেলার সাথী—আমার অনন্ত মহারাজ—আর একজন কিশোরীমোহন দাস। একজনই মাত্র আছে। আর একজন সে চ'লে গে'ছে এই দুনিয়ার মানুষের স্থুল দৃষ্টির অন্তরালে, বিরহ ও বেদনার ঢেউ-এ পারিপার্শ্বিক সব অন্তর হল্ দল্ ক'রে—সেদিন এই তো' এলো—ওই আসে—সেই ২৯শে মাঘ—যেদিন আমার পায়েব তলা থেকে লহমায় দুনিয়াটা স'রে গিয়েছিল, আকাশটা হ'য়ে গিয়েছিল নীলাহারা ফাঁকা—সেদিন কি কেউ তাই তোরা তার স্মৃতির আগুন জ্বালি'যে—সেই তার স্মৃতিতর্পণ ক'রে ওই আমার আগুন-ছোঁযা প্রাণ প্রত্যেক প্রাণে জ্বালি'য়ে দিবি না? কে আছ দরদী! আমার এই ক্ষীণ ডাকে প্রাণের সুরের টানে চ'লে এস শ্রদ্ধা-স্মৃতিতর্পণে যা' দিতে সাধ তাই নিয়ে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের আন্তরিক ভালবাসার তীব্র টানে অনন্তনাথ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন আর এই অপূর্ব্ব প্রণয়-পরশই তাঁহার জীবনের মোড় চিরতরে ফিরাইয়া দিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া বসিয়া

দিলেন—'লোকে পাচক ব্রাহ্মণকেও ত' ঠাকুর ব'লে ডাকে, তা' এরা আমায় যদি ঠাকুর ডে'কে আরাম পায় তা' ডাকুক্—কি আর করব্।'

অনন্তনাথকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতি সহজ ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া কত দিন, কত রাত্র তাঁহার সঙ্গ করিতে করিতে তদীয় চরিত্র-প্রভাবে অনন্তনাথের অন্তর ফাটিয়া কোথা হইতে একদিন জাগিয়া উঠিল, ভগবানকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। স্ত্রী-বিয়োগের পর অনন্তনাথ তাই মনে করিলেন, ভগবানকে পাইবার জন্য সাধনা করিবার সুবিধা ভগবানই জুটাইয়া দিলেন। ভগবৎ-লাভের এই তীব্র বাসনা দিন দিন তাঁহার মনকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে লাগিল। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাধনার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন বলিতে শুনিয়াছি—"অনন্ত মহারাজের সাধনা কি কঠোর! এমনও হ'য়েছে, তিন চার দিন ঘর থেকে বে'রোয় নি। আমি একদিন গিয়ে দেখি, সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, বুকে একটুও স্পন্দন নেই, নাড়ী সম্পূর্ণ লুপ্ত। সারা গা' লাল লাল পিঁপ্ড়েতে ঢে'কে গিয়েছে। সমস্ত গায়ে মুখে মাছি ভিন্ ভিন্ কচ্ছে, একটুও চৈতন্য নেই,—মনে কর্‌লাম ম'রে গেল নাকি! তার সমস্ত গায়ের পিঁপ্‌ড়ে ছাড়ি'য়ে দিই। মাছিগুলো কোনরকমে গা' থেকে তাড়ি'য়ে দিই, তারপর ঘর থেকে বেরি'য়ে আসি। শেষে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হ'লো। শরীরের অবস্থা দে'খে মনে হ'তো আর বেশী দিন বাঁচ্‌বে না—এমনই কঠোরভাবে সাধনা ক'রেছে!"

অনন্তনাথ বহুকাল ধরিয়া এইরূপ দুশ্চর্য্য তপস্যা করিলেন। অদ্বৈতানুভূতি, শব্দ-শ্রবণ, জ্যোতিঃ-দর্শন প্রভৃতি সাধন-জগতের অনেক-কিছু উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু এ সকল সম্পদ পাইয়াও তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; ভাবিতেন,—অনুভূতি না হয় হইলই, কিন্তু ভগবানকে পাইলাম কৈ? তাঁহাকে নরদেহধারীরূপে পাইয়া যদি তাঁহার সঙ্গ করিতে না পারিলাম তবে এ ব্যর্থ জীবন বহন করিয়া লাভ কি? যতই চিন্তা করেন, মন ক্রমেই ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একদিন ভাবিলেন,—এ জীবনে যখন তাঁহাকে পাইলামই না—দেখি পরজন্মে নবীন উৎসাহে সাধনা করিয়া পাই কি-না। এই মনে করিয়া অনন্তনাথ ইহ জীবন নাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

নির্জ্জনে সাধন করিবার জন্য বাড়ীর নিকটেই বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে অনন্তনাথ একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সাধন-গৃহের আড়িকাঠে একটী বস্ত্র রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করতঃ তাহার সাহায্যে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কাল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ বাটীতে ডাক্তারখানার বারান্দায় বসিয়া সমাগত রোগীদিগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

এমন সময় তিনি হঠাৎ বারান্দা হইতে লাফ্ দিয়া মাটীতে পড়িয়া বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া কাশীপুরের মাঠে অনন্তনাথের সাধন-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সজোরে দরজায় আঘাত করিতে লাগিলেন, এবং "অনন্ত রে! দরজা খোল্, দরজা খোল্, ভি'জে গেলাম্, শীগ্গির্ দরজা খোল্" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তনাথও জীবন অন্ত করিবার জন্য বন্ধন-রজ্জু গলায় পরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে এরূপ আকস্মিক বাধা পাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অনন্তনাথ প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কপাট অধিকক্ষণ অনুকূলচন্দ্রের সজোর আঘাত সহ্য করিতে পারিল না—অর্গলচ্যুত হইল। অনুকূলচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া অনন্তনাথকে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—"ভাই, তুই আমায় ফে'লে কোথায় চ'লে যাচ্ছিলি? ভগবান ভগবান ব'লে পাগল, ভগবান যে তোব পাছে পাছে ঘু'রে বেড়াচ্ছে!" নির্ব্বাক বিস্ময়ে এবার অনন্তনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বাল্যের ক্রীড়ার সঙ্গীটীকে অভীষ্ট ইষ্টজ্ঞানে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে অনন্তনাথ অভাবনীয়রূপে পাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ।

আজীবন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া অনন্তনাথ বিশেষ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আর কোন সাধনাই সাধনা নহে, ইষ্টের প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভালবাসাই চরম সাধনা, আর এই ভালবাসার টানে কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রিয়তমকে তৃপ্তি দিবার এক-একটা সাফল্যের আনন্দই হইল মানুষের জীবনের সত্যিকারেব প্রাপ্তি বা ভোগ—যাহার তুলনায় স্বর্গের কাল্পনিক সুখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অনন্তনাথ যত দিন বাঁচিয়াছিলেন সকলকে এই উপদেশই দিতেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও পার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারীগণকে বলিয়া গেলেন,—"ভালমন্দ এ জীবনে অনেক কিছুই কর্‌লাম, তোরা যতদূর পারিস্ প্রাণপণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করিস্, মানুষের জীবনে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা ছাড়া দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই।"

যাক্, কীর্ত্তনের সময়ের কথা যাহা বলিতেছিলাম,—কীর্ত্তন শুনিলেই শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হইয়া পড়িতেন; সকল কাজ ফেলিয়াও কীর্ত্তনে যোগদান না-করিয়া পারিতেন না। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন চলিবার পরেই নৃত্য করিতে আরম্ভ করিতেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে সময় সময় তাঁহার একটী অপূর্ব্ব অবস্থা প্রকাশ পাইত, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তনকালে নৃত্যকালীন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় তিনি ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন। তখন তাঁহার শরীরে যোগশাস্ত্রোক্ত বহুপ্রকারের আসন-মুদ্রা প্রকাশ পাইত।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও মহারাজ অনন্তনাথ

কখনও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সমস্ত দেহ ন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতেন, কখনও বা সমস্ত দেহ চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গড়াইয়া যাইত —কখনও পদ্মাসন, কখনও বীরাসন, কখনও কূর্ম্মাসন—ইত্যাদি নানা প্রকারের আসন হইত। এই সকল আসন একটীর পর আর একটী বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত নিতান্ত অভ্যস্তের মত তিনি করিয়া যাইতেন। আর এই কষ্টসাধ্য আসনগুলি নিমেষের মধ্যে অবিরাম করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার না জানি কত পরিশ্রম ও যন্ত্রণা হইতেছে মনে করিয়া দর্শকবৃন্দ অস্থির হইয়া পড়িতেন। জীবনে তিনি কখনও কোনরূপ আসনে অভ্যস্ত নহেন তবুও এত সহজে হস্তপদাদি যথাযথ বিন্যস্ত করিয়া এমন অবলীলাক্রমে আসনগুলি করিয়া যাইতেন যে, দেখিয়া মনে হইত তাঁহার দেহটী একটী মাংসপিণ্ডমাত্র, তাহাতে অস্থিমাত্র নাই, বা থাকিলেও তাহা যেন বাঁকিয়া গিয়াছে।

আসন করিবার পরেই মাটীর উপর শবের ন্যায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া নিশ্চল হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইত; তখন ক্রমে ক্রমে শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইত। গণ্ডদেশ হইতে শরীরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত অসাড় ও শীতল হইয়া যাইত। এই অবস্থায় বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু-পুত্তলির উপর স্পর্শ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞাবোধ নাই। এই অবস্থায় আত্মীয়-স্বজন শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন। সন্দেহকারী দুষ্ট লোকেরা অনেকে নির্দ্দয়ভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া শরীরে চিম্‌টী কাটিয়াছে, এমন কি জ্বলন্ত অঙ্গার পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কোন চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই।

এই বাহ্যচেতনাহীন অবস্থায় তাঁহার বদনমণ্ডল কখনও হাস্যোজ্জ্বল, কখনও নীল বিবর্ণ, কখনও বা ঈষদারক্তিম স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে দীপ্তিমান হইয়া উঠিত। এইরূপ অলৌকিক আত্মস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে তাঁহার মুখ হইতে ধীর-উদাত্ত স্বরে নানা ভাষায় গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় অদ্ভুত বাণীসমূহ উচ্চারিত হইতে থাকিত। সে সময়ে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী স্বর-লহরী, সেই আবেগ-আপ্লুত দিব্যকণ্ঠের স্বর-ঝঙ্কার বিদ্যুতের মত সমবেত জনমণ্ডলীর প্রাণ স্পন্দিত করিয়া তুলিত। সে অপূর্ব্ব সমারোহ যিনি না দেখিয়াছেন তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। এই অবস্থায় উচ্চারিত বাণী সকল সাধারণতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব, অবতারবাদ, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান,

ভক্তি, কর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, প্রেম-প্রচার, নাম ও কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিশ্ব-মঙ্গলকর নানা গভীর তথ্যে পরিপূর্ণ থাকিত। বাণীতে কোন কোন দিন উপস্থিত ব্যক্তি-বিশেষের মনের নানা প্রশ্নের উত্তর এবং জগতের ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা থাকিত। বাণীর আর একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, সেই দিনের কার্য্যাবলী তাঁহার মস্তিষ্কে যে ছাপ রাখিয়াছে তাহা পর পর সমস্তই বাহির হইয়া পড়িত—সারা দিনের গোপনীয়, অগোপনীয় চিন্তা ও কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাণী নির্গত হইত। তারপর ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত, তখন পিপাসায় কাতর হইয়া 'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতেন এবং খানিকটা জল পান করিয়া সুস্থ হইতেন।

কখনও কাহারও প্রাণস্পর্শী সুমধুর গীত-ধ্বনি শ্রবণমাত্র, কিংবা কোন দিন নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় কীর্ত্তন জমিয়া উঠিলে, উক্ত প্রকারে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ হইয়া বাণী প্রকাশ পাইত। অর্দ্ধভাবাবস্থায় কখনও যদি কীর্ত্তন থামিয়া যাইত, সে সময় খুব কষ্ট অনুভব করিতেছেন বলিয়া বোধ হইত। তখন কেহ স্পর্শ করিলে, "উঃ, দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে গেল" বলিয়া ভীষণবেগে ধাবিত হইতেন এবং হঠাৎ লাফ দিয়া ডিগ্‌বাজী খাইয়া সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত পড়িতেন। কখন আঘাত পাইতেন, কখনও ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িত, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, পূর্ণ জাগ্রত হইলে গায়ে কোন ব্যথা থাকিত না, ঘা-গুলিও অতি সত্বর সারিয়া উঠিত; আর তখন যেন অমৃত-নদীতে স্নান করিয়া উঠিলেন, এমন একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য অনুভব করিতেন। কোন কোন দিন নিজে বাণী সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন, কখনও বা সবই ভুলিয়া যাইতেন। সচেতন থাকাটাও যেন মেঘ্‌লা মনের মত—মনে একটা কুয়াসার মত ভাব থাকিত।

ভাবাবস্থার কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই একদিন বলিতে-ছিলেন—"বাণীর সময় কখনও কখনও মনে হ'ত যেন কতকগুলি idea'র ঢেউ আমার আমিত্বের মধ্য দিয়ে ফক্ ফক্ ক'রে বে'রিয়ে আস্‌ছে। আর বায়োস্কোপের ফিলিম্‌স্-এর মত ideaগুলিও দেখা দিত মূর্ত্ত জীবন্ত হ'য়ে। সে কি ভীষণ! যেন উল্কাটা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালে, আর তাই দে'খে সব বে'রুত।"

ভাবাবস্থায় উচ্চারিত বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গীয় লোকেরা প্রথমতঃ কেহই বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ক্রমে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া

পড়িল। বাণী শুনিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত। অনেকেই বাণীর ভাব-গাম্ভীর্য্য এবং সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইতেন। কিছুদিন পর নাজিরপুর-নিবাসী পাবনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ৺বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী, বি-এল্, ৺অনন্তনাথ রায় ও কিশোরীমোহন দাস প্রভৃতির চেষ্টায় বাণী লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বাণী এত দ্রুত উচ্চারিত হইত যে, শ্রবণমাত্র তাহা পূর্ণভাবে লিখিয়া উঠা কঠিন হইত। এজন্য চারি পাঁচ জন লোক এক সঙ্গে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত উচ্চারিত বাণীগুলি লিখিয়া যাইতেন এবং পরিশেষে তাহা পরস্পর মিলাইয়া সেই দিবসের পূর্ণাবয়ব বাণী প্রস্তুত করিতেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য নানা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বাণী নির্গত হইত, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহই বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া এই তিন ভাষায় উচ্চারিত বাণীগুলিমাত্র সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। অধিকাংশ বাণী বাংলা ভাষায়ই নির্গত হইয়াছে। প্রথম কয়েক দিবসের বাণী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বসমেত একাত্তর দিনের বাণী সংগৃহীত অবস্থায় আছে।* তন্মধ্যে প্রথম পনর দিবসের বাণী একত্র করতঃ "Holy Book"—"পুণ্যপুঁথি" নাম

* প্রতাপপুর-নিবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের আবাল্য সহচর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে একটা গৃহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-সমাধি প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বারেও তাঁহারই বাড়ীতে এক আম্রবৃক্ষের তলায় এই প্রকার অবস্থা ঘটে। তৎপর মাঝিপাড়ায় যদুনাথ পালের বাড়ীতে পুনরায় এইরূপ হওয়ায় এ ব্যাপারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিশোরীমোহনের উক্ত আম্রবৃক্ষের তলায় এককালে অহর্নিশ কীর্ত্তন চলিত; এই স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসংখ্য বার ভাব-সমাধি হইয়াছে এবং তদবস্থায় উচ্চারিত বহু বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্থানটীর একখানা চিত্র এখানে সন্নিবেশিত হইল। ১৩২১ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩২৬ সনের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্যান্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে হিমাইতপুর, প্রতাপপুর, বারাদি, কুষ্টিয়া, খোকসা-জানিপুর, মদাপুর, হরিণাকুণ্ড, মজিলপুর, চক্রতীর্থ, কমলাপুর, খলিলপুর, বরইচরা, ধুসণ্ডু, কণ্ঠগজরা, ধলহরাচন্দ্র, রাতুলপাড়া (এই সকল ও অন্যান্য স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্ত্তনের দল লইয়া গিয়াছিলেন) প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন সময়ে সর্ব্বমোট একাত্তর দিন বাণী হইয়াছিল। লিপিবদ্ধ বাণী-সমূহের সর্ব্বপ্রথম তারিখ বাং ১৩২১।৩১ জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৯১৪।১৪ই জুন। ঐ দিন রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় কাশীপুরে ৺অনন্ত নাথ রায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা চেয়ারে বসিয়া "নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোম ছায়া সম বিশ্ব চরাচর........." এই গানটী গাহিতে গাহিতে চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইতে উদ্যত হন। তখন তাঁহাকে ধরিয়া মাটীতে শোয়াইয়া দেওয়া হয়। আসনাদি সংঘটিত হওয়ার পর বাণী নির্গত হইতে থাকে। সেদিনও সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত কতিপয় বাণী লিখিতে পারা যায় নাই। লিপিবদ্ধ বাণী-সমূহের আদি বাণী—"আমি চাই শুদ্ধ আত্মা—"

দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থের এই নামটীও একদিনের উচ্চারিত ভাববাণী হইতেই পাওয়া গিয়াছে। কয়েক দিবসের ভাববাণীর যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

তৃতীয় দিবসের বাণীর শেষাংশ

হিমাইতপুর, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩২১ সন

"* * * প্রাণ দিয়ে ভালবাস্। খুব ক'রে ভালবাস্। কানুর সহিত পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। সব নে, মহা আমি, ভয় নাই, দুর্ব্বলতা নাই। যা' মনে করিস্ তাই হবে, শক্তি তোদের ভিতরেই আছে। তাঁকে ধ্যান করবি চব্বিশ ঘণ্টা; সব দেখ্‌বি সব সেই। তাকেই কয় 'সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করা।' জাগাও, জাগাও, জাগিয়ে তোল্; পাপীকে সান্ত্বনা কর্, পাপীকে আশ্রয় দে।"

"Trust me and give me everything. Sure! be glad and everything will make you glad. Spit on and spurn the sin, not the man, the sinner.

"When I was before, He was latent in me. When I was before, you were latent in me. When I was you, you were 'I'. I was the only one. I was latent in me. Think (within) yourselves, you were latent in me. The whole creation is within you,—no doubt the Spirit. I was the sound, sound is my creation ; therefore you are created by me. Only sound is your spirit, no doubt.

"Name and love can win everyone. Love can give everything in this world. Love can gain 'I' and love can gain 'you', and everyone will be loved. Love and name can conquer 'I', can win 'I' ; therefore love and name can conquer this universe, because this universe is 'I'. Therefore, declare name and love. Give heart to heart and win heart. Love is heaven and heaven is love. Peaceful heart can make everyone peaceful. Come to me, I will give you everything, no doubt. Be fearless and proceed on and on. Check your tongue and kiss the feet. Draw the heart fastly. Atom can feel atom."

সপ্তম দিবসের বাণীর একাংশ

হিমাইতপুর, ১৩ই আষাঢ়, ১৩২১

"একবার উন্মত্তের মত গে'য়ে গে'য়ে বেড়াতো দেখি! নিদ্রিতের কাণের কাছে গিয়ে বল্—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' বিশ্বকে স্তম্ভিত ক'রে ফেল্, তুই প্রাতঃসূর্য্যের মত সকলকে জাগা * * *।"

"My Lord! I am nothing but I. You must know all is not little, all is Supreme Soul. I am Supreme Soul,—the Para Brahma. The things which we see, are nothing but illusion and this illusion is the expression of Spirit; therefore we see it.

"Try to draw your attention upon the current of Spirit that is going on at the junction of the two eyes, at the root of your nose. It is the spirit-current onward. Children! you must fix your attention at the root of the nose. You can search the Holy Book, this was my practice when I was Jesus."

"* * * বুকভরা প্রেম নিয়ে চ'লে আয়। কোন দুঃখ নাই,—কোন কষ্ট নাই, সহস্র হাতে রক্ষা কর্‌বে। আত্মাভিমান ছে'ড়ে দে। পাপেই সব ভারী হয়। পাপ সব ঝে'ড়ে ফেল্‌তে পারিস্ নে? তোরা ছু'টে আয়—পাগল হ'য়ে ছু'টে আয়, উধাও হ'য়ে আমার পানে ছু'টে আয়;—চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, প্রেতলোক, এমন কোন লোক নাই যে তোদের গতি রোধ কর্ত্তে পারে। ছু'টে আয়—মহাদেবের মত ছু'টে আয়; মহাদেবের মত সতীকে কাঁধে ক'রে ছু'টে আয়, বুকভরা প্রেম নিয়ে, প্রাণে অসীম শক্তি নিয়ে ছু'টে আয়। পাপীকে ঘৃণা করিস্ নে। পাপীকে বুকে তু'লে নে। সব আমি তু'লে নিয়ে যাব। পাপীকে আশ্রয় দে। আমি তোদে'ক ছোঁ'ব না? তোরা আমার জীবন—তোদের পূর্ণত্বে আমার পূর্ণত্ব। যা ওদের পানে ছু'টে যা। চিন্তা কিরে? ছু'টে যা, প্রাণ-ছাড়া করিস্ নে, শান্তি পাবি কত! আমি পরদা দিয়ে রে'খেছি, তোদের জন্য আমি একটা আত্মাকে বহু ক'রে রে'খেছি—সংসার দিয়ে রে'খেছি, কত কষ্ট দিয়ে রে'খেছি;—ছুটে আয়—আপন ভুলে যা। আদিতে এক, ইচ্ছায় বহু, শেষে একা, তাই কচ্ছি। প্রথম ছিলাম নির্ব্বিকার, কিছু ছিল না; তার পর হ'লো বিকার! আবার ইচ্ছা—নির্ব্বিকার হ'তে।

আমার আমিগুলি কু'ড়িয়ে আবার পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি। দেখ্, তোদের জন্য কত ভাগ হ'য়েছি, কত মহাভাগ হ'যেছি, কেবল কু'ড়িয়ে নিতে। আয় ছু'টে আয়। তোরাই আমায় কু'ড়িয়ে নিবি। তোরা খোঁজ করিস্—তাই আমি খোঁজ করি; আবার আমি খোঁজ কবি ব'লে তোরা খোঁজ করিস্।"

দ্বাদশ দিবসের বাণী

৭ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২১ সন

"তোমার আবার ভাবনা কি? সব হ'বে, সব পা'বে, যা' চাও তাই পা'বে। যে একবার আমার শরণ লয়, তার কি আব ভাবনা থাকে? নিশ্চয় ব্রহ্মে লীন হ'বে, নিশ্চয়। আমার কর্ত্তব্য ভে'বে কর্ম্মী হ'য়ে কাজ কর্—মনে মনে ভাব্‌বি—আমার কিছুই নয়,—সব আমার! একবার আমাকে স্পর্শ কর্‌তে পা'ল্লে প্রাণে মনে, অজ্ঞাতসারে আমি তাঁকে স্বর্গরাজ্যে তু'লে দিই, পবে আমার স্বারূপ্য লাভ করে। আবার সেই বাঁশী দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে,—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' ঐ দেখ্ বল্‌চে, ঐ শোন্ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস কর্, সকলকে ভালবাস্—দেখ্, কি এক অজানা পথ দিয়ে আনন্দধামে চ'লে যাচ্ছিস্—আনন্দ!—কেবল আনন্দ!—"

ত্রয়োদশ দিবসের বাণীর একাংশ

১০ই শ্রাবণ, ববিবার, ১৩২১

"আমার আমি উ'ঠে প'ড়েছি। জীব! তোর চিন্তা কি? তোর শোক দুঃখ কি? ছু'টে আয়, বিশ্বাস কর্, ঝাঁপ দে কীর্ত্তনে, ব্রহ্ম-সাগরে ডু'বে যা'বি। তোদেব মহা মহা পাপ থাক্,—ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি ক'রে থাকিস্—ভয় নাই। আমায় বিশ্বাস কর্, আত্মাকে বিশ্বাস কর, ছু'টে চ'লে আয়, নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছু'টে আয়, ভগবান্ ভগবান্ ব'লে ছু'টে আয়, খোদা খোদা ব'লে ছু'টে চ'লে আয়, জয় Jesus জয় Jesus ব'লে ছু'টে আয়।

"দেখ্ কোথায় আছিস্ শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব আর চণ্ডাল, একবার পরমাত্মার ভাবে ভাবিত হ'। তোদের সব জ্বালা-যন্ত্রণা আমার হাত দিয়ে সব মু'ছে দে'ব। অন্তরে অন্তরে নাম কর্, নামে ডু'বে পড়্। আমি অনামী, তোদের অন্তরে অন্তরে জে'গে উঠ্‌ব।

তোদের আত্মাতে আমি জে'গে উঠ্‌ব। সকলকে বল্—ভয় নাই, চিন্তা নাই ....অভীরভীবভীঃ!

"একবার সকলের প্রাণের কাছে গে'য়ে গে'য়ে বেড়াতো যে, তোদের সকলের শান্তি দিতে পরমাত্মা জে'গে উ'ঠেছে। ছু'টে আয়, আমি তোদের শান্তি দিব, আমি তোদের স্থান দিব। আমি নরকে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত ক'রে দিব। তোরা আমারই বুদ্বুদ্, আমাতে লয় হ'য়ে যা'বি। আর বাতাসের আঘাত সহ্য কর্‌তে হ'বে না। ছু'টে আয়, বিশ্বাস কর্, মনে কর্, চিন্তা কর্—আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, আমি পরব্রহ্ম, আমি জে'গে উঠ্‌ব, আমি তোদের ভিতর প্রকট হ'ব।"

চতুর্দ্দশ দিবসের বাণী

১১ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩২১ সন

"এঁ্যা! এ কি ঘোর অন্ধকার! এ আগুনে যে দীপ্তি নাই! এখানে কেবল অন্ধকার—সব পু'ড়ে গেল! চাঁদ নাই, সূর্য্য নাই, কেবল আর্ত্তস্বর! তুমি কে গো এখানে? 'ঐ দিন গেল, দিন গেল' ব'লে চেঁচাচ্ছ কেন? কেন তুমি উত্তর দিচ্ছ না? শুধু বল্‌ছ—'দিন গেল, দিন গেল'—কিন্তু উত্তর দিচ্ছ না কেন? ও! তুমি সাবধান কচ্ছ? জীবকে সাবধান কচ্ছ? পথ খু'জে নিতে বল্‌ছ? তবে তোমার বাম দিক দিয়ে এত লোক যাচ্ছে কেন? ঐ নদীতে এত লোক ঝাঁপ দিচ্ছে কেন? ওঃ এই কি আকাঙ্ক্ষা-নদী? এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যদি না হয় তবে জপেও কিছু হয় না, ধ্যানেও কিছু হয় না, নিযত দেবতা-আরাধনায়ও কিছু হয় না। ঐ আকাঙ্ক্ষা-নদী...... .. এই আকাঙ্ক্ষা-নদীতে এসে সব ডু'বে যাচ্ছে কেবল। দ্যাখ্, প্রায় হৃদয়েই ত' এই আকাঙ্ক্ষা। আর ঐ দক্ষিণ—দক্ষিণ—এই তো শান্তি, এই তো স্নিগ্ধ আলো, এই তো কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। এত আলো, তবু তার তীব্রতা নাই। বেশ তো বাতাস বইছে! কি মধুর শব্দ,·বেশ তো, বা বা বাঃ! এখানেও তো নাম। এখানেও তো নামময়, এখানেও তো শান্তি। এখানেও তো কীর্ত্তনের ঋষিরা কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে ছু'টে আস্‌ছেন; এখানেও তো খোল করতাল' মৃদঙ্গের বাদ্য, ঐ যে সব ওঙ্কারে মি'শে যাচ্ছে। এ যে আনন্দের ধারা—বিপুল আনন্দ! ওঃ কি শান্তি! ঐ তো সব ডু'বে যাচ্ছে, ঐ ওঙ্কারে সব ডু'বে গেল! প্রাণে প্রাণে সব ডু'বে গেল! ভেদ গেল—এই তো মুসলমান, এই তো ব্রাহ্মণ, এই তো বৌদ্ধ, এই তো জৈন, এই তো শিখ—এই যে সব ওঙ্কারে লয় হ'য়ে গেল।"

চত্বারিংশৎ দিবসের বাণী

কুষ্টিয়া, ১৩২৪ সাল, ২৩শে মাঘ

"আগুন লাগিয়ে দে', পাপে আগুন লাগিয়ে দে'। মর্‌বি কেন? অমর হ'য়ে মর্‌বি কেন? তোদের প্রাণে প্রেম নাই? তোরা জানিস্ না আত্মদান কর্‌তে? তোরা অন্ধ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ কেন ভাই কাঁদ? মু'ছে ফেল চোখের জল। ঐ শোন, দূরে কান পে'তে শোন কি কলরোল শুনা যায়। দেও ঝাঁপ।

*　　*　　*　　*　　*

সংসারটা শিক্ষা। দেখ্‌বি আর শিক্ষা কর্‌বি। দ্যাখ্, ব্যথা না পে'লে কি ব্যথা বুঝা যায়? ক'রে যাও কেবল ক'রে যাও—দেখ্‌তে গেলে কি হয়? দেখ আর কর, নাই বা বিশ্বাস কর্‌লে, ক'রেই যাও না। তোমার মন, চোখ ও তোমাকে তুমি বিশ্বাস কর, তা-ই যথেষ্ট। কর্ম্ম না কর্‌লে তাঁ'র দয়া পাওয়া যায় না। ভালবাসাতে সব পা'বে। পণ্ডিতি ক'রো না, মারা যা'বে। যা' বুঝ্‌বে তা-ই বল্‌বে, সাধু ফ'লিও না—সাধু-ফলান বেশী ভাল না। অহঙ্কার কর্‌বি তো কর্—'আমি তাঁর সন্তান।' করিস্, ক'রেই দেখ।"

পঞ্চপঞ্চাশৎ দিবসের ভাববাণীর প্রথমাংশ

ধলহরাচন্দ্র (যশোহর), ২রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩২৪
স্থানীয় জমীদার যোগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী।

"সে একটা অব্যক্ত পরমানন্দ—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ প্রাণের প্রাণ, জগতের জগৎ—অণুর অণু, সে একটা বলা যায় না রে! যখন ছিল-নার সত্তা ছিল—কাল আসে নাই—যখন শব্দ ছিল—যখন সূর্য্যের চাঁদের সৃষ্টি হয় নাই তখন এক বিরাট ধ্বনি সোঽহং পুরুষ ভেদ ক'রে সৃষ্টি কর্‌তে চ'লে এল—সেই ওঁ। শব্দ সূক্ষ্ম মায়াতে, ব্রাহ্মী মায়াতে, হ্লাদিনী শক্তিতে, ঘাত-প্রতিঘাতে সে ধারা বাধা পে'ল—তখনই সৃষ্টি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সত্ত্ব, রজঃ, তম ত্রিধারা। বিরাট গতিতে শব্দ চল্‌তে লাগ্‌ল, তখন প্রাণ স্থির হয় নাই—তখন সৃষ্টি হ'ল আকাশ···বায়ু···। কাল নির্দ্দেশ ক'রে চল্‌ল, তখন সৃষ্টি তেজ—সেই শক্তি। গতি চল্‌ছিল, আবার চল্‌বে, তাই দিয়ে বিরাট জলখণ্ড। তেজ ও জলখণ্ড যখন উপর গতি ধর্‌তে না পে'রে আপন গতিতে চল্‌তে লাগ্‌ল, তখন সৃষ্টি হ'ল জড়।—আবার সেই ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হ'ল দেবতা, কিন্নর, জীবজগৎ। এখন আমি কে? সত্তা আমার কোথায়? আমি কি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্? আমি কি সেই বিরাট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আমি কি সেই সোঽহং ধারার সুরত-শব্দ? সেই সোঽহং পুরুষ সেই সোঽহং পরমাত্মা কি

ভাবসমাধি-অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র

(কুষ্ঠিয়ায় গৃহীত ফটো হইতে)

সেই অনামী পুরুষ?—কে বল্‌বে আমার সত্তা কোথায়? ছাখ্‌ আমি কি? আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমি স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব—আমি যা কিছু সব,—আবার আমি কিছু নয়। কিছু নয় সেই আমি কত সৃষ্টি ক'রেছে। কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কত আল্লা, খোদা, যীশু—কোটী কোটী অবতার আমি সব হ'য়েছিলাম—সব হচ্ছে আমার অবিরাম গতি। আমার কারণ-সত্তা না জে'নে যদি আমার কর্ম্ম-সত্তা জান………।

"আপনি মি'শে যাচ্ছে, আপনি চল্‌ছে, তাকেই বলে প্রকৃতি। আমি পরম কারণ। অনন্তকোটী দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্তা—আমিই সব। আমি সেই দয়ালদেশ, ব্রহ্মদেশ, পিণ্ডদেশ, আমিই সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ-রাধা, গোপ-গোপী, আমার আরতি করে চন্দ্র সূর্য্য তারকা, কোটী কোটী গগন সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য আমারই ফাঁদ, আর কিছু নয়। আমি লু'কিয়ে থাকি প্রতি প্রাণে, অন্তরে অন্তরে লু'কিয়ে থাকি। আমি চৈতন্যপুরুষ আবার আমিই 'হা ভগবান' ব'লে কেঁ'দে বেড়াই। আমি স্ত্রী হ'যে স্বামী-সেবা করি, আমিই স্বামী হ'য়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি····· আমিই পুত্র-কন্যা, আমি সন্ন্যাসী-বৈরাগী, আমি কত নাচি, কত কাঁদি, কত গাই, কত ভাণ ক'রে বেড়াই, আমি কুকুর হ'য়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছু'টে যাচ্ছি, আবার নির্ম্মম হ'য়ে আমারই মাথায় লাঠি মারছি। আমিই পথ—বেদ, কোরাণ, বাইবেল সব আমি। ওবে আমি জীবন্ত হ'যে ঘু'রে বেড়াচ্ছি, আমি মৃত—আমাকেই গোর দিচ্ছে, আমাকেই পোড়াচ্ছে, আবার ইন্ধন যা' কিছু সব আমি। কি করছিস্‌ তোরা সব—লে'গে যা—প্রাণপাত কর্‌—তবে ভাই অবিশ্বাসী—আর তুই দাঁ'ড়িয়ে আছিস্‌ নির্লজ্জ কাপুরুষ? ছু'টে. যা, বুক দিয়ে ধর্‌—কোল দিয়ে ধর্‌।"

পঞ্চষষ্ঠিতম দিবসের বাণীর কিয়দংশ

মদাপুর, মাঘশেষ, শনিবার, ১৩২৪ সন

"ছাখ্‌ ভাই, আমি এসেছি ভিক্ষুক তোদের দ্বারে। আমাকে চিনিস্‌ নে? আমি তোদের অপরিচিত নই। বড় জ্ব'লে এসেছি, মারিস্‌নে ভাই। একটু ভাল কথার আশায়, একটু দাদা ডাকের আশায় এসেছি। তোদের মধ্যে যত পাপ তাপ দস্যু আছে, তাদের সহায়তা কর্‌, কিন্তু আমার মাথায় পদাঘাত করিস্‌ নে। তোদের মধ্যে ভিক্ষুক-বেশে এসেছি। আমি আত্মীয়—পরমাত্মীয়—আমি তোদেরই—আমি তোদেরই। ছাখ্‌ ভাই, আর কেন

ভাই ওর গায়ে হাত দিচ্ছিস্? অনেক স'য়েছি না হয় ফি'রে যা'ব, না হয় ফি'রিয়ে দিবি। একবার আমাকে একটু স্পর্শ কর্। ছুঁয়ে দে—না হয় লাথি মার্, অস্ত্রাঘাত কর্, তথাপি বুঝ্‌বো তোদের কাছে প্রেমের আশায় প্রেম পে'য়েছি। তোরা জানিস্ না ব'লে না হয় লাথি খে'য়েছি। আমার না হয় আস্‌তে দেরী হ'যেছে, তোরা কাঙ্গাল হ'য়েছিস্ পরে এসেছি। আমি আস্‌বো ব'লে এতদিন আসি নি, সে আমারই দোষ। যেদিন তোরা নদীয়ার প্রেম ভু'লে গিয়ে নামেমাত্র বৈষ্ণব হ'য়েছিস্, সেদিন তোদের সব · গিয়েছে। বদ্ধ থাকিস্ না, বদ্ধ থাকা কি ভাল? এই মুহূর্ত্তে তোরা মুক্ত। ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর স্ত্রী পুত্র কন্যা ল'য়ে তোরা ভু'লে আছিস্। তোদের জন্য প্রার্থনা কর্‌বো। ভাবি কোন্ কৌশলে তোদের ভিতর প্রবেশ ক'রে তোদের সামিল্ হ'য়ে যাব। আমি তোদের, তোরা আমার।"

ষষ্ঠষষ্ঠিতম দিবসের বাণী

কুষ্টিয়া, ২৭শে চৈত্র, ১৩২৪ সন

"আমি কাঁদবো? আমি কাঁদি কেন? তোরা কাঁদিস্ কেন ভাই? এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত অভাবের তাড়না,—তবু বল্‌ছিস্ সুখ?—ভাই, তোরা কাতর, তাই আমিও কাতর! আবার ফু'টে ওঠ্ ভাই,—আবার তোদের গলা জ'ড়িয়ে সামগান গাই, আবার দেখি তোরা প্রত্যেকে, সেই চার বেদের প্রতিমূর্ত্তি! তোরা বল্—'আমার মৃত্যু নাই, আমি অজর, অমর, অনন্ত আত্মা!' আমি তুই, আমি তোরা, তোরাই আমি!!! যখন বলিস্, যখন কাতর ভাবে বলিস্—'আমি হীন, আমি বদ্ধ, আমি ক্লিষ্ট', তখন যে আমার বুকে বজ্রদুয়ার প'ড়ে যায়! ভাই তোরা একবার বল্—'আমি মুক্ত, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি শুদ্ধ, আমি বুদ্ধ'—দেখ্‌বি বজ্রদুয়ার ফে'টে খান্ খান্ হ'য়ে যা'বে। যখন তোরা ভাইয়ের দিকে চোখ রা'ঙ্গিয়ে তাকাস্, ভাইয়ের বুকের উপর ছুরি তু'লে ধরিস্—তখন আমি একদম ভু'লে যাই যে আমার বুকে এক ফোঁটাও প্রেম আছে! ভাই দ্যাখ্, আমি তোদেরই, আমি তোদেরই,—নিতান্তই তোদেরই, আমি তোরাই! যখন তোরা সেই ব্রজলীলায় নিত্যরাসে মাতিস্ তখন আমি প্রতি ঘটে ঘটে শ্রীকৃষ্ণ! আবার যখন তোরা নদীয়ার পথে ঘাটে বাটে হরিবোল্ হরিবোল্ ব'লে প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে নৃত্য করিস্—তখন সর্ব্ব ঘটে আমি শ্রীচৈতন্যরূপে চৈতন্য দান করি! আমি নিত্য সাক্ষীস্বরূপ,—আমিই শ্রীকৃষ্ণ, আমিই শ্রীচৈতন্য, আমিই রামকৃষ্ণ,

—আমিই সব, আমিই সব! আবার আমি শ্রীকৃষ্ণও নই, শ্রীচৈতন্যও নই! আমি আমিই, আমি তোরা!!!"

অষ্টষষ্ঠিতম দিবসের বাণী

কুষ্টিয়া, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সন

"তখন এক বজ্রপ্রেমের খেলা আরম্ভ হ'ল। তখন স্বপ্নের ভিতর, আপনার ভিতর একটি শক্তি······কাজ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। Expansion—ব্রহ্মা, Stagnation—বিষ্ণু, Repulsion—মহেশ্বর। তখন জ্যোতিঃর সৃষ্টি হ'ল, তাই শিবের বুকে শ্যামা। নি'ভে গেল, সব নি'ভে গেল, একটী একটী ক'রে সব ডু'বে গেল—যা' ছিল যা' হ'য়েছিল; আশা গেল, ভরসা গেল, সব গেল। কেবল আমি, সেই আমি গো, সেই অনন্ত আমি, অসীম আমি, আমি গো, কেবল আমি। তুমি আমি, সে আমি,—'আমি'র ধারা 'আমি'র ঢেউ······ব্রহ্মা আমি, বিষ্ণু আমি, ঐ জ্যোতিঃ আমি, ঐ গ্রহনক্ষত্র সব আমি। ঐ যাকে দে'খে তুমি যে ঘৃণা কর্‌ছ তাও আমি। বল—কেবল আমি, আমি, আমি গো। দেখ, দেখ, তুমি যাকে ভালবাস, তুমি যাকে বিষের মত ভয় কর, তুমি যাকে শত্রুর মত দেখ, দ্বিধা কর, সন্দেহ কর, তাও আমি—সব আমি। দেখ্‌বে ভাইকে আমি, চিন্‌বে ভাইকে আমি। দেখ 'তুমি' ভু'লে যাও, 'তুমি' মু'ছে ফেলাও। দেখ্‌বে শুন্‌বে বুঝ্‌বে, তাও আমি। আমি অনন্ত ধারা, আমি সত্যপুরুষের ধারা; আমি শব্দ, আমি ঈশ্বর, আমি জ্যোতিঃ, আমি সৃষ্টি; দুঃখ—তাও আমি, সুখ—তাও আমি। দেখ আমার ভেদ নাই, আমি আমার আমি। যখন আমার জ্ঞান হয়, আমি তখনই স্রষ্টা, আমি বিষ্ণু, আমি মায়া; যখনই আমি ভুলে যাই, আমার অস্তিত্ব আমি সগর্ব্বে মু'ছে ফেলি············তখনই আমি মহাকাশ, আকাশের ঢেউ লে'গে সব আমি সৃষ্টি স্থিতি লয় ক'রে ফেলি, অনন্তে মি'শে যাই। আমার জ্ঞান অজ্ঞান সেও জ্ঞানময়। দেখ, আমাকে দেখ্‌বে, বুঝ্‌বে, ভোগ কর্‌বে। তুমি কিছু ভে'বনা, যা' দেখ তাই তুমি। প্রত্যেকে ভাব সেই তুমি। যা' দেখ তোমার নিজের রক্তের মত, যা' দেখ তোমার নিজের হৃৎপিণ্ডের মত; যেন জান না কত প্রেম। অমনতর এমনভাবে তাকে আকর্ষণ কর, দেখ্‌বে তুমি কেমন—আমি কেমন। দেখ যখন আমি কীটাণুকীট, আমি অণুর অণু, আমি বৃহৎ—সেও আমি। যেমন আমি অণুর ভিতর সেই আমি; সব অহং আমার, আমার স্ফূর্ত্তি তাও গেল, অবলম্বন ছিল জ্ঞান, অবলম্বন ছিল সত্তা, তাও গেল।

"বল, বল, তুমি সেই 'আমি'। মলিনতার অহঙ্কার, দুঃখের অহঙ্কার—অপবিত্রতার অহঙ্কার—দুর্ব্বলের অহঙ্কার—অহঙ্কার ক'রো না। যদি অহঙ্কার কর তো বল 'সেই আমি', সব ছু'টে যায়, সব খু'লে যায়। তুমি যখন কাম-প্রবৃত্ত, বল 'সেই আমি', প্রতি অণু পরমাণু সব নিরস্ত হ'য়ে যা'বে। রিপু তোমাকে ঠে'সে ধর্‌বে—তুমি জ্ঞান-নেত্র জে'লে তাকে ঠে'সে ধর। যাহার অহঙ্কার কর্‌বে তাই হ'য়ে যা'বে। তুমি যদি বল পাপী, তোমার কখনও নিস্তার নেই। তুমি যদি বল পুণ্যবান তবে জে'নো তুমি সেই জ্যোতিঃ পারিজাত। দুর্ব্বলতা পরিহার কর্‌বে, দুর্ব্বলতার আশ্রয় নিও না, ঠ'কে যা'বে। তোমার মৃত্যু নাই, কষ্ট যন্ত্রণা সব ভু'লে যাও। জান, তুমি পবিত্র, সগর্ব্বে তাঁকে আলিঙ্গন কর। এই যে অগ্নি দেখ্‌ছ, তাকে তুমি নিজের ভে'বে আলিঙ্গন কর। জ্বালাও তুমি, জ্ঞানের ফল জ্ঞান। সিংহ-গর্জ্জনে প্রেমের বুক নিয়ে প্রেমের অগ্নি নিয়ে পাপীর সম্মুখে দাঁড়াও। জ্বালিয়ে দাও—যা' ভাব্‌বে, তুমি তা-ই। বিশ্বাসের জ্যোতিঃ মলিন হ'তে দিও না। তোমার জ্যোতিঃ তুমি হারিয়ো না। সে বিশ্বাস বজ্রের মত কঠোর। মন পবিত্র, বজ্রের মত কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল হওয়া চাই। আমাকে অনুসরণ কর—আমার কথার অনুসরণ কর। অমন ক'রে কাঁদ্‌লে হ'বে না—ও কেবল ফাঁকি কাঁদা, ওর কোন অর্থ নাই। যা' মনের ভিতরে উঠ্‌বে, যা' কিছু ভুল, যা' কিছু পাপ কর্‌বি অমনি আমার কাছে এসে বল্‌বি, আমি হজম কর্ত্তে পারি। ত্যাখ্‌, বলি শোন্‌, তোরা মনে কর্‌, এই মুহূর্ত্তে মনে কর্‌—'আমি মুক্ত, আমার বন্ধন নাই।' আমি সব পারি; পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা আমি সব সহ্য কর্‌ব, আমি সব ভোগ কর্‌ব, আমি তোদের অধম দাদা, আমি সব পার্‌বো। * * * *"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সত্যনাম প্রচার

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বগ্রামে যে কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছিলেন তাহা লইয়া নাম-প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে স্থানেই যাইতেন তুমুল কীর্ত্তনে সবাইকে মাতাইয়া তুলিতেন; সর্ব্বত্র নরনারী সকলে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব-সমাধি দেখিয়া ও তদবস্থায় উচ্চারিত উদার বাণী শুনিয়া মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইত। ৺অনন্তনাথ, কিশোরীমোহন, গোস্বামী সতীশচন্দ্র, নফরচন্দ্র, চারুচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ, তরণী, কোকন প্রভৃতি বহু ভক্ত এই কীর্ত্তন-দলের প্রাণ ছিলেন।

১৩২৪ সালের পৌষমাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদিগকে লইয়া চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত মজিলপুরে গিয়াছিলেন। মজিলপুর হইতে চক্রতীর্থ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইস্থান হইয়া পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। সকলেরই ইচ্ছা, একবার চক্রতীর্থ দর্শন করিয়া আসেন। একদিন ভক্তগণ কীর্ত্তনের দল লইয়া চক্রতীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরোভাগে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন,—পথে যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছেন। তুমুল কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার সেই ভাব-বিহ্বল অবস্থায় নৃত্য এবং পথে অগণিত লোক-সমাগম যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, সে কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন নৃত্য করিতে করিতে এত বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন যে, কেহই তাঁহার সঙ্গ লইতে পারিতেছিল না। তাঁহার চক্রতীর্থে পৌঁছিবার অনেকক্ষণ পরে, দলের অপর সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি অবস্থায় আছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে বাণী নির্গত হইতেছে। একটী বাক্য এখনও অনেকের স্মরণ আছে, তাহা এই—"One is equal to various and various is equal to one." এই দূরবর্ত্তী স্থান এত দ্রুতবেগে গমন করায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে সেদিন ভীষণাকার ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল; ভক্তগণ তাহা দেখিয়া তাঁহাকে কিছুতেই আর পদব্রজে ফিরিতে দিলেন না। সারাদিন সেখানে তুমুল কীর্ত্তনের পর তাঁহাকে পাল্কীতে করিয়া মজিলপুর আনা হইয়াছিল। মজিলপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন সেখানে প্রত্যহ অহর্নিশ পূর্ণ উদ্যমে কীর্ত্তন ও তত্ত্বালোচনা চলিত। মজিলপুর ও

পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ অসংখ্য লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে আসিতেন এবং তাঁহার বচন-সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন। অনেকেই সে সময় সত্যনামে দীক্ষিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেদিন মজিলপুর ত্যাগ করেন সে দিনের বিদায়-দৃশ্য অবর্ণনীয়! তাঁহার যাত্রাকালে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার করুণ ক্রন্দনরোলে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। শত শত নরনারীর বিপুল জনতা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে করিতে ষ্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল—সে রোরুদ্যমান বিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীকে শান্ত করা কাহারও সাধ্য ছিল না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুব একবার ভক্তদিগকে লইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে গমন করেন। তথায় তিনি বাবু শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া তত্রত্য অধিবাসী-দিগের মধ্যে সত্যনাম বিতবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর নৈহাটী আসিয়া ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। সেখানেও বহুলোক তাঁহার নিকট সত্যনামে দীক্ষিত হইয়াছিল। ১৩২৫ সনের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ সহ ফরিদপুরের অন্তর্গত মদাপুরে গমন করিযাছিলেন। তদঞ্চলের অনেকেই তখন সত্যনাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ভক্ত-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা লোকমুখে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

হিমাইতপুর হইতে তখন ষ্টীমারযোগে কুষ্টিয়া যাতায়াত খুবই সহজ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কুষ্টিয়া যাইতেন। কুষ্টিয়া হইতেও অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে হিমাইতপুর আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে-কয়দিন সেখানে অবস্থান করিতেন অহর্নিশ তুমুল কীর্ত্তন চলিত। নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা দেখিয়া এবং সমাধি-কালে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত মহাভাববাণী শ্রবণ করিয়া শত শত লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই কীর্ত্তনে যোগদান করিত। কুষ্টিয়া সহরে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কীর্ত্তনের দল লইয়া বাহির হইতেন, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য কুলবধূগণ গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতেন। কীর্ত্তনের সেই ঘনরোলে তাঁহাদেরও প্রাণ-মন মাতিয়া উঠিত,—ভক্তি-বিহ্বল অন্তরে তাঁহারা নিজেদের অঙ্গের গহনা খুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে উৎসর্গ করিতেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ও উৎসাহে ভক্তগণ তথায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাপ্রাণ যীশু ও হজরত মহম্মদ

প্রভৃতি যুগ-প্রবর্ত্তক মহামানবদিগের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উক্ত মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণী প্রচার করিতেন, গরীব-দুঃখীকে সাহায্য দান করিতেন এবং তাহাদিগকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করাইতেন। একবার শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ রায়, ডাক্তার গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীশচন্দ্র নন্দী-প্রমুখ কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার অভিলাষ করেন। প্রস্তাবটী শুনিবামাত্রই স্থানীয় অন্যান্য ভক্তগণ সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা অনুমোদন করিলেন এবং উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই ইচ্ছা, উৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশের লোককে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। অনুষ্ঠানটীকে "শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু-আবির্ভাব মহা-মহোৎসব" নাম দিয়া সর্ব্বত্র প্রচার ও অর্থসংগ্রহ কার্য্য চলিতে লাগিল। নানাস্থানের বহুলোক অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যথাসাধ্য দান করিয়া উৎসবের বিপুল ব্যয়ভার-নির্ব্বাহে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং মফঃস্বলের নানা সহরে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা এই 'বিশ্বগুরু আবির্ভাব উৎসবের' সংবাদ চারিদিকে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র করা হইল। সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গেল—ইনি কে, কোথায় তিনি থাকেন, কেমন তিনি—ইত্যাদি জানিবার জন্য এবং উৎসবে যোগদান করিয়া স্বচক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য কত লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হিমাইতপুরে ছিলেন। উৎসবের বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাকে পূর্ব্বে কিছুই জানান নাই। আয়োজন অনেক দূর অগ্রসর হইলে পর তিনি এ বিষয় অবগত হইলেন। নিজের নাম ও প্রশংসার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার এরূপ আয়োজনে তিনি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। উৎসব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ অমত জানিয়া সকলে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। দেশবিদেশে যেরূপ ব্যাপকভাবে ইহার সংবাদ প্রচার হইয়া গিয়াছে, যেরূপ প্রভূত পরিমাণে অর্থাদি ব্যয় হইয়াছে—এমতাবস্থায় উৎসব বন্ধ করিয়া দিলে লোকনিন্দা ও অর্থক্ষতির একশেষ হইবে ইত্যাদি চিন্তায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে জননী মনোমোহিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। এমন সময় উৎসবের কার্য্য স্থগিত রাখিলে সত্য সত্যই চতুর্দ্দিকে দুর্নাম ও ভক্তগণের মনঃপীড়ার

কারণ হইবে বুঝিয়া, জননীদেবী নির্দ্দিষ্ট দিনেই ইহা সম্পন্ন করিতে অনুমতি দিলেন।

১৩২৫ সনের ২৮শে ও ২৯শে ভাদ্র উৎসবের দিন স্থির করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিদেশাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের অবস্থানের জন্য স্থানীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ নিজেদের বহু পাকা বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কত স্থান হইতে কত স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা কঠিন। পণ্ডিত, প্রেমিক, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপিপাসু শত শত ব্যক্তিগণের সে এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। উৎসবের দুই দিবস কুষ্টিয়া সহরের সর্ব্বত্র এক মহা সমারোহ ব্যাপার! সহস্র সহস্র ভিক্ষুককে বস্ত্রদান করা হইল। সুবৃহৎ রন্ধন-শালায় দিবারাত্র খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাস্তায় রাস্তায় রেলের লাইন পাতিয়া ট্রলি বোঝাই করিয়া খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র লোককে দুই দিন ধরিয়া ভুরিভোজনে তৃপ্ত করা হইযাছিল। একটী প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুশোভিত করা হইযাছিল এবং তাহাতে কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও সদালোচনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় যুবকবৃন্দের সাহায্যে একটী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতঃ এই বিরাট ব্যাপারেব সমুদয় কার্য্যের যথাযথ শৃঙ্খলা বিধান করা হইযাছিল।

এই বিশ্বগুরু উৎসবের পর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরেব কথা বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় মাঝে মাঝে কলিকাতা যাইতেন। যে কযদিন সেখানে অবস্থান করিতেন তাঁহার এক মুহূর্ত্তও অবসর থাকিত না। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। তাঁহার সঙ্গ করিযা কত জনেব কত দিনের কত সমস্যা ও মনের কত জমাট অন্ধকার দূর হইযা যাইত। কিছুকাল মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীর বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক এবং অনেক সাধারণ গৃহস্থ সপরিবারে তাঁহার চবণে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

১৩২৭ সনের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুব জ্বর ও কাসি রোগে আক্রান্ত হইযা অনেকদিন অসুস্থ থাকেন। বাড়ীতে এবং কলিকাতায় চিকিৎসায় কোন সুফল না পাইয়া ডাক্তারগণের পরামর্শে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে ১৩২৮ সনের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ কার্সিয়াং লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে মাসাধিক কাল চিকিৎসাধীন থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইলে পর তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু ভক্ত পীড়ার সময় তাঁহার সঙ্গে কার্সিয়াং গিয়াছিলেন। যতদিন ভক্তগণ

সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সময় ও সুযোগ পাইলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহারা কীর্ত্তন লইয়া বাহির হইতেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে নামরসে মাতাইয়া তুলিতেন। সে সময় অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত সত্যনামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

১৩২৯ সনের ১৬ই পৌষ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে পুরীধামে গিয়াছিলেন। কটকের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল ৺রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু মহাশয় (মাননীয় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা) এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী উভয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। তাঁহাদের সবিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর সে-যাত্রা পুরী গিয়াছিলেন। সমুদ্রতীরে "হরনাথ লজ্" নামক বসু মহাশয়ের একটী সুন্দর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নিকটেই আরও কয়েকটী বড় বড় বাড়ীতে ভক্তগণ বাস করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরী যাওয়ার সংবাদ পাইয়া নানা স্থান হইতে বহু শিষ্য শিষ্যারা তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে লইয়া প্রায় দুই মাসাধিক কাল পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তত্রত্য বহুলোক নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের জন্য নিত্য তাঁহার সঙ্গ করিতে আসিতেন। শত শত ভক্ত ও আগন্তুকবৃন্দের কলকোলাহলে সারা দিনরাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের আবাস-বাটিকায় আনন্দের মেলা জমিয়া থাকিত। তখন কোন বিষয়ে কাহারও যাহাতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা না হয় তজ্জন্য বসু মহাশয় সস্ত্রীক কি আপ্রাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন এবং এই ব্যাপার-নির্ব্বাহে অকাতরে কত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়।

যে দুইমাস শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতে বাস করিয়াছিলেন, সমগ্র নগরীটী জয়ঢক্কা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদি বাদ্যসহ তাণ্ডব কীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্ত্তনের দল লইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে তথায় সকলে ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তি ও আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়াছিলেন। চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য মন্দির-প্রাঙ্গনে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু সেদিন ভাববিহ্বল অবস্থায় জয়ঢক্কাদি বাদ্যযন্ত্রসহ তাণ্ডব কীর্ত্তনের মধ্যে চর্ম্মের অশুচিতাভাব সকলের মন হইতে স্বতঃই অপসারিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে পুরীপ্রবাসকালীন একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন হাঁটিতে হাঁটিতে পুরী হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। এ সংবাদ বাড়ীতে তখন কেহই জানিতেন না। তিনিও এইস্থানে যাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বহির্গত হন নাই। খড়ম পায়ে দিয়া রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। অজানা পথে চলিতে

চলিতে সাক্ষীগোপাল উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, এতদূরে চলিয়া আসিয়াছেন। সারাদিন তাঁহাকে না দেখিয়া এবং নানা স্থানে খুঁজিয়া কোথায়ও তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া, সকলে সবিশেষ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে আশ্বস্ত হন।

শিষ্যবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর যখন পুরীতে সমুদ্র-স্নানে গমন করিতেন তখন সমুদ্র-সৈকতে তাণ্ডব নৃত্যে কীর্ত্তন চলিত। অনন্তর তরঙ্গপ্রবাহের সহিত তালে তালে নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় সকলে অসীম আনন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া স্নানক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। একদিন স্নানকালে সমুদ্রজলে দণ্ডায়মান থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা আলোক-চিত্র তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।

পুরী অবস্থানকালে ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনের দল লইযা কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সত্যনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে উৎকলবাসী বহু নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন।

সত্যনাম-প্রচারার্থ শ্রীশ্রীঠাকুব আরও অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; সকল স্থানের অসংখ্য ঘটনার যথাযথ বিবরণ দেওয়াব স্থান নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মজিলপুর, চক্রতীর্থ, কুষ্টিয়া, মদাপুর, কলিকাতা, পুরী প্রভৃতি ভিন্ন তিনি অন্যান্য যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নওগাঁ, রংপুর, পাবনার নিকটবর্ত্তী দোগাছী ও সালগেরে, নদীয়ার অন্তর্গত বারাদি, বরৈচরা, দুধকুমরা, খোকসা-জানিপুর, ধলহরাচন্দ্র ও কমলাপুর, বগুড়ার সান্তাহার, রংপুরের বদরগঞ্জ, গোদাগারীঘাট, ফরিদপুবের নড়িয়া, যশোহরান্তর্গত হরিণাকুণ্ড প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরীতে সমুদ্রজলে দণ্ডায়মান শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

(১৩২৯ সনের পৌষ)

সপ্তম অধ্যায়

আলোচনা-প্রসঙ্গে

বহুলোক জুটিয়া গিয়াছে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক, দেশ-বিদেশের কত সত্যান্বেষী শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ-লাভের জন্য নিত্য আসিতেছেন যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নির্জ্জন পল্লী-বাটিকা জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। শিষ্য ও আগন্তুকের সহিত বিজ্ঞানের কথা, সমাজের কথা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে কত কি আলাপ-আলোচনা অহর্নিশ চলিল। বৈজ্ঞানিক 'ইলেকট্রন্' 'এটম্' প্রভৃতি সম্বন্ধে কত সূক্ষ্ম প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন; সমাজ-সংস্কারক বিবাহ, জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ তুলিতেছেন; শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ধর্ম্ম লইয়া বিশেষজ্ঞেরা কত সমস্যার অবতারণা করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ সরল কথায় দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনার সহিত মিলাইয়া এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া এই সকল দুরূহ প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। অনেক দিনের কথা। নানা বিষয়-সংক্রান্ত তাঁহার সেই সময়ের আলোচনা আমরা কেহ কেহ কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিনের লিখিত আলোচনা-প্রসঙ্গ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

১৯২০ সনের জুন মাসে একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অনেকে বসিয়া আছেন। ছোট টিনের ঘরে বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনি কথা বলিতেছেন। অন্যান্য নানা কথাবার্ত্তার পর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এম-এ, বি-এল্‌কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"জ্ঞানের দিক্ দিয়ে যা' দে'খেছি তার দুই একটা শোন্। এ আমার প্রাণে প্রাণে অনুভব করা। বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখ্‌লে এতখানি strong conviction (দৃঢ় বিশ্বাস) হয় না। আর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে বস্তু আমরা দেখি সেগুলি indirect (পরোক্ষ), তাতে direct feeling (প্রত্যক্ষ বোধ) কিছু হয় না, কিন্তু আমি দে'খেছি direct feeling দিয়ে। স্থলপদ্ম রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে লাল হ'য়ে ওঠে, সেটা কখন লক্ষ্য ক'রেছিস্? এর কারণ কি জানিস্? ঐ স্থলপদ্মগুলির ভিতর এমন কিছু আছে যা' ঐ সূর্য্যের ভিতরকার তত degree of vibration (কম্পন)-টাকে absorb (শোষণ) করে, আর তার effect (ফল) লাল হয়। কাজেই যদি এমন

কোন জিনিষ বে'র্ কর্ত্তে পারিস্ যা' সূর্য্যের ঐ vibration (কম্পন)গুলো absorb (শোষণ) কর্ত্তে পারে, তা' হ'লে nature (প্রকৃতি) থেকেই প্রচুর পরিমাণে লাল রং তৈ'রী করা যায়। আরও এমন অনেক জিনিষ জগতের কাছে প্রচার করা যায়,—যেমন electricity (তড়িৎ)। জগতের ভিতর এমন একটা central point (কেন্দ্রস্থল) আছে, যেখান থেকে জগতের সমস্ত magnetic force (চুম্বকশক্তি)কে আকর্ষণ করা যায়। সেই point (স্থানটী) যদি বে'র্ করা যায় তবে সমস্ত পৃথিবীময় বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা যায় এবং এই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার কত মঙ্গলজনক কার্য্য করা যায়।"

"পৃথিবীতে নানা স্তর আছে,—যেমন জলের স্তর, বাতাসের স্তর ইত্যাদি। জলটাকে আমরা control (আয়ত্ত) কর্ত্তে পারি ব'লেই সাঁতার কাট্‌তে পারি। এরোপ্লেন বাতাসের উপর দিযে চল্‌তে পারে কারণ সে বাতাসকে অধীনে রাখ্‌তে পারে। তেম্‌নি পৃথিবীতে এমন একটা finer (সূক্ষ্ম) স্তর আছে, সেই স্তরটা control কর্ত্তে পার্‌লে সমস্ত গ্রহে গ্রহে সংবাদ ধরা বা চালান যায। গ্যাখ্, এগুলো আমার কল্পনা নয। এগুলি আমি প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রেছি। এগুলি ধ্রুব সত্য, আর scientific methodএ (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) বে'র করা যায়। কারণ এগুলি আমি প্রত্যক্ষ অনুভূতি ক'রেছি, আমার শরীরের ভিতর দিয়ে। এ শরীরটা একটা mechanism (যন্ত্র)বিশেষ। এ শরীর দিয়ে যদি অনুভূতি কর্ত্তে পারি তবে সে সত্যগুলো কোন finer mechanical process (সূক্ষ্ম যান্ত্রিক উপায)এ বে'র করা যা'বে না কেন?"

১লা অক্টোবর, ১৯২০ সন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরের বাঁশের মাচাংএর উপর অনেকে বসিয়া আছেন। ছোট ছোট গাছে জায়গাটী চারিদিকে ঢাকা, মাঝখান পরিষ্কার। Holy Book (পুণ্যপুঁথি) পড়িতে পড়িতে আঁধার ঘনাইযা আসিয়াছে, তখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"পূর্ণত্ব মানে সব-গুলোই তোমার ভিতরে আছে, অথচ সমস্ত বৃত্তিগুলো দ্বারা চালিত না হ'য়ে সেগুলোর নিয়ামক তুমি হ'বে। Highest Principle (আদি কারণ)কে প্রাণে প্রাণে অনুভব করাই পূর্ণতা, কিন্তু সেটা অনুভব কর্‌তে হ'লে সমস্তগুলির জ্ঞান থাকা চাই; কারণ প্রত্যেকটীর ভিতরে Highest Principleই (মূল কারণ) মূর্ত্ত, জীবন্ত হ'য়ে উ'ঠেছে। চরম কারণকে জান্‌বে অথচ যেগুলোর ভিতরে সেট বিকশিত সেটা জানা নেই, তার মানে তোমার পূর্ণ জ্ঞান হয় নি।

তার ভিতরে সমস্ত included (অন্তর্ভুক্ত), চরম কারণকে বোধ কর্‌তে গেলে সমস্তগুলো কার্য্য-কারণই জানা যায়, কারণ, সে সবগুলো একেরই বিভিন্ন step (ধাপ) ; তবে যতক্ষণ তুমি সেগুলোর অধীন, ততক্ষণ তুমি অপূর্ণ, সে সম্বন্ধে তোমাব সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নি। আর যখনই সেগুলো তোমার অধীন, তখনই বুঝ্‌তে হ'বে সেগুলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান হ'য়েছে, আর তাই তুমি বৃত্তিগুলোকে চালিত কচ্ছ। ভাবাধীন না হ'য়ে ভাবাধীশ হওয়াই পূর্ণতা। সাধারণতঃ মানুষ মনে করে যে সাধু হ'লে তার ক্রোধ থাক্‌তে নেই। কিন্তু ঐটাই ভুল। সাধু যিনি তিনিই জানেন কোথায় ক্রোধের ব্যবহার কর্‌তে হয়, আর তুমি তা' জান না, তাই ক্রোধের অধীন হ'য়ে পড় ; যেখানে তোমার ক্রোধ করা উচিত নয় সেখানে তুমি ক্রোধ ক'রে কাজ নষ্ট কর। এক কথায়, সাধুই ক্রোধকে regulate (নিয়মিত) কর্ত্তে পারেন, আর তুমি তা' পার না।"

কথায় কথায় আলোচনাটা একটু ঘুরিয়া গেল, তিনি বলিলেন,—"মানুষের কারও প্রতি ভালবাসা বেশী হওয়া মানে, তার ভিতরে নিজেকে ততখানি ডু'বিয়ে দেওয়া অথবা আমার আমিত্বের ভিতরেই তাকে টে'নে আনা। মানুষ নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সব চেয়ে বেশী চায় কিন্তু যাকে সে ভালবাসে তাকে সুখী কর্‌তে আরও বেশী চেষ্টা করে ; তার অর্থ এই যে, নিজেকে সে তার ভিতরে বি'লিয়ে দিয়েছে বা তার আমিত্বের scope (গণ্ডী)টার প্রসার হ'য়েছে। আমার হাতে চিম্‌টী কাট্‌লে ব্যথা লাগে কারণ হাতটী আমারই অংশ, তেমনি অন্য মানুষের ভিতর যখন আমাকেই দেখ্‌তে পাই তখন তা'দের কষ্ট হ'লে আমার কষ্ট হয়—কারণ তারা তখন আমার আমিত্বের ভিতরে এসে প'ড়েছে। ইহারই নাম প্রেম। প্রেম বল্‌তে আমি বুঝি—নিবিড় ক'রে বোধ করা। কিন্তু শুনতে পাই কা'রও কা'রও প্রেম-ভাবের জন্য একজন স্ত্রীলোক চাই, নতুবা তাদের প্রেমের অভিব্যক্তি হয় না। আমি সকল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের কথা বল্‌ছি না, অনেক মহাপুরুষ আছেন আবার অনেকে এই পরকীয়া ভাবও প্রচার করে। এই কি প্রেম ? কত জনকে দে'খেছি বাইরে ভক্তের সাজের অভাব নাই কিন্তু মনে মনে নষ্টামির অন্ত নাই ; রঙ্গীন কাপড় চোপড় এবং রং-চংএর চিহ্ন-ধারণ করাটাই যেন মহা ধর্ম্ম ; ভিতরে তার যত গলদই থাকুক্। মনে রে'খো মন তোমার সাধু হ'বে, বাইরে সাধু-সন্ন্যাসীর সাজ নাই-বা রইল ; বাইরের সজ্জার দিকে বেশী নজর, অথচ অন্তর যে আগাছায় ভ'রে উঠ্‌ছে সে দিকে তোমার লক্ষ্য নাই। কত

জল ছি'টিয়ে ফুল ফে'লে আহ্নিক কচ্ছ, কিন্তু যাঁকে পূ'জো কচ্ছ মনটা তাঁর কাছেও নাই। চিরজীবন তুমি বাইর নিয়েই থাক্‌বে, কিন্তু যে অন্তরের প্রয়োজনে বাইরের এত আদর সেই অন্তরই থাকে অনাদৃত। উন্নতির এই কি ধারা?

"তুমি বল্‌বে, ভগবান লাভ কর্‌তে হ'লে ছোট উপায় থেকে আরম্ভ ক'রে বড় উপায়ে যে'তে হয়। কিন্তু এ জন্মটা তোমার বাইরের ভড়ং নিয়েই কে'টে গেল, তা' ত্যাগ ক'রে বড় উপায় ধর্‌বার সাহস কি তোমার হ'বে? বড় একটা উপায় যখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত, তখন চিরাভ্যস্ত গতানুগতিক আচার-নিয়ম ত্যাগ কর্‌তে পার না, ঘোর সংস্কার তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ ক'রে তোমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় চা'লিয়ে নিচ্ছে। সে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার্ শক্তি কোথায়? সন্ধ্যা-আহ্নিকের উদ্দেশ্য যদি জল-ছিটান এবং কর-সঞ্চালনেই তোমার খতম হয় তবে তোমার কাছে ভগবান-লাভ ঐ পর্য্যন্ত। মনে রে'খো লক্ষ্য তোমার কত বড়! তুমি লক্ষ্য হা'রিয়ে উপায়টাকে লক্ষ্য ক'রে ব'সে আছ। আমরা এতটা আচ্ছন্ন যে প্রচলিত সংস্কারের একটু এদিক ওদিক হ'লে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে ভীষণভাবে তার প্রতিকার কর্‌তে চাই, একটু ভে'বে দেখ্‌বার ধৈর্য্যটুকুও হয় না—ধর্ম্ম আমাদের কাছে এম্‌নি প্রাণহীন আচারে পর্য্যবসিত হ'য়েছে।

"এই অন্ধ-সংস্কারের অত্যাচারে দেশটা উৎসন্ন গেল। নীচ জাতিকে ঘৃণায় স্পর্শ করি না। প্রাচীন শাস্ত্র-নিয়মগুলি শুধু কথায় পালন করি, তার সঙ্গে প্রাণের যোগ মোটেই নাই। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলির সার্থক অর্থ না ধ'রে কদর্থ ধরা ও কু-সংস্কারের দাসত্ব করা যে একই কথা! যে অনুভূতি-লাভে জীবনের চরিত্র ও কর্ম্মে একটা আমূল পরিবর্ত্তন এনে দেয়, যাকে আশ্রয় ক'রে সুপ্ত জীবন জে'গে উঠে—আমি বলি তাই মানুষের ধর্ম্ম। আর যে জীবন্ত মূর্ত্ত দেবতার আকর্ষণে এই আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যাঁকে ঘি'রে ফু'টে ওঠে আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী, যাঁর স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শে জে'গে ওঠে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, তীব্র কর্ম্ম-প্রেরণা, যাঁর জীবনের সামীপ্য-লাভে আমার ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হ'য়ে উঠে—ব্যক্ত হ'তে অব্যক্ত পর্য্যন্ত যা' কিছু সমস্তই আমার বোধের মধ্যে ধরা দেয়, তিনিই আমার ভগবান। Personal Concrete God (রক্ত-মাংস-সঙ্কুল জীবন্ত নর-বিগ্রহ) মানে আমি এই বুঝি—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, হজরত, বুদ্ধ প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্য কোন Godএর সঙ্গে মানুষের কোন দিনই পরিচয় নাই, আর আকাশস্থ ভগবানের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে গেলে সৃষ্টি হয় নাস্তিকতার।"

১৯২৩ সন ১৫ই জুন, ডাক্তার যতীন রায়, প্রফেসার কৃষ্ণদা এবং অন্যান্য অনেক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত। জীব-কোষ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছিলেন—"Body cellsএর (দেহ-কোষের) nucleus (সার বস্তু)এ expansion (বিস্তার) ও contraction (সঙ্কোচ) হ'লে একটা nucleus ভাগ হ'য়ে দু'টো হ'য়ে যায়। এইরূপ প্রতিনিয়ত expansion (সম্প্রসারণ), contraction (সঙ্কোচ) ও stagnation (নিশ্চলতা)এ cell division (কোষ-বিভাগ) হ'য়ে হ'য়ে একটা cell (কোষ) অগণিত cellsএ (কোষে) divided (বিভক্ত) হ'য়ে যায়। একটা cell (কোষ) যে দু'টো হয়, সে দু'টোই exactly similar (সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার) হয়। একটার যে দুই ভাগ হয় তা' নয়। একটাই নিজের মত আর একটা সৃষ্টি করে।

"Animal cells (প্রাণিজ কোষ) এবং vegetable cells (উদ্ভিজ্জ কোষ)এ কোনই পার্থক্য নাই। Cell (কোষ) হিসাবে তাহারা exactly similar (সম্পূর্ণ একপ্রকার), কিন্তু বিভিন্ন cellsএ (কোষে) বিভিন্ন প্রকারের energy'র manifestation (শক্তির বিকাশ) হয়। মানুষের প্রত্যেকটী cellএ (কোষে) তার সমস্ত consciousness (জ্ঞান) ও ideas (ভাব) বর্ত্তমান থাকে। মাতৃ-রজঃস্থিত ovum (স্ত্রী-বীজাণু) এবং পিতৃ-শুক্রস্থ spermatoza (পুং-বীজাণু) এই দুইয়ের মিলনে একটী cell (কোষ)। এখন এই যে cellএর (কোষের) division (বিভাগ) এবং তাদের growth (বৃদ্ধি) হয় এর rateকে (গতি) regulate (নিয়ন্ত্রিত) করা সম্ভব। হঠযোগীরা তা' ক'রে বেশী দিন বাঁচ্‌তে পার্‌তেন। ব্যক্তিগত সাধনা এবং উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারা অকালমৃত্যু অনায়াসেই control (রোধ) করা যায়। শরীরের যে সমস্ত glands (মাংস-গ্রন্থি) আছে এই glands-গুলোর extracts বা secretions (নিঃস্রবণ) প্রয়োগ করায়, অন্য কোন স্থান হইতে এই glands grafting (সংযোজন) দ্বারা cellএর (কোষের) rate of growth (বৃদ্ধির পরিমাণ) vary (পরিবর্ত্তিত) করান যায়। কারণ glands (মাংস-গ্রন্থি)গুলি যেন power-houses—reservoirs of energy (শক্তির ভাণ্ডার)। বানরের thyroid gland (মাংসগ্রন্থি-বিশেষ) extract (নিষ্কাসিত) ক'রে মানুষে ব'সিয়ে বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত করা হচ্ছে শুন্‌তে পাই। ইহার কারণ, কোন প্রাণীরই cells (কোষ) বিভিন্ন নয়, যা' কিছু পার্থক্য তাদের energy'র (শক্তির)। Structural (গঠনের) কোনও difference (পার্থক্য) নাই—এমন কি inorganic (অজান্তব) cells (কোষ) বাতাস, আলো, 'ইলেক্‌ট্রন্' প্রভৃতির cellএর

(কোষের) সঙ্গেও কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবলমাত্র energy'র (শক্তির)।

"মৃত্যুতে cellsএর (কোষের) পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ এক রকমের cell আর এক রকমের cellsএ (কোষে) transformed হয় (পরিবর্ত্তিত হয়), কিন্তু প্রত্যেক cellএরই (কোষের) consciousness (বোধ) আছে। এই হিসাবে মৃত্যু আর কিছু নয়, কেবল diffusion of crystallised consciousness (দানাবাঁধা জ্ঞানের বা সম্বিৎ-এর বিক্ষেপণ)। Individual (ব্যক্তিগত) consciousness (বোধ), cell consciousnessএ (কোষের বোধে) বিকীর্ণ হ'য়ে পড়ে। বহু cell (কোষ) চতুর্দ্দিকে তাদের consciousness (জ্ঞান) নিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। এক জটিল আমিত্ব ভে'ঙ্গে খান্ খান্ হ'য়ে বহু কোষের বহু আমিত্বে পরিণত হয়, আর তাই মৃত্যু। একটা ideaয় (ভাবে) যেন cells (কোষ)গুলি দানাবাঁধা থাকে, মৃত্যুতে cellsএর (কোষের) disintegration (বিশ্লেষণ) হয়। সেই আত্মার উপলব্ধি যার হ'য়েছে তার কাছে মৃত্যু নাই—এটা real (প্রকৃত); আর লোকের কাছে পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম মিথ্যা, কারণ তা'রা আত্মার সঙ্গে নিজেদের এখনও identified (একাত্ম) ক'রেনি ব'লে আত্মাই যে নানা ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি ক'রে ক'রে জীবন-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চল্‌ছে তা' বুঝে না এবং অনুভব করে না।" এইভাবে আলোচনা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইল। সেদিনের সকল কথা সুসংবদ্ধভাবে আর লিপিবদ্ধ হয় নাই।

২৪শে জুন ১৯২৩। ডাঃ এস্ কে রায়, এম্-বি মহাশয়ের সঙ্গে Cell সম্বন্ধে আর একদিন কথা উঠিয়াছে। আশ্রমবাসী অনেকেই উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন,—"Animal cells (প্রাণিজ কোষ) ও vegetable cellsএ (উদ্ভিজ্জ কোষে) histological (গঠন-সম্বন্ধীয়) কোন difference (পার্থক্য) নাই। তবে vegetable cellsএর (উদ্ভিজ্জ কোষের) animal cellsএ (প্রাণিজ কোষে) transformed (রূপান্তরিত) হ'বার একটা natural affinity (স্বাভাবিক টান) আছে, যেমন spermatoza'র (পুং-বীজের) ovumকে (স্ত্রী-বীজকে) receive কর্‌বার জন্য বিশেষ affinity (টান) আছে সেইরূপ। Vegetable cells (উদ্ভিজ্জ কোষ) যত সহজে animal cellsএ (প্রাণিজ কোষে) transformed হয়, animal cellsএর affinity না থাকায় তত সহজে হয় না। এক রকমের গাছ আছে তাদের ভিতরে cellএর animality (জান্তবতা) এতটা প্রকাশ পায় যে, তারা নাকি পতঙ্গ-জাতীয় প্রাণী ধ'রে খায়। Animal cellsএর (প্রাণিজ

কোষের) transformed (রূপান্তরিত) হ'বার affinity (টান) না থাকায় এবং সমজাতীয় বিধায় মানুষে animal food (আমিষ খাদ্য) খে'লে সেই খাদ্যের animal cells (প্রাণিজ কোষ)গুলো ও body cells-এর (শারীরিক কোষের) মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। একে অন্যকে হজম করতে চেষ্টা করে, আর যে সমস্ত tissue (দৈহিক উপাদান) মধ্যে cells (কোষগুলি) imbeded (সংলগ্ন) থাকে সেখানে একটা toxin produced (একপ্রকার বিষ উৎপন্ন) হয়। এই toxin (বিষ) body cells (শরীরের কোষ) গুলোকে এমন ক'রে irritate (উত্তেজিত) করতে থাকে যার ফলে cells গুলোর rapid development (দ্রুত বিকাশ) হ'য়ে যায়। সত্বরে ঐ development (বিকাশ) চরমে পৌছায়। অনতিবিলম্বে বার্দ্ধক্য আসে।"

কত রাত্রি কত সকাল-সন্ধ্যায় এইরূপ কত আলোচনা হইয়াছে। এক এক দিনের আলোচনায় আলোচ্য বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার বলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইতেন এবং স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা শুনিয়া যাইতেন। নিম্নে আরও কয়েক দিনের আলোচনা উদ্ধৃত করিতেছি।

১৯২৩ সনের ১০ই জুলাই। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে কারখানা, পাওয়ার হাউস্ প্রভৃতি দেখিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"মনের শান্ত অবস্থায় জগতের সমস্ত ভাবগুলো মনে ফু'টে উঠে। মনটা বিশ্ব-জোড়া। উহাকে একটা ক্ষুদ্র আমিত্বের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ ক'রে আমরা ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করি। এই ক্ষুদ্র আমিত্বের idea (ভাব) ছে'ড়ে দিলে বড় আমিত্বের বোধ আসে। মনটা তো একই। বিশ্ব-আমির সমুদ্রের ভাবরাশির আমরা এক-একটা বুদ্বুদ্। আমরা succession of ideas-এর (ভাবপরম্পরার) গণ্ডীতে বদ্ধ আছি, তাই আমাদের individual আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব। Passive (ক্রিয়াহীন) হওয়া মানে, এই গণ্ডী বা বুদ্বুদ্ নিষ্ক্রিয় ক'রে তোলা। তখন নিজের কোন বিশেষ idea-র (ভাবের) activity (কার্য্যকারিতা) না থাকাতে বিশ্বজগতের ঢেউ এসে মনে লাগে। Brain cells-এ (মস্তিষ্ক-কোষে) বিশ্বজগতের ঢেউ-এর জন্ম-জন্মান্তর অবধি ছাপ প'ড়ে গে'ছে। আমি নিজে যে-idea-তে (ভাবে) identified (যুক্ত) ও active (ক্রিয়াশীল) হ'য়ে আছি তা' ছে'ড়ে passive (ক্রিয়াহীন) হ'তে গেলেই brainএ (মস্তিষ্কে) সব ছাপ আপনা আপনি মূর্ত্তি, জ্যোতিঃ, শব্দ প্রভৃতি নানা রূপ ধ'রে in flesh and form (রক্ত-মাংসের আকারে) দেখা দেয়,—তাই নানাবিধ দর্শন যোগীদের হয়। Deeper and deeper concentration-এ (গভীরতর মনঃসংযমের ফলে) জাগ্রত

অবস্থাতেই স্বপ্নের ন্যায় দর্শন হয়। আলো দেখ্‌ছি—আরও deeper concentration (গভীরতর মনঃসংযম) হ'লে নিজেকেই আলোক-মণ্ডিত দেখ্‌তে পাই। আমিত্ব ঠিক আছে কিন্তু extreme concentration-এর intensity-তে (চরম মনঃসংযমের তীব্রতায়) passivity (ক্রিয়াহীনতা) এলেই এ সমস্ত দর্শন হয়। Universal I-এর (বিশ্ব আমির) succession of ideas (ভাবপরম্পরা) হ'লেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, অথবা সে নিজেই যেন বিশ্বজগৎরূপে সৃষ্ট হয়। Universal I (বিশ্ব আমি) যেন সমুদ্র, তখন সব একাকার। তারপর জীবজগৎ-সৃষ্টি মানে Universal I-তে (বিশ্ব আমিতে) তরঙ্গ-সমষ্টি। বিশ্ব আমি যখন তার কোন বিশেষ তরঙ্গে এই আমিত্বে identified (একীভূত), তখন বহুত্বের সৃষ্টি—তুমির সৃষ্টি। আবার এই আমিত্ব intermediate stage-এও (মধ্য অবস্থায়ও) আছে, আবার ব্যক্তিত্বও আছে—কিন্তু প্রত্যেক idea-র (ভাবের) সঙ্গেই যেন identified (একীভূত) হচ্ছে, তখন প্রত্যেক বস্তুই যেন নিজেরই প্রতিরূপ অথবা নিজেই ব'লে feel (অনুভব) করা যায়। তখন আর আস্বাদ থাকে না, কাম-কামনা থাকে না, male-female (পুরুষ-স্ত্রী) বুদ্ধি থাকে না। কিন্তু আমির বহুত্ব থাকে। তখন সবই আমি, তাই আমার ক'রে নেবার ইচ্ছা থাকে না। ভেদবুদ্ধি না থাকাতে রাগ-দ্বেষ থাকে না—নিজেকেই নিজে কি আস্বাদ কর্‌তে পারি? Femaleকে (স্ত্রীলোককে) জ'ড়িয়ে ধর্‌লে নিজেকেই জ'ড়িয়ে ধরা, সেখানে নিজের প্রতি নিজের কাম, কামনা, ক্রোধ প্রভৃতি কেমন ক'রে সম্ভব?

"আমাদের যেন তিনটা অবস্থা আছে—প্রথম, সুষুপ্তি—তখন ideas (ভাব) নাই, মনের তরঙ্গ নাই। দ্বিতীয়, জাগরণ-বিশেষের অবস্থা—তখন আমিত্ব আছে কিন্তু কোন ভাব-তরঙ্গের সঙ্গে identified (যুক্ত) হ'চ্ছি না, এমন এক অবস্থা। তৃতীয়, ইন্দ্রিয়ের দাস—কামুক আমি অন্য idea (ভাব)-ওয়ালা আমিকে যেন তুমি-ভাবে দেখে। অনন্ত প্রথম অবস্থা, সান্ত তৃতীয় অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থায় সান্ত ও অনন্ত পাশাপাশি, তখন মনে হয় খুব বড় ও খুব ছোট। আস্তে আস্তে যখন প্রথম অবস্থাটা আসে তখন মনে হয় আমারই হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই বিশ্বজগৎ ছে'য়ে যাচ্ছে।

"Universal I-র (বিশ্ব আমির) ভঙ্গীগুচ্ছ যেন এক-একটা species বা জাতি। মানুষ আয়না দিয়ে মুখ দেখ্‌তে—সাধারণতঃ যখন একা থাকে—সবাই কিছু-না-কিছু মুখভঙ্গী করেই। আমার মনে হয় এই বিশ্বজগৎ বিশ্ব আমির ভঙ্গীগুচ্ছের একত্র সমাবেশ।

"Universal I-র জাগরণ অর্থাৎ Will (ইচ্ছা) prominent (প্রধান)

হ'তে আরম্ভ হয় সোঽহং পুরুষে—যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন। সেখানে I (আমি) ও Will (ইচ্ছা) যেন পাশাপাশি। তারও ঊর্দ্ধে অলখ, অগম ও দয়ালদেশ—মহা আমির ক্রম-জাগরণের স্তর। ঊর্দ্ধে I prominent (আমি প্রধান), Will latent (ইচ্ছা গুপ্ত)—নিম্নে I latent (আমি গুপ্ত) হ'য়ে যাচ্ছে, Will (ইচ্ছা) prominent (প্রধান) হ'চ্ছে—আবার মহা আমির ছাপযুক্ত মানব-মানবীও ঐ এক অর্থেই কৃষ্ণ-রাধা, রাম-হনুমান বা কৃষ্ণার্জ্জুন। Universal I (বিশ্ব আমি)-জানা লোককে যে-ভাবেই হোক ভালবাস্‌লেই তার ভাব আমাদের মধ্যে ফু'টে বে'রুবে। তাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রেয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

শাস্ত্রে যে বলে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—তাও তিনি Universal I-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব'লেই; আর তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম 'অচ্যুত'।

"যাঁর আমিত্ব বিশ্ব-জোড়া, তাঁর মনের নাগাল পাওয়া বা বুদ্ধি ক'রে তাঁকে বুঝা বড় মুস্কিল। এই এক ভাবে আছে, পরমুহূর্ত্তেই বিপরীত ভাবের সঙ্গে identified—কারণ তাঁর আমিত্বের control-এতেই (সংযমেই) জীব-জগতের সমস্ত ভাবরাজি,—সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীব তাঁর নাগাল পায় না। তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে কর্‌তেই—brainএ (মস্তিষ্কে) জগতের নানা ছাপ ত' আছেই, বহু জন্ম হ'তে র'য়ে গে'ছে—intense concentration-এ (সুগভীর মনঃসংযোগে) মানুষের চোখের সাম্‌নে কথাগুলো রূপ নিয়ে দেখা দেয়—তা'ই অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন। এই অবস্থায় শরীর কেঁ'পে ওঠে, মনের ওলট্ পালট্ হ'য়ে যায়—আবার মনের এই পরিবর্ত্তনে শরীরেরও অনেক পরিবর্ত্তন আনে। ঐ পরিবর্ত্তন আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে শরীরও transformed (রূপান্তরিত) হয়। ধীরে ধীরে nerve-system-এর (স্নায়ুযন্ত্রের) regeneration (নব জীবন) হয়, মানুষের মধ্যে ভগবত্তা বিকশিত হ'য়ে উঠে। মানুষ যখন সদ্‌গুরুর বা আদর্শের প্রতি অর্জ্জুনের মত অনুরক্ত হয়, গুরুর ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তখনই মানুষ হয় সবচেয়ে active (কর্ম্মতৎপর)। Intense passivity না হ'লে অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে merge না কর্‌লে perfect activity আসে না; আর এ ক্ষেত্রে অন্য সাধনার দরকার হয় না, সদ্‌গুরুর কথাতেই তার কাছে বিশ্ব ফু'টে উঠে।"

* * * * *

আর একদিন concentration (মনঃসংযম) সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে বলিলেন—"In-going nerves (অন্তঃপ্রবাহী স্নায়ু) দিয়ে life-current (জীবন-ধারা) nerve-centre-এ (স্নায়ুকেন্দ্রে) ফি'রে এসে concentrated (কেন্দ্রীভূত) হয়। Life-current-এর (জীবন-ধারার) এই concentration (কেন্দ্রীকরণ) বা accumulation (সংযোগ)-এর অবস্থায়ই অনাহত নাদ বা স্বয়ংজ্যোতিঃ উপলব্ধি। এই concentration (মনঃসংযোগ)-এর জন্য nerve-centre-এর (স্নায়ুকেন্দ্রের) intense activity (তীব্র কর্ম্মশীলতা) হয়। নাদ এবং জ্যোতিঃ প্রভৃতিই life (জীবন)-এর স্বরূপ; এইগুলিই life-এর expression (বিকাশ)—দেহ-নিরপেক্ষ ভাবেও এদের অস্তিত্ব থাকে। যে আলোক ও শব্দ আমরা অনুভব করি, উহাও এই vital current (জীবন-ধারা) partially (কতক পরিমাণে) centre-এর (কেন্দ্রের) দিকে concentrated (কেন্দ্রীভূত) হয় ব'লেই। কিন্তু এর উপর আমাদের control (হাত) নাই। চিত্তকে থামিয়ে দেওয়া মানে চিত্তের স্পন্দন থামিয়ে উহাকে নিশ্চল করা।

"নাম-জপটা বা সর্ব্বাপেক্ষা concentrated (একাগ্র) চিত্তের expression (ভাব ও প্রকাশ) চিন্তা করা, thoughts and ideas (চিন্তা ও ভাব) eliminate (দূরীভূত) করার easy process (সহজ উপায়)। Thoughts and ideas (চিন্তা ও ভাব) eliminate (দূর) কর্ত্তে চেষ্টা কর্‌লেও mind-এর (মনের) sub-conscious (অর্দ্ধচেতন) region-এ (প্রদেশে) অনেক thoughts and ideas (চিন্তা ও ভাব) থাকে। সেগুলি অবসর পে'লেই, সুবিধা পে'লেই জে'গে ওঠে। Thoughts and ideas (চিন্তা ও ভাব) যত বাদ দিতে দিতে যাওয়া যায় তত higher thoughts (উচ্চতর চিন্তা), higher ideas (উচ্চতর ভাব) বা life-এর (জীবন-সত্তার) original (মূল) স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানের thoughts and ideas মনে আস্‌তে থাকে। এইরূপে proceed কর্‌তে কর্‌তে অনেক সময় একটা লয়ের অবস্থা আসে অর্থাৎ এমন thoughts and ideas আসে যাকে clearly trace (স্পষ্ট নির্দ্দেশ) কর্‌তে বা বুঝ্‌তে পারা যায় না। 'নেতি' 'নেতি' ক'রে বিচার কর্‌তে গেলে এই লয়টা আসে অর্থাৎ মাঝের রাস্তায় একটা সাময়িক স্থিতি এসে life-এর (জীবনের) মূলে পৌঁছিবার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। Fully concentrated mind-এর (পূর্ণ কেন্দ্রীভূত মনের) expression (প্রকাশ) যে নাম তা' জপ কর্‌তে থাক্‌লে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লয়ের অবস্থায় মানুষকে বিশেষ বাধা দিতে পারে না; কারণ মাঝখানের ঐ লয়ের অবস্থা হইতেও উচ্চতর অবস্থার idea বা নাম

মনে থাকে ব'লে মাঝে স্থির হ'য়ে লয় পে'তে পারে না। এই জন্য উচ্চস্তরের নাম-জপ, 'নেতি' 'নেতি' বিচারের চেয়ে নিরাপদ। 'নেতি' 'নেতি' বিচারের সঙ্গে নাম-জপ থাক্‌লে সেই সব চেয়ে ভাল। 'নেতি' বিচারে বাহ্যবস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, আবার নামের ফলে life-এর (জীবনের) origin-এ (মূলে) পৌছান যায়। যে ভক্ত, সে জীবনটাকে ঠিক যেমন আছে তেমনি রে'খে আপনাকে এমনি ক'রে পরিবর্ত্তিত করে, যা'তে জীবজগতের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যা'তে সে জীবজগতের অঙ্গীভূত হ'য়ে যে'তে পারে। আর অভক্ত মায়া-বদ্ধ জীব আপনার ক্ষুদ্র দেহ ও অহংকে ঠিক রে'খে জগৎটাকে বদ্‌লে নিয়ে আপনার অনুবর্ত্তী কর্‌তে চায়। বুঝে নিতে হয়, বিশ্বাস কর্‌তে হয় ও চিন্তা কর্‌তে হয় যে, এই বিশ্বটা একটা প্রেম-তরঙ্গ। এই তরঙ্গের ভিতর ক্ষুদ্র আমিটাকে মিশিয়ে দিয়ে এর অঙ্গীভূত হ'য়ে পড়াই প্রেমরসের আস্বাদন করা। আর ক্ষুদ্র আমিটাকে পৃথক্ রে'খে বিশাল বিশ্বকে ভোগ করার চেষ্টা ভেকের পর্ব্বত উদরস্থ করার চেষ্টার ন্যায় বৃথা বিড়ম্বনা।"

কথায় কথায় আর একদিন বলিতেছিলেন—"সাধনার চরমে সুখও থাক্‌বে, দুঃখও থাক্‌বে—সবই থাক্‌বে। কিন্তু স্মৃতিটা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে লক্ষ্য—স্মৃতি ফিরিয়ে আন্‌লে সুখ দুঃখ উভয়েরই তীব্রতাটা আর থাকে না। কিন্তু যার স্মৃতি জাগ্রত, তাঁর সাহায্য না পে'লে, তাঁর শরণাপন্ন না হ'লে ঐ স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভবই। এই self-টা (নিজত্বটা) সেই self-ই, তবে মনের গণ্ডীর সঙ্গে নিজেকে identified (একীভূত) ক'রে রে'খেছে। আবার এই আমিই Universal (বিশ্ব) আমি,—এটা শুধু মুখে বল্‌লে বা মনে ভাব্‌লেই যে হ'ল তা' নয়। আমার এই গণ্ডীবদ্ধ আমিত্বকে যেমন মনে প্রাণে feel (অনুভব) করি ও live করি (জীবনে লাগাই) সেই রকমটা যদি আন্‌তে পারি তবেই Universal I-র (বিশ্ব আমির) সঙ্গে সত্যিকার একাত্মতা হয়। মনটাকে passive (নিষ্ক্রিয়) ক'রে, কোন contents (আধেয় বস্তু) না রে'খে যদি সৎ-এর জাগ্রত স্মৃতি কোন ব্যক্তির উপর concentrate (কেন্দ্রীভূত) করি তখনই Universal I (বিশ্ব আমি) আমার ভিতরে প্রবেশের উপযুক্ত আধার পে'য়ে আমাতে rush কর্‌বে (ঢুক্‌বে)। যেমন, মন যদি সংস্কারশূন্য হয়, আর সেই মন যদি চাঁদে concentrated হয়—মন ত' সব জায়গাতেই আছে—তখন চাঁদ সম্বন্ধে যে ভাবগুলি কল্পনাকারে মানস-সমুদ্রে উত্থিত হ'বে সে ideas (ভাবগুলি) true (সত্য) হ'বেই। কিন্তু মনে যদি কল্পনা বা ভাব already (পূর্ব্বে) থাকেই তবে conflict of ideas (ভাবের সংঘাত)-এর জন্য সত্যানুভূতি

সম্ভবপর হ'বে না। Love-এ (প্রেমে) এই ভাবটা আসে, তাই ভগবান ভক্তির কাছে কাৎ হন। কারণ ভালবাসায় mind-এর (মনের) ঐ উপরি-উক্ত attitude (ভাব) আসেই, তা'তে ভগবানের গুণগুলি অলক্ষিতে ভক্তে এসে পড়্বেই। শরণাগতের নিকট ভগবান পরাজিত হনও এই জন্যই।"

স্মৃতি ফিরাইয়া আনিবার কথাটা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"একটা idea (ভাব) মানুষের মনে যে কারণেই হউক predominant (প্রবল) হ'লে মানুষ তাতে absorbed (নিমগ্ন) হ'য়ে যায়। যেমন মৃত্যুসময়ে কতগুলো ideas (ভাব) পর পর আস্তে থাকে—কিন্তু যে পর্য্যন্ত মন একটা idea-তে (ভাবে) absorbed (নিমজ্জিত) হ'য়ে অন্য associated idea-র (সংযুক্ত ভাবের) স্মৃতি ও connecting link (যোগসূত্র) হা'রিয়ে না ফেলে, সে পর্য্যন্ত মৃত্যু সম্ভব হয় না। কোন একটা particular idea-তে (বিশেষ ভাবে) যেই concentration (মনঃসংযোগ) হয় অমনি সেই concentration (মনঃসংযোগ)-এর ফলে জ্যোতিঃদর্শন হয়, আর সে জ্যোতিঃর এমনি ঝাঁঝ যে তা'তে অন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী coming ideas-এর (আগন্তুক ভাবের) সহিত connecting link (যোগসূত্র) হা'রিয়ে যায়, তাই present (বর্ত্তমান) আমিত্বের বিস্মৃতি ঘটে এবং যেই সেই ideas (ভাব) থেকে cut-off (বিযুক্ত) হওয়া অমনি মৃত্যু সম্ভবপর হয়। Continuous succession of ideas-এর (নিরন্তর ভাব-পরম্পরার) মধ্যে যে-কোন একটা idea-তে absorbed (নিমজ্জিত) হ'লে স্মৃতির যোগ নষ্ট হ'লেই মৃত্যু। আমাদের ইহজীবনেও শৈশবের আমিত্বের মৃত্যুতে যৌবনের আমিত্ব আসে; এস্থলে স্মৃতির যোগ একেবারে নষ্ট হয় না ব'লেই দেহত্যাগ না ক'রেও আমিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটে। তা'তে দেহেরও কিছু যে re-building না হয়, তা' নয়। এই যদি বল মৃত্যু-রহস্য, তবে কোন্ ব্যক্তি কোন্ idea-তে (ভাবে) absorbed (নিমজ্জিত) হ'য়ে মরে, তা' জান্তে পারি তার ইহজীবনের কর্ম্মের দ্বারা। কোন ব্যক্তির জীবনের কর্ম্মে ও ব্যবহারে তা'র অন্তর্নিহিত মূল ভাবটাই পরিস্ফুট হয়। সেই ভাবটী জান্লে পূর্ব্বমৃত্যুর সময় তা'র prevailing (প্রধান) ideaটী (ভাবটী) পাওয়া যায়। আর association of ideas-এর (ভাব-সম্বন্ধের) laws (নিয়ম) অনুসারে সেই prevailing idea-র (প্রধান ভাবের) সঙ্গে কি chain of ideas (ভাব-লহরী) তার এসেছিল তা'ও infer (অনুমান) করা যায়। তা'হ'তে পূর্ব্ব জীবনেরও clue (সন্ধান) পাওয়া যায়। এইরূপে মৃত্যুকালে predominant (প্রধান) idea-র

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (পাঠ্যাবস্থায়)

(ভাবের) সঙ্গে chained (সংযুক্ত) হ'য়ে যে ছোট ছোট ideas (ভাবগুলি) মনে উত্থিত হ'য়েছিল সেগুলি determined (নির্দ্ধারিত) হ'য়ে পড়ে। এই ভাবে proceed কর্‌লে (অগ্রসর হ'লে) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস inference (অনুমান) দ্বারাই পাওয়া যায়।"

১৯২৩ সনের ৫ই আগষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মার ধারে বাঁধের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া শুইয়া আছেন। দুই পার্শ্বে অনেকেই বসিয়া আছেন। ভরা পদ্মা স্ফীতবক্ষে প্রিয়-সম্ভাষণে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যাকালীন সমীরণ তার সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আর সে নীরবে যাইতে পারিতেছে না, বাঁধের তটতলে উচ্ছলিত হইয়া কলকল-নাদে তার আনন্দোচ্ছ্বাস জানাইয়া যাইতেছে। পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্য্যদেব লালবর্ণের ক্ষীণ রশ্মি রাখিয়া বিশ্রামলাভে যত্নশীল। যাঁহারা বাঁধের উপরে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মুখমণ্ডলই সেই রঙীন আভায় দীপ্ত। মাঝে মাঝে এক-একখানা নৌকায় কৃষকগণ দিবসের কার্য্য-সমাপনান্তে উত্তাল তরঙ্গমালা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নানা বিষয়ে সেদিন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। কয়েকটী প্রসঙ্গ এখানে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

"বর্ত্তমান যুগের research (গবেষণা-কার্য্য) ও এদেশের পূর্ব্বকালের research-এ (গবেষণায়) ফারাক্ আছে। এখন মাঝখান থেকে একটা ধ'রে বাইরের দিক দিয়ে নানা রকম চিন্তা ক'রে খানিকটা বা'র করে, হয় সেখানেই শেষ হ'য়ে যায়, আর না-হয় খাঁত হা'রিয়ে ফেলে। আমাদের ঋষিদের চিন্তাপদ্ধতি ছিল অন্যরূপ। তাঁরা জিনিষের গোড়া ধ'রে ক'রে যে'তেন। এই ধরুন যেমন জল। জল থেকে steam (বাষ্প)। যতক্ষণ জল earth-এর (মাটীর) সঙ্গে ছিল ততক্ষণ negatively charged (ঋণাত্মকভাবে সম্পৃক্ত) ছিল। যখন steam (বাষ্প) হ'ল তখন বাতাসে উঠ্‌ল—air (বাতাস) positively charged (ধনাত্মকভাবে ভরপুর)। Steam (বাষ্প) বাতাসে গিয়ে মিশে' water particles (জলকণা)-গুলো তা'তে ছি'টিয়ে থাকে। গাছগুলো মাটীতে আছে ব'লে তা'রা negatively charged. যখন তা'রা highly charged (বিশেষভাবে ভরপূর) হ'য়ে জলকণাগুলিকে draw (আকর্ষণ) করে তখন তা'রা positively charged ছিল ব'লে এক হ'য়ে নে'মে আস্‌তে বাধ্য হয়, তখন মেঘ, মেঘ হ'তে বৃষ্টি হয়। এই জন্যই যেখানে বেশী জঙ্গল বা উচ্চ পাহাড় সেখানে মেঘ-বৃষ্টি বেশী হয়। মরুভূমিতে গাছপালা নেই ব'লেই বৃষ্টি কম। আমরা যদি এমন কোন ব্যবস্থা কর্‌তে পারি—গাছের মাথায়

উপর highly negative charge (অত্যন্ত ঋণাত্মক শক্তির ব্যবস্থা) করতে পারি তা' হ'লেও মেঘ হ'য়ে বৃষ্টি হ'তে বাধ্য হয়।"

* * * * *

"একটা body-কে (শরীরকে) strike (আঘাত) করা মানে energy-র finer and grosser planes (শক্তির সূক্ষ্ম ও স্থূল স্তর)গুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত। Sound (শব্দ) ও light (জ্যোতিঃ) প্রভৃতি আঘাতেই উৎপন্ন হয়—কতকগুলি perceptible (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য), কতকগুলি imperceptible (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়)। একটা সূক্ষ্ম টোকা দিলেও শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলো ছিটকে উঠে। ভজনে mind-এর (মনের) concentration-এ (একাগ্রতায়) finer nerves-এর (সূক্ষ্মতর স্নায়ুর) যেই সৃষ্টি, অমনি finer (সূক্ষ্ম) স্পন্দনকে শব্দরূপে বোধ করি। সবই স্পন্দন—স্পন্দমান শক্তির বিভিন্ন plane (স্তর)। তা'দের ঘাত-প্রতিঘাতেই idea (ভাব)। সৎ-এর intensity (তীব্রতা) বাড়লে বাপ-মা ভুলে যায়, ক্রমশঃ objective world (বাহ্য দুনিয়া) অদৃশ্য হ'য়ে যায়, শেষে সব যেন হা'রিয়ে যায়, আবার repelled (প্রতিহত) হ'য়ে সবার মধ্যে ফি'রে আসে, দেখে সুখের মধ্যে আনন্দ, দুঃখের মধ্যে আনন্দ। অদৃশ্য হ'তে আরম্ভ করলেই অর্জ্জুন কিংবা বিবেকানন্দের মত অবস্থা হয়—নিজের intensity-র জন্যই।

"বিশ্বব্যাপী স্পন্দমান শক্তিমান শক্তিকণাগুলো ভাসছে, কখনও মেঘের মত জ্বলছে, কখনও গাঢ়তর হ'য়ে তারকা ও সূর্য্যে পরিণতি লাভ করছে; তাদের expansion (সম্প্রসারণ), contraction (সঙ্কোচ), stagnation-এ (বদ্ধাবস্থায়) চতুর্দ্দিকে গ্রহচন্দ্রাদি বিচ্ছুরিত হচ্ছে—এই-ই বিশ্বজগৎ। প্রতিকণাই প্রাণে স্পন্দমান। মানুষ, বৃক্ষ যদি সজীব হয়, চন্দ্র-সূর্য্যও সজীব—সবই সজীব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও এই নিয়মে। Electronic (বৈদ্যুতিনিক) vibration (স্পন্দন)কে মূল ধরলে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্ electron (বিদ্যুতিন)-এরই স্পন্দনে (Expansion, Contraction and Stagnationএ) সৃষ্ট। Electrons-এর এই স্পন্দনের এক এক স্তরে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির সৃষ্টি। এই স্পন্দমান বিভিন্ন জাতীয় কণার crystallisation-এ (দানাবাঁধায়) উদ্ভিদ-জীবাদির সৃষ্টি। এই মূল স্পন্দনকে যদি জানতে পারা যায় তবে তৎপ্রসূত স্থূলতর স্পন্দনকেও জানব। স্পন্দমান বিভিন্ন জাতীয় কণার সমাবেশে যে resultant (ফলস্বরূপ) স্পন্দন তা'ও জানব। এই resultant (ফলস্বরূপ) স্পন্দনই কোন জীবের presiding deity (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বা বীজ। এই বীজ জানলে, সেই জীবের সবই জানা হ'ল। জল বহু, কিন্তু

এই হিসাবে মূল স্পন্দনের জ্ঞান থাকলে জলের মূল স্পন্দন অর্থাৎ বীজ জ্ঞাত। একটা কথা আছে, অগস্ত্য মুনি সাগর পান ক'রেছিলেন। সকল জিনিষেরই একটী ক'রে অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে। প্রত্যেক অণু-পরমাণুরই different degrees of vibration (বিভিন্ন পরিমাণের কম্পন) আছে। এই vibration-এর (কম্পনের) খবরটা ভালভাবে জান্‌তে পার্‌লে, এই vibration-এর (কম্পনের) degree-র (পরিমাণের) change-এর শক্তিতে এক জাতীয় জিনিষকে অন্য জাতীয় জিনিষে পরিবর্ত্তিত করা যায়। অগস্ত্য মুনি জলের vibration-টা (কম্পনটা) ঠিক জান্‌তে পে'রেছিলেন, তাই তাকে অন্য রকম vibration (কম্পন) দিয়ে change (পরিবর্ত্তিত) ক'রে সমস্ত সমুদ্রের জলকে এক গণ্ডূষে পান কর্‌তে পে'রেছিলেন।

"বিশ্বজগতে ফাঁকা কিছুই নাই। এক plane-এর (স্তরের) স্পন্দমান কণাগুলির ঠাস বুনানির মধ্যে যেন আর এক plane-এর (স্তরের) স্পন্দমান কণাগুলির ঠাস বুনানি—এইভাবে মূল স্পন্দমান শক্তিকণা পর্য্যন্ত—তার পরেই কারণ-সমুদ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বহু প্রকারের আবির্ভাব, বহু প্রকারের individuality (স্বাতন্ত্র্য) হইতে একেরই ভিন্ন ভিন্ন position-এ (অবস্থায়) এই বিভিন্ন বহুত্বের উপলব্ধি—সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপদঃ।"

* * * * *

"বিধবা তাঁরাই যাঁরা মৃতস্বামীকে নিজ ইচ্ছায় বরণ ক'রে তাঁ'কে ভালবে'সেছিলেন এবং গর্ভে সন্তান ধারণ ক'রেছিলেন। এরূপ বিধবাদের বিবাহ অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিকই। ইহাতে সমাজের অকল্যাণ বৈ কল্যাণ নাই। কিন্তু যে সমস্ত বাল-বিধবার পূর্ণজ্ঞান হ'বার পূর্ব্বেই অভিভাবকেরা বিবাহ দিয়েছেন অথচ গর্ভসঞ্চার হয় নাই এমন বালিকার পুনর্ব্বিবাহ সমাজের কল্যাণের জন্য বাঞ্ছনীয়। যিনি জানেন যে, আমার যে পতি—আমি যাঁকে মনপ্রাণ অর্পণ ক'রেছিলাম, তিনি ম'রে গেছেন—তিনিই বিধবা। তাঁর বিয়ে হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যিনি বিয়ে হ'য়েছিল জানেন না, এমন কি স্বামী ব'লে গ্রহণ করেন নাই, কি মনপ্রাণ অর্পণ করেন নাই, ভালবাসেন নাই—তাঁর স্বামী ম'রে গেলে তাঁর আবার বিয়ে হওয়া উচিত। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি সহজ চরিতার্থতা লাভ না করায় অন্তরে অন্তরে লালসা সঞ্চিত হ'য়ে থাকে। রুদ্ধ লালসা বাল-বিধবাদের মন ও শরীরকে যে বিষাক্ত ক'রে তুলে তা' পরীক্ষিত সত্য। এই বিষ সর্ব্বদা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বহির্গত হয় ও আবহাওয়াকে বিষাক্ত ক'রে তুলে। এই বিষাক্ত বায়ু যে-কেহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করে সেই সে-বিষে বিষাক্ত হ'য়ে উঠে

—তা'তে তা'র দেহ ব্যাধির কারণ হ'য়ে পড়ে এবং অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে সমাজে দিন দিন পুরুষের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'চ্ছে। নারীর বিবাহ-প্রথা অবহেলা করায় সমাজে কেবলই পুরুষের অভাব ঘট্‌ছে এবং বিধবা নারীর সংখ্যাধিক্য হ'চ্ছে। এই ভীষণ সামাজিক ব্যাধি হ'তে আমাদের সমাজকে উদ্ধার কর্‌তে হ'লে বিধবাদিগকে বিবাহ দেওয়া এবং প্রচলিত বিবাহ-প্রথাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করা একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে।"

"বিবাহ-প্রথাতে আমরা যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছি তা'তে সমাজে মেরুদণ্ড-যুক্ত চরিত্রবান সন্তানের জন্ম হ'চ্ছে না। আমাদের দেশে কি নারীর সম্মান আছে? গরু-উৎসর্গের মত ঘুরিয়ে নিয়ে যায়,—তা' সে স্বীকার থাক্ আর নাই থাক্; মেয়ের পছন্দ হো'ক্ বা না হো'ক্ বিয়ে হ'য়ে গেল। এরূপ হ'লে প্রায়ই ভালবাসা জন্মায় না, ফলে সন্তানও ক্ষীণজীবী, অস্থির-মস্তিষ্ক হ'য়ে থাকে; যে স্ত্রীর স্বামীকেই স্বাধীনভাবে মনোনীত কর্‌বার শক্তি নাই, তার আবার ছেলে কি রকম হ'বে বলাই বাহুল্য। মুসলমানের মধ্যে এমন কি সাঁওতালদের মধ্যেও মেয়েকে স্বীকার ক'রিয়ে নেবার প্রথা আছে, এ জাতির মধ্যে তা'ও নাই। বিবেকানন্দ সত্যই বল্‌তেন—'এ স্ত্রীজাতিকে childmaking machine-এর (সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্রের) মত ক'রে রে'খেছে।' শাস্ত্রে ভাল বিধি আছে, তা' কি আমরা মানি? আমরা নিজেদের সুবিধামত শাস্ত্রের কত কদর্থ ক'রে নিই। এখনও যদি আমরা শাস্ত্র-সম্মত নিয়মে বিবাহ-সংস্কারের জন্য উ'ঠে-প'ড়ে না লাগি তবে ধ্বংস হ'বার আর দেরী নাই। ভিন্ন জাতীয় লোকে তা'হ'লে শীঘ্রই আমাদের নারীদের নিতে আরম্ভ কর্‌বে। দেশের সকল আন্দোলনের মধ্যে আমার মতে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন সর্ব্বাগ্রে করণীয়। এখনই আমরা মেয়েদের consent (মত) নিয়ে বিয়ে দিতে পারি আর যা'তে তারা শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বংশ, চরিত্র, বিদ্যা প্রভৃতি বিচার ক'রে আদর্শপ্রাণ ব্যক্তিকে স্বামী নির্ব্বাচন ক'রে নিজেদের জীবন সার্থক কর্‌তে পারে তদ্রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌তে পারি। মেয়ের যদি বিবাহে খুব সম্মতি থাকে তবে সেখানে সন্তান খুব ভাল হয়। Intensity of love (ভালবাসার প্রগাঢ়তা) আছে কিনা তাই দেখ্‌তে হ'বে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার প্রগাঢ়তা থাক্‌লেই সন্তান সবল ও মেধাসম্পন্ন হয়। হয়ত' এ পর্য্যন্ত কাউকেও ভালবাসে নাই, কি অন্যের উপর ভালবাসা আছে, এমন স্ত্রীলোকদিগের যদি সন্তান হয় তবে সেই সকল সন্তানের weak brain (দুর্ব্বল মস্তিষ্ক) এবং weak nerve

(দুর্ব্বল স্নায়ু) হ'বে। কিন্তু স্বামীস্ত্রীর পরস্পরে ভালবাসা থাক্‌লে সন্তানের power of resistance (প্রতিরোধের ক্ষমতা) খুব বেশী হয়।"

১৯২৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর। Different strata of energy-র (শক্তির বিভিন্ন স্তরসমূহের) কথা উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"নানা Science (বিজ্ঞান) আর কিছুই নয়—the effect of these energies on one another (পরস্পরের উপর শক্তির ক্রিয়া)। Science (বিজ্ঞান) যে বলে ether একটা homogeneous (সমজাতিক) liquid (তরল পদার্থ) তা' নয়, সবই কণাপূর্ণ discontinuous (বিচ্ছিন্ন) aggregation of vibrating particles (স্পন্দমান কণাসমূহের সমষ্টি)। কোন stratum-এ (স্তরে) energy (শক্তি) homogeneous (সমজাতিক) হওয়া possible (সম্ভবপর) নয়। Discontinuity (বিচ্ছিন্নতা) আছেই। আর vital energy নামক subtler (সূক্ষ্মতর) stratum of energy'র (শক্তির স্তরের) mutual (পবস্পরের) ঘাত-প্রতিঘাতে আমার self (সত্তা) যে ভাবে রা'ঙিয়ে উঠে, তাকেই আমার mind (মন) বলি। গোড়ায় mental concentration-এর (মনঃসংযোগের) ফলস্বরূপ বাইরে যে আলোক-কণিকা দৃষ্ট হয় আমার মনে হয় ওগুলো solid, liquid, gaseous (কঠিন, তরল, বায়বীয) কোন জাতীয়ই নয়, fourth state-এর (চতুর্থ অবস্থাব)—তাই electrons (বিদ্যুতিন) ব'লে মনে হয়। Cause (কারণ) হ'চ্ছে finest position (সূক্ষ্মতম অবস্থা) আর এই কারণ-সমুদ্রেরই পরিণতি এই সব different strata of energy (শক্তির বিভিন্ন স্তরসমূহ)। এরা আবার causeই স্ব activity-তে (ক্রিয়াশীলতায়) expansion & contraction-এ (সম্প্রসাবণ ও বিকর্ষণে) এই সৃষ্টিতে পরিণত। Causeই (কারণই) হ'চ্ছে Self—সে একরকম ভাবের তরঙ্গ-সমষ্টিতে এক-এক position-এ (অবস্থায়) আবদ্ধ হ'য়ে নিজত্বেব সঙ্গে এই বুদ্বুদ্ মিলিয়ে তার individuality-র (ব্যক্তিত্বের) বোধ জাগ্রত ক'চ্ছে। আর এই সৃষ্ট বহুত্বের ego-ই (আমিত্বই) হ'চ্ছে cause (কারণ), আর বুদ্বুদ্ হ'চ্ছে প্রকৃতি বা Will (ইচ্ছা)—এই দু'য়ে মি'লে আমিত্ব-বোধ ও মনের বিকাশ। Vital current-এর (জীবন-ধারার) পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে যে বুদ্বুদ্গুলো cause-এর (কারণের) উপর হ'চ্ছে সেই বুদ্বুদ্গুলো তার মন।

"Cause (কারণ-সমুদ্র) তার স্বকীয় activity-তে (সম্প্রসারণ ও বিকর্ষণরূপ শক্তিতে) নিজেই বিশ্বরূপ হ'য়েছেন। Cause (কারণ) স্বীয় লয় ও সৃষ্টিকারিণী মহাশক্তি প্রভাবে থরে থরে বহু স্তরে নিজেই বিবর্ত্তিত হ'য়েছেন।

কিন্তু বহুত্বপূর্ণ এই বিশ্ব সেই কারণ-সমুদ্রেই ভাস্‌ছে—simultaneously many and one. বহুস্তরের পরস্পর আঘাতে আবার বুদ্‌বুদ্‌ উঠ্‌ছে, এই বুদ্‌বুদ্‌-সমষ্টি লইয়া কারণ বা Self (আমিত্ব) নিজকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত কর্‌ছে। Cause-এর দু'টো দিক আছে—একটা towards itself, towards unity (নিজের দিক), আর একটা বহুত্বের দিক। যা' Cause-এর (কারণের) দিকে নিয়ে যায় তাকেই 'ভাল' বলা হয়, বহুর দিকে যা' নিয়ে যায় তাকে 'মন্দ' বলা হয়। বিশ্বের সব জিনিষ—গাছ, পালা, পশু, পক্ষী সকলেই সেই Self বা Cause-এরই বিভিন্ন রূপ-গ্রহণ ব'লে মনে হয়। একজনই যেন গাছের মত হ'য়ে দাঁ'ড়িয়ে আছে, মানুষের মত চ'লে বেড়াচ্ছে। আর ঐ বহু ego-র সৃষ্টি হ'লে একটা ego-তে not-ego দ্বারা obstructed হ'য়ে মন প্রভৃতির উদ্ভব হ'য়েছে। এ ভাবে দেখ্‌লে ভালমন্দ ব'লে কিছুই নাই। মানুষ ইচ্ছা কর্‌লেই Cause-এর দিকে যে'তে পারে, আবার ইচ্ছা কর্‌লেই বহুত্বের অর্থাৎ সৃষ্টির দিকেও যে'তে পারে।"

১৯২৫ সনের ২৫শে জানুয়ারী। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। অনেকেই সেখানে রহিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে Foreman-এর (যুগাবতারের) আগমন সম্বন্ধে কথা উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন—"Foreman (যুগাবতার) যখন আসেন, তিনি যে সমস্ত ideas (ভাবরাজি) দিয়ে যান, তখন মানুষ সেগুলো ধর্‌তে পারে না। তিনি চ'লে যাবার পরে এবং পরবর্ত্তী Foreman আস্‌বার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আরও কতকগুলি মহাপুরুষ আসেন,—তাঁরা ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের ভাবরাজির এক-একটি বিশেষ বিশেষ ভাব নিয়ে তাঁরই প্রচার করেন। এই রকম ক'রে যখন তাঁর অর্থাৎ উক্ত Foreman-এর (যুগাবতারের) সমস্ত ভাবরাজি ঐ পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হ'য়ে পড়ে তখনই সেই পূর্ব্ববর্ত্তী Foreman-কে জান্‌বার এবং বুঝ্‌বার একটা চেষ্টা আসে। ধরুন যেমন শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ideas (ভাবরাজি) দিয়ে গেলেন, তাঁর পরবর্ত্তী সময়ে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি তাঁরই (শ্রীকৃষ্ণেরই) এক একটী ভাব প্রচার কর্‌তে প্রয়াস পে'য়েছেন। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে যে জ্ঞান ছিল তা'ই বিশেষভাবে প্রচারের চেষ্টা ক'রেছেন। বুদ্ধ ও শঙ্করের পরে যে যে মহাপুরুষের আগমন হ'ল তাঁরা কেউ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম, কেউ বা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা ও প্রচার ক'রে গিয়েছেন। মানুষ শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ কর্ম্ম বা শুদ্ধ ভক্তিতে তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পার্‌ল না। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাবরাজি তাঁ'র পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ

কর্ত্তৃক প্রচারিত হ'বার পরে, সেই সমস্ত ভাবরাজির সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা আসে, তা'রই ফলে তখন মানুষ সেই পূর্ব্ববর্ত্তী Foreman-কে বুঝ্‌তে চেষ্টা করে। আবার কোন পূর্ব্ববর্ত্তী Foreman-কে জগৎ তখনই বুঝ্‌তে পারে যখন তৎপরবর্ত্তী Foreman-এর আগমন হয়। ছেলেরা যে বাঁশের নলের পট্‌কা ফুটায়, তাতে পট্‌কাটা বেগে বে'র হয় তখনই যখন তার পূর্ব্বে আর একটা পট্‌কা ঢুকিয়ে আঘাত করা যায়। সেই রকম পরবর্ত্তী Foreman-এর, ধরুন কল্কির আগমনের কালে, পূর্ব্ববর্ত্তী Foreman শ্রীকৃষ্ণকে জগৎ ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারবে।

"Material government-এর arrangement যে রকম ভাবের, spiritual government-ও সেইভাবেই managed হয়। ধরুন যেমন King আছেন, এঁর Viceroy, Governor, Commissioner, Magistrate প্রভৃতি আছেন; এঁরা প্রত্যেকেই King-কে accept ক'রে নিয়ে শাসন করেন। কিন্তু যখনই Provincial Governor-রা King-কে deny ক'রে নিজে King হ'য়ে বসে তখন পরস্পরের মধ্যে বে'ধে যায় সংঘর্ষ, কারণ তখন প্রত্যেকেই King হ'তে চায়। Spiritual division-ও ঠিক সেই রকমের। যখন সেই Foreman আসেন সে সময়ে তাঁকে অন্যান্য মহাপুরুষ বা পরবর্ত্তী যুগের মহাপুরুষরা যদি King ব'লে accept করেন তবে বেশ শৃঙ্খলার সহিত spiritual kingdom governed হ'তে পারে, কিন্তু তা' হয় না। কারণ মহাপুরুষেরা তাঁকে (সেই Foreman-কে) বা পরস্পরকে চিন্‌তে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মধ্যে থাকে একটা gulf of ignorance, আর এ gulf of ignorance যদি না থাকত তা'হ'লে এই লীলা বা creation সম্ভবই হ'ত না। কিন্তু Foreman যিনি আসেন তাঁর ভিতর কখনই কোন ignorance থাকে না বা থাক্‌তে পারে না। Foreman is always conscious—সুতরাং তাঁর কাছে বিস্মৃতি আস্‌তে পারে না; নিজের জীবন, বাণী ও কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অবতার পুরুষগণকে fulfil করার জন্যই হ'য়ে থাকে তাঁর আবির্ভাব।"

১৯২৬ সনের ২০শে মে। অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে উপবিষ্ট; রোগের উৎপত্তি এবং নানারূপ চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"একখণ্ড তামা যদি জলে boil (সিদ্ধ) করা যায় তবে তামার কোন অংশ জলে যদি না-ও dissolved হয় (গলে) তবুও ঐ জলের এমন ultra-atomic re-arrangement (আণবিক পুনর্ব্যবস্থা) হ'তে পারে যাতে ঐ জলে তামার অংশ পাওয়া যা'বে না বটে, এমন কি জলের physical properties-ও (বস্তুগত উপাদানও) পরিবর্ত্তিত হ'বে না হয়ত', কিন্তু chemical

properties (রাসায়নিক উপাদান) এমন changed (পরিবর্ত্তিত) হ'বে যা'তে ঐ জল poisonous (বিষাক্ত) হ'তে পারে। Homeopathic medicine-এর (হোমিওপ্যাথিক ঔষধের) action (ক্রিয়া) ঠিক ঐ রকমের। কয়েক ফোঁটা Nux Vom. (নক্স ভম্) spirit (স্পিরিট্)এ দিলে এই Nux Vom.এর presence-এ (উপস্থিতিতে) spirit-এর ultra-atomic (আণবিক) arrangement-এর জন্য (ব্যবস্থার দরুণ) spirit-এর nerve-system-এর (স্নায়ুযন্ত্রের) উপর একটা বিশেষ রকমের action (ক্রিয়া) হয়।

"আমাদের রোগ প্রথম হয় মনে, মন হ'তে brain-এর একটা ভাগের একটা arrangement (ব্যবস্থা) হয়। ঐ arrangement (ব্যবস্থান) nerves-এ (স্নায়ুগুলোতে) affect (প্রভাবান্বিত) ক'রে শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গকে আক্রমণ করে, তাই সেই অঙ্গে রোগ দেখা দেয়। এখন এই brain-এর (মস্তিষ্কের) arrangement-এর (ব্যবস্থানের) অনুরূপ কোন arrangement (ব্যবস্থা) spirit-এ যদি কোন কিছু Nux Vom., Sulphur, Ipecac বা এমন কিছু দ্বারা set up (তৈরী) করা যায় তবে ঐ spirit কয়েক ফোঁটা খে'লেই directly (বরাবর) affect (প্রভাবান্বিত) করবে এবং brain-এর (মস্তিষ্কের) arrangement-এর (ব্যবস্থার) অনুরূপ impetus (প্রেরণা) brain-এ (মস্তিষ্কে) দেওয়ার জন্য প্রথম রোগের symptoms-এর (লক্ষণের) aggravation (বৃদ্ধি) দেখা যায়। Aggravation মানে brain-এর arrangement-টা বাড়ে, আর এই দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে curative force-ও (আরোগ্যজনক শক্তিও) সমান অনুপাতে বাড়্তে থাকে। যেমন একখণ্ড রবার টেনে লম্বা করলে, pulling force (টানবার শক্তি) বাড়্বার সঙ্গে সঙ্গে force of restitution-ও (পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিবার শক্তিও) বাড়ে, তেমনি curative force-টা (আরোগ্যকারিণী শক্তিটা) ঐ force of restitutionএরই মত aggravation-এর পাশাপাশি বাড়্তে থাকে। তাই aggravation আন্লেই indirectly (পরোক্ষভাবে) curative force (আরোগ্যশক্তি) বাড়ান হয়। তাই Homeopathic medicine-এর immediate effect aggravation. Brain-এর centre-এর (কেন্দ্রের) change (পরিবর্ত্তন) হ'লে, root cause (মূল কারণ) দূর হ'লে organs-এর (শরীরযন্ত্রের) রোগও ঐ কারণ দূর হ'বার সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যায়, আর তাই এই Homeopathic cure more radical (হোমিওপ্যাথিক মতে আরোগ্য আরও মৌলিক)। Chronic disease-এ (পুরাতন রোগে) ইহা বোধগম্য

হয়। Acute case-এ (তরুণ রোগে) aggravation (বৃদ্ধি) এত শীঘ্র দেয় ও চ'লে যায় যে উহা ধরা যায় না, কিন্তু এই aggravation (বৃদ্ধি) হ'বেই। আর এই aggravation-এর indirect effect (পরোক্ষ ফল) cure (আরোগ্য)।

"Higher dilution-এর Nux Vom. বা অন্য যাহা spirit-এর সঙ্গে থাকে তাহা এতই সামান্য যে, থাকে না বল্‌লেই চলে, তাই spirit-টাই medicine. Higher dilution-এ spirit-এরই electronic condition (বৈদ্যুতিনিক অবস্থা) পরিবর্ত্তিত হয় আর ঐ spirit-ই medicine. অন্য যে জিনিষ spirit-এ দেওয়া হয় তাহা accessory (সাহায্যকারী) মাত্র, spirit-এর ঐ arrangement-টা (ব্যবস্থানটা) induce করে মাত্র।

"Allopathy আর কবিরাজী দুইই একজাতীয় চিকিৎসা। কবিরাজ যদি শিক্ষিত হন তবে Allopathy হ'তে কত নূতন তথ্য করায়ত্ত ক'রে কবিরাজীকে উন্নত কর্‌তে পারেন, Allopathy-কে ছা'পিয়ে উঠ্‌তে পারেন। Allopathy চিকিৎসা organs-এর (শরীরযন্ত্রের) চিকিৎসা। Organs-এ যে পরিবর্ত্তন হয় ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে তার একটা পরিবর্ত্তন আন্‌তে পার্‌লে, বাইরের অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন ঘট্‌লে ভিতরের কারণেরও পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে, তাই রোগের কারণও সে'রে যায়। কোন কোন সময় বাইরের symptoms (লক্ষণ) suppose (কল্পনা)-করা, তাই রোগ-নিরাকরণ হয় না, রোগের suppression (প্রতিরোধ) হয়। Homeopathy-তে এই suppression খুব কম হয়। আবার Psycho-analysis-এ (মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায়) suppression (প্রতিরোধ) একদম হয় না বল্‌লেই হয়—একেবারে radical cure (পূর্ণ আরোগ্য) হয়।"

* * * * *

"Language শেখ্‌বার নাকি একটা direct method (সহজ পন্থা) হ'য়েছে, তা'তে verb-গুলো প্রথমে শিখান হয়—তার কারণ শিশুদের করার tendency-টা (ঝোঁকটা) খুবই বেশী। তাই তাদের কাছে বলা হয় 'run' (দৌড়াও), সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৌড়াতে বলা হয়—'walk' (হাঁট), সঙ্গে সঙ্গে হাঁট্‌তে বলা হয়। এমনিভাবে করার মধ্য দিয়ে বালকদের সহজেই language (ভাষা) শেখান যে'তে পারে। শব্দটার সঙ্গে একটা কিছু কর্‌লে শব্দটা সহজেই মনে আঁকা থাকে। তেমনি বাইরের যে জগৎটা র'য়েছে, যেটার সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই আমাদের মনের প্রসার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বে'ড়ে উঠে, সে'টাতেই আমাদের শিক্ষার সমস্ত উপকরণগুলো র'য়েছে। আমরা সকলেই মাতৃভাষা বাংলা যেমন শিখি,

অন্য কোন ভাষা কিছুতেই তেমন শিখ্‌তে পারি না। আবার একজন ইংরেজ ইংরেজী যেমন শিখেন আমরা কিছুতেই তেমন শিখ্‌তে পারি না। ছেলেবেলা হ'তেই আমাদের মাতৃভাষাটা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়া মায়ের আদর-অনাদরের মধ্য দিয়া সহজভাবে শি'খে উঠি, তাই মাতৃভাষার জ্ঞান এতটা সত্যিকার ও এতটা সুন্দর হ'য়ে উঠে। এই জ্ঞানটা আমাদের পণ্ডিত করে না বটে, কিন্তু এমনই মজ্জাগত হ'য়ে পড়ে যে, এ জ্ঞানে আমাদের অহঙ্কার থাকে না। আর আমাদের জীবনের সমস্ত সাধারণ প্রয়োজন এই ভাষার দ্বারা আমরা কেমন সুন্দরভাবে আজীবন মিটিয়ে থাকি! তেমনি মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো টানের—কতগুলো ইচ্ছার—সৃষ্টি হয়। বালক লা'ফাতে চায়, কিছুদিন বাদে গাছে উঠ্‌তে চায়, আবার কোন বয়সে লাঠি নিয়ে মারামারি বা লোহা নিয়ে ঠোকাঠুকি কর্‌তে ভালবাসে। আবার কখনও—এটা কি, ওটা কি কত প্রশ্ন কর্‌তে দেখি। এমনই একটা সহজ রকমের কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া মানুষের শরীরটা আর তারই সঙ্গে মনটা বে'ড়ে ওঠে। তা'হ'লে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যা'তে মানুষের এই প্রকৃতিটাকে সহায়করূপে ল'য়ে তা'র বহুদর্শন বা'ড়িয়ে দেয়। আর তখনই জগৎটার সঙ্গে তা'র সহজ ব্যবহার ও ভাবের বিচিত্র আদান-প্রদানে তা'র জীবনটা সার্থক হ'য়ে উঠে, আর এই-ই প্রকৃত শিক্ষা। এর জন্য বালকের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, প্রয়োজন হ'লে তাদের কাঠের কাজ, কর্ম্মকারের কাজ প্রভৃতি বেশী শি'খাতে হয়, বই-পড়া বা অঙ্ক-কষার চেয়ে।"

১৯২৬ সনের ২রা নবেম্বর। রাত্রে আমরা Stekel-এর 'The Beloved Ego' পড়িতেছিলাম।—শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদা ও অবিনাশদা আর আমি। খানিকটা পড়া হইয়াছে, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি পড়্‌ছেন্?" কৃষ্ণদা বলিলেন—"Ego, marriage ইত্যাদি পড়্‌ছি। Stekel বলেন, প্রত্যেক love-এর (প্রেমের) সঙ্গেই hate (ঘৃণা) আছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"Positive (ধনাত্মক ভাব) prominent (প্রধান) হ'লে negative (ঋণাত্মক ভাবের) একটা centre (কেন্দ্র) থাকে, আর negative (ঋণাত্মক ভাব) prominent (প্রধান) হ'লে একটা positive (ধনাত্মক ভাব) centre (কেন্দ্র) থাকে। Positive prominent-এর কাছে গেলেই negative prominent-এর positivity (ধনাত্মকতা) বাড়্‌তে থাকে। আর তখন সে এমন একটা position (ভাব) নেয় যখন তার positivityটা positive prominent-এর দিকে ঘুরে যায়, তখন উভয়ের

মধ্যে হয় repulsion (বিতৃষ্ণা)। কিন্তু দুই জনেই যদি common centre-এ (একই কেন্দ্রে) attached (যুক্ত) হয়, তবে এই repulsion আর হয় না"—বলিতে বলিতে সন্তান হইলে তার উপর attachment-এর (ভালবাসার) জন্য পিতামাতার ভালবাসা কেমন গাঢ় হইয়া উঠে বলিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"Stekel-এর সঙ্গে মেলে না?" অবিনাশদা বলিলেন—"Stekel ব'লেছেন—Small trivialities (ক্ষুদ্র বিষয়)গুলির দিকে মনোযোগ না দিলে love (প্রেম) বজায় থাকে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা দৃঢ় থাকে।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"Stekel বল্‌ছেন যে দু'টো যেন এত কাছাকাছি না আসে যা'তে negative prominent-এর positivity এত বে'ড়ে যায় যা'তে সে repelled (বিতৃষ্ণ) হয়।" তারপর কথা হইল, প্রত্যেক love-এর (প্রেমের) ভিতরেই একটা repression (দমন) থাকে—repression of will to power (শক্তিলাভের ইচ্ছার দমন), যেটা হ'চ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এইটা love-এর দরুণ repressed হ'য়ে রইল, পরে হয়ত repressionটা (দমনটা) একটু strength (শক্তি) gather (সংগ্রহ) ক'রে শেষে irresistible force-এ (অদম্য শক্তিতে) ভে'সে উঠ্‌ল। সেইটা হ'চ্ছে hate (ঘৃণা)—কত মানুষের জীবন তা'তে বিষময় হ'য়ে উঠ্‌ছে—এই Stekelএর মত। Stekel তার solution (মীমাংসা) দিয়েছেন—এ hateটা (ঘৃণাটা) ক'মে যায় যদি স্বামী-স্ত্রী দুই জনে নিজেদের খুঁটিনাটি জিনিষগুলো না দে'খে world at large-এর (বিশ্ব দুনিয়ার) দিকে তাকায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"এর মীমাংসা তখনই হয়, যখন স্বামী-স্ত্রী দুই জনে মি'লে third something-এ (তৃতীয় কিছুতে) attached (যুক্ত) হয়। সেই object (পাত্র) গুরু বা পিতা যদি হন তবে দু'জনের hate (ঘৃণা) আরও ভালভাবে controlled (দমিত) হ'তে পারে। একটা centre of attachment (ভালবাসার কেন্দ্র) চাই।" একটু থামিয়া বলিতেছেন—"World at large-এর (বিশ্ব দুনিয়ার) দিকে তাকিয়ে কি দেখি? সূর্য্যের লাল আলো পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে প'ড়েছে। সে-গুলোতে মনে সত্যি কোন sentiment (ভাব) হয় না, আকাশ দে'খে ভাব উথ্‌লে উঠে না, শুধু যেন গ্রাস কর্‌তে চায়, কিন্তু যখন আমার unit-এর (কেন্দ্রের) দিকে তাকাই তখন তাঁর অসীম রূপে বিভোর হ'য়ে যাই, সূর্য্যের সোণালী কিরণে যেন স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হই, বাতাস যেন তার কোমল স্পর্শ গায়ে বুলিয়ে দেয়—সমস্ত পৃথিবী সুন্দরতর ভাবে এক অপূর্ব্ব শিহরণ এনে দেয়।" কিছুক্ষণ

নীরব থাকিয়া (যেন কিছু একটা অনুভব করিতেছেন বলিয়া মনে হইল) বলিলেন—"দেখ্, একটা point (বিন্দু) আর infinite expansion (অনন্ত বিস্তৃতি) যেন এক জিনিষ ব'লে মনে হয়। দেখ্ছি যেন একটা atom (পরমাণু), সেটা ঝক ক'রে ফে'টে চৌচির হ'য়ে তার থেকে millions of smaller electrons (কোটী কোটী ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিন)-এর মত বে'রুচ্ছে। সেগুলো আবার attraction (আকর্ষণ) এবং repulsion-এর (বিকর্ষণের) দরুণ আবার নানারূপ দানা বাঁধ্ছে। আবার সেগুলো যেন originate কর্ছে (উৎপন্ন হ'চ্ছে) একটা আরও ছোট দানা থেকে—যেন একটা sub-electron (ক্ষুদ্রতর বৈদ্যুতিন), আবার সেই ছোট point-এর (বিন্দুর) মত দানাটা আবার ঝক্ ক'রে ফে'টে গেল। তাব থেকে আরও millions and millions of smaller hyper electrons (কোটী কোটী অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিন) সমস্তটা ব্যাপ্ত ক'রে ফেল্লে। এমনি ক'রে ভাঙ্গ্তে ভাঙ্গ্তে শেষে একটা দানাতে গিয়ে পৌঁছে। ঐ থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। ঐ সেই prime (আদি) দানাটা থেকে যেন একটা series of process-এর (ক্রমিক অগ্রগতির) ভিতর দিয়ে আমার Ego'র দানাটা living being-এর (জ্যান্ত শরীরের) ভিতর এসে পড়্ল। দেখ্লাম যেন জলের ভিতরে কুমীর হ'য়ে আছি, এক জন্মে গাছ হ'য়ে আছি। তারপর দেখ্লাম ছোট ছেলে হ'য়ে দৌড়াচ্ছি, শেষে বিয়ে হ'ল, স্ত্রী নিয়ে enjoy (ভোগ) ক'চ্ছি। তারপর দেখ্লাম ধীরে ধীরে আমি বেবিয়ে এসেছি। আমার দেহটা প'ড়ে আছে, সবাই কান্নাকাটি ক'চ্ছে—হঠাৎ তখন মনে হ'ল সত্যই কি আমি ম'রে গেছি? তারপর যেন একটা gap-এর (ফাঁকার) মত লাগে। তারপর আবার নূতন একটা জীবন চল্তে থাকে। এমনি এক জীবনে মনে হয় আমি চামার ছিলাম। এক জীবনে রাজার ঘরে জ'ন্মেছিলাম, বাড়ীতে একটা গম্বুজের মত ছিল এবং তার চূড়াটা সোণার পাতে মোড়া ছিল। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীলোকেরা সবাই আমায় বড় ভালবাস্ত। এক জীবনে মনে পড়ে, কোন পাহাড়ের পাদদেশে ঘর বেঁধে আশ্রম ক'রেছি। সেস্থানটা একখানা বড় ঢালু শ্বেতপাথরে বাঁধান ছিল। একটা ফুলের লতা-গাছ তার উপরে ছায়া করত, লতায় সাদা সাদা ফুল ফুট্‌ত, এক ধার দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে একটা ছোট ঝরণা ব'য়ে যাচ্ছে —এমনি ক'রে ক'রে শেষে এই জীবনে এসে পৌঁছেছি। আর এ জন্মের কথা ত' সব মনেই আছে। দেখ্লাম এক আলোক-ধারা হ'য়ে আমি সূর্য্যের মধ্যে নে'মে এসেছি। সূর্য্যের ভিতর পৃথিবীর মতই ঠাণ্ডা অনুভব

কর্‌লাম। সেখানে যে-সব জীব আছে তা'দের ভাব আর পৃথিবীর জীবের ভাব সম্পূর্ণ পৃথক। ওদের ভাব এখানে প্রকাশ কর্‌বার উপায় নেই। তা'দের সঙ্গে এখানকার কোন প্রকার common object না থাকায় তা'রা যে কি রকম তা' এখানকার মন নিয়ে বলা কঠিন। সূর্য্যের ভিতর দিয়ে যখন আস্‌ছি জ্যোতিঃর সব পাহাড় দেখ্‌লাম, আর সেগুলোকে positive মনে হ'ল, কারণ তা'রা যেন স্বতঃই জ্যোতিঃ-কণা—অনবরত চারিদিকে বিকীর্ণ ও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তারপর কত গ্রহ-উপগ্রহের ভিতর দিয়ে চ'লে এসেছি ; আমার আসার সময় তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা কত স্তব-স্তুতি ক'চ্ছিল, তা' শুনে তা'দের ফে'লে আস্‌তে যেন ইচ্ছা হচ্ছিল না। আস্‌তে আস্‌তে এক জায়গায় দেখ্‌লাম পাঁচটী তারা। তন্মধ্যে একটী কেন্দ্রে অবস্থিত আর চারটী একবার সেই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে, আবার কেন্দ্র হ'তে দূরে স'রে যা'চ্ছে। নভোমণ্ডলের সকল গ্রহই তা'দের স্ব স্ব সূর্য্য-কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুর্‌ছে, কেবল এইখানেই তা'র ব্যতিক্রম দেখ্‌লাম। এই গ্রহগুলো যখন কেন্দ্রের দিকে যা'চ্ছে তখন তা'দের রং হ'চ্ছে লাল, আর যখন দূরে স'রে যা'চ্ছে তখন তাদের রং হ'চ্ছে নীল। তা'দেব এই অদ্ভুত গতিভঙ্গিমা তখন আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'রেছিল ব'লে এখনও তা' আমার স্মৃতিপটে বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। * * * * তারপর মাতৃগর্ভে in হ'লাম (প্রবেশ কর্‌লাম)। জানি 'নামই' আমার Basis তাই মাতৃগর্ভে থাক্‌তেই আমি নাম করতাম্‌। জন্মের পর দেখ্‌ছি ঐ আতুর-ঘরে আলো মিটি মিটি জ্বল্‌ছে, আর আমি যেন কতকগুলো নাড়ীতে জড়িয়ে প'ড়েছি, মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'বামাত্র হে'সে উঠ্‌লাম। নাড়ী কাটার পর মা যখন গরম সেঁক দিতেন তখন আমার ভাল লাগ্‌ত না, খুব কষ্ট হ'ত, আমি কাঁদ্‌তাম্‌। একটু বড় হ'য়ে ছোট ছোট হাত-পা নিয়ে বে'ড়াতাম। একটা শেফালি গাছ ছিল তাই ধ'রে উঠ্‌তাম্‌। অতি শৈশবে সবসময় একখানা লাঠি হাতে ক'রে থাক্‌তে খুব ভাল লাগ্‌ত, এজন্য সকলে আমায় আদর ক'রে গাড়োয়ান ব'লে ডাক্‌ত। তারপর বড় হ'য়ে হ'য়ে এই অবস্থায় এসেছি। এর ভিতর যেন gap (ফাঁকা) নেই, from beginning to end (আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত) a series of process (পরম্পরাক্রমে অগ্রগতি) চল্‌ছে। কিন্তু যখন যে stage-এ (অবস্থায়) থাকি তখন সেই stage (অবস্থা) অনুযায়ী feelings (ভাব) and thoughts (চিন্তা) moulded (গঠিত) হয় এবং relative to that stage (সেই অবস্থানুপাতিক) ততটুকু দেখি।"

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট একদিন এক ভদ্রলোক উপস্থিত। আগন্তুক প্রশ্ন করিলেন—"কথিত আছে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরায়। এই কথার মানে কি?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিলেন—"ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের পিছনে ফিরে। মাধুর্য্য কথাতে আমরা কি বুঝি?—সোজা কথায় মাধুর্য্য বল্‌তে বুঝি মিষ্টি-লাগা। যখনই আমার কাউকে মিষ্টি লাগে, তখন ক্রমশঃ তার ঐশ্বর্য্যগুলি ধীরে ধীরে আমার চোখে পড়্‌তে থাকে। আস্তে আস্তে হ'য়ে ওঠে সে আমার কাছে অনেক বড়। অর্জ্জুনের যেমন হ'য়েছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রথমে attached (আকৃষ্ট) হ'য়েছিলেন শুধু এই জন্য যে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ভারি মিষ্টি লাগ্‌তো—তাঁর কোনও qualification (গুণগ্রাম) বিশেষের জন্যে নয়। এই মিষ্টি-লাগা থেকেই ফু'টে উঠ্‌তে লাগ্‌লো অর্জ্জুনের কাছে তাঁর ঐশ্বর্য্যগুলি—তাঁর সঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে। ক্রমে তিনি হ'য়ে উঠ্‌লেন অর্জ্জুনের নিকট উপদেষ্টা—ক্রমশঃ গুরু—পরে একেবারে ভগবান্। কিন্তু মানুষটাকে বাদ দিয়ে তাঁর ঐশ্বর্য্যের জন্য ভালবাসা হ'লে আর তাঁকে মিষ্টি-লাগা হয় না। যখনই কারও গুণের জন্য আমাদের admiration হয় (তাঁর প্রতি মন ঝুঁকে পড়ে) তখন ঐ গুণকে বাদ দিয়ে আমরা আদৌ মানুষটাকে বোধ করি না। Qualifications-এর (গুণগ্রামের) জন্য love (ভালবাসা) যেন 'mal-love' (মিথ্যা ভালবাসা)। একজন বড় লোককে—সে বড়লোক এই জন্য ভালবাস্‌লে, তাঁকে ভালবাসা যায় না। এই হিসাবে বলা যায় ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরায়।"

প্রশ্ন হইল—"আপনার শিষ্যবর্গের বিশ্বাস—কেউ কেউ নাকি বোধও ক'রেছেন যে, আপনি স্বয়ং ভগবান্। সে যা' হোক, যাঁ'কে এত লোকে এমনভাবে সম্মান ও ভক্তি কর্‌ছে সেই আপনার মুখ থেকেই আমার শুন্‌বার ইচ্ছা যে আপনি ভগবান্ কি না?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"এই প্রশ্নটাই তো করা ঠিক হ'ল না। আমি ভগবান্ কি না আমার তা' বলা কঠিন। ধরুন আমি একজনের স্বামী আছি, তাই ব'লে আমি একজন স্বামী, এই রকম বোধ করা যায় না। তেমনি আমি যদি ভগবান্ সত্যি সত্যি হ'য়েও থাকি, তা'হ'লেও ভগবান্-আমি—হাত-পা-ওয়ালা মানুষ হ'য়েছি তো? কাজেই আপনি নিজেকে যেমন মানুষ ছাড়া আর কিছু ব'লে জানেন না, তেমনি আমারও আমাকে একজন মানুষ ছাড়া আর-কিছু বোধ করার কথা নয়। যেমন আপনি পণ্ডিত, কিন্তু আপনি কি আর আপনাকে পণ্ডিত ব'লে বোধ করেন? আপনি মনে করেন—'আমি যা' দেখি তাই বলি, সকলেই ত' তা' দেখ্‌তে পারে, আমি আর নূতন কি বল্লাম?' তবে আপনাকে যারা পণ্ডিত বলে, তারাই

পিতৃদেব ও ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

চেয়ারে উপবিষ্ট :—বামদিক হইতে তৃতীয়—পিতৃদেব

দণ্ডায়মান :—বামদিক হইতে তৃতীয়—শ্রীশ্রীঠাকুর

বল্‌তে পারে, আপনাকে কি দে'খে পণ্ডিত বলে। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হ'লে আপনি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারেন—'আমি পণ্ডিত কিনা তা' আমি জানি না—তবে এঁরা বলেন, এঁদের জিজ্ঞাসা করুন।' আমার দিক থেকেও সেই কথা। শালগ্রাম নিজের কাছে পাথর ছাড়া আর কি?—গায়ে ছু'ড়ে মারলে হাড় ভে'ঙ্গে যা'বে। তাঁর গুণগ্রাম সম্বন্ধে জান্‌তে হ'লে জিজ্ঞাসা করতে হয় তাকে, যে তাঁর গুণগ্রামকে জে'নেছে। এই জন্যই বুঝি বলে—'ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।' ভক্তের সুবিধা এই যে, সে এই জানে যে, সে অন্ততঃ একজনের অনুবর্ত্তী—তার একজন আছেন।"

ভদ্রলোকটী অতঃপর বলিলেন—"আশ্রমের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ঘু'রে দেখ্‌লাম, খুবই ভাল লাগ্‌লো। মনে হ'ল যে, সবগুলি কেন্দ্রই যেন ধীরে ধীরে একটা fullness (পূর্ণতা) পে'য়ে উঠ্‌ছে। আচ্ছা, এইগুলি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হ'লেই কি তা' ভগবৎ-প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"যখনই আমরা এমন কাউকেও ভালবাসি যিনি পূর্ণকে ভালবাসেন তখনই আমাদের জীবন পূর্ণতর হ'তে থাকে। কাজেই যদি কেউ ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে তার জীবন সব দিক থেকেই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। সে যতই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার existence (সত্তা) ততই farm (দৃঢ়) হ'তে থাকে। তাই সকল দিক থেকে fullness (পূর্ণতা) যেন তাকে চে'পে বসে। আর তখন তার সব দিক প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। অকল্যাণ তার কাছেও আস্‌তে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছিলেন—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' একজন ভগবানকে বা পূর্ণকে ভালবাসে, অথচ সে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে যা'চ্ছে—এ হয় না; হ'লে বুঝ্‌তে হ'বে যে, সেখানে ঐ ভালবাসায়ই খাকৃতি আছে। আর এই যে 'আশ্রম' কথাটা, তা' কিন্তু এসেছে আ+শ্রম্‌-ধাতু হ'তে অর্থাৎ যেখানে শ্রম ক'রে উন্নতি করা হয়। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে এক-একজন ঋষি বা দ্রষ্টার ৫০।৬০ হাজার শিষ্য থাকৃত আর তাদের নিয়ে গ'ড়ে উঠ্‌তো এক-একটা আশ্রম—যেমন বশিষ্ঠাশ্রম, কপিলাশ্রম ইত্যাদি। এক-একজন ঋষিকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে সমস্ত activity আর তা' থেকেই পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতি যত-কিছু সব। আর এগুলো শ্রম ক'রে লাভ করে ব'লেই তা' ঠিক ঠিক পাওয়া হয়—নতুবা হয় না।" আগন্তুকটী অবশেষে প্রশ্ন করিলেন—

"আচ্ছা, প্রেমের প্রতি attached (যুক্ত) থাকলেই কি আপনা হ'তেই শ্রেয়ঃ লাভ হয়?" শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন—"একজনকে আমরা ভালবাসি এইজন্য যে, সে আমার কাছে খুবই মিষ্টি। কোন জিনিষকে

মিষ্ট ব'লে বোধ হয় কারণ তা'তে আমার existence (সত্তা)কে সার্থক করে, আর তা'কেই বলে শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল। কাজেই যাঁর প্রতি টানে আমার জীবনটা স্বস্তিতে ভ'রে উঠে এমন প্রেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আর মঙ্গলের কোলে আশ্রয় নেওয়া একই কথা। সেই প্রেয়ের ভাল-মন্দ সব-কিছুতেই হয় আমার তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রীতি। ভাল-মন্দ বলি এই জন্য যে, তাঁর প্রতি তখন হই আমরা পূরোপূরি-ভাবে দোষদৃষ্টিশূন্য; তাই তাঁর কোনও-কিছু আর মন্দ ব'লে আমার চোখে ঠেকে না, তিনি হ'য়ে পড়েন আমাদের প্রিয়পরম। পরম প্রীতিতে তাঁর পূজা ও সেবাই হয় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর তখনই হই আমরা অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী।"

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম্-এ, মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"সে অনেক দিনের কথা, একদিন রাত্রে কথা চল্‌ছিল কবিবর ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। কবি কর্ম্মদেবীকে নায়িকা ক'রে পুরুষ-চরিত্রহীন একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখ্‌ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'আচ্ছা, আমাদের দেশের নাটকগুলো comedy (মিলনান্তক) না?' আমি বল্লাম 'হাঁ, আর তাই এ দেশের প্রাচীন নাটকগুলো পড়্‌লে মনে হয় যেন আমাদের দেশে প্রাণ ছিল না।' শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'আর ওদেশের বা আজকাল আমাদের দেশের ভাল নাটকগুলো কেমন?' আমি বল্লাম, 'সেগুলি tragedy (বিয়োগান্তক নাটক), কিন্তু কালিদাস হ'তে আরম্ভ ক'রে আমাদের দেশের প্রাচীন সকল নাট্যকারই কেমন undramatist-এর মত (অনাটকীয় ভাবে) লি'খে গে'ছেন মনে হয়। কেবল কতগুলি শ্লোকের পর শ্লোক। নিশ্চিন্তভাবে বেশ পড়া যায়; হয়ত নাটক শুন্‌তে শুন্‌তে খানিক ঘুমিয়ে নিলাম, তারপর উ'ঠে আবার শুন্‌তে লাগ্‌লাম। Plot-এর (নাটকীয় গল্পাংশের) ঘনিমা এতই কম যে, মাঝের break-এ (বিরতিতে) যেন শ্রোতার বিশেষ কোন লোক্‌সান হয় না, আবার শেষের দিকে একটা মিলন আছেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের যত ভাল ভাল নাটক যেমন ম্যাক্‌বেথ্, হ্যাম্‌লেট্, ওথেলো—সমস্তই বিয়োগান্তক (tragedy). কবিও আমারই মত বিয়োগান্তক নাটকের পক্ষপাতী। তাই তাঁর নূতন নাটকখানি বিয়োগান্তক কর্‌বার অভিপ্রায় প্রকাশ কচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন, 'যা'তে মানুষের উৎসাহ, আশা, ভরসা, সাহস বাড়ে এমন ক'রে লিখ্‌তে হয়,—প্রত্যেক দৃশ্যে দৃশ্যে যেন রোমাঞ্চ হয় এমন কর্ত্তে

হয়। কর্ম্মদেবী আর কুতব্‌উদ্দীন নিয়ে কিন্তু খুব ভাল নাটক হয়।' আমরা দু'জনেই tragedy-র (বিয়োগান্তক নাটকের) ভক্ত—বল্লাম, 'আমাদের মিলনান্তক নাটকগুলো দে'খে মনে হয়, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের যুগে বালকের মত ছিলাম। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় 'সরযুবালা বা অপূর্ব্ব মিলন' ব'লে একখানা বই প'ড়েছিলাম। সে বইখানার শেষের অপূর্ব্ব মিলনটা ছেলেবেলায় খুবই ভাল লে'গেছিল।' শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন, 'সে-সময় আপনার nerves (স্নায়ু) strong (মজবুত) ছিল তাই মিলনটাই ভাল লাগ্‌ত। মিলনান্তক নাটক—যে নাটক গ'ড়ে তোলে, যে নাটকে construction (গঠন) এনে দেয় তাই ভাল।' আমি বল্লাম, 'তা যেন কেমন unpsychological (মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়) ব'লে মনে হয়।' শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন, 'তা নয়। কেমন ক'রে construction হয়, অন্যায় ক'রে কেমন ক'রে ধীরে ধীরে মানুষের অনুতাপ আসে, আর অনুতপ্তকে ভালবেসে ক্ষমা করার মধ্যে যে কতখানি সৃষ্টি, তার মধ্যে যে কতখানি subtle (সূক্ষ্ম) psychology (মনস্তত্ত্ব), কতখানি suggestiveness (আভাস) ও রহস্য থাকে তা' আমরা সাধারণতঃ অনুভব করি না ব'লেই আমাদের ঐ রকম মনে হয়। আমার মনে হয়, বাংলাদেশে আজকাল স্বামী ছে'ড়ে স্ত্রী চ'লে গিয়ে আত্মোৎসর্গ করুল বা স্বামী বিধবা বিবাহ করুল—তাই দে'খে স্ত্রী স্বামী ছেড়ে' চলে' গেল, এমনই ধরণের বিয়োগান্তক নাটক-নভেল ছাড়া আর বেশী-কিছু হ'চ্ছে না, আবার জনসাধারণও যেন অন্য-কিছু পছন্দ ক'চ্ছে না—তার মানে আমাদের সমাজ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। স্ত্রীর কোন positive activity-র (নিশ্চয়াত্মক কার্য্যের) ভিতর দিয়ে স্বামীর চরিত্র পরিবর্ত্তিত হ'য়ে পরস্পরের আবার মিলন-সংঘটন আমাদের সমাজে বিরল হ'য়ে উ'ঠেছে। সে মিলনের psychology (মনস্তত্ত্ব) আমাদের বেশী জানা নেই, আমাদের কাছে ভাল ক'রে ধরা প'ড়েনি। তাই আমরা বলি যে মিলনান্তক নাটক unpsychological (মনস্তত্ত্ববিরোধী), ওতে নাটকীয় রসের অভাব আছে ব'লে আমাদের মনে হয়। এই রকমের ভাঙ্গন আমাদের সামাজিক জীবনে এসে প'ড়েছে। পরিবারকে শান্তিময় ক'রে গ'ড়ে তোলা বা বিপথগামীকে শান্তির মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনা যেন আমাদের পারিবারিক জীবনে কম হ'চ্ছে—বিরল হ'য়ে উ'ঠেছে, আর তারই জন্য তেমন নাটক-নভেলও বে'রুচ্ছে না। আমাদের কিন্তু দরকার constructive (গঠনশীল) হওয়া।' কবি এই কথা শু'নে বল্লেন, 'কৈ এমন construction (গঠন) ত' হ'তে দেখা যায় না।' শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন,

'হচ্ছে বৈ কি! আমরা সে-সব ঘটনার খবর পাই না, রাখি না। একজন অনুতপ্ত হ'য়ে যখন ফি'রে আসে—আর, আর-একজন যখন তাকে ক্ষমা করে—উভয়ের যখন আবার মিলন ঘটে, এর যে subtle psychology (সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব) আর romance (নাটকীয়তা) যেন আমরা অনুভব করতে পর্য্যন্ত ভু'লে গে'ছি।' একটা নূতন অর্থ লইয়া সাহিত্য ও তা'র সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্বন্ধটা যেন ধরা দিল। আমি বল্লাম, 'আচ্ছা, তবে যে কালিদাস প্রভৃতিকে নিন্দা কচ্ছিলাম তা'ও ত' ভুল দেখ্‌তে পাচ্ছি। মহাকবি গ্যেটে যে কালিদাস সম্বন্ধে ব'লেছেন—যৌবনের ফুল আর পরিণত বয়সের ফল যদি একসঙ্গে দেখ্‌তে চাও তবে শকুন্তলা পড়। তা'তে খুব গভীর সত্য আছে ব'লে মনে হচ্ছে।'

"কবি ব'লে উঠ্‌লেন, 'তবে যে বিয়োগান্তক নাটক হ'লেই আমরা পছন্দ করি সে বোধ হয় একটা দুর্ব্বলতা। মারামারি দে'খে যেমন লোকে আকৃষ্ট হয় বা মেয়েরা যেমন হাঁ-ক'রে মড়া দেখ্‌তে দৌড়ে যায় তেমনই আমরা বিয়োগান্তক নাটক দেখ্‌তে ভালবাসি, ওতে আমাদের দুর্ব্বলতারই প্রশ্রয় দিই—স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন হ'লে যেমন ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য মদ খে'তে মানুষ ভালবাসে।'

"শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন—'আর বিষবৃক্ষে যেমন কুন্দনন্দিনীর কথা আছে। বিধবাবিবাহ হ'ল আর সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করল। এতে যেন সমাজের বা পারিবারিক শান্তির কোন গঠনমূলক মীমাংসাই হ'ল না। যদি এমন হ'ত, কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী গিয়ে এমন-কিছু করল যা'তে তার সহৃদয় ব্যবহারে কুন্দনন্দিনীর নূতন জ্ঞানের উন্মেষ হ'ল, সে অনুতপ্ত হ'য়ে স্বেচ্ছায় নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মিলন ঘ'টিয়ে দিল—তাতে artও (রসও) বাদ পড়্‌ত না, আর তা'তে constructionও (গঠনও) হ'তো —শুধু ধ্বংসটাকেই দেখান হ'তো না।' আমি বল্লাম, 'সমাজে, পরিবারে-পরিবারে আমরা যে দুঃখময় জীবনযাপন ক'চ্ছি তারই একটা artistic (শিল্পকৌশলময়) রূপ ছাড়া আমরা যেন আর কিছুই সাহিত্যের মধ্য দিয়া সৃষ্টি করতে পাচ্ছি না। ধ্বংসের আর ক্রমিক অধঃপতনের মনোবিজ্ঞানটাই আমরা আজকাল অনুভব ক'চ্ছি। আর তা'ই আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিখুঁত ক'রে আঁ'কৃছি। সমাজ-জীবনের এই negative criticism (ঋণাত্মক সমালোচনা) আজকাল বিশেষ ক'রে আমাদের সাহিত্যে চ'ল্‌ছে। নূতন সংগঠন বা সৃষ্টি আমাদের নিকট এক-রকম অপরিচিত বল্‌লেই হয়,—তাই তেমন

জিনিষ আমরা ঠিকভাবে আঁক্‌তেও পারি না—আর তা' কখনো আঁক্‌তে গেলে আমরা unpsychological (মনস্তত্ত্ববিরোধী) ক'রেই তুলি।'

"শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাতীরে এসে বিছানায় শু'য়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'দেখুন আমাদের সমাজে শান্তি নেই বল্‌লেই হয়, খুব কম পরিবারেই শান্তি আছে; জীবনের উপরকার দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বের তলায় একটা নিরন্তর নিবিড় শান্তি র'য়েছে এমন খুব কম পরিবারেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের চেয়ে Europeanদের অনেকের শান্তি বেশী আছে ব'লে যেন আমার মনে হয়।' তারপর বল্‌তে লাগ্‌লেন—'দেখ্‌তে হবে নিজের দিকে চে'য়ে—আমি চাই কি? আমার destruction (ধ্বংস) চাই, death (মৃত্যু) চাই—না আমার শান্তি চাই? আব আমাদের সেই চাওয়াটাকেই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে, নাটকীয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে সার্থক ক'রে তুল্‌তে হ'বে। তখন সাহিত্য হ'বে creative (সৃষ্টিকারী) ও constructive (গঠনকারী), তা'তে সমাজের destruction (ধ্বংস) আন্‌বে না। আজকাল ধ্বংসোন্মুখ সমাজ-জীবনটাকে উলঙ্গ ক'বে দেখান হ'চ্ছে। নাটকের ভিতর দিয়ে জীবনসৃষ্টির চেষ্টা হ'চ্ছে না। আর এই destruction (ধ্বংস) জীবনে ভাল লে'গে উঠ্‌ছে, আমরা একটা-কিছু tragedy (বিয়োগান্তক) চাইতে আরম্ভ ক'রেছি—জীবনে এবং সাহিত্যে। বিচ্ছেদের পর মিলনের মঙ্গল-চেষ্টার ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনে বিরল; ধ্বংসশক্তিকে সৃজনের অনুকূল ক'রে তুল্‌তে পাচ্ছি না—তাই মিলন বা সৃষ্টি সাহিত্যে ও নাট্যকলায় তেমন ফু'টে বে'রুচ্ছে না। এমন ক'রে ক'রে, এই রকম জলন্ত বিয়োগচিত্রগুলি দে'খে দে'খে যেন দেশের জনসাধারণের মনে মিলনের মঙ্গল-চেষ্টা ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে। মিলনান্তক (constructive) যা-কিছু inartistic ব'লে মনে হ'চ্ছে। চাই এমন সাহিত্য যা'তে মানুষের বল, ভরসা, সাহস, উদ্দীপনা বে'ড়ে ওঠে, মানুষের মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়'—বল্‌তে বল্‌তে তিনি থাম্‌লেন।"

* * * * *

কতদিন কত বিভিন্ন বিষয়ে যে এইরূপ কত অসংখ্য আলোচনা হইয়াছে তাহার অবধি নাই। এই সকল আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাঁহার কাছে বিজ্ঞানের নূতন তথ্য পাইলেন, দার্শনিক তাঁহার সংস্পর্শে দর্শনের দর্শন পাইলেন, শিক্ষিত আসিয়া পাইলেন শিক্ষার মূলতত্ত্ব; এইরূপে সাহিত্যিক তাঁহার নিকট সাহিত্য-সৃষ্টির নবীনমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, প্রবীন সমাজসেবী তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার সমস্ত প্রতিভাকে ছাপাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার পরদুঃখকাতর প্রেমময় মধুর ভাব। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা-কালে শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের নিকট দেশের নানা দুরবস্থা এবং তাহা নিরাকরণের উপায় সম্বন্ধে কত কথা বলিতেন। মাতৃজাতির ঘোর দুর্দ্দশার কথা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ, বিদ্যালয়ে প্রচলিত কুশিক্ষার প্রভাব, সারাদেশব্যাপী অন্ন ও বস্ত্রের জন্য হাহাকার, রোগযন্ত্রণায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর করুণ আর্ত্তনাদের কথা বলিতে বলিতে তিনি নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। অকালমৃত্যু-নিবারণের জন্য, সমাজে প্রচলিত বীভৎস বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য, আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া প্রাণবান্ মানুষ তৈয়ার করিবার জন্য, বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া জাতির সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য সকলের কাছে প্রাণের কত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন এবং তাঁহাদিগকে এই সকল কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কতই-না উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার সস্নেহ করুণ আহ্বানে অনুসরণকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পার্থিব সুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তখন হইতেই নিয়তরূপে তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার লোককল্যাণকর ভাবরাজি বাস্তব-কর্ম্মে মূর্ত্ত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। এইভাবে স্থায়ী অধিবাসী কর্ম্মীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরও তখন হইতে ডাক্তারী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। নবীন চিকিৎসকের পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীখানা এখন বন্ধুবান্ধব, অনুসরণকারী এবং আগন্তুকবৃন্দের এক বিরাট উপনিবেশে পরিণত হইল, আর ইহাই "পাবনার সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান" * নামে আজ দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত। বিগত ১৯২৫ সনে ইহাকে ভারতীয় আইনের ১৮৬০ সনের ২১ বিধান মতে রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে।

---

* প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বপ্রথম-মনোনীত কাউন্সিলের সভ্যগণের নাম, যথা—৺মনোমোহিনী দেবী—সভাপতি, ৺অনন্তনাথ রায়—সহ-সভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি, এস্-সি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এম-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দাস, ৺ডাঃ যতীন রায় শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায়, এম-এ, বি-এল্—সহ-সম্পাদক। শ্রীশ্রীঠাকুরের অধুনা-মনোনীত কাউন্সিলের কর্ম্ম-সচিবগণের নাম, যথা সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্, সহ-সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি, এস্-সি, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এস্-সি, সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত। বর্ত্তমানে সভাপতি মহাশয়ের স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্ঘের যাবতীয় কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

পল্লীসংগঠন

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন তদীয় জন্মভূমি হিমাইতপুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান। তিনি তাঁহার সকল অন্তর দিয়া গ্রামের দুঃখকে বোধ করিয়াছিলেন এবং এই দুঃখ-দৈন্য-নিপীড়িত গ্রামবাসীকে কেমন করিয়া জীবনীয় রসধারায় স্নাত করিয়া তোলা যায়, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বনজঙ্গলে ঘেরা, ব্যাধি-প্রপীড়িত, অন্তরকলহে ও গৃহবিবাদে পারিবারিক-সুখশান্তিহীন এই গ্রামখানিকে জীবনে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে—জীবন-বিকাশের যাহা-কিছু প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাই ভক্ত কর্ম্মীদিগকে লইয়া এইবার নামিলেন তিনি মনের মত করিয়া একটী আদর্শ-পল্লীর পত্তন করিতে, আর যোগাইতে লাগিলেন সবারই মধ্যে প্রেম, প্রেরণা ও প্রাণ। তাঁহার সঞ্জীবনী স্পর্শে সকল দিক একটা জীবনীয় সজীবতায় ভরপূর হইয়া উঠিল,—দেখিতে দেখিতে গজাইয়া উঠিল এই গ্রামখানির বক্ষ ভেদ করিয়া কত অভিনব শিক্ষায়তন, গবেষণাগার, শিল্পকুটীর, কলকারখানা প্রভৃতি। নিম্নে এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়

আমাদের দেশে বালকেরা প্রায়ই দুর্ব্বল, তাহাতে শৈশব হইতে পড়িতে আরম্ভ করে; আবার এই দুর্দ্দিনে খরচান্ত করিয়া দশ বৎসর ধরিয়া পড়িয়া পড়িয়া তাহারা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কোন প্রকারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় বটে, কিন্তু কেহই যথার্থ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠে না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা মানুষের সহজাত বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়া সকলকেই ব্যক্তিত্বহীন একই ছাঁচে ঢালিয়া এক নির্জ্জীব সাম্যের সৃষ্টি করে—যাহা আনে অশ্রদ্ধা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যত অনর্থ। আর্য্যগৌরবের উজ্জ্বল যুগে শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ গুরুর সহবাসে থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। সেই গুরু থাকিতেন চারিত্র্যে, পাণ্ডিত্যে, ব্যবহারিক নৈপুণ্যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্ব্বরকমে শ্রেষ্ঠ। আচার্য্যের সঙ্গলাভ ও উপদেশ-পালনের মধ্য দিয়া তাঁহার

তৃপ্ত্যর্থে শিক্ষার্থী যাহা করে তাহা সে প্রেমের টানে সর্ব্ব-মনপ্রাণে করিতে অভ্যস্ত হয়, আর এইভাবে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়াই ভাষা-শিক্ষা, গণিত-শিক্ষা, দেশবিদেশের বর্ত্তমান ও অতীত, নৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতিমূলক জ্ঞানাহরণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় একটা হাতে-কলমে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া চৌকষ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। এইরূপ আচার্য্যানুরাগমূলক আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি দেশ হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়ই জাতির এই অধঃপতন হইয়াছে। তাই ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার মানসে শ্রীশ্রীঠাকুর এই তপোবন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহাতে বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণকে ইষ্টপ্রাণ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাহাদের সহজাত সংস্কার ও অভ্যাসগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতঃ তাহাদিগকে মঙ্গলের অধিকারী করিয়া তোলা যায়, যাহাতে তাহারা ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্বাভিঘাতে অভিভূত না হইয়া পদে পদে উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী হইয়া জীবন ও জাতিকে নব নব অভিজ্ঞতায়, সম্পদে ও ঐশ্বর্য্যে মহনীয় করিয়া তুলিতে পারে, যাহাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে আসে জীবন-বৃদ্ধির সম্বেগ, শ্রদ্ধাময় জীবন্ত কর্ম্ম-প্রেরণা, যাহাতে দেশে আনিতে পারা যায় শ্রেষ্ঠের পূজায় সকল শ্রেণীর মিলন-সামগীতি, প্রেম, পরস্পরে প্রীতিসম্বন্ধ ও অটুট গণ-সংস্থিতি—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের তপোবন বিদ্যালয়-স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এখানে শিক্ষকগণ নিজেরা ছাত্ররূপে নিয়ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করতঃ তাঁহার অনুপ্রেরণায় মানুষ গড়িয়া তুলিবার গুরুদায়িত্ব-সম্পাদনের বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা অর্জ্জন করিতেছেন। এই সকল স্বার্থত্যাগী একনিষ্ঠ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে বালকগণ শারীরিক, মানসিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে মাত্র একজন ছাত্র ও একজন শিক্ষক লইয়া এই তপোবন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বিদ্যালয়ের জন্য কোন স্থান বা ছাত্রাবাস ছিল না। ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে বাংলা, বিহার, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কত স্থানের কত ছেলে আসিয়া জুটিল। বিদ্যালয়ের গৃহাদি-নির্ম্মাণে তপোবনের বালক ও শিক্ষকবৃন্দ বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্র কি ভীষণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়। ইট কাটিয়া পাঁজা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ অবধি অধিকাংশ কার্য্যই অধ্যাপক ও ছাত্রগণ নিজেরা করিয়াছেন। যখনই কোন কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন যেন কর্ম্মপ্রবণতার প্রবল তুফান উঠে;—কেহ ইট আনিতেছে, কেহ লোহা টানিতেছে, কেহ বা কাঠ কাটিতেছে, কেহ কেহ মিস্ত্রির কার্যে

যোগান দিতেছে। হঠাৎ একখানা ইট পড়িয়া কাহারও হাতখানা ছেঁচিয়া গেল, কি ইটে পা কাটিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া আবার সে কাজে লাগিয়া যাইতেছে। এই ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদানে উদ্যত সৈনিকের ন্যায় উন্মত্ত কর্ম্মপ্রেরণার ঘোর প্রতিযোগিতা চলে।

ছাত্রের শৈশব-জীবন পরিবারের আবেষ্টনীর মধ্যে পিতামাতার স্নেহনীড়ে থাকিয়া তাঁহাদের আদর, যত্ন ও উপদেশের মধ্যে সংসারের নানা অভিজ্ঞতায় বাড়িয়া উঠে ইহাই বাঞ্ছনীয়। তাই এখানে সাধারণতঃ বার তের বৎসরের বালকগণকে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। সামান্য-কিছু ইংরেজী ও বাংলা ভাষা জানা থাকিলেই তিন বৎসরের চেষ্টায় অন্যান্য বহু বিষয় সহ ছাত্রগণ প্রবেশিকার পাঠ সমাপ্ত করে। আর এই সঙ্গে, সংসারে প্রবেশ করিয়া যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে পারে, এমন কার্য্যকরী শিক্ষাও লাভ করিয়া থাকে। এই তিন বৎসরে ছাত্রগণ বিজ্ঞান শিখিতেছে, ছুতরের কাজ, ছাপাখানার কাজ, কারখানার কাজ, রাজ-মিস্ত্রির কাজ, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যায়ও পারদর্শী হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতেছে। ছেলেরা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তরিতরকারী চাষ করে; গৃহ-পরিষ্কার, বাসন-মাজা, রোগী-শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যও তাহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রীতিমত ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করেন। বিস্তৃত প্রান্তর এবং পদ্মার চরে ছেলেরা ব্যায়াম ও খেলাধূলা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত শিক্ষার আদর্শ তপোবন বিদ্যালয়ে সম্যক্‌ভাবে কার্য্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য কর্ম্মিগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বিগত কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জি মহাশয় সেদিন বলিয়াছেন—"সুদূর পাবনা জেলায় সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার অনুষ্ঠান হইয়াছে, অনেক দিন ধরিয়া আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সে স্বপ্ন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জোর করিয়া বলিতেছি যে, এইরূপ অনুষ্ঠান বাংলার ঘরে ঘরে করণীয়। যত দিন না বাংলার জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে এরূপ অনুষ্ঠান সৃজিত হইবে, ঘরে ঘরে লোক বুঝিবে এরূপ শিক্ষা না দিলে যথার্থ শিক্ষা হইবে না, ততদিন আমাদের দেশের শুভদিন উপস্থিত হইবার বিন্দুমাত্র আশা ভরসা নাই।"

সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র

দেশের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃ বলেন—"যদি আমরা অতীতের গৌরবে মোহান্ধ থে'কে পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানের আধুনিক অত্যুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করি, প্রকৃতি-সমুদ্র মন্থন করতঃ নিত্যনূতন সত্যের আবিষ্কার দ্বারা জাতীয়সম্পদ-বৃদ্ধির চেষ্টা না করি তাহা হ'লে আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখ্‌তে হ'লে এবং ইহাকে ক্রমবিবর্দ্ধনের পথে চালিত করতে হ'লে, আমাদিগকে বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে অগ্রগামী হ'তে হ'বে, কোন বিষয়ে কা'রও পিছনে প'ড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না।" যাহাতে বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতার মধ্য দিয়া দেশের অভাব প্রশমিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কতিপয় বৎসর হইল শ্রীশ্রীঠাকুর "সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র" নাম দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিবার ও তাহা হইতে দেশের ও জাতির চাহিদা মিটাইবার উপাদান-সংগ্রহের হাতে-কলমের কাজে লাগিয়াছেন।

অনেক দিনের কথা। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক সংঘভ্রাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"এখানে একটী বিজ্ঞানাগার-স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করুন।" সকলে ত' শুনিয়া অবাক! একি সম্ভব? এই নগণ্য পল্লীগ্রামে—এখানে আবার বিজ্ঞানের গবেষণা হইবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে তখন একটী পয়সাও নাই। সৎসঙ্গের কর্ম্মীদিগের তখনও দিবসে দুইবার আহার জুটিত না। শ্রীশ্রীঠাকুরের যখন যাহা ইচ্ছা হয়,—একবার যাহা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তিনি সোয়াস্তি পান না। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, পরিহাস করিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর পল্লীগ্রামে বিজ্ঞানাগার-স্থাপনের মত এমন অদ্ভুত ও অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছেন। তখন কে জানিত ইহা তাঁহার প্রাণের অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা! 'বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের' পরিকল্পনা হইল, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা হইল, একটু একটু করিয়া, দেখিতে দেখিতে বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইল, যন্ত্রপাতি কত-কিছু আসিল। বাংলার এই সুদূর পল্লীর বুকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। যে সকল গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করতঃ কত বহুমূল্য যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন! **Projection microscope, X-Ray apparatus, Microtone, Ultra microscope, Spectroscope, Gaedes Air-pump, Galvanometer, Barometer, Chemical Balance,**

Radiophone, Beckmann's apparatus, Hoffman's apparatus, Reflex condenser, Oil-filter, Filter-press, Tincture Filter-press, Digester, Induction Coil প্রভৃতি কত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিতে বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের কক্ষগুলি সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিজ্ঞান-চর্চ্চার উপযুক্ত গৃহাদি না থাকায় ছোট ছোট কুটীরেই নানা অসুবিধার মধ্যে এতদিন গবেষণা-কার্য্য চলিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের দীর্ঘকাল-ব্যাপী ক্রমাগত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এখন সে-অভাব অনেকাংশে দূর হইয়াছে। প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রায় তিন বিঘা জমির উপর বৃহৎ পাঁচটী কক্ষ ও প্রশস্ত বারান্দা-বিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেই বর্ত্তমানে নানা বিষয়ে গবেষণা-কার্য্য চলিতেছে। অপর একটী বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার একতলায় অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণা-কার্য্য পরিচালনা করিবার আয়োজন করা হইয়াছে, এবং ইহার দ্বিতলে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য আবশ্যকীয় পুস্তকাদি রক্ষাকল্পে একটী গ্রন্থালয়-স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,—"বিশ্ববিজ্ঞানটী আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণপ্রিয় জিনিষ, আশ্রমের জনকোলাহল হ'তে দূরে এখানে এই নির্জ্জন নিরালায় আপন মনে বিজ্ঞানের উচ্চ চিন্তা ও পরীক্ষাকার্য্য নিয়ে থাক্‌তে বড়ই ভাল লাগে। —নানা গবেষণার চিন্তা নিয়ে ইচ্ছা করে অধিকাংশ সময় এখানেই থাকি।" বিজ্ঞানাগারটীকে সর্ব্বপ্রকারে কার্য্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চেষ্টার বিরাম নাই।

সৎসঙ্গ মেকানিক্যাল্ ও ইলেক্ট্রিক্যাল্ ওয়ার্কসপ্

দেশের আর্থিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—"নিত্যব্যবহার্য্য নানা প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ার ক'রে দেশবাসীর প্রয়োজন নির্ব্বাহ করা এবং গবেষণার সাহায্যে নূতন নূতন যন্ত্র ও দ্রব্যজাত প্রস্তুত করতঃ বিদেশ হইতে অর্থাগমের ব্যবস্থা কর্‌তে না পার্‌লে কোন জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হ'তে পারে না। কত যুবক নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে র'য়েছে—বেকার-সমস্যা প্রতি-পরিবারে নিতান্ত ভয়াল হ'য়ে উ'ঠেছে। গতানুগতিকের পথ ত্যাগ ক'রে দেশবাসীকে আজ নূতন কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হ'বে।" কতদিন ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এজন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন! বলিতে কি, কাজেও তিনি ইতিমধ্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। বার বৎসর পূর্ব্বে একখানা ছোট টিনের

চালার নীচে একখানামাত্র হাপর ও সামান্য কয়েকটী কামার-শালার যন্ত্রপাতি লইয়া সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফলে সম্প্রতি একটী অতি বৃহদায়তন কারখানা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় দুই বিঘা জমির উপর বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কর্ম্মিগণ স্বহস্তে এই কারখানার বাড়ীটী তৈয়ার করিয়াছেন। আশ্রমের পুরুষগণ, মহিলাবৃন্দ এবং তপোবনের বালকগণ ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রাণপণ সাহায্য করিয়াছেন। সারাদিন ব্যাপিয়া এবং বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাজ করতঃ সকলে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কারখানায় মেসিনের কলকব্জা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এবং গবেষণার উপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণের উপযুক্ত নানাবিধ আধুনিক উন্নতপ্রণালীর যন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। অধুনা এখানে লেদের কাজ, দাঁত কাটিবার ও ছিদ্র করিবার কাজ, 'প্লেনিংয়ের' কাজ, ঢালাইএর কাজ, সর্ব্বপ্রকার ঝালাইয়ের কাজ, কামারখানার কাজ, 'ইলেক্ট্রোপ্লেটিং' প্রভৃতির কাজ অতি সুন্দররূপে করা হয়। মোটর গাড়ীর সর্ব্বপ্রকার কার্য্য যথা,—'বেটারী-প্লেট' তৈয়ার করা, 'বেটারী' মেরামত ও চার্জ্জ করা, 'আরমেচার-ওয়াইন্ডিং' 'ডাইনামো'-মেরামত এবং 'ইলেক্ট্রিক্-ফিটিং' প্রভৃতি কার্য্যও এখানে উত্তমরূপে করা হইয়া থাকে।

কারখানার সঙ্গেই একটী বৃহদাকার 'পাওয়ার-হাউস' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ৪৫ ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট দুইটী 'অয়েল ইঞ্জিন' দিবারাত্র চলিয়া কারখানা, ছাপাখানা, 'ষ্টিম্-লণ্ড্রি' প্রভৃতির কার্য্যে ও রাস্তায় আলোক-প্রদানে তড়িৎশক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। নানাবিধ কুটীর-শিল্পের কার্য্যেও এখান হইতেই তড়িৎশক্তি সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

কারখানার একাংশে দারুশিল্প-বিভাগের কার্য্য চলিতেছে। গবেষণা-ভবনের জন্য টেবিল, আলমারী ও অন্যান্য আসবাবপত্র, প্রতিষ্ঠানের নানা বিভাগের প্রয়োজনীয় কাঠের যাবতীয় জিনিষপত্র এবং সৎসঙ্গে নিত্য নূতন যেসকল অসংখ্য গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে তাহার দরজা, জানালা ও গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহাদি এই বিভাগের শিল্পিগণ অতি সুন্দররূপে যত্নপূর্ব্বক তৈয়ার করিয়া থাকেন।

সৎসঙ্গ কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্

বলেন—"বাংলার পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলে কত অদ্ভুতগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ র'য়েছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল উদ্ভিদ হ'তে কত আশ্চর্য্যফলদায়ক ঔষধ যে তৈয়ারী

সৎসঙ্গ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কসের বহির্ভাগ।
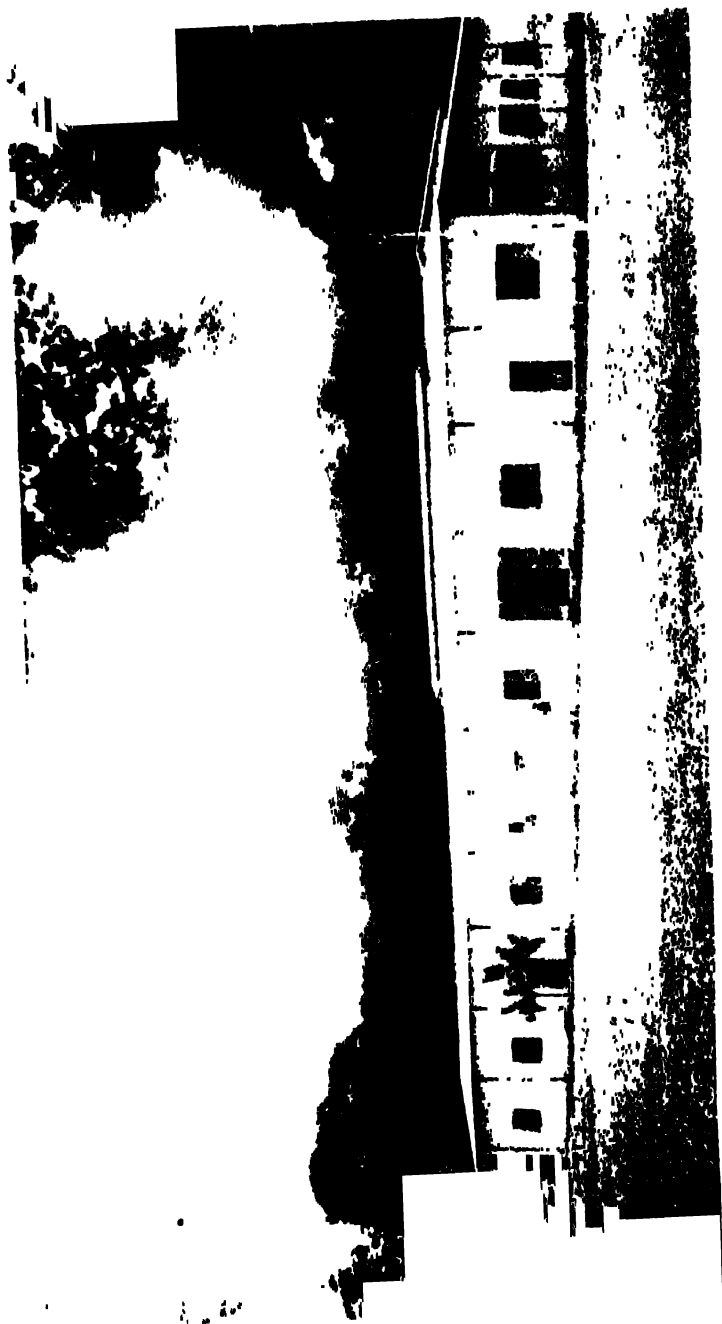
হ'তে পারে তা'রও ইয়ত্তা নাই! এদেশের জলবায়ুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওষধি-সমূহই আমাদের ধাতুর পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। তাই এ-দিকে মনোযোগ দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে একটী বিশেষ কর্ত্তব্য ব'লেই আমার মনে হয়।" বাংলার পল্লীর লতাগুল্মাদি হইতে অমৃত আহরণ করিয়া দেশের যে কতখানি কল্যাণ সাধন করা যায় তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ঔষধ-প্রস্তুতের এই কারখানাটী পল্লীক্রোড়েই স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাসায়নিক ও চিকিৎসকগণ আজ এখানে টাট্‌কা দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে কত ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন! দরিদ্র দেশবাসীর রোগক্লেশ যাহাতে সহজে নিবারিত হয় এবং দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া যায়, 'কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্' স্থাপনের ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯২৫ সন স্মরণ করাইয়া দেয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সপরিবারে সৎসঙ্গে আসিবার কথা। সেই বৎসরই কেমিক্যাল্ ওয়ার্কসের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত দুইটী মাত্র ঔষধের ফরমূলা লইয়া সর্ব্বপ্রথম 'কেমিক্যালের' কাজ আরম্ভ হইল—একটী 'নবরঞ্জিনী তৈল', ও একটী 'প্রিভেণ্টিনা মলম'। তখন আশ্রমে কলকারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে, মাঝে মাঝে আকস্মিক দুর্ঘটনা হইত, কিন্তু পোড়া বা কাটার ভাল ঔষধ ছিল না, অথচ তাহার প্রয়োজন বেশ অনুভূত হইত। এই প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়াই 'প্রিভেণ্টিনার' সৃষ্টি হয়। তেমনি প্রতিবৎসর আশে পাশে চারি-দিকে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে 'মিষ্ট্ এজামঞ্জিট্' নামক ঔষধটি তৈয়ার হয়। আশ্রমে একজন মহিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া সূতিকারোগে ভুগিতেছিলেন। সকল রকমের চিকিৎসা ব্যর্থ হইল, ডাক্তারগণ তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শুধু চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই তাঁহার স্বভাব নয়, কি প্রকারে তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবেন তজ্জন্য বিশেষভাবে তিনি চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে "পিওর-পেরো-ডাইরিণ" নামক ঔষধটী তৈয়ার হইল। রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। তারপর এই ঔষধটী আরও কয়েকটী রোগীকে ব্যবহার করাইয়াও সুন্দর ফল পাওয়া গেল এবং তখন ইহা ব্যাপকভাবে সৎসঙ্গের ডিস্পেন্সারীতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপ এক-একটী প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর দেশীয় বনজাত নানা প্রকার গাছ-গাছড়ার গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া এক-একটী ঔষধের ফরমূলা ও তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া দিতেন, আর তাঁহার নির্দ্দেশমত ঔষধ প্রস্তুত করতঃ

বহু রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইত। এই ভাবে 'কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্'-এর প্রস্তুত ঔষধাবলীর সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

প্রথমতঃ পাঁচ ছয় বৎসর খড়ের ও টিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে ঔষধ-প্রস্তুতের কার্য্য চলিত। তখন মাত্র দুই তিনটী কর্ম্মী সারাদিন বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছ-গাছড়া সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ-প্রস্তুত ও তাহা নানাস্থানে প্রেরণ প্রভৃতি এই বিভাগের যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেন। ১৯৩০ সনে 'কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্'-এব জন্য পাকা বাড়ী তৈয়ার হইল ; তদবধি আরও অধিকসংখ্যক-কর্ম্মী নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ ঔষধ, 'টিংচার', 'এক্স্ট্রাক্ট্', 'ইন্জেকসন' প্রভৃতি বহুল পরিমাণে তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ 'সৎসঙ্গ কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্'এর ঔষধ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী ঔষধের প্রতিযোগিতা-বহুল বাজারে এবং সেই সমস্ত ঔষধেরই প্রয়োগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মহলে দেশীয় গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধাবলী বিশেষ ফলপ্রদ না হইলে যে সমাদর লাভ করিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। দেখিতেছি, বাংলার এক নিভৃত পল্লীর বক্ষে সৎসঙ্গের এই কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানটী আজ দেশের সত্যিকারের মস্ত বড় সমস্যা-সমাধানের একটা বাস্তব প্রাণপূর্ণ রূপ লইয়া গজাইয়া উঠিতেছে।

সৎসঙ্গ প্রেস ও পাব্লিশিং হাউস্

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার একখানা বৃহৎ টিনের ঘরের পত্তন দিলেন এবং কর্ম্মীদিগকে লইয়া সর্ব্বক্ষণ নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাজ করাইয়া ঘরখানা সম্পন্ন করিলেন। কেহই জানিল না, কিসের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইল। কিছুদিন পর একজন সঙ্ঘভ্রাতার (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর) নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু অর্থ চাহিয়া লইলেন এবং তদ্দ্বারা প্রেসের কতগুলি সাজ-সরঞ্জাম আনাইলেন। কয়েকটী কর্ম্মী লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইল। প্রেসের কার্য্য কর্ম্মীরা তখন কেহ কিছুই জানিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহে তাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টায় মেসিন-চালান এবং কম্পোজের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কতবার মেসিন ভাঙ্গিল, টাইপপত্র কত নষ্ট করিল, অর্থের কত অপচয় হইল! কর্ম্মীদিগকে সুদক্ষ করিয়া তুলিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র আন্তরিক ইচ্ছা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব প্রেরণার সহিত কর্ম্মীদিগেরও প্রাণপাত পরিশ্রমের অভাব ছিল না। কিছুকাল অবিরাম চেষ্টার ফলে কর্ম্মিগণ প্রেসের যাবতীয় কার্য্যেই বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন ; সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় কার্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কাজও তাঁহারা আস্তে আস্তে

গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যেমন কাজ পাওয়া যাইতে লাগিল, তদুপযোগী সাজসরঞ্জামও ক্রমেই সংগৃহীত হইতে লাগিল। অধুনা বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত উন্নত প্রণালীর প্রকাণ্ড কয়েকটী 'ফ্লাট্ মেসিন' ও 'ট্রেড্‌ল্ মেসিনের' সাহায্যে সকল প্রকার ছাপার কার্য্য স্বল্প সময়ের মধ্যে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় আজ বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত যুবক এখানে প্রেসের কার্য্যে যোগদান করিয়া মুদ্রণ-ব্যাপারের উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। সৎসঙ্গ-প্রেসে কম্পোজিং-এর প্রায় যাবতীয় কার্য্যই আশ্রমবাসী মহিলারাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ নিজ সংসারের গৃহকর্ম্মাদি করিয়াও প্রত্যেকে বিপুল উৎসাহে দৈনিক অন্ততঃ ১০ঘণ্টা করিয়া প্রেসের কাজে পরিশ্রম করিতেছেন। প্রেস-সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সরবরাহ করিবার জন্য প্রেসের সঙ্গে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক বাঁধাই বিভাগও খোলা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সরবরাহ করিয়া প্রেসের কর্ম্মিগণ সর্ব্বত্র যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। মফঃস্বলে এরূপ উচ্চশ্রেণীর প্রেস যে খুব কমই আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

নানা সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত বাণীর সহিত দেশবাসীকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রেস হইতে বহু গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত এবং তাঁহারই ভাবধারা-অবলম্বনে অন্যের লিখিত এই সকল গ্রন্থরাজি "সৎসঙ্গ পাব্লিশিং" বিভাগের চেষ্টায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। সৎসঙ্গের মুখপত্র "সৎসঙ্গী" পত্রিকাটীও এই প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে প্রতি সপ্তাহে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় তাঁহাদিগকে সন্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—"যাঁহারা বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চলমান নেশায় জীবনের পথে ছুটিয়াছে তাঁহারাই 'সৎসঙ্গী' নামের যোগ্য।—বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া যেখানে যাহার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে সেইখানেই সৎসঙ্গ।" "সৎসঙ্গী" পত্রিকাটী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত এই উদার আদর্শে দেশবাসী সকল সম্প্রদায়কে একতার মহামিলনে আবদ্ধ করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করিতেছে! 'সৎসঙ্গীর' এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও সেদিন মন্তব্য করিয়াছেন—"এই চিন্তাহীন, লক্ষ্যহীন গতানুগতিকতার দিনে সৎসঙ্গের স্বাতন্ত্র্য সাময়িক সাহিত্যে যে বিশিষ্ট ভাবধারা বহিয়া আনিতেছে তাহার প্রয়োজন আছে। নিষ্ফল সমালোচনা ও কর্ক্কশ বাদানুবাদের পরিবর্ত্তে জাতির চিন্তা ও চরিত্রে যে

গঠনমূলক আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি প্রয়োজন 'সৎসঙ্গী' প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও আলোচনার ভিতর দিয়া তাহারই আভাস দিতেছে।"

সৎসঙ্গ কুটীরশিল্প বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—"পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন-পূরণের অনুসন্ধিৎসা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'লেই বেকার-সমস্যা জাতির বুক হ'তে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'য়ে যা'বে।" তাই আজ দেখিতেছি, বাংলার নরনারীর জীবনে নবচেতনা জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুখ ও সমৃদ্ধি-অর্জ্জনের একমাত্র পথ এই গৃহশিল্প যাহাতে পল্লীগ্রামেও প্রবর্ত্তিত হইয়া নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনীয় অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে পারে, ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুর ময়দার কল, আটার কল, চাউলের কল, তৈলের কল, চিনির কল এবং 'মেডিকেটেড্ এইরেটেড্ ওয়াটার,' 'স্পাইস্ পাউডারিং', 'সূতার গুটি', 'গ্লাস ব্লোইং', 'টেলারিং', বোতাম-নির্ম্মাণ, 'লজেন্স'-প্রস্তুত, 'পটারী ওয়ার্কস্', রুটি, বিস্কুট, ডাল, গম প্রভৃতি তৈয়ার করিবার নানাপ্রকার ছোট ছোট সুন্দর মেসিনারী খরিদ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহা স্থাপনের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কতকগুলি বিভাগের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একখানা বাড়ীতে 'কার্ড-বোর্ড' তৈয়ারীর যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে নানা কার্য্যের উপযোগী 'কার্ড-বোর্ডে'র বাক্সনির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে। গ্রামের বহু নিরাশ্রয়া বিধবা এবং দরিদ্র লোক এই বিভাগে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। 'ষ্টীম্লণ্ড্রি'র' জন্যও একটী বৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহাতে ঐ কার্য্যের উপযোগী নানা জাতীয় যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। এতদঞ্চলে বহু 'হোসিয়ারী' কারখানা থাকায় একটি উচ্চশ্রেণীর 'লণ্ড্রি'র খুবই অভাব ছিল। সৎসঙ্গের এই ধোলাই বিভাগটী আজ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

'কটন্-ইণ্ডাষ্ট্রিজের' জন্যও একটী প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে,—সে প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর। বাড়ীখানিতে অনেকগুলি দীর্ঘায়তন সুবিস্তৃত কক্ষ এবং সম্মুখে একটী প্রশস্ত বারান্দা রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিল স্থাপন করিয়া যাহাতে বস্ত্রসমস্যার সমাধান করা যায় এবং পল্লীশিল্পের উন্নতি করিয়া দেশের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা যায় ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম উদ্দেশ্য। 'অনুকূল হোসিয়ারী' নাম দিয়া এখানে

একটী উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জীর কল স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার কার্য্যও বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত, শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহ ও উপদেশে বহু পরিবারেই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী নানারূপ স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যদ্রব্য, অব্যর্থ ঔষধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এইরূপ অনুসন্ধিৎসু সেবা দ্বারা এখানে অনেকেই আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। দারিদ্র্য-মোচনের অমর মন্ত্র—এই সেবা-মাহাত্ম্যে যত শীঘ্র সকলে উদ্বুদ্ধ হইবে ততই দেশের মঙ্গল। ইহা ছাড়া অন্য উপায় যে আর কিছুই নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

সৎসঙ্গ ব্যাঙ্ক

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিতেছিলেন,—"পল্লীর কথা যখন ভাবি, প্রত্যেকটী পরিবারের ব্যথা-বেদনা-ভরা চিত্রটী যেন আমার চোখের সাম্‌নে ভে'সে ওঠে, মনে হয় আমিও সেই পরিবারেরই একজন, তাদের অবনতির জন্য আমিই দায়ী।" তাই দেখিতে পাই গ্রামবাসীদিগের দুঃখ-নিরাকরণের জন্য তিনি দিবারাত্র কত ব্যস্ত থাকেন! পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃ বলেন—"বাংলার কৃষক ও শিল্পীদের কি দুরবস্থা! দেশে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকর প্রভৃতির ব্যবসায় আজ একরূপ লোপ পে'তে ব'সেছে। কৃষককুল নিরন্ন এবং ঋণভারে জর্জ্জরিত। কৃষি ও শিল্পকার্য্যের পরিচালন-উপযোগী যৎসামান্য মূলধন যাহা যখন দরকার হয়, তজ্জন্য তা'রা ধনী মহাজনের শরণাপন্ন হয়, আর কুশীদজীবী মহাজনগণ উচ্চহারে সুদ গ্রহণ ক'রে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে থাকেন। গ্রামের সাড়ে-পনর-আনা লোক কৃষি ও শিল্পজীবী। ইহারা এমনভাবে নাশ পাওয়ায় গ্রাম আজ ধ্বংসের মুখে। যেরূপেই হউক ইহাদিগকে বাঁচাতেই হ'বে। একটী পল্লীও যদি মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা পাওয়ার সন্ধান পায়, আশা করা যায় সেই নীতির অনুসরণ ক'রে অদূর ভবিষ্যতে একদিন বাংলার শ্রী ফি'রে আস্‌তে পারে।" পল্লীর উন্নয়নের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্বগ্রামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে পল্লীর সম্পদ সেই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন মৃৎশিল্প, লৌহশিল্প, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া দেশকে ধনৈশ্বর্য্যে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তোলে, কৃষিসম্পদে গৃহস্থের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে, সেজন্য কৃষক ও শিল্পীদিগকে ব্যবসায় চালাইবার জন্য সময়োচিত প্রয়োজনীয় মূলধন দিয়া সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নামমাত্র সুদে তাহাদিগকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা

কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋণগ্রহীতা নগদ টাকা দ্বারা দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে কৃষি বা শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে সে-ঋণ শোধ করিতে পারেন। অসচ্ছল অবস্থার ভিতরেও যাহাতে পল্লীবাসীরা কিছু কিছু বাঁচাইয়া দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য "সৎসঙ্গ রিনোভেশন্" নামে একটী 'ফণ্ড' খুলিয়াছেন। আবার গৃহস্থেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে এক একটী বাক্স রাখিয়া দুই চার পয়সা করিয়াও যাহাতে ইচ্ছা করিলেই যখন খুসী জমাইতে পারে এবং তাহা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া বাড়াইতে পারে, ব্যাঙ্কটীতে তেমন ব্যবস্থাও আছে।

সৎসঙ্গ পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্)

বিভিন্ন বিভাগের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গের অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়াও বহু লোক আসিয়া জুটিল। ইহাদিগের কতকজনকে লইয়া একটী পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ খোলা হইল। সে আজ বার বৎসর পূর্ব্বের কথা। কর্ম্মিগণ সর্ব্বপ্রথম দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ পানীয় জল সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে নলকূপ-খননকার্য্য আরম্ভ করিলেন। নলকূপ হইতে যাহাতে উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায় তজ্জন্য তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটী ও জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে ঘর-বাড়ী, লোহার 'ষ্ট্রাক্চারেল্ ওয়ার্কস্', 'ওয়াটার ওয়ার্কস্', রাস্তাঘাট, সেতুনির্ম্মাণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের কণ্ট্রাক্টারের কার্য্যই এই বিভাগের কর্ম্মিগণ বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। প্রতিবৎসর বহু যুবক নানাস্থান হইতে আসিয়া এই বিভাগে শিক্ষানবিশীর কার্য্য করতঃ অল্প সময়ের মধ্যে নিজেরা স্বাধীনভাবে হাতে-কলমে কার্য্য করিবার অভিজ্ঞতা ও কৌশল অর্জ্জন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে বেকার যুবকের অন্নসংস্থানেরও একটা উপায় হইল। এমন দিন গিয়াছে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বক্ষণ নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্বহস্তে কর্ম্মীদিগকে এই সকল কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন। এখনও তাঁহার সাহায্য ও উপদেশ-দানে বিন্দুমাত্র বিরাম নাই। কর্ম্মীরা যখনই কোন অসুবিধায় পতিত হন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাহা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যসম্পাদনের যুক্তি ও বুদ্ধি গ্রহণ করেন এবং তিনিও স্বয়ং কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কর্ম্মবেগ আরোতর গতিতে চালাইতে কত উৎসাহিত করেন। বুদ্ধিবলে কি ভাবে কম খরচে ও অল্প সময়ে কার্য্যগুলি উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীকে আরও অধিকতর উত্তম সেবা দ্বারা খুসী করা যায় তজ্জন্য কর্ম্মীদিগকে

কত পন্থা বলিয়া দেন। তাঁহার অবিরাম আপ্রাণ চেষ্টায় কর্ম্মীরাও ইতিমধ্যে কার্য্যসম্পাদনে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনার, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড প্রভৃতি সকলেই ইঁহাদের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। পাক্‌সীর সারা-সেতু এবং গড়াই-সেতুর River boring-এর কার্য্যে ইঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের খুবই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কর্ম্মীদিগকে এই জাতীয় কঠিন কার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া হইত না। সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণেরও ইতিপূর্ব্বে এ-প্রকার কার্য্যের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না। কাজের আদেশ পাইয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার কৌশল বলিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। কার্য্যটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যখন যে অসুবিধা ঘটিয়াছে সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ তৎপরতার সহিত তাহা মীমাংসা করিবার পন্থা বলিয়া দিয়া কর্ম্মিগণকে সাহায্য করিয়াছেন।

সৎসঙ্গ মাতৃ-সঙ্ঘ

মাতৃজাতির উন্নতির জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুর কম চেষ্টা করেন নাই। এই অশিক্ষিত, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত, আদর্শচ্যুত সমাজের নারীকুলকে শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র ও ব্যবহারে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী করিয়া গড়িয়া তুলিতে তিনি দিবারাত্র ব্যস্ত। নারীই যে জাতির জননী—এই বোধ প্রত্যেক নারীর অন্তরে সজাগ থাকিয়া যাহাতে তাহাদিগকে নিয়তই উদ্বর্দ্ধনের দিকে চালিত করিতে পারে, এজন্য তাঁহার পরিশ্রমের অন্ত নাই। নারীজীবনের আদর্শগুলি সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যাহাতে তাঁহাদের চরিত্র ও চলনকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে, এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নারীজাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় এখানে মহিলা-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ তথ্য-প্রচার, বিবিধ কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা নারীজাতিকে স্বাবলম্বী করিয়া তাঁহাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা, পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্বারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ভাব উদ্দীপ্ত করা, সেবা ও রোগপ্রতিকার বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি নারীজাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণ-চেষ্টাই মাতৃ-সঙ্ঘ-স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সৎসঙ্গের মহিলাগণ সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্যনিরত থাকিয়া নানাবিষয়ে সুদক্ষ কর্ম্মী হইয়া উঠিতেছেন। গৃহস্থালী ও লেখাপড়া, সঙ্গীত

ও বাদ্য, চিত্র ও সূচি-বিদ্যা, ধাত্রী ও শুশ্রূষা-বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ তাঁহারা একই সঙ্গে নিত্য করিয়া যাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকে স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিয়মিতরূপে ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সাধনাও করিয়া থাকেন। পদ্মাতীরে প্রত্যহ পূজান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আশ্রমবাসী সমবেত বালিকা ও মহিলাবৃন্দের ভক্তি-আপ্লুত-কণ্ঠোচ্চারিত মঙ্গলাচরণ ও বিনতিপাঠ পূজামন্দির ও প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া তুলে। হিন্দী মঙ্গলাচরণ ও বিনতিপাঠ ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রার্থনা দুইটী মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রত্যহ সমবেত উপাসনায় বিশেষভাবে পঠিত হইয়া থাকে। যথা :—

(১)

"আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ !

আজ থেকে আমার জীবন তোমার। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক্। তোমাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত হউক। 'নারীর নীতিতে' তুমি ব'লেছ—তুমি কলাণীরূপে—সতীরূপে—নারীরূপে আমাকে আমাব বৈশিষ্ট্যে বর্দ্ধনশীলা দেখিতে চাও। শপথ কর্‌ছি—আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ কর্‌তে চেষ্টা করব।

তুমি সুস্থ দীর্ঘায়ু হও। আমার জীবন আমি তোমায় অর্ঘ্য দিলাম। —তুমি উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—পুলকে—জীবনে—যশে—আর সমান সম্বেগে। নারী আমি—অমৃতের অধিকারিণী—আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এই অফুরন্ত অমৃত দিযে নিপীড়িত ব্যথিত কর্ম্মিষ্ঠ আদর্শানুপ্রাণ নরকে আমি অপূর্ব্ব প্রাণন-স্নানে স্নাত করিযা তোমাবই দিকে তাকে আবো এগিয়ে দিতে পারি।

তুমি আমাকে ভালবাসার অধিকারিণী ক'রেছ—আমি আমার সব ভালবাসা উজাড় ক'রে দিয়ে তোমাকে স্বতেজোদীপ্ত জীবনময় দেখ্‌তে চাই।

তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমি এমনিভাবেই আমার চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মূর্ত্ত ক'রে তোমার মহান্ অভিযানকে অবাধ ক'রে তুল্‌তে পারি।"

(২)

"আমার অস্তিবৃদ্ধির পরম-উদ্গাতা—

আমার প্রিয়পরম !

জন্মজন্মান্তরের বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পে'য়েছি আমরা আমাদের এই জীবনে। সার্থক হ'য়েছে আমাদের জন্ম। ধন্য হ'য়েছি, কৃতার্থ হ'য়েছি তোমার চরণস্পর্শ ক'রে।

যুগের পর যুগ তপস্যা ক'রেও দেবতারা যাঁকে মূর্ত্ত ক'রে তুল্‌তে পারেন নি, কত পুণ্যফলে সেই তোমাকে ক'রেছি মূর্ত্ত, অরূপ ভগবানকে ক'রেছি মানুষ-ভগবান্—দয়াল! কত ভাগ্য আমাদের!

প্রিয়তম!

আজ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের—তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা' আমাদের সক্ষম ক'রে তুল্‌বে বাঁচা-বাড়ার অপূর্ব্ব সৌরভ ছড়া'তে ছড়া'তে সপারিপার্শ্বিক আমাদিগকে তোমার জীবন-বৃদ্ধির অনুকূল ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে।

ওগো দরদী বন্ধু! আমার সর্ব্বস্ব! তুমিই আমার জীবন। আমি জানি তোমার মত বন্ধু, তোমার মত প্রিয় আমার আর কেউ নাই। তোমার প্রতি-কর্ম্মে, প্রতি-ভঙ্গীতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আশীর্ব্বাদ কর দয়াল, আমি যেন মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি না, তুমি আমার প্রেষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ।

তাই প্রার্থনা দাসীর—তোমার জীবন চিরবর্দ্ধনে রঞ্জিত হ'য়ে উঠুক্। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক্। আমার নারীত্ব ধন্য হোক্, সার্থক হোক্ তোমার 'নারীর নীতি' প্রতিপালনে।

ওগো প্রিয়, রাজাধিরাজ সম্রাট্! তুমি থাকো, তুমি বাঁচো, আমাদের জীবন-চলনার প্রতি-পদক্ষেপে ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক্—

স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি !!!"

আশ্রমবাসী মহিলাদিগের নিকট কোন কার্য্যই হেয় নহে, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই সমান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিবার উপদেশ তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পাইয়া থাকেন। সৎসঙ্গে গবেষণাগার, কারখানা, কলাভবন, শিল্পকুটীর প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় গৃহাদির নির্ম্মাণ-ব্যাপারে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ সামান্য কুলী-মজুরের কার্য্য করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা সারারাত্র জাগিয়া লক্ষ লক্ষ ইট তৈয়ার করিয়াছেন, ইটের পাঁজা সাজাইয়াছেন, কোমরে কাপড় বাঁধিয়া উচ্চ পাঁজায় উঠিয়া পাঁজা ভাঙ্গিয়াছেন, মাথায় করিয়া ইট যথাস্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে যে-কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে সর্ব্বদাই সাহায্য করিয়া থাকেন।

সৎসঙ্গের মহিলাগণ নিজ নিজ পরিবারের ব্যয়ভার-নির্ব্বাহ এবং গৃহস্থালীর কার্য্যে সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকিয়াও অনেকে অধিক রাত্রি

পর্য্যন্ত জাগিয়া অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করেন। বহু বালিকা ও মহিলা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সৎসঙ্গের কলেজ বিভাগে পড়িতেছেন, অনেকে আই-এ, ও আই-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করিয়া উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং কেহ কেহ বি-এ, ও বি-এস্-সি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া সৎসঙ্গের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। যাহারা কতিপয় সন্তানের জননী এমন বয়ঃপ্রাপ্ত বর্ণজ্ঞানহীন মহিলারাও শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় বিপুল উৎসাহ ও অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে, গৃহকার্য্যাদির ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিয়া, আপনাদিগকে অত্যল্প কালের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিতেছেন। নারী-জীবনের বৈশিষ্ট্য —আদর্শ বিবাহ, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, পরিবার-পরিজনের শুশ্রূষা, সুপ্রজনন, সন্তান-প্রতিপালন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যাহাতে তাঁহারা সহজেই নিজ নিজ চরিত্রে অনুশীলন করিয়া প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হইতে পারেন, সেজন্য উপদেশ-প্রদানার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-অবলম্বনে ও তাঁহারই অপরিসীম উৎসাহে, মহিলারা নিজেরাই পুরুষচরিত্র-বিহীন নাটক রচনা করিয়া নিজেরাই তাহা অভিনয় করিয়া থাকেন।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলাদেবী, বি-এ, একবার সৎসঙ্গে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। আশ্রমবাসী মহিলাগণের বিভিন্নমুখী কর্ম্মকুশলতা বর্ণনা করিয়া তিনি "বাংলার কথা"য় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লেখিকা মন্তব্য করিয়াছেন,—"যোগশাস্ত্রে যে বলে সাধনার দ্বারা মুদিত হৃদপদ্ম বিকশিত হয়, এই আশ্রমের নারীদের মধ্যে সেই তত্ত্ব সত্যে পরিণত দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম্। আমি উপদেশ দ্বারা তাঁদের উপকৃত করিব এই আশা করিয়া তাঁহারা আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বাকে তাঁহাদের আত্মার সহিত পরিচয় সাধন করিয়া নিজেকে লাভবতী করিতে লাগিলাম এবং মনে মনে নতমস্তকে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলাম। দেখিলাম পাবনার এই সৎসঙ্গ আশ্রমটী বাঙ্গলার নারীর মনের চিকিৎসালয, আত্মার নার্সারি ও কর্ম্মের কারখানা। নারী এখানে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও আনন্দের সমগ্রতায় পূর্ণ বিকশিত হইতেছে।"

সৎসঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,—"জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ ক'রতে হ'লে, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার আনন্দ-উদ্দামে অঢেল হ'তে হ'লে সুস্থ ও শক্তিশালী দেহের প্রয়োজন। মানুষকে বাঁচ্তে হ'লে, পারিপার্শ্বিকের সেবায় উন্নতিলাভ

ক'র্তে হ'লে যেমন শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন তেমনি পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন, বরং স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তাই প্রথম ও প্রধান, কারণ স্বাস্থ্যই ঐশ্বর্য্য—স্বাস্থ্যই সামর্থ্য।"

সকলকে নীরোগ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কত চেষ্টা করেন! যখনই বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আশ্রমবাসী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—নরনারীকে নিজে সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া তাহা সেবন করাইয়া থাকেন এবং অনতিবিলম্বে রোগ-প্রতিকারের উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালন করিতে জনে জনে উপদেশ দান করেন। এতদঞ্চলের লোক পূর্ব্বে নদীর জল পান করিত। অশিক্ষিত গ্রামবাসীর যথেচ্ছ ব্যবহারে নদীর জল প্রায়ই নানাপ্রকারে দূষিত হইত এবং তাহা ব্যবহারে আমাশয় এবং বিসূচিকা রোগে প্রতিবৎসর বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। গ্রামবাসীর এই দুঃখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরে ভীষণভাবে বাজিয়া উঠিত। যাহাতে মহামারী প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রকোপ না হইতে পারে এবং লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকে এজন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বহু অর্থব্যয় করিয়া চারিদিকে অনেকগুলি নলকূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন। গ্রামের মধ্যে অনেক স্থান পূর্ব্বে গভীর জঙ্গল ও পচা ডোবায় পরিপূর্ণ ছিল এজন্য এস্থান দারুণ ম্যালেরিয়া রোগের প্রিয় আবাসভূমি ছিল। বাঁশবনের নীচে এক-একটী পরিবার দুরন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আক্রমণে জন-বিরল হইয়া পড়িতেছিল। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুর এই স্থানে যে সকল কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিকে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে কদর্য্য স্থানগুলির অধিকাংশই এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামে জলনিকাশের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না, ম্যালেরিয়া-সৃষ্টির ইহাও একটী কারণ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গ্রামটীর স্বাস্থ্য এখন ক্রমেই বেশ ভাল হইয়া উঠিতেছে। অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদিগেব মধ্যে এই সকল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুব প্রথম জীবনে ডাক্তারী করিয়া কি ভাবে গ্রামবাসীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অধুনা তিনি চিকিৎসার দায়িত্ব আশ্রমের কয়েকজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে দিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশক্রমে চতুষ্পার্শ্বের রোগীদিগকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা এখনও শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই করিয়া থাকেন।

চিকিৎসা-ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা এবং যত্ন নেওয়ার জন্য ডাক্তারগণকে তিনি প্রায়শঃ উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়া থাকেন,—"সকলের নিকটই প্রাণের মূল্য সমান, সুতরাং কাহারও ব্যাধি হ'লে ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাহার জন্য তদবস্থায় যতদূর সম্ভব যথাসাধ্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রতেই হ'বে।" ডাক্তারগণও তাঁহার এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ এবং সৎসঙ্গের অধিবাসীবৃন্দের সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর একটী হোমিওপ্যাথিক ও একটী এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। কতিপয় অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ইহাদের কার্য্য চলিতেছে। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র রোগীকে এখানে বিনামূল্যে ঔষধপত্র দিয়া যত্নের সহিত চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজন হইলে ডাক্তারগণ বিনা 'ভিজিটে'ও রোগীর বাড়ীতে গিয়া রোগী পরীক্ষা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থাদি করিয়া থাকেন। আশ্রমের সেবকগণ চিকিৎসকগণের পরিচালনায় গ্রামবাসী আতুরগণের শুশ্রূষা করেন এবং সৎসঙ্গ ধাত্রী-বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীগণ গ্রামস্থ প্রসূতি-সাধারণের নিশ্চিন্ত ও সুখপ্রসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্র

দেশের লুপ্তপ্রায় কলাবিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে একটী কলাকেন্দ্রেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় শিল্পিগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ইহার দ্রুত উন্নতি বিধান করিতেছেন। কর্ম্মিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে চিত্রশিল্পের নানা অভিনব পরিকল্পনা এবং তাহা মূর্ত্ত করিবার কৌশল সম্বন্ধে নিয়ত উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেখিতে দেখিতে এই পল্লী কলাভবনটী নানা মনোরম চিত্রে পরিশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। কলাভবনটীতে একটী আলোক-চিত্র ও একটী মৃৎশিল্প বিভাগও খোলা হইয়াছে। অধুনা কলাকেন্দ্র হইতে 'সস্‌পেণ্টিং', 'ওয়াটার কালার', 'এন্‌লার্জ্জমেণ্ট', 'অয়েলপেণ্টিং', 'কমার্শিয়েল ডিজাইন', এবং মাটীর তৈয়ারী—ব্যক্তিবিশেষের অবিকল আকৃতি, দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং নানা জাতীয় খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা বয়সের বিভিন্ন অবস্থার বহু প্রকার ফটোচিত্রও এখানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। সূচি-শিল্পের নানা প্রকার অতি মনোরম ছবি ও দৃশ্যাবলী সর্ব্বদাই এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই মহিলাগণের হাত দিয়া এমন সুন্দর সুন্দর কাজ বাহির হইয়াছে যে, অনেকেই তাহাদের

সৎসঙ্গ দাতব্য-চিকিৎসালয়

শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বহু পরিদর্শক বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রায়শঃ তাহা উচ্চমূল্যে খরিদ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান কলাভবনটীর আয়তন তেমন প্রশস্ত না থাকায় এই বিভাগের কার্য্যপরিচালনার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল, এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুদিন হইল একটী বৃহদায়তন 'আর্ট-ষ্টুডিও'-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই নবনির্ম্মিত ভবনে এই বিভাগটী স্থানান্তরিত হইবে। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের পূর্ব্ব দিকে বৃক্ষাদি-পবিশোভিত এক অতি সুন্দর নির্জ্জন স্থানে এই কলামণ্ডপটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দক্ষিণে গ্রামখানি, উত্তরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ইহারই সীমান্তে প্রকৃতির রমণীয় ক্রোড়ে এই অভিনব কলাভবনটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরেব কথিত নানা ভাবরাজি নাটকীয় চরিত্রের অভিনয় দ্বারা প্রকাশ কবিয়া ফিলিম্‌স্‌-এর সাহায্যে তাহা জনসমাজে প্রচার কবিবাব জন্য বায়োস্কোপের ফিলিম্‌স্‌ তৈয়ারীর কাজ এবং ব্লক-প্রস্তুতের কাজ প্রভৃতিও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিবাব পরিকল্পনা রহিয়াছে।

সৎসঙ্গ আনন্দবাজার

আনন্দবাজার সৎসঙ্গের সাধারণ ভোজনাগার। অতি পূর্ব্বে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য-সংখ্যা কম ছিল, মাঝে মাঝে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিতে আসিতেন, যে দুই চারি দিন তাঁহারা থাকিতেন, ঠাকুরবাড়ীতেই আহারাদি করিতেন। তখন সকলে সারাদিন তত্ত্বালোচনায় এবং কীর্ত্তনানন্দেই মত্ত থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদিগকে লইয়া পদ্মায় স্নানক্রীড়া সমাপন করিয়া সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহারে বসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্ত্রী স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রান্নাঘরেই সকলকে একসঙ্গে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইতেন। তখন প্রায়শঃই কীর্ত্তন শেষ করিয়া আহারাদি করিতে অপরাহ্ণ হইয়া যাইত। রাত্রে জননীদেবী ডাল, তরকারী, ভাত একসঙ্গে মাখিয়া সকলের হাতেই এক-এক দলা দিতেন, রাত্রির ভোজনকার্য্য এই ভাবেই নিষ্পন্ন হইত। লোকসংখ্যা যেমন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং অনেকে স্থায়ীভাবে ঠাকুরবাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইহাদের আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তদবধি আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে তখন এক-এক বেলায় শতাধিক লোকের আহারের সংস্থান করিতে হয়। তাহার উপর তিনি তখন নানা কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন, সেজন্যও ব্যয় কম নয়। নিজের পৈতৃক যৎসামান্য সম্পত্তিটুকুই ছিল যা-কিছু সম্বল। এই কঠোর দারিদ্র্য নিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠানের

গোড়াপত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। বেশী দিনের কথা নয়। যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠানাবলীর কার্য্য তেমন ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই, যখন শিক্ষা ও গবেষণাগার ছিল নিতান্ত স্বল্পায়তন, যখন লোকসংখ্যা আজকালকার মত এত বেশী হয় নাই, তখন আনন্দবাজারে আউসের সব চেয়ে কম মূল্যের মোটা লাল চাউলের ভাত, পদ্মার ঘোলা জলের মত তরল ডাইল, আর মাটীর মতন লবণ দিয়া একবেলা সকলের আহার হইত। মাঝে মাঝে যেদিন শাক বা তরকারীর ঘেঁট হইত, সেদিন ত' নিমন্ত্রণ লাগিয়া যাইত, সকলের কি স্ফূর্ত্তি—সেদিন বোঝা যাইত 'আনন্দবাজার' নামটী কতখানি সার্থক। শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করিয়া টাকা যোগাড় করিয়া দিলে তবে প্রত্যহ রান্না চড়িত। উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও ডাইল খরিদ করিবার মত অর্থ যেদিন সংগৃহীত না হইত সেদিন ফেন-ভাত বা 'লপ্‌সীর' ব্যবস্থা হইত, কোন কোন দিন রান্না চড়িতে চড়িতে রাত্রি হইয়া যাইত। শ্রীশ্রীঠাকুরও ততক্ষণ কর্ম্মীদের সঙ্গে অনাহারে থাকিতেন। নিতান্ত অসময়ে প্রস্তুত উক্তরূপ কদর্য্য আহারও কর্ম্মিগণ পরম সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অসীম টানে গায়ের রক্ত জল করিয়া প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিত।

কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী একবার আশ্রমের অতিথি হইয়াছিলেন। অতিথিদের জন্য সেদিন একটু বিশেষ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সাধারণ খাদ্যই খাইতে চাহিলেন। খাইতে বসিয়া নেতৃস্থানীয় জনৈক কংগ্রেসকর্ম্মী হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন—"এর চেয়ে ঢের ভাল খাবার পে'য়ও আমরা জেলে ধর্ম্মঘট ক'রে অনশন ক'রেছি। যাহা হউক এখানকার কর্ম্মীরা কাজ করে প্রাণের একান্ত সহজ টানে, কাজেই এখানে অনশন নাই।" আনন্দবাজারের তৎকালীন অবস্থা শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত একখানা চিঠিতে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করা হইল। যথা :—

"মা, এখানকার কথা আর কি কইব? প্রায়ই একবেলা আহার, তা'ও না-জোটার মত হয়, আর যখন হয়—তা'ও প্রায় সন্ধ্যার সময়। ওমা! এদের মুখ দে'খে বুক ফে'টে যায়, অপোগণ্ড শিশুসন্তান নিয়ে জননী হয়তো সারাদিন ছট্‌ফট্ করে, কোন দিন সন্ধ্যা কিংবা রাত্রে এক মুঠো পেলে না হয়ত—কোন রকমে চারটী চিড়ে মুড়ি যোগাড় ক'রে তাই দিয়েই চ'লে গেল। মা, আর কতদিন এমনতর দেখব? পরমপিতার চরণে কতই অপরাধ ক'রেছিলাম! এত অপদার্থ সন্তান মা আমি,—কাহারও দু'টো পেটের ভাতের উপায় কর্‌তে পার্‌লাম না। ভে'বেছি আমিও কাল থেকে

সকলের দশায় গা ঢে'লে দিব। যদি পারি—ওরা ছু'বেলা খে'লে আমি একবেলা—আর ওরা একবেলা খে'লে আমি—না!"

সৎসঙ্গের অবস্থা এখন আর তেমন নাই। প্রতিষ্ঠানগুলির দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীদের বাসস্থান ও আহারাদির অনেকটা শৃঙ্খলা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তপোবন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেস এবং কারখানার কর্ম্মিগণও পৃথকভাবেই আহারাদি করেন। আবার কর্ম্মীদের অধিকাংশই এখন সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। নিজ নিজ পরিবারেই তাঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যান্য কর্ম্মী, আশ্রমপরিদর্শনকারী ভদ্রমহোদয়গণ এবং নানা দেশের আগন্তুক শিষ্য-সেবকগণের আহারাদির ব্যবস্থা এখনও আনন্দবাজারেই চলিতেছে। এখন প্রত্যহ দুইবেলা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারের মত সাধারণ-ভাবে ডাল, ভাত, তরিতরকারী দিয়া সকলকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করান হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আনন্দবাজারের গৃহাদি শ্রীশ্রীঠাকুরের আবাসবাটিকার পার্শ্বে নিতান্ত অল্পপরিসর স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। এজন্য অসুবিধার অন্ত নাই। আগন্তুক ও অতিথি-অভ্যাগতের স্নানাহার এবং বাসস্থানের যথাযথ সুবিধার জন্য উপযুক্ত গৃহাদি-নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইতেছে। সৎসঙ্গ-পল্লীর ঠিক মধ্যস্থলে বড় রাস্তার ধারে প্রায় ৫।৬ বিঘা জমির উপর এই নবপরিকল্পিত আনন্দবাজার ভবন নির্ম্মাণের কথা স্থির হইয়াছে। জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া ভূমি জরিপ করা হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের মালমশলা কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, শীঘ্রই শ্রীশ্রীঠাকুর ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এই বাড়ীতে একই সঙ্গে কয়েকটী ভদ্রপরিবারের থাকিবার মত শয়ন-কক্ষ, বৈঠকখানা-গৃহ, স্নানাগার, কল ও পায়খানাদির ব্যবস্থা থাকিবে। বাসগৃহের পার্শ্বেই ভোজনাগার থাকিবে এবং নিকটেই খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান বসিবে।

সৎসঙ্গ গৃহনির্ম্মাণ-বিভাগ

১৯২৭ সন—তখন আশ্রমে পদ্মাতীরস্থ 'সৎসঙ্গ-গৃহ' ব্যতীত পাকাবাড়ী আর ছিল না। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের দ্বিতলের গাঁথুনী কতক পরিমাণে হইয়াছে। অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করিবার জন্য ঢাকা হইতে দৈনিক দুই টাকা আড়াই টাকা বেতনে ছয় জন রাজমিস্ত্রী আনা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ-মত, গ্রীষ্মের এক প্রভাতে তপোবন বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক কয়েকটী উৎসাহী ছাত্র লইয়া রাজমিস্ত্রীদিগের কাজের যোগান দিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাদের কাজের যোগান দিয়া মাঝে মাঝে যে সময় পাইতেন সেই

অবসরে তাহাদের দুই একটা যন্ত্র ধরিয়া ইঁহারাও একটু-আধটু কাজ করিতেন। রাজমিস্ত্রীদের তাহা ভাল লাগিত না। এজন্য মাঝে মাঝে তাহারা যথেষ্ট কড়া কথাও বলিত। অন্যের হাতের দিকে চাহিয়া থাকা শ্রীশ্রীঠাকুর কোনদিনই পছন্দ করেন না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কর্ম্মীরা নিজেরাই রাজমিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা করিয়া লন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া, রাজমিস্ত্রীর কাজ বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করতঃ অবিলম্বে তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহাদিগকে রাজমিস্ত্রীর কার্য্যের উপযোগী সমুদয় যন্ত্রাদি কিনিয়া দেন। তপোবনের শিক্ষক ও ছাত্র মিলিয়া একটা রাজমিস্ত্রীর কার্য্যের দল গঠিত হইল। সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মী-সংখ্যা হইল পনর জন। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের দ্বিতলের কাজ সম্পূর্ণ হইলে এই নবগঠিত রাজমিস্ত্রীর দল ৯০ফুট লম্বা ও ১০ফুট চওড়া বারান্দাবিশিষ্ট একটী পাকা বাড়ী এবং তাহার চারিদিকের প্রাচীরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিলেন। মধুমক্ষিকা যেমন করিয়া নিজগৃহ-নির্ম্মাণে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সমস্ত কর্ম্মীরা ততোধিক পরিশ্রম করিতেন। তখন সৎসঙ্গের পূর্ব্ববর্ণিত আনন্দবাজারে প্রত্যহ একবেলা করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্নানের ঘণ্টা পড়িলে সবাই যে-যাহার কাজ সারিয়া স্নান করিয়া কলাই-করা এক-একখানা থালাহস্তে পদ্মার ধারে গাছতলায় বসিয়া যাইত। খাওয়া শেষ হইলে পদ্মার চরে নামিয়া থালা ধুইয়া ঐ থালা ভরিয়া জলপান করিত। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রত্যেকে আবার স্ব স্ব কাজে লাগিয়া যাইত।

গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যয়-সমস্যা এইভাবে সহজ করিয়া লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্থির করিলেন যে, নিজেরাই যদি ইট কাটিয়া লইতে পারা যায় তাহা হইলে আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় পাকাঘর নির্ম্মাণের কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। সেই বৎসর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহে কর্ম্মিগণ ইট কাটিতে আরম্ভ করেন। আজ পর্য্যন্ত সৎসঙ্গের অধিকাংশ গৃহ ও রাস্তার ইট কর্ম্মিগণ নিজেরাই কাটিয়া লইয়াছেন। অতঃপর এই উৎসাহী কর্ম্মিগণকে শ্রীশ্রীঠাকুর 'ফেরো-ব্রিক' ও 'ফেরো-কংক্রিটের' কাজ হাতে-কলমে শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। কর্ম্মীরা বিপুল উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া 'ফেরো-কংক্রিটে'র সাহায্যে সৎসঙ্গের পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্কের দালানের নির্ম্মাণ-কার্য্য অত্যল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁহাদিগকে 'স্যানিটারী লেট্রিন্'-এর নির্ম্মাণ-কার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। অধুনা কর্ম্মিগণ এই সকল কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বঙ্গের নানা স্থানে এই সকল কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া সর্ব্বসাধারণের সেবা করিতেছেন।

বাংলার গৃহ-সমস্যার বাস্তব সমাধান কেমন করিয়া হইতে পারে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশমত সৎসঙ্গের নির্ম্মাণ-বিভাগ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত জীবন ও বৃদ্ধির কর্ম্ম-প্রণালীতে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন স্থানের যে সকল অসংখ্য অধিবাসী এখানে আসিয়া স্থায়ীভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের বাসোপযোগী গৃহাদিও এই বিভাগের কর্ম্মিগণ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পছন্দসই পরিকল্পনামত দুইখানি শয়নগৃহ, একখানি বৈঠকখানা ঘর, বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য একটী ক্ষুদ্র 'লেবরেটরী' একটী পূজার্চ্চনার গৃহ, একখানি রান্নাঘর, একটী 'স্যানিটারী' পায়খানা ও একটী নলকূপযুক্ত এক পরিবারের বাস করিবার মত যোগ্য ভদ্রাসন, ইঁহারা যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। এই সকল গৃহাদি যথেষ্ট আলো ও বাতাস চলাচলের উপযুক্ত, ঝড় ও অগ্নিভয়-বিরহিত, বেশ মজবুত এবং অতিশয় মনোরম।

এই বিভাগের কর্ম্মিগণ যে সারাদিন শুধু গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন তাহা নহে। ছাত্রগণ পড়াশুনার অবসরে এই কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকে—ইহা তাহারা খেলাধূলা বা বিশ্রামের সামিল বলিয়াই গণ্য করে। ছাত্র ব্যতীত অপর যাঁহারা এই বিভাগে কর্ম্ম করেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে পড়াশুনা করিয়া 'ম্যাট্রি-কুলেশন' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

সৎসঙ্গ ফিলানথ্রপি

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের ফলে আজ দেশময় যে বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের মূলগত সনাতন ঐক্যের ভিত্তির উপর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়ে আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। সহস্র সহস্র হিন্দু, শত শত মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান আজ তাঁহার প্রেমের পতাকা-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সত্যিকারের পরিচয় লাভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া আজ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চিরপোষিত অন্ধ-কুসংস্কারের মহা অবসান হইয়াছে। সকলে ভেদ-বুদ্ধি ভুলিয়া গিয়া একতাবদ্ধ হইয়া পরম শান্তিতে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে যে ইহা একটী অভিনব অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা বলাই বাহুল্য। সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আদর্শ কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিয়াছেন তাহারই অনুকরণে বাংলার গ্রামে গ্রামে এইরূপ শিক্ষায়তন, বিজ্ঞানাগার, চিকিৎসালয়,

শিল্পকুটীর প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন দেশকে সমৃদ্ধ করিবার যে অন্য উপায় আর নাই,—আবার গোড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই একটীমাত্র কথা—একের জীবন ও বৃদ্ধির উপরই অন্যের অস্তিত্ব ও উন্নতি সর্ব্বপ্রকারে নির্ভর করে—এই সকল বোধ দেশময় সকলের মধ্যে সহজভাবে চারাইয়া দিতে না পারিলে মানুষের মধ্যে প্রীতিসংস্থাপনও যে আকাশকুসুম মাত্র—ইহা সকলে আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন।

যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জনমঙ্গল ভাবরাজি এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া মানুষকে ইষ্টস্বার্থে কর্ম্মোদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ যোগ্য কর্ম্মীদিগকে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিতেছেন। বঙ্গের বিভিন্ন জিলায়, বিহার ও ব্রহ্মদেশে এই সকল যাজক, অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক ও প্রতি-ঋত্বিকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত জীবন ও বৃদ্ধির আদর্শ এবং তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমিক-চরিত্র সম্বন্ধে সর্ব্বত্র সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি করিতেছেন। আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির অভাবেই যে দেশে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে না, ইষ্টানুরাগমূলক আদর্শ শিক্ষার অভাবেই যে দেশে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পরিবারের মধ্যে স্বার্থপরতার বীভৎস অভিনয় চলিতেছে, বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও শিল্পানুষ্ঠান না থাকায়ই যে দেশ দিন দিন দারিদ্র্যের কবলে নিষ্পেষিত হইতেছে, ইষ্ট-স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃত্তি-স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুণই যে সম্প্রদায়গত বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে—যাজকগণের চেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল মতবাদ দেশ-বিদেশে আজ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। যাজকগণ যাহাতে গ্রামস্থ প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের ব্যথা-বেদনার কথা সম্যক্ জানিয়া, সহানুভূতির সঙ্গে দরদ প্রাণে তাহা প্রতিকারের জন্য অনুসন্ধিৎসু সেবা-প্রবৃত্তি লইয়া এবং ইষ্টস্বার্থে কর্ম্মতৎপর হইয়া সকলকে সাহায্য করেন এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদিগকে নিয়ত কতই না উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন! যাজকগণের উপর ন্যস্ত এই সকল গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য ব্যাপকভাবে শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে তাঁহারা সম্পাদন করিতে পারেন এজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সময়োচিত সর্ব্বপ্রকার উপদেশ ও সাহায্যাদি প্রদানের সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এই 'ফিলান্থ্রপি' বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ঋত্বিক, প্রতি-ঋত্বিক এবং তাঁহাদের মনোনীত বহু অধ্বর্য্যু ও যাজকগণের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর বর্ত্তমানে বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁহার আদর্শ-প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। যথা:—প্রতিনিধি-নায়ক শ্রীযুক্ত

প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ঋত্বিকাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এস্-সি, ঋত্বিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, ঋত্বিক-সচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি; নানাস্থানের প্রতি-ঋত্বিকগণ:—কলিকাতায়—ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র, এল্-এম্-এস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস, ইঞ্জিনিয়ার (লিড্স্), শ্রীযুক্ত মহম্মদ খলিলর রহমান, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দে, এম্-এ, বি-এল, এড্ভোকেট্, শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভবতারণ বসু, ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; নদীয়ায়—শ্রীযুক্ত বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, এল্-এম্-এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পূততুণ্ড; যশোহরে—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-বি, ডি-পি-এইচ্, শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ বিশ্বাস, বি-এল্, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়, বি-এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বাগ্ছী, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শিকদার, বি-এস্-সি; ঢাকায়—শ্রীযুক্ত কানাইলাল গাঙ্গুলী, বি-এল, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর দাশগুপ্ত, বি-এস্-সি, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী; নারায়ণগঞ্জে—শ্রীযুক্ত ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়; ফরিদপুরে—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার পূততুণ্ড, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত; বরিশালে—৺যোগেশচন্দ্র দে, বি-এল, এড্ভোকেট্, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে, বি-এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দে, বি-এল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহ ঠাকুরতা, বি-এ, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায়, এম্-এ, বি-এল্; খুলনায়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র হালদার, এম্-এ, বি-এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর রায় চৌধুরী; চট্টগ্রামে—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত জগতমোহন দিচ্ছিত; নঁওগায়—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন গোস্বামী; চব্বিশ পরগণায়—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য, বি-এল; ময়মনসিংহে—শ্রীযুক্ত রেবতীকুমার সেন, শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন গোস্বামী, উকীল; রংপুরে—শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোস্বামী, বি-এস-সি; ব্রহ্মদেশে—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি, এড্ভোকেট্, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বি-এল্, এড্ভোকেট্, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ চাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কর্ম্মকার; পূর্ব্ব আফ্রিকায় শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার গুহ; সৎসঙ্গে—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্-এ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

আজ সমগ্র বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশবাসী সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া জীবনপথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সুখে-দুঃখে, আশায়-আনন্দে, সম্পদে-বিপদে মনের কত সমস্যা, পারিবারিক কত অশান্তি ও অসুবিধার কথা নিত্য তাঁহার চরণে পত্রদ্বারা নিবেদন করিতেছেন এবং তাঁহার করুণা বাণীর তীব্র প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। ব্যথার ব্যথী তিনিও অন্তরের সবটুকু সহানুভূতি জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিপদে সাহস ও দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব ব্যক্তিগত সমস্যার যথাযথ মীমাংসা প্রদান করিয়া ইষ্টানুসরণের অঢেল চলনায় চলিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিয়মিতরূপে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। সৎসঙ্গের 'ফিলান্থ্রপি' বিভাগ হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল চিঠিপত্রাদি প্রেরণ এবং শত শত দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক আর্থিক সাহায্য-দান, পারিপার্শ্বিকের নানা অভাব-অভিযোগের মীমাংসা এবং আগন্তুকগণের অভ্যর্থনা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের যথাযথ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

সৎসঙ্গ পল্লীবাসীর দৈনন্দিন কার্য্যক্রম

সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণ কেহই বেতনভোগী কর্ম্মচারী নহেন। সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং তাঁহার প্রেমময় মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কে কয় ঘণ্টা কাজ করিল এখানে সে হিসাব বা কৈফিয়ৎ নাই। সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিলেও কাহারও মুখে বিরক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার উপর অর্পিত কাজ আরও সুন্দরভাবে যদি তিনি করিতে পারিতেন, তাঁহার প্রেমাস্পদ আরও কত খুসী হইতেন!

দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে আজ সৎসঙ্গে কত বিভাগে কত কাজ আরম্ভ হইয়াছে! সর্ব্বত্রই কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ কর্ম্মিগণ সমুদয় কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। অতি প্রত্যূষে কর্ম্মিগণ শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্ত্রী-পুরুষ সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে গমন করিয়া ভোরের প্রার্থনায় যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুক্ষণ ধরিয়া সকলের সহিত হিন্দী মঙ্গলাচরণ ও বিনতী স্তোত্র পাঠ করিয়া সমবেত শত শত আশ্রমবাসী নরনারীর অন্তর ভাবমাধুর্য্যে এবং পবিত্র উদ্দীপনায় অনুষিক্ত করিয়া তুলেন। অতঃপর সকলে প্রায় একঘণ্টাকাল ধ্যাননিরত থাকিয়া ইষ্টারাধনা করেন।

নিম্নলিখিত স্তোত্রগুলি প্রত্যহ সৎসঙ্গের সমবেত উপাসনায় হইয়া থাকে। যথা :—

(১)

রাধা-স্বামী নাম যো গাওয়ে, সোই তরে।
কল্ কলেশ সব্ নাশ্, সুখ্ পাওয়ে সব্ দুঃখ্ হরে॥
এইসা নাম অপার, কোই ভেদ ন জানই।
যো জানে সো পার্, বহুর ন জগ্‌মে জন্‌মই॥
রাধা-স্বামী গায়্‌কর্, জনম্ সুফল কর্‌লে।
এহি নাম নিজ্ নাম হ্যায়, মন অপ্‌নে ধর্‌লে॥
বৈঠক স্বামী অদ্‌ভূতি, রাধা নিরখ নিহার।
আউর ন কোই লখ্‌সকে, শোভা অগম্ অপার॥
গুপ্তরূপ জঁহা ধারিয়া, রাধা-স্বামী নাম।
বিনা মেহর নহি পাঅই, জহাঁ কোই বিস্‌রাম॥

করুঁ বন্দগী রাধা-স্বামী আগে,
জীন্ পর্‌তাপ জীব বহু জাগে।
বারম্বার করু পর্‌ণাম
সদ্‌গুরু পদম ধাম সৎনাম।
আদি অনাদি যুগাদি অনাম্,
সন্ত-স্বরূপ ছোড়্ নিজ ধাম।
আয়ে ভৌজল নাও লগাই,
হাম্‌সে জীঅন লিয়া চঢ়াই।
শব্দ দৃঢ়ায়া সুরত বতাই,
করম্ ভরম্ সে লিয়া বচাই।
কোট কোট করুঁ বন্দনা,
অরব খরব দণ্ডোত।
রাধা-স্বামী মিল্ গয়ে,
খুলা ভক্তিকা সোত।
ভক্তি শুনাই সব্‌সে ন্যারী,
বেদ কতেব ন তাহি বিচারী।
সত্যপুরুষ চৌথে পদ বাসা,
সন্তন কা উহাঁ সদা বিলাসা।

সো ঘর দরসায়া গুরু পুরে,
বীণ্ বজে জহাঁ অচরজ তুরে।
আগে অলখ্ পুরুষ দর্বারা,
দেখা জায় সুরত্ সে সারা।
তিস্পর্ অগম লোক ইক্ ন্যারা,
সন্ত-সুরত কোই করত্ বিহারা।
তহাঁ সে দরশে অটল অটারী,
অদ্ভুত রাধা-স্বামী মহল সওঁয়ারী।
সুরত হুই অতিকর্ মগনানী,
পুরুষ অনামী জায় সমানী।

(২)

বার বার করুঁ বিনতী, রাধা-স্বামী আগে।
দয়া করো দাতা মেরে, চিত চরণন লাগে॥
জনম্ জনম্ রহী ভুল্মে, নহি পায়া ভেদা।
কাল্ করম্কে জাল্মে, রহী ভোগত খেদা॥
জগত জীব ভরমত ফিরে, নিত চারোখানী।
জ্ঞানী যোগী পিল্রহে সব মন্ কি ঘানী॥
ভাগ্ জগা মেরা আদিকা, মিলে সদ্গুরু আই।
রাধা-স্বামী ধামকা, মোহি ভেদ জনাই॥
ঊঁচা সে ঊঁচা দেশ হ্যায়, ওহ অধর ঠিকানী।
বিনা সন্ত পাওয়ে নহি, শ্রুত শব্দ নিশানী॥
রাধা-স্বামী নাম কি, মোহি মোহিমা শুনাই।
বিরহ অনুরাগ জগায়কে, ঘর পহুছু ভাই॥
সাধ্ সঙ্গ কর সার রস্, মৈনে পিয়া অঘাই।
প্রেম লগা গুরু চরণমে, মন্ শান্ত ন আই॥
তড়প উঠে বেকল্ রহু, কস্ পিয়া ঘর যাই।
দরশন রস নিত নিত লহু, গহে মন থিরতাই।
সুরত চঢ়ে আকাশ মে, করে শব্দ বিলাসা।
ধাম ধাম নিরখত চলে, পাওয়ে নিজ ঘর বাসা
এই আশা মেরে মন্ বসে, রহে চিত্ত উদাসা।
বিনয় শুনো কিরূপা করো, দীজে চরণ নিবাসা।

তুম বিন্ কোই সমরথ নহী, যা সে মাঁগু দানা।
প্রেমধার বরখা করো, খোল অমৃত খানা॥
দীন দয়াল দয়া করো, মেরে সমরথ স্বামী।
সুকর করু গাওয়ত রহুঁ, নিত রাধা-স্বামী॥

(৩)

বার বার্ কর্ জোড়কর্, সবিনয় করু পুকার।
সাধ্ সঙ্গ মোহি দেও নিত, পরম গুরু দাতার॥
কৃপা-সিন্ধু সমরথ পুরুস, আদি অনাদি অপার।
রাধা-স্বামী পরম পিতু, মৈ তুম্ সদা অধার॥
বার বার্ বলজাঁউ, তন্মন্ ওয়ারু চরণ পর্।
ক্যা মুখ্ লে মৈ গাউ, মেহর করি জস্ কৃপা কর্॥
ধন্য ধন্য গুরুদেব, দয়া-সিন্ধু পূরণ্ ধনী।
নিত্য করু তুম্ সেব, অচল ভক্তি মোহি দেও প্রভু॥
দীন অধীন অনাথ, হাত গহা তুম্ আন্কর্।
অব রাখো নিত সাথ্, দীন দয়াল কৃপানিধি॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ, সব বিধি অওগুণ-হারমৈ।
প্রভু রাখো মেরে লাজ, তুম্ দ্বাবে অব মৈ পড়া॥
রাধা-স্বামী গুরু সমরথ্, তুম্ বিন্ আওর ন দুসরা।
অব করো দয়া পরতক্স, তুম্ দর এতি বিলম্ব কেঁউ॥
দয়া করো মেরে সাইয়া, দেও প্রেম্ কি দাত্।
দুঃখ্ সুখ্ কছু ব্যাপে নহি, ছুটে সব উৎপাত॥

প্রার্থনা-কার্য্য এইভাবে সমাপ্ত হইলে, বেলা হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে কর্ম্মের সাড়া পড়িয়া যায়। তপোবনে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সঙ্গে মাচাং, বারান্দা, বেদী বা ঘাসের উপর বসিয়া সাহিত্য, গণিত ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন,—শিক্ষকের হাসি-তামাসার গল্প শুনিতে শুনিতে বালকগণ পাঠ্য বিষয়গুলি অজ্ঞাতসারে কেমন সহজে আয়ত্ত করিয়া লইতেছে! ডাক্তারখানায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে, চিকিৎসকগণ রোগীদিগকে পরীক্ষা করিয়া কাহাকেও 'ইন্জেক্সন' দিতেছেন, কাহারও ঔষধ, কাহারও বা পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। বেলা ক্রমে বাড়িয়া চলিল, কর্ম্মপ্রবাহ দ্বিগুণ বেগ ধারণ করিল। 'পাওয়ার হাউস' হইতে নানাস্থানে তড়িৎশক্তি বিতরিত হইতে লাগিল—কারখানা, প্রেস, কুটীর-শিল্প ও গৃহনির্ম্মাণ বিভাগে তুমুল-

বেগে কাজ চলিতে লাগিল। মহিলাদিগের, বালিকাদিগের নানারকম ক্লাস বসিয়া গেল। কোথায়ও সেলাই, কোথায়ও চিত্রাঙ্কন, কোথায়ও স্কুল, এবং কোথায়ও কলেজের পাঠ চলিতে লাগিল। নানা বিভাগে নানা কাজ আরম্ভ হইল। ব্যাঙ্কের গৃহে কর্ত্তৃপক্ষ গ্রামের কৃষকদিগকে লইয়া দরবার করিতেছেন। 'কেমিক্যাল্ ওয়ার্ক্‌সে'র একাংশে ঔষধপত্র তৈয়ারী হইতেছে, অন্যদিকে তাহা দেশ-বিদেশে পাঠাইবার জন্য পার্শ্বেলে প্যাক্ করা হইতেছে। ডাকঘরে সকলে ভিড় করিয়াছে। মধ্যাহ্ন হইল, ফাঁকমত সকলে স্নান ও আহারাদি সারিয়া নিল। আহারান্তে সামান্য বিশ্রাম করিয়া যে যাহার কার্য্যে পুনরায় লাগিয়া গেল। চারিদিক কর্ম্মকোলাহলে আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। সম্পাদকগণ প্রবন্ধ-লেখায় মনোনিবেশ করিলেন, বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রে গবেষণা-কার্য্য চলিতে লাগিল, শিল্পকুটীরগুলিতে সকলে আবার কর্ম্মনিরত হইল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, সকলে পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুর-সমীপে বিকালের প্রার্থনায় যোগদান করিতে উপনীত হইলেন। সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রার্থনা শেষ করিলেন।* ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কোথাও সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া লোক-সমাগম হইল, প্রাঙ্গনে ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে লাগিল। পদ্মাতীরে কত লোক জমায়েত হইয়াছে—গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনায় স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি অধিক হইতে চলিল। কোথায়ও জ্যোতির্ব্বিদগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিয়া কোষ্ঠী-বিচারের নানা রহস্যের মীমাংসা লাভ করিতেছেন, অধ্যাপক ও ছাত্রগণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠনিমগ্ন, বিশ্রামগৃহে আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া কর্ম্মিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, সাধনগৃহে কেহ কেহ নীরব সাধনায় ধ্যাননিরত, অভিনয়-গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-অবলম্বনে কর্ম্মীদের স্বরচিত কোন নাটকের মহলা চলিতেছে। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো সমানভাবে জ্বলিতে থাকে। কর্ম্মক্লান্ত হইয়া কর্ম্মিগণ কেহ বা পদ্মার ধারে, কেহ গৃহের বারান্দায়, কেহ প্রাঙ্গনে ঘাসের উপর যিনি যেখানে সুবিধা পাইতেছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর

*। এতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর জননীদেবীর পার্শ্বে বসিয়া সকলের সঙ্গে প্রত্যহ দুই বেলা প্রার্থনা করিয়াছেন। জননীদেবীর স্বর্গারোহণের পর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত প্রার্থনায় আর যোগদান করেন না। এখন আশ্রমবাসী নরনারী সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজেরাই তাহা যথারীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন।

সমবেত প্রার্থনায় জননীদেবীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর অ কূলচন্দ্র
(১৩৪১ সন)

এই ভাবে চলিয়াছে। কর্ম্মিগণ প্রতিকার্য্যে, প্রতিপদে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ও সাহায্য লাভ করিয়া এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া পরম উৎসাহে কাজ করিয়া যাইতেছেন।

বাংলার পল্লীতে যেখানে দেশের প্রাণশক্তি আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত সেই প্রাণে সাড়া তুলিবার জন্য পল্লীসন্তান শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার এই নিরালা পল্লীগ্রামেই সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানটীর পত্তন করিয়াছেন। কত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে আজ ইহা স্ফটিকের মত দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে! নগরীর কোলাহল হইতে দূরে বাংলার প্রাণবাহিনী পদ্মানদীর ধারে—বাংলার দুঃখ-বেদনাকে সত্য করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া—তাহা নিরাকরণের জন্য আজ কত বৎসর ধরিয়া তিনি ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছেন এই প্রতিষ্ঠানটী!

সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় সহস্রাধিক কর্ম্মী আজ যে এই অভিনব কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া তুলিয়াছেন, জাতির ভবিষ্যতের দিক দিয়াও তাহা যে সমৃদ্ধির সূচক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রতিষ্ঠান আজও শিশু, আজও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণভাবে পরিণতি লাভ করে নাই—কিন্তু বলিতে কি, শিশু-দেহের প্রত্যঙ্গ-নিচয়েরই মত সর্ব্ব-সম্ভাবনা লইয়া ইহা গড়িয়া উঠিতেছে। **সৎসঙ্গের গবেষণা বিভাগে** নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সহযোগে, যাহাতে মানব সাধারণের দুর্দ্দশাসমূহের লাঘব করা যাইতে পারে সে বিষয়ে পরীক্ষা-কার্য্য চলিতে থাকিবে, **সৎসঙ্গের প্রেস এবং পাব্লিশিং বিভাগ** দেশের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা-বাণী প্রচার করিয়া সকলের নিকট বাঁচার অমর মন্ত্র ঘোষণা করিবে; **সৎসঙ্গের রসায়ন বিভাগে** নানাবিধ রোগ-যন্ত্রণাদি দূরীকরণের মহৌষধসমূহ স্বল্পব্যয়ে দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইতে থাকিবে; **সৎসঙ্গের গৃহশিল্প বিভাগে** নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইয়া ভেজাল-শূন্য, খাঁটী ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য-সরবরাহে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়া গ্রামের স্বাস্থ্যকে অটুট করিয়া তুলিবে—সেই সঙ্গে এই সমস্ত কুটীর-শিল্পে পল্লীর নর-নারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনের পথ করিয়া দিবে; **সৎসঙ্গের কারখানা** সমূহ উদ্ভূত ও নবোদ্ভাবিত যন্ত্ররাজির নির্ম্মাণে দেশের যন্ত্র-সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইবে; **সৎসঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ** স্বগ্রামে ও অন্যান্য স্থানে গৃহ, রাস্তা-ঘাট ও জল-সমস্যাদির নিরাকরণ করিয়া একদিকে যেমনই দেশের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করিবে, অন্যদিকে তেমনি সেই কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহে দেশের বেকার-সমস্যারও সমাধান সূচনা করিতে থাকিবে; **সৎসঙ্গের চিকিৎসাবিভাগ**

ব্যাধি-যন্ত্রণাগ্রস্ত আতুরগণের সেবায় দেশের রোগ-ক্লিষ্টের ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়াইবে; **সৎসঙ্গের জননী-মঙ্গল ও ধাত্রী-বিভাগ** প্রসূতি-সাধারণের নিশ্চিন্ত ও সুখপ্রসবের ভরসা প্রচার করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ শিশুতে দেশ ভরিয়া দিবার আশার সূচনা করিবে; **সৎসঙ্গের সাধন-বিভাগ** জনসাধারণের মনে প্রাণের স্বস্থতা ও শান্তি-বিধানের লক্ষ্য-স্থল হইয়া দাঁড়াইবে—সর্ব্বোপরি **সৎসঙ্গের শিক্ষা-বিভাগ** প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ-ত্রুটিগুলি নিরাকরণ করিয়া দেশের কিশোর-গণের হৃদয়ে ইষ্টস্বার্থপরায়ণতার বীজ বপন করিয়া এবং ইষ্টপ্রাণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাহাকে অঙ্কুরোদ্গমে ও ফলনে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া কিশোরগণকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দক্ষ ও নিপুণ করিয়া জগতের বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণোপযোগী করিয়া ছাড়িয়া দিবে—যাহাতে সেই শিক্ষিত কিশোরগণের মধ্য দিয়াই আর্য্যের ইষ্ট-চলনপরতা দেশময় প্রচারিত ও প্রসারিত হইতে পারে—দেশের সকলকে ইষ্টের টানে একমুখী করিয়া আর্য্যের আদর্শে অচ্যুত করিয়া তুলিতে—ইষ্টস্বার্থপরায়ণ একাদর্শের আদেশ-পালনে নিষ্ঠাবত্তায় দেশকে দেশ-নামের যাথার্থ্য-লাভে সমর্থ করিতে পাবে। **সৎসঙ্গের কৃষি ও শ্রমশিল্পাদির উদ্বর্দ্ধন-পন্থা** এবং **সৎসঙ্গের সেবামূলক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি** সকলের অনুসরণীয়। **সৎসঙ্গের সমাজ-সংস্কারের** পরিক্রিয়মান পরিকল্পনাগুলি আর্য্য-সমাজের ব্যাপক সংস্কার-মূলক পথ-প্রদর্শক। ভারত বর্ত্তমানে গভীর দুর্দ্দশার স্রোতে নিমজ্জমান হইলেও, কি করিয়া শুভের আবাহনে এবং অশুভের নিয়ন্ত্রণে সমাজ-শুদ্ধি, বংশ-শুদ্ধি ও চলন-শুদ্ধির পথে তিলে তিলে দক্ষ ও নিপুণ ভবিষ্য বংশধরের সৃজনের সূচনা করিয়া, ন্যায়ের পথে, শান্তির আশ্রয়ে ও প্রেমের পতাকাতলে অবস্থান করতঃ ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে পারে—সেই পথই আজ প্রদর্শন করিতে যাইতেছে—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই অভিনব **"সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানটী"**।

নবম অধ্যায়

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সে আজ প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বের কথা। চিত্তরঞ্জন তখন তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীতে বাস করেন। দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। নেতৃগণ সকলেই মহাব্যস্ত। সৎসঙ্গে তখন 'Wind Power Dynamo' নামে একটী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে বায়ু-মণ্ডল হইতে বিনা খরচায় তড়িৎশক্তি-সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর যথার্থ বন্ধু ছিলেন। লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে জাতীয় উন্নতি-সাধন বিষয়ে তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না। উক্ত যন্ত্রটীর নির্ম্মাণ-কার্য্যে সাহায্যলাভের আশায় সৎসঙ্গের কতিপয় কর্ম্মী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে 'সৎসঙ্গের' কথা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উঠিতেই, নিজ হইতেই বিশেষ আগ্রহ-সহকারে দেশবন্ধু বলিলেন,—"তিনি কি সেই অনুকূল ঠাকুর, যাঁর কথা আমি বারীনের কাছে কত শু'নেছি? তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার যে আমার অনেক দিনের সাধ র'য়েছে!" শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুদিন সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছিলেন এবং দেশবন্ধুর পৃষ্ঠপোষিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'পাবনার মধুচক্র' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর সহিত সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণের সাক্ষাতের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় হরিতকীবাগান লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার আগমনে লোকের অত্যন্ত ভিড় হওয়ায় মাণিকতলায়ও আর একটি বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেশবন্ধু যখনই জানিতে পারিলেন যে, তিনি উপস্থিত কলিকাতায়ই আছেন, তাঁহার কি আগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য! দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক-নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন,—"এখানে তিনি? বাড়ীর নম্বর কত? কোন্ রাস্তায়?······আজই আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।" সেদিন আর কথাবার্ত্তা হইল না। পরদিন সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সে দেশবন্ধু সভাপতি হইয়া যাইতেছেন, সে কারণে প্রত্যুষেই সৎসঙ্গ

বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, সিরাজগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় চিত্তরঞ্জন মাণিকতলার বাসায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেদিন বাড়ীতে তুমুল কীর্ত্তন চলিতেছিল। নির্জ্জনে সুবিধামত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য তাঁহাকে দোতলার ছাদে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা মাদুরের উপর শুইয়া ছিলেন। দেশবন্ধুকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর 'দাদা' সম্বোধনে তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইলেন এবং কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অসহযোগ আন্দোলন, চরকা, খদ্দর ও মহাত্মাজী সম্বন্ধে কত কথা হইল! দেশবন্ধু বলিলেন,—"নন্‌কোপারেশনের জন্য অনেক খাটতে হ'য়েছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"নন্‌কোপারেশন্ কি আরম্ভ হ'ল?" দেশবন্ধু উত্তরে বলিলেন—"সত্য কথা বলতে কি, অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃতপ্রস্তাবে এখনও আরম্ভ হয় নাই।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"এরূপ আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশেরই যোগ্য, এ দেশের লোকের ইহা প্রকৃতিগত নয়, তাই বোধ হয় লোকে ইহা নিতে চায় না। চাণক্যের নীতিই এ দেশবাসীর পক্ষে উপযুক্ত; চাণক্যই এ দেশের আদর্শ রাজনৈতিক।" দেশবন্ধু বলিলেন,—"দেশের অর্থ বিদেশে চ'লে যাচ্ছে, তাই ইহাকে বাধা দে'বার জন্য, এই আন্দোলনের কতকটা সার্থকতা আছে ব'লে অনেকে মনে করেন, আমার কিন্তু এই আন্দোলনে মোটেই আস্থা নাই। মহাত্মাজীর কথায় আকৃষ্ট হ'য়ে এক বৎসর তাঁ'র নির্দ্দেশমত কাজ করতে রাজী হ'য়েছিলাম, কিন্তু নিরাশ হ'য়ে বৎসরান্তে ইহা ছে'ড়ে দিয়ে স্বরাজ্যদল গঠন ক'রেছি। চরকা এবং খদ্দরেও যে দেশোদ্ধার হ'বে সে সম্বন্ধে আমার তেমন বিশ্বাস নাই,—ইহাতে লোকের যৎসামান্য অর্থাগমের একটা উপায় হ'তে পারে এই মাত্র।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"শুধু খদ্দরে বিশেষ কিছুই হ'বে না। আজ-কাল কর্ম্মীরা অনেকেই জেলে যান, তাতেও কোন ফল হ'বে ব'লে আমার মনে হয় না। তারপর, ইংরেজ এমন শক্তিহীন নয় যে, খদ্দর পরলেই বা জেলে গেলেই তারাও ভয়ে দেশ ছে'ড়ে দে'বে। আর দেখুন, জেলে গেলে ক্ষতি বৈ লাভ নাই। তাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় হয়।"

দেশবন্ধু উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"ইংরেজ এদেশে এসেই সেবাদ্বারা লোকের অন্তর জয় ক'রে ছিলেন। আমরাও যদি দেশবাসীর দুঃখ-দৈন্য অন্তরের সহিত বু'ঝে তা' দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, আর সেই করার ফলে যখন সকলে ইংরেজের

চেয়ে আমাদের সেবার দান বেশী ব'লে অন্তরে অন্তরে অনুভব কর্‌বে, তখনই স্বরাজ আপনি এসে উপস্থিত হ'বে। ইংরেজেরা এদেশে তা'দের commerce and culture (বাণিজ্য ও কৃষ্টি) নিয়ে এ'সেছিলেন। Commerce (বাণিজ্য) দিয়ে তাঁরা দেশবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় অভাব অভিযোগ খুব কম খরচে দূর কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর মিশনারীগণ সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে, নিজেরা পুস্তক লি'খে, এবং নিজেদের প্রেসে তা' ছাপিয়ে, এক-রকম বিনামূল্যেই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারে মনোযোগী হ'লেন। দেশবাসী দেখ্‌ল ইংরেজের মত সুহৃদ নাই। বাস্তবিকই সেবা ছাড়া দেশ-জয়ের অন্য উপায় নাই। সেবা দিয়া মানুষের যত-কিছু অভাব সব দূর ক'রে তা'দিগকে সুস্থ রাখা এবং উন্নত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ রাজনীতি!"

দেশের প্রচলিত রাজনীতি দেশবন্ধুরও ভাল লাগিত না; উপায়ান্তর ছিল না বলিয়া বাধ্য হইয়াই তিনি তাহাতে যুক্ত রহিয়াছিলেন। উপযুক্ত লোকাভাবে এ দায়িত্ব অন্য কাহারও হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে যে সরিয়া দাঁড়াইবেন সে পথও ছিল না। দেশে যে সত্যি সত্যি আজ মানুষের অভাব, আর সেই জন্যই যে কোন কাজই অগ্রসর হইতেছে না, একথা উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"দেশে উপযুক্ত মানুষ হ'বে কি ক'রে? সমাজের আজ কি ঘোর দুর্দ্দশা! ইহা যে একেবারে প'চে গিয়েছে। কোন পরিবারেই স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয় নাই, ঘরে ঘরে শিশুমৃত্যু, সর্ব্বত্র ঘোর অশান্তি! আমাদের উন্নতির অন্তরায়গুলি দূর ক'র্‌তে হ'বে। লক্ষ্য যদি ঠিক হয়, তখন যাওয়া।—সে চিৎ হ'য়েই পারি, কাৎ হ'য়েই পারি, সাঁতার দিয়েই পারি, আর বুকে হেঁ'টেই পারি। এই জন্য আগে লক্ষ্য স্থির হওয়া দরকার। আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হ'বে—ঐ মানুষ চাই। দেশে যা'তে সুসন্তান হয় তাই কর্‌তে হ'বে।"

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"আপনারা নিম্নজাতির জলচল করা ইত্যাদি যে আন্দোলন কর্‌ছেন ওটা এখন এই বাঙ্গলা দেশে আর তত বেশী দরকারী নয়, ও-ত' প্রায় চল্‌ হ'য়েই গে'ছে। এখন ত' প্রায় সকলেই সকলের হাতে জল খায়। তার চেয়ে বেশী দরকার হ'চ্ছে, বিবাহ সম্বন্ধে reform (সংস্কার) আনা,—বিবাহ-সমস্যাটা যদি solve (মীমাংসা) করা যায় তবে সুসন্তান হ'বে, তখন আর দেশে কর্ম্মীর অভাব হ'বে না। ভাল সন্তান জন্মাতে হ'লে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার intensity (গভীরতা) ও continuity (নিরবচ্ছিন্নতা) থাকা চাই। ভালবাসার intensity (প্রগাঢ়তা) থাক্‌লে সন্তানের longevity (আয়ু) বে'ড়ে যায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিলেন,—"আবার বালবিধবাদিগের বিয়ে হওয়া উচিত। যে নিজেকে বিধবা ব'লে জানে, স্বামীকে যে accept (গ্রহণ) ক'রেছিল, তার বিয়ে হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যার conception (গর্ভাধান) হয় নাই, অথচ বিয়ে করতে চায়, তার বিয়ে হওয়া উচিত। আর উপযুক্ত পাত্র না পে'লে আজীবন কুমারী থাকাও ভাল। পাত্রপাত্রী যদি according to choice (পছন্দসই) বিয়ে করতে পারে তবেই ভাল হয়। এখনকার মত গরু-দান, ঘটি-দান গোছের বিবাহ আর না-থাকাই সঙ্গত। ঐরূপ বিবাহ হ'লে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম বেশী গাঢ় হ'বে এবং তার থেকে যে issue (সন্তান) পাওয়া যা'বে তারা খুবই সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান হ'বে। এইরূপ এখন করতে পারলে বিশ পঁচিশ বৎসর পরে এমন কতকগুলি brain (মস্তিষ্ক)-ওয়ালা মানুষ পাওয়া যাবে, যারা দেশের সত্যিকারের কাজ করতে পারবে।"—ইত্যাদি কত কথাই শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা করিলেন। দেশবন্ধু অবাক বিস্ময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত বাণীগুলি অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ-সহকারে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে তাঁহার বদনমণ্ডল আশার উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিল।

জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ কিসে হইবে তাহা সুনিশ্চিত জানা না থাকায়, এতদিন আন্দোলন চালাইতে পদে পদে নিজেকে কিরূপ বিপন্ন বোধ করিয়াছেন, দেশবন্ধু অবশেষে তাহাই শ্রীশ্রীঠাকুরেব কাছে অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া কত দুঃখ করিলেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কহিলেন—"দেখুন দাশদা, যিনি আদ্যন্ত সবটা দেখেন এমন একজন দ্রষ্টাপুরুষ পিছনে না থাকলে, কোন কাজেই কেহ সফলকাম হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সারথী ছিলেন ব'লেই নানা সমস্যা-সঙ্কুল ভারতযুদ্ধে বড় বড় মহারথীদিগকে পরাস্ত ক'রেও অর্জ্জুন জয়ী হ'তে পে'রেছিলেন; রামদাস ছিলেন তাই প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের সঙ্গে লড়াই ক'রে শিবাজী বিরাট মহারাষ্ট্র জাতি গঠন ক'রতে পে'রেছিলেন; চন্দ্রগুপ্তের বিশালসাম্রাজ্যস্থাপনও চাণক্যের জন্যই। আবার দেখ্‌তে পাই, রাণা প্রতাপসিংহ এত বড় স্বার্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক বীর হ'য়েও শুধু চালকের অভাবে কোন কৃতকার্য্যতা লাভ করতে পারেন নাই, দারুণ ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে গেলেন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি দেশবন্ধুর মনে কেমন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল, উৎকণ্ঠার সহিত আবেগভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তা'হ'লে আমায় কি করতে হবে ব'লে দিন!"

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সকল সংস্কারের জন্য শক্তি নিয়ে কাজে লাগুন।

চিত্তরঞ্জন—শক্তি আমায় কে দিবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মুহূর্ত্তে আপনার ভালবাসাখানা তাঁর উপর পড়্‌বে সেই মুহূর্ত্তেই শক্তি এসে যা'বে। তাঁকে ধ'রে খুব নাম কর্‌তে হয়। তাঁ'তে যুক্ত হ'লেই শক্তি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—"আমার কি হবে ?" শুনিবামাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"এখনই হবে, এই জন্মেই—এই জেদ্ চাই। পরমপিতাকে ডাকুন, শিবাজীর মত হওয়া চাই, ভাবনা কি ? তবে নাম করা চাই-ই, আর এতে তো লোকসান নাই দাশদা! এই যে বলে—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'— ।"

দেশবন্ধু—নাম কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের system-এর (শরীর-বিধানের) ভিতর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দরুণ প্রতিনিয়তই যে সমস্ত শব্দ স্বভাবতঃই হ'চ্ছে তাকেই নাম, নাদ বা বীজ বলে। এই নামের স্থূল-সূক্ষ্ম হিসাবে স্তর-ভেদ আছে। হ্রীং, ক্লীং, ওঁ, বং প্রভৃতি প্রত্যেকই এক-একটা স্পন্দন। আমাদের brain cells (মস্তিষ্ক-কোষ)গুলি বহির্মুখীন প্রবৃত্তির চাপে মুদিত থাকে, কোন বীজমন্ত্র মনোযোগের সহিত মনে মনে অনবরত উচ্চারণের ফলে, আমাদের স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া মস্তিষ্কের কোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, সেগুলি পূর্ব্বের চেয়ে অধিক সাড়াপ্রবণ হয়, cells (কোষ)গুলি ফু'টে উঠে, যাহা পূর্ব্বে বোঝা কঠিন হ'ত তাহা তখন সহজে বুঝা যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, জ্ঞানের দরজার যেন চাবি খু'লে যায়।

দেশবন্ধু—নাম ত' অনেক ক'রেছি, কিন্তু ফল ত' কিছু পেলাম না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি নাম কর্‌তে হয়, কি ভাবে কর্‌তে হয়, তা' শু'নে নিতে হয়, আর তাই নিয়মমত ঠিক ঠিক চালা'তে হয়।

দেশবন্ধু নামদীক্ষা-গ্রহণের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে জননীদেবীর নিকট হইতে সকল বিষয় যথাযথ জানিয়া লইবার জন্য বলিলেন। জননীদেবী তখন অন্য ঘরে ছিলেন, দেশবন্ধু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষাগ্রহণের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। দেশবন্ধুর কথা শুনিয়াই জননীদেবী বলিয়া উঠিলেন, —"তোমরা বড় লোক, আমাদের কাছে নাম নেওয়া কি তোমাদের শোভা পায় ? বড় লোকদের আমার আর বিশ্বাস হয় না, তা'রা মনে করে ভগবানকেও তা'রা অনুগ্রহ করে। এইত' সেদিন—পাল বল্‌ছিল, সৎসঙ্গে এসে সে সৎসঙ্গকে কৃতার্থ ক'রেছে।"

মায়ের কথা শুনিয়া দেশবন্ধু কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মা, আমি

পাপী, আমার উপর দয়া হ'বে না, তা'ত জানিই, আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত। জগন্নাথ সবাইকে দয়া করেন, আমিই শুধু তাঁর দয়া-লাভে বঞ্চিত। জগন্নাথের মন্দিরে কত জনেই যায়, আমি কিন্তু অভিমানে কোনদিন প্রবেশ করি নাই।" দেশবন্ধুর সরল অকপট বচন শুনিয়া জননীদেবী বলিলেন—"কত জনকেই দে'খেছি, সবাই নাম নেয়, দুই দিন পরে ছে'ড়ে দেয়, আর বলে—'ওতে কিছু হয় না', আর নিন্দা করে। তুমি এত বড় লোক, দেশময় তোমার নাম-যশ, কত লোক নেতা ব'লে তোমায় মান্য করে। তুমি হয়ত মনে কর, তুমি এখান থেকে নাম গ্রহণ ক'রে সৎসঙ্গকে চরিতার্থ ক'চ্ছ। এমন ভাব থাকলে তোমার নাম নিয়ে কাজ নাই বাপু! যদি সৎসঙ্গের ভাবধারা পরমপিতা হ'তেই এসে থাকে একথা সত্য হয়, তবে তা' গ্রহণ করলে নিজেরই ত' লাভ বেশী—কৃতার্থ হ'লে সেই হ'য়েছে যে নাম পে'য়েছে।" এইবার দেশবন্ধু বিনয়-সমন্বিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন,—"মা, চিত্তরঞ্জন যখন যা' গ্রহণ ক'রেছে তা' ভে'বে চিন্তেই ক'রেছে, সে একবার যা' ধরে তার শেষ না দে'খে ছাড়ে না।" মা তাঁহার নিষ্ঠা, আগ্রহ ও ব্যাকুলতায় পরম সন্তুষ্ট হইলেন। দুই জনে আরও কত কি কথাবার্ত্তা হইল। মায়ের কাছে সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই রাত্রেই (১৩৩১ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ) দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে দেশবন্ধু আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মাণিকতলার বাসায় আসিয়াছিলেন। সাধন-ভজনের দ্বারা কি ভাবে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া চরিত্র সবল করা যায়, ছেলেমেয়েদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে দেশে আদর্শ মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে, কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া কি ভাবে দেশের অভাব দূর করা যায়, বিজ্ঞানের সাহায্যে কি ভাবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, ব্যাঙ্ক খুলিয়া কি ভাবে দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীদিগকে সাহায্য করা যায় ইত্যাদি কত কথাই সেদিন হইল। ইহার কিছুদিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা হইতে সৎসঙ্গে প্রত্যাগমন করেন। দেশবন্ধুর একান্ত ইচ্ছা, আশ্রমে আসিয়া কিছুকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করেন, কিন্তু নানা আবল্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অবশেষে ১৯২৫ সনের ১১ই মে তিনি সস্ত্রীক আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। পদ্মাতীরে একখানা বাড়ীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সেখানে তাঁহার শয়নগৃহের সম্মুখেই একটী প্রশস্ত বাঁধান বেদী ছিল, এই বেদীর উপর বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ে কত গল্প করিতেন। জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কথাবার্ত্তায় এক-এক দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত

দুইজনে জাগিয়া থাকিতেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা উদ্দীপনাময়ী আলোচনায় দেশবন্ধু অসুস্থ দেহেও প্রাণের প্রাচুর্য্য অনুভব করিতেন,—কত ভাবী সুখ-কল্পনায় তাঁহার অন্তরখানা পূর্ণ হইয়া উঠিত।

আশ্রমে যে বাড়ীটাতে চিত্তরঞ্জন বাস করিতেছিলেন, তাহা খরিদ করিয়া লইয়া সেখানে পছন্দমত গৃহাদি প্রস্তুত করাইবেন এবং দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নিয়তরূপে তথায় বাস করিবেন, সৎসঙ্গ হইতে একখানা সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাজ-সংস্কার ও গঠনমূলক উদার ভাবরাজি দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত তাঁহারই আরব্ধ পল্লীসংগঠন-কার্য্যে নিরত থাকিবেন—ইত্যাদি কত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, ইহার কিছু দিন পরেই (জুলাই মাসে) নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। দেশবন্ধু মনস্থ করিয়াছিলেন, সৎসঙ্গেই সেই কমিটির অধিবেশন যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং তখন সকল প্রদেশের নেতৃবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও কার্য্যাবলী প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকেও শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের গঠনমূলক সেবাকার্য্যে যোগদান করিতে অনুপ্রাণিত করিবেন। সৎসঙ্গে সে-সময় একটা ব্যাঙ্ক-স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, দেশবন্ধু সর্ব্বপ্রথম এই ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে সৎসঙ্গের কতিপয় কর্ম্মী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-অবলম্বনে 'Commerce and Culture' (কমার্স এণ্ড কাল্‌চার) নামে একটা যৌথ কারবার খুলিয়াছিলেন, নানাকারণে ইহার কাজ ভাল চলিতেছিল না। ইহাকেও পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট চিঠি-পত্রাদি লিখিলেন। মহাত্মাজীর তখন বঙ্গদেশ-পরিভ্রমণের কথা ছিল, তাঁহাকেও সৎসঙ্গে আসিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিলেন।*

* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে, বঙ্গ-ভ্রমণ-কালে মহাত্মাজী দেশবন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থ বিশেষ আগ্রহের সহিত সৎসঙ্গ-পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তখন দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন (ভোম্বল) সস্ত্রীক আশ্রমে ছিলেন। ইঁহারা ইতিপূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সৎসঙ্গে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করিতেছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে আশ্রমে দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বিদায়কালে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গেলেন, তাঁহারা যেন নিয়তরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই বাস করেন। আশ্রমে পদার্পণ করিবামাত্র মহাত্মাজীকে মাল্যভূষিত করিয়া অভিনন্দন প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও জননীদেবীর সহিত সৎসঙ্গের যাবতীয় কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতঃ বিশেষ আনন্দের সহিত উচ্চপ্রশংসা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীকে মহাত্মাজীও

দেশবন্ধু যে কয়দিন সৎসঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর ক্রমেই বেশ সুস্থ হইতেছিল। আশা করা গিয়াছিল, আরও কিছুকাল কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া এইরূপ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাইতে পারিলে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিবেন। তাঁহারও একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিছু অধিককাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করেন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে তিনি বেশীদিন সৎসঙ্গে থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি দার্জ্জিলিং যাইতে বাধ্য হইলেন। দেশবন্ধু দীর্ঘকাল যাবত একজন বিশ্বস্ত সহকারীর খুবই অভাব অনুভব করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এ-বিষয় জানাইলে, তাঁহার আদেশে সঙ্ঘ-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোহরচন্দ্র বসু মহাশয় প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেশবন্ধুর সহিত দার্জ্জিলিং গমন করেন। মে মাসের মধ্যভাগে চিত্তরঞ্জন সৎসঙ্গ হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। হায়! কে জানিত, সেদিন তিনি আমাদিগের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া যাইতেছেন! দেশের নানা সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এতদিন আলাপ-আলোচনা শুনিয়া এবং সৎসঙ্গের তৎকালীন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া দেশবন্ধু এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যাইবার সময় ঈশ্বরদির পথে তিনি সৎসঙ্গের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ মহাশয়ের নিকট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এতদিন আমার জীবনের যত চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট ছিল, তাহা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ পে'য়ে অধিকতর সুস্পষ্ট হ'য়ে ফু'টে উ'ঠেছে।

"মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তৎকালে জননীদেবীর আদর-আপ্যায়নায় মহাত্মাজী এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, অতঃপর ভারতের যেখানেই যখন তিনি গিয়াছেন, নেতৃবর্গের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত সৎসঙ্গ-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক স্থানেই জননীদেবীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"I have never seen such a masterful woman in my life" (এমন মহীয়সী নারী জীবনে আমি কখনও দেখি নাই)। অনেক দিনের কথা। সৎসঙ্গের কার্য্য-ব্যপদেশে একবার আমি বোম্বে গিয়াছিলাম। তখন আমেদাবাদ হইতে সবরমতী আশ্রমে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি পাবনার সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়াছি সংবাদ পাইয়াই মহাত্মাজী আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং উল্লসিতকণ্ঠে জননীদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রায় এক-ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত সৎসঙ্গের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল, তিনি মনোযোগের সহিত সমুদায় শুনিলেন; আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম যে, সৎসঙ্গের ভাবধারা এবং ইহার কর্ম্মগতি তিনি সর্ব্বদাই বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মাজী দেশবন্ধুকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন; দেশবন্ধুর দীক্ষাগুরু বলিয়া, তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাপূর্ণ উচ্চধারণা পোষণ করেন, দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

আমার জীবনের সকল আদর্শ সম্বন্ধে এমনতর মিল আর কারও সঙ্গে এ পর্য্যন্ত হয় নাই।”

না-জানি কি কুক্ষণেই তিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন! দেশবন্ধুর তিরোধানে বাংলার গৌরব-রবি সহসা অস্তমিত হইল—ভারতাকাশের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জীবন-মধ্যাহ্নেই নির্ব্বাপিত হইল। সে বিষাদের দিন—সেই ১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় ভারতবাসী কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। ভাগ্যহীন চিররঞ্জন পিতার মৃত্যুসময়ে তাঁহার নিকটে ছিলেন না, তিনি তখন সৎসঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনি আশ্রমের কতিপয় কর্ম্মীর সহিত শিলিগুড়ি পৌঁছিয়া, যাঁহারা শবদেহ লইয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য চিররঞ্জন বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশবন্ধুর অভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে এই শোকপূর্ণ ব্যাপারে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জননীদেবী এবং আশ্রম-সেবক অনেকেই সে-সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বর্গগত মহাত্মার পারলৌকিক ক্রিয়াদি যথারীতি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পিতার একমাত্র পুত্র—তাঁহার বড়ই আদরের দুলাল চিররঞ্জন জীবন-সর্ব্বস্ব পিতৃদেবকে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“ভোম্বল,

লক্ষ্মী আমার!

যদিও লাখ বজ্র একেবারে একদম্ তোর মাথায় ভে'ঙ্গে প'ড়েছে, তথাপি তুই পরমপিতার সন্তান—কুসুম-কঠোরের তনয়—ভোগের কোলে ত্যাগের দুলাল। তুই যে চিরসহনশীল সন্ন্যাসী—ব্যথাহত অকম্পিত যে রে তুই—ওরে তুই যে দাশদার আত্মজ! দাঁড়াত' একবার—দাঁড়াত' লক্ষ্মী সোজা হ'য়ে—স্থির বিস্ফারিত মনশ্চক্ষে একবার চে'য়ে দেখ্‌তো তাঁর মুখের পানে—বল্ অহিংস অথচ মধুর ভৈরব নিনাদে—ভারত আমার বাবা, ভারত আমার মা, ভারত আমার ভ্রাতা-ভগিনী। তাঁর কাছে যুক্তকরে প্রাণ ঢে'লে বল্—আমায় বল্ দাও—মঙ্গলে নিযুক্ত কর—আমায় সেবার অধিকার দাও।

ওরে কাঁদ্, যত ইচ্ছা কেঁ'দে নে—কিন্তু আপনহারা হ'স্‌নে। ব্যথা যত পারে আঘাত করুক্ কিন্তু কিছুতেই ভে'ঙ্গে পড়িস্ না। সবটুকু প্রাণ দিয়ে তাঁকে আ'কড়ে ধর্‌বি—দেখিস্ সব আঘাত মধুর হ'য়ে যাবে। সব আঁধার

কোথায় ছু'টে যা'বে—উষার আলোক নিমিষে ফু'টে উঠ্‌বে। ভয় নেইরে—এতটুকুও ভয় নেই।

প্রায়ই দাশদাকে স্বপ্নে দেখি—বলেন, 'আর আমি কখনও তোমায় ছে'ড়ে যা'বনা।'……মাকে দেখিস্—দুটী মেয়ে ও সুজাতা মাকে ও আর আর সকলের প্রতি নজর রাখিস্। তোর যে সবই সইতে হ'বে লক্ষ্মী!

মহাত্মাজী কোথায় ও কেমন আছেন? যদি ইচ্ছা করে, চলে আস্‌বি—সুবিধা হ'লেই।

তোরই
দীন
"আমি"

দেশবন্ধুর মহা-প্রয়াণের পূর্ব্বে মহাত্মাজী দার্জ্জিলিং গমন করিয়া কিছুকাল তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর নিকট শুনিয়াছি, দেশবন্ধু তখন সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কেবলই শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতেন, আর বলিতেন—"পৃথিবীতে অনেক লোকই দে'খেছি কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মত সর্ব্ববিষয়ে এমন অসাধারণশক্তি-সম্পন্ন অপূর্ব্ব প্রেমিক কর্ম্মী আর কোথায়ও দেখি নাই। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মাজীও বলিয়াছেন—"শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গলাভ করিবার পর দেশবন্ধুকে যেমন মিষ্টি লাগিয়াছে, এমন আর পূর্ব্বে দেখি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণাই-না তাঁর ছিল!" দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মাজী তাঁহার 'Young India' পত্রিকায় 'At Darjeeling'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া দার্জ্জিলিং অবস্থানকালে দেশবন্ধুর সহিত তাঁহার তৎকালীন আলোচনা-প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী তখন বাংলার প্রায় সকল প্রধান ইংরাজী পত্রিকায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে দেশবন্ধু মহাত্মাজীর নিকট যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিতে করিতে এক স্থানে তিনি উদ্ধৃত করিতেছেন—"* * * * I have learnt from my Guru (Spiritual Guide) the value of truth in all our dealings. I want you to live with him for a few days atleast. Your need is not the same as mine, but he has given me strength, I did not possess before. I see things clearly which I saw dimly before."—Young India, July, 1925. অর্থাৎ—"আমাদের জীবনে সত্যের মর্য্যাদা কতটুকু তাহা আমি আমার গুরুদেবের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করি,

চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কুসুমদাম-সুসজ্জিত প্রতিকৃতি

(১৩৩২ সন)

মাসিক বসুমতীর সৌজন্যে)

কিছুদিন আপনি তাঁহার সঙ্গ করুন। আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনার না হইতে পারে কিন্তু তিনি আমাকে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে আমার ছিল না। যে সকল জিনিষ আমি পূর্ব্বে অস্পষ্ট দেখিতাম তাহা আমি এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।"

* * * * *

দেশবন্ধুর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কত সময় কত দুঃখ করেন তাহা বলিবার নয়! তাঁহার অলোকসামান্য গুণগ্রাম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেক দিনই অনেক কথা বলিতে শুনিয়াছি। সে-দিনের দুই-চারিটী কথা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করিতেছি।—১৯৩৭ সনের ২রা এপ্রিল। বাঁধের ধারে অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কথায় কথায় দেশবন্ধুর কথা উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"এমন একটা ভাবপ্রবণ অথচ দৃঢ় এবং সুকৌশলী নেতা আর কখনও দেখা যায় না। মা তাঁ'কে দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে কত কড়া কথা শু'নিয়েছিলেন, কিন্তু দাশদা তখন এমন একটা pose নিলেন যে, মায়ের কঠোর মনও নিমেষে গ'লে গেল। এমন sincerity (সরলতা) এবং সত্যের প্রতি টান আর কোথাও দেখি নাই। একদিন গভীর রাত্রিতে দাশদা এই বাঁধের উপর একাকী দাঁ'ড়িয়ে বল্‌ছিলেন,—'মা, তোকে কি স্বাধীন কখনও দেখ্‌তে পা'ব না?' আমি পিছনে আস্‌ছিলাম, দাশদা তা' জান্‌তেন না, আমি চেঁচিয়ে ওঁর বলার পরেই ব'লে উঠ্‌লাম,—'নিশ্চয়ই পারব,—তবে কাজ অনেক বাকী।' খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিমর্ষ-বদনে বলিতে লাগিলেন—"দাশদাকে ছে'ড়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মনে হ'চ্ছিল, দাশদা যখন গাড়ীতে উঠ্‌লেন (দার্জ্জিলিং-এ যাওয়ার জন্য) তখন তাঁকে টে'নে গাড়ী থেকে নামাই……।" সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণ উদাস দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া নতমুখ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদা বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পরেই ত' তিনি তাঁর 'Forward' কাগজে village reconstruction-এর (পল্লীসংস্কারের) scheme (পরিকল্পনা) ছাপিয়ে দিলেন। নাগপুর Congress-এও আপনি তাঁকে যেমন যেমন চল্‌তে ও বল্‌তে ব'লে দি'য়েছিলেন তিনি ঠিক তেমনটিই চ'লেছিলেন। সেখানে মাত্র দু'-ভোটে তিনি মহাত্মাজীর নিকট হে'রে গেলে মহাত্মাজী নাকি ব'লেছিলেন,—'আমারই দেশে এই যে দু'-ভোটে আমার জিত হ'ল, এত' আমার জিত নয়,—এযে আমার হার, দেশবন্ধুরই জয়।' তখন কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"আমার এই মেঠো পাড়াগেঁয়ে কথা সবাই বোঝে না। আমি অশিক্ষিত লোক, ঠিক ঠিক সবটা

বুঝিয়েও বল্‌তে পারি কি না জানি না। কিন্তু দাশদাকে যা'-কিছু বল্‌তাম, আকার-ইঙ্গিতেই তিনি সব বু'ঝে নিতেন এবং তেমন তেমন ঠিক ঠিক চল্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। বল্‌তে কি, দাশদা কয়েকদিনের মধ্যেই আমার ভাষার A, B, C, D যেন মুখস্থ ক'রে ফে'লেছিলেন। আমি যা' বল্‌তে যা' বুঝি, তিনি তা' অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আয়ত্ত ক'রে ফে'লেছিলেন। তিনি যেন শিশুর মত আমার কথাগুলো গিল্‌তেন্।" বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর নীরব হইলেন।

দেশের কত গণ্যমান্য ব্যক্তিকেই নানা সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। কতজনেই তাঁহার আদর্শ ও মতবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বাস্তব কর্ম্মে তাহা প্রতিফলিত করিবার মত তীব্র আগ্রহ ও অটুট আপ্রাণতা কোথায়ও এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। চিত্তরঞ্জনের মস্তিষ্ক ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাঁহার মত এমন একনিষ্ঠ উদ্দাম কর্ম্মী এ অধঃপতিত জাতিতে সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইষ্টপদে বরণ করিয়া অবধি তিনি যেন অকূল সমুদ্রে আশ্রয় লাভ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—কত বল, ভরসা, আশা ও উদ্দীপনায় তাঁহার অন্তরখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্য্যে তাহা মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার অবসর পাইলেন না। কে জানিত তাঁহার জীবন-প্রদীপ তখন নির্ব্বাপিত-প্রায়! কালের কঠোর বিধানে মনের আশা মনে লইয়াই তিনি দেশবাসীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

দশম অধ্যায়

বাধাবিঘ্ন ও বিরুদ্ধাচরণ

শ্রীশ্রীঠাকুর জনমঙ্গল-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন অবধি কত অকৃতজ্ঞ স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া কত সময় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, কত জনে কত মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা ও বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিনিয়ত কত নিন্দা ও অপমান নীরবে সহ্য করিয়া তিনি পারিপার্শ্বিকের হিত-সাধনে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা তৎসম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ কতিপয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বিদ্রোহ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই কাশীপুর গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই অর্থসাহায্য করিয়া তাঁহাকে বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দুই দুই বার চেষ্টা করিয়াও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। দার্শনিক হইবার তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। মনের দুঃখে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া কান্নাকাটি করিলে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে নানরূপ আশ্বাস-বাক্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন এবং বলেন—"ভাবিস্ কেন, তুইও অবশ্যই দার্শনিক হ'তে পার্‌বি।" তখন হইতে সুযোগ পাইলেই কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে আসিতেন এবং তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় জ্ঞানলাভ করিতেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র স্থায়ীভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করিয়া এই ব্যক্তির সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইহার পূর্ব্বে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের পঠদ্দশায় তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত একাসনে বসিতে দেখিয়া হিমাইতপুর গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ একদিন কৃষ্ণচন্দ্রকে পাদুকা-প্রহার করিয়া বিশেষভাবে অপমানিত করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—"তুই মোটেই দুঃখ করিস্ না, চেষ্টা করলে তুইও একদিন ব্রাহ্মণের মত

হ'তে পার্‌বি।" সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরও কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—ইচ্ছা করিয়াই তিনি প্রায়শঃ কৃষ্ণচন্দ্রের অশেষ গুণগ্রামের কথা সকলের কাছে বলিতেন এবং তাঁহার উপর নানা দায়িত্বের ভার অহরহঃ প্রদান করিতেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণ স্বভাবতঃই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহারা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতেন, এমন-কি অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় অত্যল্পকাল মধ্যেই এইরূপ আশাতীত উচ্চপদ লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র নিজ বুদ্ধি এবং ক্ষমতার বলেই ইহা অর্জ্জন করিয়াছেন, এই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতেই ইহার ফলস্বরূপ উপকারীকে অস্বীকার করিবার দুর্বুদ্ধি প্রায়শঃ তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সেই পাপ-প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

১৩২৭ সনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন খুব অসুখ—জ্বর ও কাসিতে ভুগিতেছিলেন। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে কার্সিয়াং লইয়া যাওয়া হইল। তখন হইতেই কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন শিষ্যের নিকট গোপনে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ছয় মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত ভক্তগণ অনেকেই কার্সিয়াং গিয়াছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু কার্সিয়াং না গিয়া গৌহাটী রওনা হইলেন এবং তথায় নিজেকে "সত্যাশ্রয়ী" নামে প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পীড়ার সময় তিনি সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কোনই আশা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধান হইলে তিনিই (কৃষ্ণচন্দ্র) যে তৎস্থলবর্ত্তী হইবেন এই কথাও তখন হইতেই আকার-ইঙ্গিতে অনেকের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিধির বিধান অন্যরূপ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্রের দারিদ্র্য দেখিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক শিষ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ-প্রচার উদ্দেশ্যে একটী প্রেস-স্থাপনের জন্য তাঁহাকে তিন হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এই অর্থদ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর একটী প্রেস খরিদ করিলেন এবং ইহার কার্য্যপরিচালনার ভার কৃষ্ণচন্দ্রের উপর অর্পণ করিয়া লভ্যাংশ দ্বারা তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রেস হইতে অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে সৎসঙ্গের আদর্শ-প্রচারকল্পে একটী পাক্ষিক

পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজের সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত এই প্রেসটী কৃষ্ণচন্দ্রের কাশীপুরস্থ নিজ ভবনেই স্থাপন করা হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থাবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-বর্ণিত হীন কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কেহই তাঁহাকে জানাইতে সাহস করেন নাই। লোক-মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি তাঁহার সহজ অকৃত্রিম স্নেহাধিক্যবশতঃ এ সকল কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করিলেন না; দৈবাৎ কেহ কোনদিন এ সম্পর্কে কথা উঠাইলেও তিনি যারপরনাই ব্যথিত হইতেন। ইহার কিছুকাল পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক·········আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে অবকাশ পাইলেই তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়া সৎসঙ্গে বাস করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলে অধ্যাপক মহাশয় শীঘ্রই 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করিতে পারিবেন, এই বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অধ্যাপক মহাশয় অহরহঃ কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি অগাধশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন।

ইহার বৎসরাধিক কাল পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হন। তাঁহার এই বারের পীড়ার সময়েও কৃষ্ণচন্দ্রের মনে পূর্ব্ব-পোষিত সেই পাপ-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিল। হীন আত্মপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেসটীকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিয়া বসিলেন এবং নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় সৎসঙ্গের পাক্ষিক পত্রিকায় জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করিয়া দিলেন যে, হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমের সঙ্গে তাঁহার প্রেসের কোনই সম্পর্ক নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম বারের অসুখের সময় কৃষ্ণচন্দ্র একাকী ছিলেন, এবার তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা নানাকার্য্য-ব্যপদেশে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় তিনি দুরূহ দার্শনিকতা ও তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া নানা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বের অসুখেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণনাশের কথা ছিল কিন্তু এবার তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত—শ্রীশ্রীঠাকুরের চৈতন্যধারা এখন তাঁহারই (কৃষ্ণচন্দ্রের) দেহের ভিতর নামিয়া আসিয়াছে। এই কথার সমর্থন করিবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের

ভাববাণী হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটী বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করিতেন, যথা—"The medium may not last long, it may not last for more than five years." (মধ্যবর্ত্তী-দেহ দীর্ঘকাল নাও থাকিতে পারে, ইহা পাঁচ বৎসরের বেশী নাও থাকিতে পারে)। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববাণীর কিয়দংশের বিবৃতি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকট এখন তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজেরই কথিত বাণী অনুসারে তাঁ'র দেহত্যাগ সুনিশ্চিত, পাঁচ বৎসর এইবার পূর্ণ হ'তে চ'ল্‌ছে, এবার যদি তিনি রোগমুক্ত হন তবুও তাঁ'রই কথামত তাঁ'র এই দেহের আর কোন মাহাত্ম্য থাক্‌বে না—বরং ইহা বিশ্বে সত্যপ্রচারের পক্ষে ঘোর অন্তরায় হ'য়ে পড়্‌বে, কারণ সাধারণ মানুষ এই দেহকেই 'ঠাকুর' ব'লে ধ'রে আছে; সুতরাং সত্যপ্রচারেব বাধাস্বরূপ তাঁহার এই সাধারণ শরীরটী যে-কেহ নাশ কর্‌তে পার্‌বেন তিনিই জগতে যথার্থ সত্যধর্ম্ম-প্রচারের পরম সহায়ক ব'লে সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা পা'বেন।"

এইরূপ নানা হেঁয়ালী অর্থহীন কথা অহর্নিশ বলিতে বলিতে কৃষ্ণচন্দ্র কয়েক-জনকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাহাদের দ্বারা গোপনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এদিকে ষড়যন্ত্রকারিগণ যখন তাহাদের হীন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়, তখনও তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহমমতা লাভে প্রতিদিন পরিপুষ্ট হইতেছেন।—শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় সহজ চির-অভ্যাসমত কত আদর করিয়া স্নানকালে তাঁহাদের গায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতেছেন, আব্দার করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া একই সঙ্গে আহার করিতেছেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের দৈনন্দিন সকল অভাব-অভিযোগ দূর করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার যত-কিছু কার্য্য যিনি কতকাল যাবত এমনইভাবে সর্ব্বক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারই বুকে ছুরি মারিবার জন্য আজ তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন,—জনৈক ষড়যন্ত্রকারীর মনে ঈদৃশ চিন্তা হঠাৎ উদয় হইয়া তাঁহাকে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিল। তীব্র অনুতাপ-অনলে দগ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া একদিন রাত্রে সেই ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র এ সংবাদ পাওয়ামাত্র সেই রাত্রেই অন্যান্য সহযোগী, মাতা ও ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ভীত ও সন্ত্রস্তচিত্তে পাবনা ত্যাগ করিয়া রংপুর পলায়ন করিলেন। গুপ্ত ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে হত্যা করিবার অভিযোগে পুলিশকর্ত্তৃক

ধৃত হইবার ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার দলের লোকেরা, নিজেদের উক্ত প্রকারে গোপনে হঠাৎ পাবনা-পরিত্যাগের কারণ সমর্থন করিবার জন্য, শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার পার্ষদ অনেকের নামে নানা মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তদবধি ইঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে কত জঘন্য চেষ্টাই যে করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁহারই সযত্ন-পালিত আশ্রিত কর্ত্তৃক নৃশংস কৃতঘ্ন আচরণের এই একটী পর্ব্ব !

কৃষ্ণচন্দ্রের এবম্বিধ দুর্ব্ব্যবহারেও তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনদিন স্নেহ-যত্নের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। নানাভাবে বহুকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রোগাক্রান্ত এবং আর্থিক ও পারিবারিক নানা দুর্দ্দশায় বিপন্ন হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারবর্গের সেবাশুশ্রূষা ও ভরণপোষণের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যাহাতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করিয়া পুনরায় লোক-সমাজে যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইতে পারেন তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আপ্রাণ চেষ্টার এক মুহূর্ত্ত বিরাম ছিল না। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, দীর্ঘকাল নানা উৎকট রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র অকালে পরলোক গমন করেন।

'শনিবারের চিঠি'র অশ্লীল সাহিত্য-প্রচার

দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক নামে এক ব্যক্তি স্ত্রী ও তিন চারিটী পুত্রকন্যা লইয়া একবার সৎসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"আমি একজন সমাজ-সংস্কারক, সমাজ-সেবাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।" সৎসঙ্গে পদার্পণ করিয়াই এই ব্যক্তি প্রত্যহ নিত্য নূতন দাবী উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়ের দুধের অভাব, সিগারেটের জন্য হাত-খরচের পয়সা নাই, চাকরের অভাবে তাহাদের কত কষ্ট—ইত্যাদি নানা প্রয়োজন-উল্লেখে প্রায়শঃ তিনি অর্থ চাহিতেন। কাহারও অসুবিধার কথা শুনিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা পূরণ না করিয়া পারেন না। সৎসঙ্গের নানা কষ্ট ও অভাবের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করিয়া দুই-এক টাকা রোজই তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত সৎসঙ্গের সাধারণ ভোজনাগার 'আনন্দবাজারে' প্রত্যহ দুইবেলা তাঁহার স্ত্রীপুত্র-পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইঁহাদের স্বামী-স্ত্রীতে মোটেই প্রণয় ছিল না; প্রায়শঃ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বামী আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নালিশ করিতেন, স্ত্রীও স্বামীর নামে সর্ব্বদাই নানা অভিযোগ

করিতেন, উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইত। তাঁহাদের ঈদৃশ কুৎসিত আচরণে প্রতিবেশী সকলে ত' অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেনই, শ্রীশ্রীঠাকুরকেও এজন্য দিবারাত্র যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতে হইত। একদিনের ঘটনা আজও বেশ স্মরণ আছে। সেদিন ১৯২৮ সনের ৩০শে এপ্রিল শনিবার, রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা। মল্লিকবাবু স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নালিশ করিতে আসেন ও তাঁহাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া এক তুমুল কাণ্ডের সৃষ্টি করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য কত বুঝাইলেন কিন্তু তিনি কোন কথা শুনিবার পাত্র নহেন। কোনপ্রকারেই তাঁহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর মল্লিকবাবুর পায়ের জুতা দ্বারা নিজের অঙ্গে দুই শতেরও অধিক বার সজোরে আঘাত করিলেন—ইঁহাদের দুষ্কর্ম্মের জন্য নিজেই কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিয়া আপন দেহ ক্ষতবিক্ষত করিলেন।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। লোকপরম্পরায় জানা গেল যে, মল্লিকবাবু হিন্দুর ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি একবার খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইহাতেও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি নাকি অবশেষে মুসলমান ধর্ম্মেও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আরও শুনা গেল, তিনি কুলত্যক্তা এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে মিশনারীদের নিকট হইতে ঐ কন্যার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইবার মল্লিকবাবু আর একটী নূতন দাবী উপস্থিত করিলেন—কলিকাতায় বাড়ী-ভাড়া বাকী পড়ায় সেখানে তাঁহার মালপত্র সব আটক পড়িয়াছে, তাহা ছাড়াইয়া না আনিলে রক্ষা নাই। দারুণ অভাবের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর অতিকষ্টে তাঁহার এই দেনাও পরিশোধ করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে সৎসঙ্গে আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। একদিন মল্লিকবাবু অশ্বিনীবাবুর নিকট বলিলেন—"দেখুন, কয়দিন ধরিয়া আমি অনাহারে আছি। তিন দিন হইল ঠাকুর আমাকে খাবার দিতে 'আনন্দবাজারে' নিষেধ করিয়াছেন এবং আর-সবাইকে বলিয়া দিয়াছেন, কেহ যেন আমাকে কোনপ্রকার সাহায্য না দেয়। আপনি আমাকে কিছু অর্থ দিন, কিন্তু এ বিষয় ঠাকুরকে কিছু বলিবেন না।" এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীবাবু অবাক হইয়া গেলেন। যে কয়দিন তিনি সৎসঙ্গে আছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমপূর্ণ মধুর ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অশ্বিনীবাবুর গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মল্লিকবাবুর উক্তরূপ অভিযোগের কথা শুনিবামাত্র তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন, কারণ মল্লিকবাবু প্রত্যহ 'আনন্দবাজার' হইতে আহার্য্য ত' পাইতেছেনই, অধিকন্তু সেই মাসে তিনি তাঁহার নিকট হইতে অন্যূন ত্রিশ টাকা চাহিয়া লইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বিনীবাবুকে বলিলেন,—"এখনই আপনি মল্লিকবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া আমার সম্মুখে জিজ্ঞাসা করুন দেখি?" মল্লিকবাবুকে ডাকিয়া পাঠান হইল, অসুস্থতার ভাণ করিয়া তিনি আসিতে অস্বীকার করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মল্লিকবাবু তাঁহার স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া হঠাৎ একদিন রাত্রিযোগে গোপনে কোথায় চলিয়া গেলেন, স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলেই সৎসঙ্গে রহিয়া গেল। পরম্পর শুনা গেল, পাবনা সহরে লোকের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ করিয়া অর্থসংগ্রহ করতঃ তিনি কলিকাতা গিয়াছেন। কয়েকদিন পরেই মল্লিকবাবু কলিকাতা হইতে সৎসঙ্গের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট তথাকার শাখা-সৎসঙ্গে থাকিবার অনুমতি চাহিয়া একখানা পত্র লিখিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, মল্লিকবাবু শাখা-সৎসঙ্গেই অবস্থান করতঃ আহারাদি করিতেছেন। তথায় লোকমুখে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মল্লিকবাবু নানাস্থানে সৎসঙ্গের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, তিনি মল্লিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, আপনি কিছু না-ব'লে যে চ'লে এলেন? আপনার স্ত্রীপুত্রাদি সকলে আপনার জন্য উদ্বিগ্ন আছেন।" মল্লিকবাবু বলিলেন,—"আমি আর শীগ্‌গির যাচ্ছি না।" কৃষ্ণদা বলিলেন,—"আপনি যদি না যে'তে পারেন তবে আপনার স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে আসুন। জানেন ত' আমাদের কত অভাব, একবেলামাত্র ভাত জোটে, তাও কত কষ্টে!" মল্লিকবাবু এ সকল কথায় মোটেই কর্ণপাত করিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরেই মল্লিকবাবুর লিখিত একখানা পত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের হস্তগত হইল। এই পত্রে মল্লিকবাবু লিখিয়াছেন—"আমাকে যদি পত্র-পাঠ কিছু টাকা না পাঠান তবে যত পারি আপনার আশ্রমের নামে নিন্দা করিতে থাকিব। আমার পরিবারকে আপনারা আট্‌কাইয়া রাখিয়াছেন, শীঘ্র তাহাকে পাঠাইয়া দিন···।" ইত্যাদি আরও কত কথা। চিঠি পাঠ করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। তখনই আশ্রমবাসী জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে মল্লিকবাবুর পরিবারবর্গকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ভদ্রলোকটি মল্লিকবাবুর লিখিত পত্রের ঠিকানায় তাঁহার স্ত্রীকে রাখিতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, মল্লিক বাবুর নামীয় কোন লোক

তথায় থাকেন না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া তাঁহার ও মল্লিকবাবু উভয়েরই পরিচিত এক বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসেন।

অতঃপর শুনা গেল, কৃষ্ণচন্দ্রদাসের দলভুক্ত সেই অধ্যাপকের সঙ্গে যোগ দিয়া মল্লিকবাবু বিশেষ একটী দল গঠন করিয়া অসীম উৎসাহের সহিত সৎসঙ্গের নামে নানা কুৎসা রটনা করিতেছেন। ব্যাপকভাবে দীর্ঘকাল এই কার্য্য চালাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'শনিবারের চিঠি'র শরণাপন্ন হইলেন। বেশ একটী মণ্ডলী গঠিত হইল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ মল্লিকবাবু এবং অধ্যাপক মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি নিতান্ত জঘন্য মিথ্যা প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করিয়া উপন্যাসচ্ছলে অশ্লীল সাহিত্য প্রচার কবতঃ, সমাজ-সংস্কারের অছিলায়, সৎসঙ্গের অযথা নিন্দা জুড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা এসম্বন্ধে সৎসঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ইন্দ্রিয়পরবশ হীনরুচিসম্পন্ন এক শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট 'শনিবারের চিঠি'র এই সকল অশ্রাব্য আলোচনা খুবই মুখরোচক হইয়া উঠিল। বাংলার সর্ব্বত্র ইহা লইযা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ কুলোক কর্ত্তৃক অসংখ্য অমূলক নিন্দাপ্রচারের ইহাই আর এক দফা!

প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় এই প্রকার অশ্লীল সাহিত্য ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিবার অপরাধে কলিকাতার পুলিশকর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। 'প্রবাসী' প্রেসে পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইত বলিয়া তাহাও খানাতল্লাসী হইয়াছিল এবং অবশেষে সম্পাদক মহাশয় উক্ত অপরাধে রাজদ্বারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

প্রতিবেশীর মিথ্যা অভিযোগ

……মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ীর সন্নিকটেই। বিনা খরচে বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য একবার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার বাড়ীর নিকট দিয়া ইলেক্‌ট্রিক তার চালান হইল এবং ভদ্রলোকটীর বাড়ীতেও আলোর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে অনেক দিন যাইতে লাগিল। একবার ঐ বৈদ্যুতিক তারের উপর উক্ত ভদ্রলোকের জমির দুইটী বাঁশ আসিয়া পড়ায় তড়িৎ-চলাচলের খুবই বাধা হয়। যাহাতে মূল্য লইয়া তিনি বাঁশ দুইটী কাটিবার অনুমতি দেন, তজ্জন্য সৎসঙ্গ হইতে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকটী

এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। উপায়ান্তর না থাকায় কর্ম্মিগণ বাঁশ দুইটার অগ্রভাগের কিয়দংশ কাটিয়া তার চলিবার পথ সুগম করিয়া লন। এই সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকটী তাঁহার কতকগুলি বাধ্য লোকজন ডাকিয়া তারের লাইন কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। তাহারা অনেকটা স্থানের তার কাটিয়া এবং কতকগুলি খুঁটি উঠাইয়া ফেলিয়া বিস্তর অনিষ্ট করে। বহুদিন তড়িৎ-চলাচল বন্ধ থাকায় প্রেসের কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। তখন বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র, 'ওয়ার্কসপ্', 'কেমিক্যাল্ ওয়ার্ক্স্', 'পাওয়ার হাউস্' প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছিল। বাড়ীগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদিগকে লইয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। কিন্তু তড়িৎ-শক্তির অভাবে এই সকল কার্য্যের খুবই বিঘ্ন ঘটিল। এইরূপ নানাভাবে বিপুল অনিষ্ট করিয়াও ভদ্রলোকটী নিরস্ত হইলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় একদিন তিনি আদালতে উপস্থিত হইয়া এই মর্ম্মে অভিযোগ করিলেন যে, সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণ তাঁহার জমি হইতে প্রায় পাঁচ শত বাঁশ কাটিয়া নিয়াছে। আদালতের বিচারে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইল এবং মজুমদার মহাশয় নিজেই মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। এইরূপে বিফলমনোরথ হইয়া এইবার তিনি ঘটনাটীকে নানারূপে অতিরঞ্জিত করতঃ সৎসঙ্গের বিরুদ্ধপক্ষীয় গ্রামস্থ কতিপয় স্বার্থান্ধ পরশ্রীকাতর ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তখন হইতে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে লাঞ্ছিত করা ও কর্ম্মিগণকে নানাভাবে বিধ্বস্ত করাই হইল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

লুঠ-তরাজের অমূলক অপবাদ

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন গ্রামের কয়েকটী ছেলে জমিদার··· ·সাহা চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিনায়কত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয় ও পাবনা কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সম্মুখে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করে। ইহাতে কলেজের একটী ছাত্র প্রতিবাদ কবিতেই জমিদাব-বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রটী রুল দ্বারা ঐ ছাত্রকে প্রহার করে। এ পক্ষের ছাত্রগণ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হওয়ায় তাহাদের সহিত হাতাহাতি হয়। ইহারা রুল কাড়িয়া লইয়া আসে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর তৎক্ষণাৎ সৎসঙ্গের অন্যতম কর্ম্মী ৺ডাক্তার যতীন রায় মহাশয়কে ডাকিয়া ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া উক্ত জমিদার-বাবুকে সমস্ত বিষয় জানাইতে ও তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পাঠাইয়া দেন। জমিদার-

বাবু সকল ঘটনা শুনিয়া যতীনবাবুর নিকট বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বেই ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরদিন হইতেই দেখা গেল যে, গ্রামের কয়েক জন গুণ্ডা ছেলে সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণকে দেখিলেই অকারণ মার-ধর ও গালি দিয়া অত্যাচার করিতেছে। ইতিমধ্যে একদিন জনৈক আশ্রম-কর্ম্মী বাবু বঙ্কিমচন্দ্র রায়, বি-এ পাবনায় কর্য্যোপলক্ষে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে জমিদার-বাবুদের পাড়ার একটি রাস্তার উপর কয়েকটী ছেলে তাঁহাকে নিরর্থক মারপিট করে। এ সংবাদ পাইবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং জমিদার-বাবুর নিকট গমন করেন এবং এরূপ আর না ঘটে তজ্জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে সবিশেষ অনুরোধ করেন। জমিদার-বাবু বলেন যে, গ্রামের ছেলেদের বা বাড়ীর ছেলেদের কাহারও উপর তাঁহার কোনই হাত নাই। এদিকে বঙ্কিমবাবু সৎসঙ্গে না ফিরিয়া বরাবর তাঁহার কার্য্যের জন্য পাবনায়ই চলিয়া যান। সেখানে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, জমিদার-বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার মাতুল মোক্তারের বাসায় তাঁহারই নামে নালিশ রুজু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই অবস্থায় বঙ্কিমবাবুও আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মারপিট করার অভিযোগে দরখাস্ত করেন।

এই ঘটনার পর আরও দুই চারি জন কর্ম্মীকে উহারা মারপিট করে; প্রত্যেকেই থানায় এজাহার দেয়। তৎপর একদিন রাত্রে দশ এগার ঘটিকার সময় দেখা গেল, আশ্রমের এক চালাঘরের মট্‌কায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে প্রতি রাত্রে ঢিল পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রামের অনেকের নিকট শান্তি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেন। অনেকেরই বাড়ী ঘুরিয়া এবং হাতে ধরিয়া বলিয়া কহিয়া গোলমাল মিটাইতে কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। এই সময় আর একটী ঘটনা ঘটে। একদিন গ্রামের একটী ছেলে ও আশ্রমের একটী ছেলে পাবনা কলেজ হইতে বিকালে বাড়ী ফিরিতেছিল। এমন সময় গ্রামবাসী সেই ছেলেরা তাহাদিগকে পথিমধ্যে ধরিয়া বাইসাইকেল হইতে ফেলিয়া দিয়া গুরুতর প্রহার করে। গ্রামের সেই ছেলেটী সৎসঙ্গের সংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু ঘটনার প্রথমাবস্থায় প্রতিবাদ করিবার দরুণ সে প্রহৃত হইয়াছিল। বালকের অভিভাবক (তাহার জ্যেষ্ঠতাত) এই ঘটনার প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে ঐ পক্ষ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করায় তিনি অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হইয়া শান্তিরক্ষার জন্য আদালতে দরখাস্ত করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (যৌবনে)

ইহার পরদিন বেলা নয় দশ ঘটিকার সময় হঠাৎ আশ্রমে সংবাদ আসিল, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আসিয়াছেন, পার্শ্ববর্ত্তী মাঠে তিনি সুশীলবাবু, প্রভাসবাবু ও অবিনাশবাবু—সৎসঙ্গের এই তিন জন কর্ম্মীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র হঠাৎ এই তলবের কারণ বুঝিতে না পারিয়া দ্রুতপদে মাঠ পার হইয়া অগ্রসর হইয়া দূর হইতে দেখিলেন, ভিড় জমিয়া গিয়াছে। কাছে গেলেই, একদল লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওঁরাই আমাদের সব লুঠ করিবার আদেশ দিয়াছেন।" তাঁহারা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের বাড়ীঘর নাকি লুঠ হইয়াছে, এই সংবাদ দিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তাহারা লইয়া আসিয়াছে, আর আশ্রম-কর্ম্মীরাই নাকি সেখানে দাঁড়াইয়া সেই লুঠ করাইয়াছেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ দারোগার হাতে তদন্তের ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। দারোগা গ্রামের জমিদারের রিপোর্ট অনুসারে শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এম্-এ, বি-এল মহাশয়গণকে লুঠ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করতঃ জামিনে খালাস দিলেন।

সৎসঙ্গের এই সকল বিশিষ্ট কর্ম্মিগণ কেন ঈদৃশ জঘন্য কার্য্য করিবেন কেহই ভাবিয়া পাইল না। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় এই বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল—"সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র গ্রেপ্তার—জামিনে খালাস।" বাংলাময় রটিয়া গেল যে শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রেপ্তার হইয়াছেন। দেশময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আমি তখন সৎসঙ্গের প্রচার উপলক্ষে বোম্বে ছিলাম। খবরের কাগজের এই সংবাদ তখন সেখানেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাই হউক্ আমি তৎক্ষণাৎ আশ্রমে টেলিগ্রাম করিয়া সঠিক সংবাদ জানিয়া তথাকার জনসাধারণের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে নিতান্ত দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ জানাইয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তাহা প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন না। যে দেশে সম্পাদকের রুচি এবং দায়িত্ববোধ এবম্প্রকার, সে দুর্ভাগা দেশে কোন সদনুষ্ঠানের সাফল্য-অর্জ্জন যে কত সুদূরপরাহত তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপরোক্ত ঘটনায় পুলিশের তদন্ত চলিতে লাগিল। অবশেষে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিলেন যে, সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণের

বিরুদ্ধে লুঠ-তরাজের অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং তাহা নিতান্ত ষড়যন্ত্র ও ঈর্ষামূলক। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই রিপোর্ট পাইয়া সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণকে মোকদ্দমার দায় হইতে মুক্ত করিয়া দেন; অধিকন্তু এই মিথ্যা অভিযোগ আনিবার জন্য অপর পক্ষ কেন দণ্ডনীয় হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য অভিযোগকারীদিগের উপর আদেশ জারি করেন। অভিযোগকারিগণ অতঃপর অনুতপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক লিখিত আবেদনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন। দেখা গেল, গ্রামে সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম প্রতিবেশীদ্বারাই নির্য্যাতিত হইলেন।

গ্রামের জনৈক জমিদার······সাহা চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং পরে তিনি শিষ্যও হইয়াছিলেন। এক সময় এই ব্যক্তির উপর সৎসঙ্গের কার্য্যাদি পরিচালনা করিবার ভার ছিল। তাঁহার হাত দিয়া যে-সমস্ত টাকাপয়সা খরচ হইত বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তাহার কোন হিসাব-নিকাশ না দেওয়ায়, ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে এই দায়িত্ব উঠাইয়া লইয়া তাহা অন্যের হস্তে অর্পণ করা হয়। তদবধি তিনি নানাপ্রকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যে বাধা জন্মাইবার জন্য লাগিয়া যান এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বারা উপকৃত আরও কয়েক জনের সাহায্যে নানা মিথ্যা নিন্দা-কুৎসা রটনা করিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে তাহা প্রচার করিতে থাকেন। দরিদ্র চাষীদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর যে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহা হইতে তাহাদিগকে কম সুদে টাকা ধার দেওয়া হইতেছে বলিয়া কুশীদজীবী জমীদারগণও ক্ষেপিয়া উঠিয়া এই সকল নিন্দুকের সঙ্গে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। এই সকল হীনস্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ দুষ্টলোকের সমবেত চেষ্টায়ই যে লুঠ-তরাজের এই মিথ্যা অভিযোগ সংঘঠিত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কর্ত্তৃপক্ষ যদি ন্যায় বিচার করিবার সুযোগ না পাইতেন তবে সে যাত্রা এই সকল কুলোকের ষড়যন্ত্রে কর্ম্মিগণকে যে নিরর্থক দণ্ড ভোগ করিতে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।

পারিপার্শ্বিকের হীন আক্রমণ

বৎসর দুই পূর্ব্বের কথা। এইরূপ আর একটী অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল জমি-'একোয়ার' লইয়া। যে জমি কখনও আবাদ হয় নাই কিংবা যাহা এত জঙ্গলা যে কোন কালে কাজে লাগিবে বলিয়াও ধারণা করা যায় না, যাহা বিক্রয় করিতে গেলে ক্রেতা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এমন-সমস্ত জমীর কতক অংশ 'একোয়ার' করিয়া সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি

সাধন করতঃ তদ্দ্বারা গ্রামবাসী তথা দেশবাসীর উপকার করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা চলিয়াছিল। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এই সকল জমি পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—"সৎসঙ্গের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি স্থান অত্যন্ত কদর্য্য এবং খানা, ডোবা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই সকল অস্বাস্থ্যকর স্থানের জন্য সৎসঙ্গ ও নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসী সকলে 'ম্যালেরিয়া', 'টাইফয়েড্' প্রভৃতি নানা রোগে প্রায়শঃ ভুগিয়া থাকে। সৎসঙ্গের কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রসারের জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও অন্যের অধিকৃত এই সকল ডোবা ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অবস্থা উন্নত করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে সুস্থ রাখিবার ব্যবস্থা করা অতি সত্বর একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই আমার মনে হয়।" উপরোক্ত অবস্থায় সৎসঙ্গের জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পঞ্চাশ বিঘা জমি 'একোয়ার' করার নোটিশ প্রচার করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনহিতকর প্রচেষ্টাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বহু দিন হইতে কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক নানাপ্রকার হীন চেষ্টায় কিরূপ লিপ্ত আছে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সৎসঙ্গের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনানুরূপ প্রসার-কল্পে জমি-'একোয়ার'-প্রস্তাবের ব্যাপারটী অবলম্বন করিয়া, সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকের এক দলকে উত্তেজিত করিবার জন্য ঐ সকল ব্যক্তিরা ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে। বোর্ডের ট্যাক্স কমাইবার জন্য চেষ্টা হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে একত্র করতঃ দুইটী সভা হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থানীয় কাশীপুর হাটেও একটি সভা হইয়াছিল। এই সভায় ইউনিয়ন-বোর্ডের ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার অছিলায় উঠিয়া কয়েক জন বক্তা হীন ভাষায় সৎসঙ্গকে নিরর্থক আক্রমণ করিয়া গালাগালি দেয়। পরে সভার কয়েক জন উদ্যোক্তা সৎসঙ্গের জমি-'একোয়ারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভার অতিরঞ্জিত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। তৎপর হিমাইতপুর গোখেল-লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে এই গ্রামে একটী বাজার বসাইবার পরামর্শের জন্য আর একটী সভা আহূত হয়। এই সভায়ও কয়েক জন বক্তা সৎসঙ্গকে লোকের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অকারণে নানাপ্রকার মিথ্যা দোষারোপ করে। ষড়যন্ত্রকারিগণ এই ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিপন্ন করিবার নানা উপায় খুঁজিতে থাকে।

তদবধি তাহারা আশ্রমবাসীদিগকে কখনও ভয় দেখাইত, কখনও তাড়া করিত, কখনও বা কাহারও গৃহে গোপনে আগুন লাগাইয়া দিত। ইতিমধ্যে একদিন দুপুরে দুর্ব্বৃত্তেরা পদ্মার সর্ব্বসাধারণের স্নানের ঘাটে যাইবার সময়, সৎসঙ্গের উচ্চইংরাজী মহিলা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

মুখোপাধ্যায়, বি-এ মহাশয়কে প্রহার করিল। গ্রামের কয়েক জন উত্তেজিত গুণ্ডা আশ্রমের মহিলাগণকেও স্নানের ঘাটে যাইবার সময় পথ-রোধ করিয়া অপমানিত করিতে ছাড়িল না। গ্রামের বহু মুসলমান দিন-মজুর আশ্রমে কাজ করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিয়া থাকে, গুণ্ডারা তাহাদিগকেও দিন-দুপুরে প্রকাশ্য স্থানে ভয় দেখাইয়া আশ্রমে যাইতে নিষেধ করিল। এমনও হইল ইহারা তিন-চারিজনকে দিনের বেলায়ই গুরুতর প্রহার করিল; নানাস্থানে আশ্রমের জমির সীমা-নির্দ্দেশক পাকা স্তম্ভ বেআইনীভাবে ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া দিল। এই সকল চক্রীরা সৎসঙ্গ-পল্লীর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সৃষ্টি করিল। সৎসঙ্গের লোককে পাইলেই ভীষণভাবে প্রহার করিবে, মহিলাগণকে অপমানিত করিবে, আশ্রম লুঠ করিবে—ইত্যাদি নানারূপ ভয় দেখাইয়া গুণ্ডার দল সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সৎসঙ্গবাসীর উপর অত্যাচারের ঘটনা সমূহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সৎসঙ্গের পক্ষীয় গরীব পারিপার্শ্বিক শ্রমিকদিগের কাহারও গরু-বাছুর সীমানার বাহির হইলেই, শস্য খাউক্ বা না খাউক্ খোঁয়ারে পাঠাইয়া তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করা হইল—ইত্যাদি যে সকল বীভৎস ব্যাপার এবং ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল, তাহাতে এক কথায় বলিতে গেলে, সৎসঙ্গ-পল্লীবাসীর ধন-প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া গিয়াছিল। অত্যাচার ও উৎপাত এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই বিংশ শতাব্দীর যুগেও ব্রিটিশ-রাজত্ব যেন মগের মুল্লুকে পরিণত হইয়াছিল। বহুদিন এইভাবে চলিল। তৎপর সৎসঙ্গ-সংশ্লিষ্ট নানা স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চেষ্টায় সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাদের তৎপরতায় অত্যাচার আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই জমি-'একোয়ারের' মামলা সম্পর্কে উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরেই বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় সরজমীনে তদন্তের জন্য আসিয়াছিলেন। বহু গ্রামবাসী এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সঙ্গে লইয়া তিনি স্থানগুলির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া স্বয়ং পরিদর্শন করেন এবং তাহা যে অনতিবিলম্বে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সৎসঙ্গের পক্ষে 'একোয়ার' হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতঃ সৎসঙ্গের অনুকূলে মোকদ্দমাটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন।

গুণ্ডার আকস্মিক উপদ্রব

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন মাননীয় মিঃ এস্, এন্ ব্যানার্জ্জি, আই-সি-এস্ মহোদয় পাবনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সে দিন দোল-পর্ব্ব।

পাবনার কতিপয় গুণ্ডা যুবক সন্ধ্যা-সমাগমে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মোটরবাসে করিয়া সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময় আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই কাশীপুর গ্রামে অনন্ত মহারাজের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ সবেমাত্র ফিরিয়াছেন, অনেকেই ফিরেন নাই; সুতরাং আশ্রমটী তখন পর্য্যন্ত নিতান্ত জন-বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবকাশে গুণ্ডারা তাহাদের স্বকার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে। একটী মেয়ে আশ্রমের সম্মুখে নলকূপ হইতে জল তুলিতেছিল, গুণ্ডারা তাহার গায়ে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে। এই সময় তাহারা বাঁধের ধারে তপোবন বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয়কে পাইয়া বিনা কারণে হঠাৎ অতর্কিতে তাঁহার মাথায় ছোরা দিয়া ভীষণভাবে আঘাত করে; সুখময়বাবু আহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, তাঁহার সেই আঘাত হইতে তীব্র-বেগে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। গুণ্ডারা তখন আশ্রমের অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে খুঁজিতে থাকে। গুণ্ডাদিগকে এইভাবে ছোরা-হস্তে নির্ভীকহৃদয়ে যথাতথা-বিচরণ করিতে দেখিয়া মহিলাদিগের মধ্যে একটা ভয়ানক চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সহসা এই ব্যাপার জননীদেবীর দৃষ্টি-গোচর হয়। জননীদেবীর সেদিনের অদম্য সাহসেব কথা স্মরণ হইলে এখনও শরীরে রোমাঞ্চ হয়। যখন গুণ্ডারা আশ্রমবাসীদিগের প্রাণ লইবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছিল তখন তিনি অকুতোভয়ে দৃপ্তা সিংহিনীর মত অগ্রসর হইয়া দলের অগ্রবর্ত্তী যুবকদিগের যাহারই হাতে ছোরা দেখিলেন বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। জননীদেবীর সে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে গুণ্ডাদের কাহারও সাহসে কুলাইল না। ইতিমধ্যে দেখিতে দেখিতে সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গনও জন-কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। সকলে পলায়মান দুর্ব্বৃত্তগণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন—একটী যুবক ধৃত হইল এবং অন্যান্য সকলে সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনায় পুলিশের জোর তদন্ত চলিতে লাগিল। ক্রমে এই ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীই একে একে ধৃত হইল। দেখা গেল ইহারা অনেকেই স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাহারও পুত্র, কাহারও ভ্রাতুষ্পুত্র, কাহারও বা ভাগিনেয় প্রভৃতি অতি নিকটতম আত্মীয়। সরকারপক্ষ দুর্ব্বৃত্তদিগের সমুচিত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাদের মুক্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"মানুষ একবার দোষ করলেই চিরকালের জন্য প'চে যায় না। এ-যাত্রা তা'দিগকে ক্ষমা করলে তা'দের অন্তরে অনুশোচনা আসবে এবং

আত্মসম্মানবোধ জে'গে উঠ্‌বে, কিন্তু শাসন কর্‌লে হিংসা, কাম ও ক্রোধ-প্রবৃত্তি শতগুণ বৃদ্ধি পা'বে।" সরকারপক্ষ আসামীদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে স্বয়ং সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়া সম্মত করতঃ অপরাধী যুবকদিগের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

চিত্রকর সত্যচরণ ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতা

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ নামে জনৈক চিত্রশিল্পী গত ১৯২৫ সনে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে দীক্ষাগ্রহণান্তর সৎসঙ্গের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া সস্ত্রীক আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে সৎসঙ্গের কলাকেন্দ্রের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৯২৭ সাল হইতে সত্যচরণ এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র চিত্রশিল্পী হিসাবে তথায় কার্য্য করিতে থাকেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাজি তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী ও তাঁহারই প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যে চিত্রে পরিস্ফুট করিতে থাকেন। বলাবাহুল্য অন্যান্য কর্ম্মীদের মত, সত্যচরণেরও সংসার-পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়াদি শ্রীশ্রীঠাকুরই স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন অবস্থার নানাপ্রকার ফটো এই চিত্রশালায় তৈয়ার করিয়া ভারতের নানা প্রদেশবাসী শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট বিক্রয় করা হইত। ইহাতে এই বিভাগে প্রতি বৎসর বহু টাকা আয় হইত, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো সহস্র সহস্র শিষ্যগণ প্রত্যেকেই দুই-চারিখানা করিয়া কিনিয়াই থাকেন, কেহ কেহ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া মূল্যবান ছবিও অঙ্কিত করাইয়া থাকেন। সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের প্রস্তুত এই সকল চিত্র ও ফটো প্রভৃতির বিক্রয়লব্ধ অনেক অর্থ বহুকাল যাবত উক্ত চিত্রকর মহাশয়ের হাতে আসে। কলাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ হিসাবে এই সকল অর্থ তাঁহার নিকটই জমা থাকিত। বিশেষ দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, প্রভূত টাকাপয়সা পাইয়া সত্যচরণের মনে হীনস্বার্থমূলক নানা দুরভিসন্ধির উদয় হইল এবং এই অর্থ কি ভাবে আত্মসাৎ করিবেন তাঁহার পাপ মন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদিগকে সন্তানাধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, সত্যচরণকেও তিনি যাবপরনাই যত্ন করিতেন এবং নিতান্ত আপন জন বলিয়া মনে করিতেন। সত্যচরণ তাঁহারই দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কার্য্য করিয়া অন্যান্য কর্ম্মীর ন্যায় সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, ইহাই সকলের অন্তরের বিশ্বাস ছিল। কালক্রমে সত্যচরণের হীন পাপ-প্রবৃত্তি সাধারণের নিকট ধরা পড়িল। জানা গেল,

'সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্র' নামের পরিবর্তে 'অমরাপুরী কলানিলয়' নামে 'ক্যাস্ মেমো' ছাপাইয়া সত্যচরণ সৎসঙ্গের চিত্রগুলি গোপনে বিক্রয় করিতেছেন। এই ব্যাপারের বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, সত্যচরণ নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের মত সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের যাবতীয় ছবি নিঃসঙ্কোচে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিলেন এবং থানায় সংবাদ দিয়া পুলিশের সাহায্য লইয়া জোর করিয়া সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিত্রকর এইবার গ্রামবাসী আশ্রমের বিরুদ্ধপক্ষীয় দলের সঙ্গে মিশিয়া সংবাদ পত্রের সাহায্যে ও লোকমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে নানা মিথ্যা কুৎসিৎ অপবাদ রটাইতে লাগিলেন এবং সৎসঙ্গের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকটী ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিয়া এক বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে সৎসঙ্গের সুনাম নষ্ট করিবার জন্য সত্যচরণ গ্রামস্থ কুটিল ও পরশ্রীকাতর লোকদের সহিত মিশিয়া কতভাবে কত হীন চেষ্টাই যে করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া, দরিদ্র সৎসঙ্গের বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া এবং সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্রের অসংখ্য ছবি লইয়া গিয়া সত্যচরণ সৎসঙ্গের যে ভীষণ ক্ষতি করিয়াছেন তাহা কোনকালেই পূর্ণ হইবার নহে। এত অন্যায় করিয়াও সত্যচরণ যখন স্ত্রী-পুত্র লইয়া সৎসঙ্গ হইতে চলিয়া যান, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, সত্যচরণকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া —"ওরে আমার কত বৎসরের পালিত পুত্র, ওরে আমার মাণিক, ওরে আমার আদরের দুলাল নয়ন-পুত্তলি, তুই আমায় ফে'লে কোথায় যা'বি—", ইত্যাদি কত কথা বলিয়া বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়াছিলেন, সে কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। কিন্তু সত্যচরণ নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত সমুদয় উপেক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যচরণ সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও কর্ম্মীদিগকে অকারণে দীর্ঘকাল নানা প্রকারে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বহু টাকা সৎসঙ্গের প্রাপ্য বলিয়া 'ডিক্রী' হইয়াছে।

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনমঙ্গল-কার্য্যে বাধা জন্মাইতে, এইরূপ কতজনে কত হীন চেষ্টা প্রতিনিয়ত করিতেছে, তাহার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে, আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। কিরূপ প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি গড়িয়া যাইতেছেন এবং এজন্য তাঁহাকে প্রতিপদে কত লোকনিন্দা, অপবাদ ও অত্যাচারের পাহাড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি।

দেশের ও দশের মঙ্গলকার্য্যে যাঁহারাই আত্মনিয়োগ করেন নির্য্যাতন-ভোগ তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমময় উদার ব্যবহারের সহিত পারিপার্শ্বিক জনসাধারণের মিল হইল না। তাহারা চাহিল বৃত্তি-স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে, অন্যের অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিতে, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর চাহিলেন পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেককে পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় আপ্রাণ করিয়া তুলিতে। গ্রামের জমিদারগণ মনে করিলেন তাঁহাদের প্রতিপত্তির হানি হইতেছে, স্বার্থপর প্রতিবেশী দেখিল তাহার হীন স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে—তাই চারিদিক হইতে বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ অহংসেবী জনগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর বিরুদ্ধাচরণের নানা অভিনয় প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি সমানভাবে চলিতেছে। নিন্দুকেরা নানা অমূলক অপবাদ প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে বিদ্বেষ-ভাব সৃষ্টি করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিযাছে, কিন্তু অনেকের নিকটেই তাহাদের এই হীন চেষ্টা এখন ধরা পড়িয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি উল্লেখ করিতেছি। যথা :—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ, এম্-আর-এ-এস্ মহোদয় লিখিতেছেন—"সৎসঙ্গ আশ্রম দেখিয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এরূপ আশ্রম দেশে যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। আমি পাবনা আসিয়া বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু অনেকের মুখেই এই আশ্রমের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুনিয়াছি। বাস্তবিক আমি স্বচক্ষে ইহার কার্য্যতা দর্শন করিয়া আমার যে ধারণা পাবনায় আসিয়া হইয়াছিল তাহা বিলুপ্ত হইল। ইহাকে সৎসঙ্গ-আশ্রম নাম না দিয়া যদি ঋষি-আশ্রম নাম দেওয়া হইত তবে যেন আরো ভাল মনে করিতাম। এই আদর্শে স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি আশ্রম হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। অনেকগুলি উচ্চশিক্ষিত লোক ইহার উন্নতি-কল্পে এখানে বাস করিতেছেন—ইঁহারা অনেকেই সপরিবারে বাস করিতেছেন। পাবনা আসিয়া আর একটী কথা শুনিয়াছিলাম যে, মহাত্মা অনুকূল ঠাকুর অনেককে সম্মোহন-বিদ্যায় বশীভূত করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করেন, আমাকেও সেরূপ করিবেন বলিয়া তাঁহারা আমাকে ভয় দেখান।

কিন্তু ঠাকুরকে দেখিয়া সেরূপ মনে হইল না, বরং আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখীই হইয়াছি। তাঁহার সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া আনন্দ হইল। যদি তাঁহাকে গেরুয়া-বস্ত্রে শোভিত দেখিতাম তবে বোধ হয় আমার অন্য ধারণাও হইত। ভিক্ষার দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি করিতেছেন। আশাকরি পুনরায় আসিয়া ইহার আরো উন্নতি দেখিতে পাইব। আমি এতটা মুগ্ধ হইয়াছি যে, আমার একটী পুত্রকেও এই আশ্রমে শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিব মনস্থ রহিল। এখানে বিলাসিতা বা তাহার ভাব পর্য্যন্ত নাই। এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের বিলাসের চিহ্নমাত্রও দেখিলাম না।

স্থানীয় পাবনার লোকেরা অনেকেই কেন যে এই আশ্রমের বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করেন তাহা বুঝিলাম না। তবে ইহা হিংসাবুদ্ধি ছাড়া কি হইতে পারে? আর একটী কথা শুনিয়াছিলাম যে, এই আশ্রমে একটী বিবাহিতা বালিকার পুনরায় বিবাহ হইয়াছে। সেই বালিকার পিতার সঙ্গেও আমার দেখা হইলে, ইহা যে কেবল হিংসাবুদ্ধিগত তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। যাহারা পাবনায় আসিয়া এই আশ্রমের বিরুদ্ধে কথা শুনিবেন তাঁহারা এই আশ্রমটী স্বচক্ষে দেখিয়া নিজেদের কাণ পাতলা করিতে পারিবেন।"

স্বনামধন্যা সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপাদেবী মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—

"সৎসঙ্গ-আশ্রমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া মন খুবই ইহার স্বপক্ষে ছিল না, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অন্যত্র এরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেরূপ মনোভাব হয় এবারে কেনই যে তেমন হয় নাই তাহাই একটু বিস্ময়ের বিষয়! মনে হয়, দোষারোপটা এতই অদ্ভুত ভাবের যে তাহাতে কোন স্থিরমস্তিষ্ক লোকে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। তারপর মনে হইল খুনী আসামীরও যখন স্বপক্ষ-সমর্থনের পথ আছে, তখন এঁরাই বা কি বলেন তাহা বলিতে দিবার সুযোগ এঁদেরও দেওয়া সঙ্গত। নিজেই গিয়া সত্যানুসন্ধান করিব। যাই হউক, এখানে আসিয়া এমন তৃপ্ত ও এমন নিশ্চিত হইয়াছি, এমন আনন্দলাভ করিয়াছি এবং তার সঙ্গে আমার দেশের লোকের (অন্য একটী দলের) এই হীন ঈর্ষাপ্রসূত সঙ্কীর্ণতার পরিচয়ে এতই মর্ম্মাহত হইয়াছি তাহা বলিতে পারিব না।"

একাদশ অধ্যায়

সমস্যা-সমাধানে মতবাদ

জগতে নানা সমস্যা উঠিয়াছে—ব্রাহ্মণের সমস্যা, ক্ষত্রিয়ের সমস্যা, বৈশ্যের সমস্যা, শূদ্রের সমস্যা,—আবার শিক্ষার সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা, ব্যক্তিত্বের সমস্যা, সমাজের সমস্যা, নারীর সমস্যা, রাষ্ট্রের সমস্যা, ধর্ম্মের সমস্যা ইত্যাদি। এ সমস্যার মহাসমুদ্রে পড়িয়া দিক্‌ভ্রান্ত সকলে হাবুডুবু খাইতেছে। আজ বাংলার এই নিভৃত পল্লীর ক্রোড়েও বিশ্বমানবের সমস্ত সমস্যার ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব না করিয়া পারিতেছেন না। দেশের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জাতীয় জীবন-ধারার অনুকূল করিয়া তিনি এই সকল মহা সমস্যার যে সহজ সরল মীমাংসা-বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব। নানা সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির বলে যে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ অভ্রান্ত অমূল্য বাণীসমূহ দান করিয়াছেন, তাহার সহস্রাংশের একাংশও এখানে প্রকাশ করিবার স্থান নাই। সুতরাং আমরা মানব-সাধারণের কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ-জ্ঞাতব্য বিষয়ে তৎপ্রদত্ত বাণীর কিয়দংশমাত্র উপস্থিত করতঃ তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি।*

স্বাস্থ্য

"যে চেতনা বহু পরিবর্ত্তনকে ভেদ করিয়া অপরিবর্ত্তিত ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত স্মৃতিকে বহন করিয়া বোধ ও বিবেচনাকে লইয়া চলিতে থাকে, আমি মনে করি, এক কথায় ইহাকেই আমরা আয়ু বলিয়া থাকি। তাই এই আয়ুকে অক্ষুণ্ণ ও অকাট্য রাখিতে হইলে শারীরিক বিধানগুলি যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে—পোষণ ও রক্ষণদ্বারা তাহাই করণীয়। দেখা যায় এই বিধানগুলির অসুস্থতা আসে প্রধানতঃ মানসিক অস্বস্থতা, কর্ম্ম ও আচরণের অস্বস্থতা, আহার্য্য ও পরিপোষণের অস্বস্থতা, চলন ও চেষ্টার অস্বস্থতা হইতে। তা'হ'লেই, আমরা সাধারণতঃ যদি এইগুলির প্রতি একটু নজর

* পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গ্রন্থরাজির পরিচয় প্রদান কালে ... কূরের কথিত আরও কতকগুলি মীমাংসা-বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

রাখিয়া চলিতে পারি—যাহাতে বিধানগুলির স্বস্থতা বিকৃতি-প্রাপ্ত না হয়, তা'হ'লেই জীবনকে অনেকাংশেই দীর্ঘ করিয়া তুলিতে পারি। ধর্ম্মনীতি মানুষকে ইহাই নানা রকমে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া কত ধরণ ও কত ভঙ্গীতে কহিয়া আসিতেছে। তাই গীতায় আছে—'যাহাদের আহার, বিহার, চেষ্টা, কর্ম্ম, স্বপ্ন, জাগরণ ইত্যাদি উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত, যোগ তাহাদের সমস্ত দুঃখকে হনন করে।' আর এই যোগ মানে হ'চ্ছে কিন্তু ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা ও ইষ্টানুরক্তি।

"স্বাস্থ্য-রক্ষার সহজ উপায়—এমন-কোন অবস্থায় না পড়া যাহাতে প্রাণন-ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ঘটে, যেমন অবৈধ আহার—যাহাতে পরিপাকের অবসন্নতা ঘটিয়া পোষণের অভাব ঘটে; নিয়মিত নিঃস্রাব—যেমন প্রস্রাব, বাহ্য, ঘর্ম্ম, লালা, শুক্র ইত্যাদির যথাযোগ্য নিস্রাবণ, যাহাতে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্যগুলি নিঃসৃত হইয়া গিয়া শারীরিক ধ্বংস না ঘটায়; যথোপযুক্ত চেষ্টা ও চলন—অর্থাৎ চেষ্টা ও চলনকে এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে মস্তিষ্ক, মাংসপেশী ও যন্ত্রাদির কোনরূপ অন্যায় অবসন্নতা না ঘটে; আর সর্ব্বোপরি ইষ্ট বা ভগবদনুরক্তি, যাহার দরুণ পারিপার্শ্বিকের আকর্ষণে চেতনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া সত্তাকে নিঃশেষ করিয়া না ফেলে। এই জন্যই শাস্ত্রে মাতা পিতা বা গুরুতে অনুরক্তির সাধুবাদ এত বিশেষভাবে রহিয়াছে—এমন কি, বৈদ্যশাস্ত্রে ইষ্টানুরক্তি না-থাকা একটা অরিষ্ট বা মৃত্যুর লক্ষণের ভিতর গণ্য করা হইয়াছে। মনকে যতই ইষ্ট ও উন্নতিতে উৎফুল্ল রাখা যায় ততই সেবাপরায়ণ, কর্ম্মপটু, উদ্বুদ্ধ, আশাবাদী হইয়া আয়ুকে বৃদ্ধির সহিত উপভোগ করা যাইবে। আর ইহা ছাড়া যে সমস্ত আহার, বিহার ও চাল-চলনে জীবনী-শক্তি উৎফুল্ল ও উদ্বোধিত হয় সেইগুলিই ধর্ম্মপ্রদ ও জীবনীয়। এক কথায় এই দাঁড়াচ্ছে, অটুট বাস্তব ইষ্টপ্রাণতার সহিত যুক্ত চাল-চলন ও যোগ্যা স্ত্রীর যথাযোগ্য আমন্ত্রণ ভিন্ন স্বয়ং কামবশ না হওয়া হইলেই প্রাণন-শক্তির অপলাপ না হইয়া আয়ুকে সাধারণতঃ দীর্ঘই করিয়া তোলে।

"স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে প্রথমেই চাই পারিবারিক শান্তির ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে প্রধান ও প্রকৃষ্ট শিক্ষক যদি নিজ নিজ পরিবারই হয়, ত' তা'র চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? বাসগৃহাদি যথোপযুক্ত আলো ও বায়ু চলাচলের মতন হয়, জল তৃপ্তিদায়ক, পুষ্টিপ্রদ ও রোগনাশক যাহাতে হয়, তাহার দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেককে যা'তে উন্নতিমুখর উৎফুল্লতাকে চারিয়ে দিতে পারে এমন একটা সহজ চলন ও বলন প্রত্যেকের ভিতর বজায় থাকে, তা'র দিকে একটা পারিবারিক সমবেত নজর থাকা নেহাৎ নিতান্তই বাঞ্ছনীয়, কারণ

হতাশ্বাস এবং অবসাদ হইতেই সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে সুরু করে, অনাচার ও অনিয়ম তাহাকে আরও তীব্র করিয়া তোলে। প্রত্যেকেরই বিশেষতঃ প্রত্যেক মেয়েদেরই বিশেষভাবে জানা থাকা উচিত কি অবস্থায় কেমনতর আহার, শুশ্রূষা ও সেবার প্রয়োজন। শিক্ষার বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার দিক দিয়া এটা নেহাৎই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, আমি ইহাই মনে করি, কারণ পোষণোপযুক্ত সহজপাচ্য বলপ্রদ আহারই জীবনকে ক্রমাগতি যোগাইতে থাকে,—আর ইহারই অভাবে শারীরিক প্রত্যেক বিধানেরই আয়ুর গতি বিকৃত ও মন্দ হইয়া উঠে।

"তার পর চাই প্রত্যেকেরই তা'ব পারিপার্শ্বিকের যথোপযুক্ত সেবা ও সম্বর্দ্ধনা এবং তাহা হইতে পুষ্টির আহরণ—এ পুষ্টি কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক দু'য়েরই, আর ইহা করিতে গেলেই সম্যক ও উপযুক্ত চেষ্টা ও চলনের প্রয়োজন। এই চেষ্টা ও চলনকে এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—ইহা হইতে পরিশ্রম-জনিত যে অবসাদ আসে তাহা শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকেই আমন্ত্রণ করে। এগুলি উপযুক্তভাবে ঘটাইতে না পারিলেই শুধু শারীরিক উন্নতির জন্য কিছু কিছু ব্যায়ামেরও প্রয়োজন।

"তার পর আর একটা জিনিষ হ'চ্ছে উপযুক্ত বিবাহ। যে বিবাহে মানুষের বৃত্তিগুলি তুষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উন্নত-প্রগতিপরায়ণ হয় সাধারণতঃ তাহাই প্রাণদ এবং সর্ব্বপ্রকারে উন্নতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। তাই বিবাহের প্রতি বিশেষ নজর রাখিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত মনে করি।

"আহার্য্য আমাদের এমন হওয়া উচিত, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষে যা' তৃপ্তিজনক, সহজপথ্য, বল ও পুষ্টিপ্রদ ও রোগনিবারক। আমিষ আহার সাধারণ ও সহজ খাদ্য হইতে পারে না। যে-কোন রকম আমিষ আহারই পরিপাক বিধানে যাইয়া এমনতর অল্পবিস্তর বিষের সৃষ্টি করে যাহা সমস্ত বিধানকে কিছু-না-কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করেই—বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষীয় আবহাওয়ায় তো ইহা সমধিকই হইয়া থাকে। যাঁহারা আমিষাহার করেন, তাঁ'দের পক্ষে ইহার বিষকে সহজে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে এমনতর কিছু আহার না করিলে অল্পে-সাবাড়ের আমন্ত্রণের হাত এড়ান সম্ভব কিনা বুঝিতে পারি না। তাই আমি বলি, মানুষের সাধারণতঃ নিরামিষাশী হওয়াই ঠিক। নিরামিষাহার বিধানে যে উপদ্রব সৃষ্টি করে তাহা শারীরিক কোষগুলির পক্ষে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। তাই নিরামিষাহার কোষগুলির পক্ষে প্রায় নিরুপদ্রব আহার বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই নিরামিষাহারেও শারীরিক অবস্থাভেদে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরো আমার মনে হয় অতি পূর্ব্বকালে কোনও দেশে

কোথায়ও আর্য্যেরা আমিষাহারী হইয়া থাকিলেও সেই আমিষাহারই বেশ করিয়া সেই আর্য্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে, নিরামিষাহার মানুষের পক্ষে কত জীবনীয়, কত প্রাণদ। তাই তাঁহারা নিরামিষাহারকে তাঁ'দেরই প্রণীত শাস্ত্রে অত করিয়া সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তাই আয়ুকে যদি বিশেষভাবে নিরুপদ্রবই করিতে হয় তবে নিরামিষাহারই শ্রেষ্ঠ।

"মাছ মাংসকে আমি মানুষের range of life shorten (আয়ুষ্কালকে খর্ব্ব) করে বলিয়া মনে করি, কারণ ইহা system-এর (শরীরবিধানের) ভিতর এত বেশী toxin (এক প্রকার বিষ) liberate করে (ছেড়ে দেয়) যা'তে নাকি কোষগুলি whipped (তাড়িত) হইয়া নিজের existence (স্থিতি) কে রক্ষা করিবার জন্য অল্প সময়ের ভিতর অনেক বেশী division-এ (বিভাগে) পর্য্যবসিত হয়—তাহাতে সেই cell (কোষ) গুলির যে time-এ (সময়ে) তাহাদের ঐরকম পরিণতি সংঘটিত হইত তাহার অনেক পূর্ব্বেই সেই রকম ঘটিয়া থাকে। মনে করুন বিশ বছরে যাহা হইত পাঁচ বছরেই তাহা সংঘটিত হয়। তা'র মানে বিশ বৎসরের আয়ু পাঁচ বৎসরে কমাইয়া আনে—আর nerve (স্নায়ু) গুলিও কেমনতর irregular (অনিয়ন্ত্রিত), irrhythmic (ছন্দহীন) হইয়া দাঁড়ায় এবং correct (যথার্থ) sensation (বোধ)ও carry (বহন) করে না। তাই আমি সব সময় ব'লে থাকি আপনারা normally (স্বাভাবিকভাবে) vegetarian (নিরামিষাশী) থাকুন।

"মাছ মাংস খে'লে আমাদের পেটের পাকরসে পীড়িত হ'য়ে এক রকম বিষ ছে'ড়ে দেয়, তা'র ফলে আমাদের বিধানের জীবকোষগুলি—ঘোড়াকে চাবুক্ মারলে যেমন ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে, তেমনতর রকমেই ছট্‌ফটিয়ে বিব্রত হ'য়ে উঠে—আবার অনেক কোষগুলি ম'রেও যায়;—আর সেই জন্যে তা'রা তাড়াতাড়ি নিজের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে—সামাল হ'তে ওদের আক্রমণ থেকে। সেই জন্য মাছ মাংস খে'লে আপাততঃ দেখা যায়, হয়তো শরীরটা একটু পুষ্টিলাভই করছে। কিন্তু যে পুষ্টি আমাদের বৈধানিক কোষগুলি স্বাভাবিক চলনে চলতে চলতে যতদিন চলতে পারতো তা'কেই খরচ ক'রে—তা'তে তা'র ফলে আমাদের জীবন-পরিধির খর্ব্বতাই ঘ'টে থাকে। আর ঐ আহার্য্যে আমাদের বিধানে ঐ রকম চাব্‌কানির সঞ্চালন করে ব'লেই আমাদের স্নায়ুগুলিতে এক রকম উত্তেজনা ও অবসাদ প্রায়শঃই লে'গে থাকে। আবার এই অবসাদের অবস্থা আসতেই ইচ্ছা করে আবার খাই। কারণ, না খে'লে তো আর ঐ উত্তেজনা—যা'তে নাকি চম্ চম্ ক'রে চলতে পারি—তা' আর ঘ'টে উঠে না—তাই ঐ রকম ঝোঁকের

সৃষ্টি হয় আর ঐ ঝোঁকের খাতিরেই ঐ আহার্য্যের কত রকম এৎফাঁক সংগ্রহ কর্‌তে থাকে।

"আবার ঐ উত্তেজনার ফলেই আমাদের স্বভাবও অনেকটা অমনতর চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—আর ওতেই লোকে বলে, মাছ মাংস আহার কর্‌লে রজোগুণী হয়। রজোগুণের প্রধান গুণই হ'চ্ছে কঠোর অনুরাগ বা আসক্তি—যা' নাকি কিছুতেই দমিত হ'তে চায় না। আর তা'রই ফলে সে এত দক্ষ ও ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও অবিশ্রান্ত হ'য়ে উঠে—এই হ'চ্ছে রজোগুণের আসল যা'—তা'ই। মাছ মাংসের রজোগুণ কিন্তু স্নায়ু ও মস্তিষ্ককোষের দুর্ব্বলতা থেকেই হ'য়ে ওঠে—তা'র সম্মুখে যা'ই কিছু আসুক, দুর্ব্বলতা-হেতু তা'তেই অতি সত্বরেই রঙিয়ে ওঠে; আর এই রঙিয়ে উঠার দরুণ চলনও তেমনতর হয়। নিরবচ্ছিন্ন লে'গে-থাকা—নিরবচ্ছিন্ন আসক্তি বা অনুরাগ—যা' নাকি প্রকৃত রজোগুণের আসল প্রাণ-প্রকৃতি তা' কিন্তু আমিষাহারী রজোগুণে কিছুতেই হ'য়ে ওঠে না। সে ক্রমাগত কিছুতেই লে'গে থাক্‌তে পারে না। তা'র করার অভিযান কাটা-কাটা—প্রত্যেক কিছু করার পরেই অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। তখন আবার তা'কে চে'তিয়ে তুল্‌তে—আবার ঐ রকম বা তা'র চাইতেও উত্তেজিত কর্‌তে পারে—এমন আহারের নিতান্তই প্রয়োজন।

"আমিষাহারী যে যত বড়ই হোক্ না কেন, এ চরিত্র তা'র কিছু না কিছু থাক্‌বেই। কিন্তু উপযুক্ত নিরামিষাহারীদের ও সব কিছু নেই কো। আহার্য্য তা'দের পেটের পাকরসে নিপীড়িত হ'য়ে কমই বিষ সৃষ্টি করে—আর, যা' করে, তা' বৈধানিক কোষের পক্ষে অতীব তুচ্ছকরই। আর সেই জন্য বৈধানিক কোষেও তা' হ'তে সহজ ভাবেই পুষ্টি পায়; আর আমিষ আহার্য্যের মতন অমনতর চাব্‌কানি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে না ব'লে স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অমনতর নিয়ত উত্তেজনা-অবসাদ-পরায়ণও হয় না। তাই তা'দের স্বভাবও প্রায়শঃ ঐ আমিষাহারীদের মতন রজোগুণসম্পন্ন নয়কো। তা'দের সব বিষয়েই অল্পই হোক আর বিস্তরই হোক, কেমনতর একটা লাগোয়াভাব থেকেই যায়।

"আবার অমনতর কোন বিষয়ে তা'রা অতি সহজে অনুরঞ্জিতও হ'তে চায় না। এই দে'খেও অনেকে ব'লে থাকেন—নিরামিষ খে'য়ে ওদের মাথা এমনতর বোকা বা ঢিলে হ'য়ে গেছে, তাই ওরা সহজে কিছু নিতেও চায় না, বুঝ্‌তেও চায় না। ব্যাপার কিন্তু তা' নয়কো। তা'দের ভিতর একটা নিরপেক্ষ ভাব, স্বচ্ছ ভাব সহজতঃ লেগে থাকে ব'লেই অমনতর হ'য়ে থাকে—তা'রা, যাই কিছু আসুক, ঐ অমনতর থাকার দরুণ, সমস্ত জিনিষটার

অদ্ধি সদ্ধি দে'খে, ভে'বে, বু'ঝে, তবে তা'তে রঙিন হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। আর ঐ রকমে কোন কিছুতে তা'রা রঙিন হ'য়ে ওঠে ব'লেই সে রং তা'দের সহজে ছু'টে যায় না—লাগোয়া চলনেই চল্‌তে থাকে। এ সবই ঘটে কিন্তু তা'দের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষের সহজ স্থৈর্য্য হেতুই। আর ঐ বৈধানিক কোষগুলি নিয়ত অমনতর বেতাল প্রবৃত্তিতে চম্‌কে থাকে না ব'লেই তাহাদের জীবন-পরিধিও অটুট থাকে তো বটেই—তা' ছাড়া আরোতে যে বে'ড়ে ওঠে না—তা' নয়কো—বে'ড়েও যে'য়ে থাকে। জীবনের চলনা যদি তাঁ'দের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিকূল না হয় তাই লোকে ব'লে থাকে—সত্ত্বগুণী হ'তে হ'লেই নিরামিষ আহারই শ্রেষ্ঠ। তাই শুনতে পাওয়া যায়, আমিষাহারী মনীষীরা অনেক সময়, নিরবচ্ছিন্ন লাগোয়া থাকতে হয় এমনতর কাজের বেলায় নিরামিষ আহারকেই তা'র অনুকূল ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন। এই তো হ'চ্ছে আমিষ নিরামিষ আহারের চুম্বক তাৎপর্য্য।

"আর পচা, বাসি, বিষ-উদ্গারী, কটু, ঝাল, অত্যন্ত উত্তেজক আহার্য্যকে তমোগুণী ব'লে থাকে এই জন্যই—কারণ সেগুলি স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত ক'রে অলস, অবশ কর্‌তে কর্‌তে জীবনকে খতমের দিকে টেনে নিয়ে যায়—তাই সেগুলিকে তমোগুণী আহার ব'লে থাকে।

"তাই সাত্ত্বিকাহারই আমার মতে—আমার মতে কেন—যাঁ'রা জানেন বা ভুক্তভোগী প্রত্যেকেরই মতে জীবন ও বৃদ্ধিদ, সবার পক্ষেই ইহা সমীচীন—এমন কি প্রকৃত রজোগুণী হ'তে হ'লেও। তবে বিশেষ অবস্থায়—যেমন রোগে বা তেমনতর কিছু, যা'তে নাকি ঐ রকম চাবকানি-সঞ্চারণই তখনকার পক্ষে জীবনকে বাঁচায় চালিত কর্‌তে পারে, ঔষধের মতন তাই তখনই প্রযোজ্য।

"পেঁয়াজ, রসুন এই দুইটী আমিষ জাতীয় খাদ্য। ইহারা বৈধানিক কোষগুলিকে বেতিয়ে এমনতর একটা অসংবদ্ধ দহনশীল চঞ্চল উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যার ফলে স্নায়ুকোষগুলি বিধ্বস্ত ও অবসাদ-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—ফলে স্নায়ু-কোষগুলি তা'র পারিপার্শ্বিকের সাড়া স্বাভাবিক ভাবে নিতে না পে'রে একটা বোধ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। একটু নজর কর্‌লেই বেশ দেখ্‌তে পাবেন যা'রা আহার্য্য মাত্রায় বা অধিক মাত্রায় পেঁয়াজ রসুন ক্রমাগত ব্যবহার করে তা'দের মস্তিষ্কের বোধ-উদ্দীপনা এত কম ও বিশৃঙ্খল, যা'র ফলে স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান এতখানি অবনত হ'তে দেখা যায়—দুনিয়ায় তা'দের জীবন-চল্‌না যেন বিপদসঙ্কুল হ'য়ে উঠে—পারিপার্শ্বিকের সাড়া অমনতর বিকৃত বিক্ষুব্ধ অসংবদ্ধ ভাবে যদি মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে, তবে তা'রা তা'দের পারিপার্শ্বিক-

গুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে পূরণ ও পোষণই কর্‌তে পারে না—ফলে জীবন কেমন একটা নীচ, অনেকটা পশুভাবাপন্ন হ'য়ে বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ চল্‌তে থাকে। যার জৈবিক কোষগুলির উপর—মুখ্যতঃ এমনতর প্রভাব, তা'কে জীবন ও বৃদ্ধির যাত্রীদের বর্জ্জন ক'রে চলাই তো সমীচীন ব'লে মনে হয়। আমার মনে পড়ে, আমি তখন ছোট ছিলাম—একদিন এক মেসে আস্ত আস্ত পেঁয়াজ ও আলু দেওয়া খিঁচুড়ী খে'য়েছিলাম। তা'র ফলে কিছুক্ষণের ভিতরেই আমার শরীরে এমন একটা দহনশীল ব্যতিক্রম উপস্থিত হ'লো যা'তে ১০৫° জ্বরে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লাম। একাদিক্রমে পাঁচ সাত দিন ভুগ্‌তে হ'য়েছিল। আমি অভ্যস্ত নয় ব'লেই অমনতর হ'য়েছিল বোধ হয়, কিন্তু যাহারা অভ্যস্ত, দ্রব্যের ক্রিয়া তা'দের বিধানে তো ঐ আমার যেমন হ'য়েছিল তেমনতরই হ'য়ে থাকে! অভ্যাসের দরুণ তা'রা বরদাস্ত কর্‌তে পারে, আর অনভ্যাসীরা তা' পে'রে উঠে না—এই যা' তফাৎ। আমার মনে হয় পেঁয়াজ রসুনের অমনতর গুণ আছে বলেই ইহা মানুষের বিধানকে অমনতর বেতালে বেতিয়ে বিকৃত বিশৃঙ্খল ক'রে স্নায়ুকোষগুলিকে অবসন্ন ক'রে তোলে। তাই হজরত রসুল ও অন্যান্য সাধু মহাপুরুষেরা সবাই তা' ব্যবহার কর্‌তে জোরের সঙ্গে নিষেধ-বাণী জারি করিয়াছেন। হজরত ত' এমনও বলিয়াছেন—"যে কেহ উহা ভক্ষণ করিবে তাহারা যেন আমাদের মসজিদের সমীপবর্ত্তী না হয়।"

"পেঁয়াজ, রসুন কিম্বা ঐ জাতীয় উত্তেজক দ্রব্যাদির প্রতি তা'দেরই ঝোঁক হয়, যেন না খে'য়ে থাক্‌তে পারে না, যা'রা temperamentally sexual (স্বাভাবিক ভাবে যৌন-প্রবণ) অথচ dull and inconsiderate in manipulations (যৌন ব্যাপারে স্থূলবুদ্ধি ও অবিবেচক)। তা'দের প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় irritant (ক্রোধপ্রবণ), egoistic (দাম্ভিক) এবং short-tempered (চঞ্চলমনা)। এই মুহূর্ত্তে এক রকম বুঝ্‌ল, অন্য মুহূর্ত্তে তা'দেরে দেখতে পাবেন ঠিক অন্য রকম—যেন কোন রকমেই তা'দের প্রতি confidence (বিশ্বাস) রে'খে চলাই কঠিন। তা'দের ভিতর হরদম স্রোতের মতন sexual desire (কাম-বাসনা) চল্‌তে থাকে অথচ desire (বাসনা) মাফিক তা'দিগকে তেমনতর ভাবে fulfil (সার্থক) কর্‌তে পারে না ব'লেই, তা'কে পূরণ কর্‌তে ও পোষণ করার urge (আকুতি) ভিতরে থাকার দরুণ প্রথমতঃ ওগুলি মুখরোচক না হ'লেও, ওর thrashing action (পিটুনী ক্রিয়াকে) পাওয়ার জন্য ঐ সমস্ত দ্রব্য খা'বার প্রলোভনকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না।

"অনেক সময় দেখা যায় sexual temperament-এর (কামপ্রবণ)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (ত্রিংশৎ বর্ষে)

যা'রা, তা'রা পেটে সহ্য করা যায় এমনতর ভাবে accumulation of toxin (বিষ-পুঞ্জীকরণ) পছন্দ করে, কারণ তা'তে পেটে ঐ toxin (বিষ) থাকার দরুণ nerve-centres (স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি) excited (উত্তেজিত) হয়---তা'র ফলে sexual impulse (কামের ঝোঁক)গুলিকে work out কর্‌তে (কাজে লাগাইতে) অনেকটা সুবিধা অনুভব করে---তাই toxin accumulation (বিষের সংগ্রহ) হয় যে সমস্ত খাদ্যে, সে সব খাদ্যের প্রতি তা'দের একটা সহজ টান।

"আমিষ আহার শরীর-বিধানের পক্ষে কোন হিসাবেই গ্রহণীয় হওয়া উচিত নয়। তবে কখনও কোন বিশেষ অবস্থায় আপনারা যদি মাছ মাংস ব্যবহার করেনও তাহাতে এমনতর অপরাধ হইবে না যাহাতে নাকি আপনাদের জাতিপাত ঘটিতে পারে—বরং অবস্থামত উহা না ব্যবহার করাই অসঙ্গত। যেমন হয়ত আপনি এমন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন যাহাতে আপনার cell division-কে (কোষ-বিভাগকে) accelerate (বৃদ্ধি) করিতে হইতে পারে এবং তাহাতে হয়ত আপনার জীবন রক্ষা পায়, সে স্থলে উহা ব্যবহার অতি সমীচীনই। হয়ত আপনারা কেহ সৈন্য-বিভাগে যাইয়া যুদ্ধ-ব্যাপারে কাহারও captive (বন্দী) হইয়া পড়িয়াছেন যেখানে হয়ত যে-কোন মাংস ব্যবহার না করিলে জীবনই রক্ষা হয় না; আমি বলি সেখানে আপনি সহ্য করিতে পারেন যতদূর সম্ভব এমনতর ভাবে animal diet (আমিষাহার) ব্যবহার করুন, বাঁচিয়া থাকুন—তখন উহাই আপনার ধর্ম্ম হইবে।

"আমার মতে শিশুমৃত্যুর একটা প্রধান কারণ, বিবাহ-বিভ্রাট; দ্বিতীয় কারণ, অসংস্কৃত প্রসূতি অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে যে সমস্ত বিধান মানিয়া চলিলে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও আয়ু অক্ষুণ্ণ, উদ্বোধিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা' না করা; তৃতীয়, স্বাস্থ্যের সেবা ও শুশ্রূষায় অনভিজ্ঞতা। ইহার সহিত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিরুদ্ধ ব্যাপারের যোগ হইয়া এই মহা আপদ আমন্ত্রিত হইয়াছে। কাজেই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এ সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

"তারপর ব্যায়ামের কথা। ব্যায়াম কর্‌লে স্বাস্থ্য ভাল এবং আয়ুবৃদ্ধি হইতে পারে। মানুষের পক্ষে এই স্বাভাবিক শারীরিক বিধান ও মন লইয়া যতখানি চেষ্টা ও কর্ম্ম করা উচিত তা' না করিলেই—আলাহিদা এমনতর কিছু করা উচিত যা'তে এই অভাবগুলির পরিপূরণ হইতে পারে, আর আমার মনে হয় সেখানে তেমনতর ব্যায়ামের দরকার। নতুবা কতকগুলি কস্‌রত করিয়া শরীরকে অন্যায্যভাবে উত্তেজিত করিয়া যে পুষ্টির সৃষ্টি করা

হয়—তাহাতে আয়ু বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কমের দিকেই বক্রগতিসম্পন্ন হইয়া চলিতে থাকে। আবার দেখুন এই মানুষের হয়ত পূর্ব্বপুরুষ গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি জঙ্গলে থাকে, জংলী চরিত্রে চলাফেরা, আহরণ, অন্বেষণ ইত্যাদি করে—তা'দের শারীরিক বল এত বেশী, তা'দের পূর্ণ কোন একটার সহিত সাধারণ কোন মানুষেরই পারিয়া উঠা সন্দেহজনক।

"নানারকম শ্রমসাধ্য খেলা প্রবর্ত্তিত করাও আনন্দ ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। খেলা জিনিষ একটা মানুষের স্বাভাবিক recreation (আমোদপ্রমোদ)—যা'তে মানুষকে স্ফূর্ত্তির ভিতর দিয়া উদ্যম ও কর্ম্মপটুতায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্ত্রীপুরুষ সবারই পক্ষে ব্যায়াম ও খেলাধূলা বিশেষ প্রয়োজন।

"এইবার জীবনীশক্তি ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য, অবশ্যপালনীয় কতিপয় প্রয়োজনীয় নিয়ম সম্বন্ধে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :---

১। ইষ্টে সহজ আপ্রাণতা, তচ্চিত্তপরায়ণতা ও তৎপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে তৎস্বার্থপরায়ণতা।

২। পারিপার্শ্বিকের প্রতি সেবা, সম্বর্দ্ধনা, সাহায্য ও সাহচর্য্যপরায়ণ হ'য়ে তা'দিগকে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা।

৩। নিয়মিত সন্ধ্যা, প্রার্থনা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ এবং প্রথমে একক ভ্রমণ ও তৎপর অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম থানকুনী পাতার রস একটু দুধ ও ইক্ষুগুড় দিয়ে বা শুধু ইক্ষুগুড় দিয়ে খে'য়ে বেশী পরিমাণে জল খাওয়ার পর সঙ্গিগণ সহ ভ্রমণে আরও সুবিধা হ'তে পাবে। এতে একটু বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হ'য়ে শরীরের toxin (বিষ)গুলি প্রায়ই বেরিয়ে যে'য়ে থাকে।

৪। বেশ সাদাসিদে, সহজ-পুষ্টিকর, সুপাচ্য আহার সাধারণতঃ দিনরাত্রে দুই বার।

৫। ক্ষুধাকে কখনও জব্দ না করা—regulated uncivilized (নিয়মিত অসভ্যজনোচিত) রকমে জীবন সম্ভবমত কম প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে চালান।

৬। বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে temper (মেজাজ) lose (নষ্ট) না করা —অন্ততঃ unprofitably (অ-লাভজনক ভাবে) temper lose না করা।

৭। Unregulated (অনিয়ন্ত্রিত)ভাবে—যাতে নাকি শরীর ও মনের অবসাদ আসে এমনতর ভাবে স্ত্রী-সহবাস না করা—অন্ততঃ স্ত্রী কর্ত্তৃক solicited (অনুরুদ্ধ বা প্রার্থিত) না হ'য়ে sexually engaged (যৌন ব্যাপারে রত) না হওয়া।

৮। Life with Superior Beloved (ইষ্টগত জীবন), life in seclusion (নিঃসঙ্গ জীবন), life with immediate environment (পারিপার্শ্বিক জীবন) *i. e.*, life with family, and life for and with the public (পারিবারিক জীবন এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য ও তাহাদের সহিত জীবন)—এ কয়টা factor (কার্য্যকে) সম্ভবমত বেশ ক'রে observe (লক্ষ্য) করা।

৯। কুব্যাধি-সংক্রমণের বিস্তার-প্রতিরোধী আচার-নিয়মকে প্রতিপালন ক'রে শুদ্ধ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ ক'রে তোলা।

১০। শুধু ভাবপ্রবণ না হ'য়ে ভাব ও বোধগুলিকে করা ও বলার ভিতর দিয়ে জীবনবৃদ্ধির অনুকূল ক'রে বাস্তবে পরিণত করা।

১১। শরীর ও সময়ের উপযুক্ততা হিসাবে মাঝে মাঝে নামমাত্র আহার বা বিধিপূর্ব্বক উপবাস প্রভৃতি করা।"

শিক্ষা

"শিক্ষাই হ'চ্ছে তা-ই যা' নাকি মানুষকে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নীত করে অর্থাৎ বাঁচিয়ে উন্নত প্রগতির পথে আরো হইতে আরোতর ভাবে চালায়—আর এই হ'চ্ছে শিক্ষার সার্থকতা। এ কিন্তু করা ও কাযদার ভিতর দিয়ে, চিন্তার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে করাকে আরো স্ফুটতর ক'রে—থাকা এবং চলায় পর্য্যবসিত করা। না হ'লে শিক্ষা জীবনকে কি দিতে পারে, তা'তে হ'বেই বা কি?

"শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণই হ'চ্ছে আদর্শে প্রণত হওয়া অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে নত হওয়া। হৃদয়ে এমনতর একটা টানের উদ্বোধন করা আদর্শকে মে'নে নিতে, তাঁ'র পছন্দসই হ'য়ে চল্‌তে, যা'তে সহজভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল লাগে। এতে যিনি শিক্ষক তিনি যদি প্রকৃত আদর্শবান্ হন, আর ছাত্রের ভিতর তাঁ'র সংসর্গে ঐ রকম ভাবের উদ্বোধন হয়—তা'হলে ছাত্রের শিক্ষা এমনতর সহজ ও অটুটভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যা'তে সে বুঝ্‌তেই পারে না শিক্ষা জীবনের পক্ষে কতখানি শ্রমসাধ্য। শ্রমগুলি তা'র আরামের কসরৎ ব'লেই মনে হয়। মনে রাখার জন্য স্মৃতির অনুশীলনই করতে হয় না। তা'র মন এমনই হ'য়ে ওঠে,—মনে রাখা তা'র সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ, কারণ স্মৃতি সেখানেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে—পছন্দ বা ভাল-লাগা যেখানে মুখর ও প্রস্ফুটিত।

"তারপর এই এমনতর আদর্শ শিক্ষক—তিনি যদি জীবন ও তা' যাপনের নিয়মগুলিকে বাস্তবতায় ছাত্রের সম্মুখে ধরিয়া ছাত্রকে তাহাতে আকৃষ্ট করতঃ

ক্রমোন্নত প্রগতির পথে চলিয়া—চালাইতে থাকেন, তা' হ'লেই ছাত্রের জীবন করায়, থাকা ও চলার সমৃদ্ধিতে তা'র অজ্ঞাতসারে জানায় সমৃদ্ধ না হ'য়েই পারবে না; আর এই চলার জানায় ছাত্র যে কত পাহাড় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ক'রে, কত যে সমুদ্র মন্থন ক'রে মহান্ ও প্রকৃত জ্ঞানের অধীশ্বর হ'য়ে উঠ্‌বে তা' সে জে'নেও জান্‌বে না। জীবনে তা'র শিক্ষার গল্পগুলি প্রণয়-কথার মতন ব'লে মনে হ'বে—আর সে মানুষের কাছে বল্‌বেও তা-ই। তা'তে আবার প্রণয়-কথা মানুষের ভিতর যেমনতর ক'রে চারিয়ে যায় শিক্ষাও প্রতি জীবনে তেমনতর ভাবে চারিয়ে যা'বে।

"তা-হ'লেই হ'চ্ছে শিক্ষা দ্রুতগতিতে চালানোর উপকরণেব ভিতর শিক্ষকই প্রথম ও প্রধান। আর আমরা এখনই আমাদের যা' যা' জীবনের প্রয়োজন, জীবন-যাপন কর্‌তে গেলে, উন্নত প্রগতিতে চল্‌তে গেলে যেগুলি করণীয় কার্য্যতঃ সেগুলি আরম্ভ কর্‌তে পারি। আব এই কায্যতঃ করার ভিতর দিয়ে আমাদের চিন্তা-সম্পদকে উদ্বুদ্ধ ক'রে আরোর পথে চলাকে সম্বেগ-সম্পন্ন ক'রে তুল্‌তে পারি। আর আদর্শবান্ শিক্ষক বল্‌তে এই বুঝি—যাঁ'র শিক্ষাগুলি তাঁ'র কোন বিশেষ আদর্শকে সার্থক করার আকুতি নিযে উদ্বুদ্ধ ও সার্থক হ'য়েছে। আমরা আজকাল পেটের দাযে শিক্ষকতা করি, আর তাই খাওযা দিন দিন আমাদের সম্মুখ থেকে দূরে স'রে দাঁড়াচ্ছে—করাটা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। এত ভড়ং, তবু সব ফক্কা! শিক্ষকের শিক্ষকতায় প্রাণ উপ্‌চে' একটা আকুল প্রিযকম্পনে উন্নত প্রগতি-পরায়ণ করায় জানাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ছাত্রের প্রাণে জীবনকে উগ্‌রে দেয় না,—তাই শিক্ষকের প্রাণ কোন ছাত্রকে প্রাণবান্ ক'রে করা ও জানার ভিতর দিয়ে সেবা ও সাহচর্য্যে তা'র পারিপার্শ্বিক জীবনে প্রাণবান্ ক'রে তোলে না,—সে পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধির স্বার্থও হ'য়ে উঠে না। নানা কায়দায় সে পারিপার্শ্বিকের জীবন থেকে জীবনের নানা উপকরণ অপহরণ ক'রে নিজেকে সমৃদ্ধ কর্‌তে চায়, আর পারিপার্শ্বিকও তাই আপ্রাণ তা'কে নানা রকমে চুরি ক'রে প্রত্যেক নিজ জীবনকে যাপনক্ষম ক'রে রাখ্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে;—তাই সমাজে এত অকৃতজ্ঞতা, এত কপট সাহায্যলিপ্সুতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ফেনিয়ে নানারকমে নানা কায়দায় নানান্ ছাঁটে ফু'লে উপ্‌চে উঠ্‌ছে।

"তবেই আমরা এখনই শিক্ষাকে জীবন-যাপনের অনুকূল ক'রে কার্য্যকরী বাস্তবতার ভিতর দিয়ে চল্‌তে সুরু কর্‌তে পারি; আর যাঁ'রা এমন শিক্ষক আছেন তাঁ'রা অন্ততঃ একটা আদর্শপরায়ণতার বাস্তব প্রচেষ্টা নিয়ে যতটুকু সম্ভব কার্য্যকরী ক'রে সেটুকুও ভাব, ভঙ্গী ও ভালবাসার সহিত

ছাত্রের ভিতর চারিয়ে দিতে পারেন। তা'হ'লেও অন্ততঃ প্রকৃত আদর্শ শিক্ষকতার এতটুকুও স্বস্তিবচন হয়।

"আর দীক্ষা ছাড়া শিক্ষা সম্ভব হয় না। দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে উপদেশ অর্থাৎ যে উপদেশ এমন করার জ্ঞান দান করে যা'তে নাকি মানুষকে পাপ (অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া হইতে পাতিত করে যা' তা') হ'তে মুক্ত ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, আর তা' করায় প্রবৃত্ত করিয়ে দেয়। আর শিক্ষা মানে আমি এই বুঝি, অভ্যাস দ্বারা সেই উপদিষ্ট বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়া জানার উদ্দীপ্তিকে চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করা। তা'হ'লেই দীক্ষা না হইলে শিক্ষা কিরূপে সম্ভব হ'বে? যেখানে যা'ই শিখ্‌তে যা'ব আমরা—তা' এমনতর ক'রেই। কিন্তু এই শিক্ষকের প্রতি যতই আমরা অনুরক্ত হ'তে পার্‌বো, জানা আমাদের ততই বেমালুমভাবে চরিত্রে প্রকৃত হ'য়ে উঠ্‌বে। তাই এখনও দীক্ষাও আছে, শিক্ষাও আছে; নাই একান্ত অনুরক্তি—শিক্ষক বা আদর্শপ্রাণতা—তাই শিক্ষা ব্যভিচারিণী নারীর মত জীবনকে কোনপ্রকারেই সার্থক করিয়া তোলে না। শিক্ষাগুলি অজানা বেকুবের মত জানার কলরবে নেহাৎ ব্যর্থ স্পর্দ্ধায় গণ্ডগোল সৃষ্টি ক'রে হাউমাউ ক'রে বে'ড়াচ্ছে।

"প্রশ্ন হ'তে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বহু বহু প্রফেসারের কাছে পড়্‌তে হয়, প্রত্যেকের প্রতি একান্ত অনুরক্তি সম্ভবই বা কেমন ক'রে—আর তাহাতে তো বহুতে অনুরক্তিই হয়! মনে করুন, আমাদের এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সেই মহামান্য আশুবাবুর আমলের; মনে করুন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, আদর্শ বা ঋষি ছিলেন; তাঁ'কে যদি আমরা বল্‌তাম ভগবান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলি শিক্ষার শাখাকেন্দ্র ছিল প্রত্যেকটারই সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষাকে কি ক'রে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে হ'বে—সমস্ত শিক্ষককেই হাতে-কলমে উপদেশ দিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। আর সবাই—কি শিক্ষক, কি ছাত্র—তাঁ'তে এই ভাব, ভালবাসা ও ব্যবস্থার দরুণ আকৃষ্ট হ'য়ে থাক্‌ত। ছাত্রেরা ভাব্‌ত, তা'রা শিক্ষায় বিশেষভাবে পারদর্শী হ'লে তিনি কত উৎফুল্ল হ'বেন। শিক্ষকেরা ভাব্‌তেন, ছেলেরা বিশেষভাবে পারদর্শী হ'লে তিনি শিক্ষকদের ছাত্রদিগকে নিয়ে' কতই হয়ত আমোদে আটখানা হ'য়ে পড়্‌বেন। এই প্রলোভনই শিক্ষক ও ছাত্রদের যেন একটা প্রধান প্রেরণা হ'য়ে উঠেছিল। তিনি হাতে-কলমে প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষকের সেবায় সবারই স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই ছাত্র, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের যা'কিছু সেই ভগবান আশুতোষে সার্থক হ'তে উদগ্রীব হ'য়ে থাক্‌তো।

তাঁ'র পোষণ ও তুষ্টির দিকে সবারই যেন একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তাঁ'র তৃপ্তি ও তুষ্টিতে সব-শুদ্ধ তৃপ্ত ও তুষ্ট হ'য়ে একটা আনন্দের অভিনন্দন-মুখর আলোড়ন প'ড়ে যে'ত। মনে করুন, তিনি যা' করে' গে'ছেন—ঐটা যদি স্বাভাবিক হ'য়ে সহজ উন্নতির উদ্দীপনায়, অনুরক্তির চেতন-আবেশে শতগুণ সম্বেগে প্রস্ফুটিত হ'য়ে চল্‌ত—যেমন চ'লেছিল ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্যকে নিয়ে—তবে কি দাঁড়াত, কল্পনায় ভে'বে দেখ্‌লেই একটু একটু কেমন লাগে বোধ কর্‌তেও পারেন।

"আজকাল শিক্ষায় আমাদের আদর্শ একেবারেই নাই। অথচ শিক্ষার প্রথম উপকরণই হ'চ্ছে আদর্শ। আদর্শে আছে অনুভূতি; আর শ্রদ্ধা, সঙ্গ, প্রশ্ন, সেবা, ব্যবহার ও উপাসনা দ্বারা আদর্শ হইতে তাঁহার অনুভূতির প্রকাশ লইয়া,—তাহা অনুভব করিয়া চরিত্রে তাহা প্রতিফলিত করাই হ'চ্ছে সম্যক্ শিক্ষা! আবার ঈর্ষা, আক্রোশ বা হীনভাব হইতে উদ্দীপ্ত যে শিক্ষা তাহা জীবন ও চরিত্রকে অল্পই স্পর্শ করিতে পারে—যদিও অবিন্যস্ত ও অবাধ্য সংগৃহীত ঐশ্বর্য্যে অধিরূঢ় হইতে পারে; কিন্তু ইষ্ট, আদর্শ বা প্রেমাস্পদে ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছলতা ও প্রয়োজন হইতে যে শিক্ষা আরম্ভ হয় তাহা বস্তুতঃ জীবন ও চরিত্রকে আক্রমণ করিয়া বংশানুক্রমিকতাকেই রঞ্জিত করে। আর তাই আদর্শবিহীন শিক্ষা আমাদের কর্ম্মশক্তি বাড়িয়ে না দিয়ে আমাদের পঙ্গু ক'রে তোলে।

"ছাত্রদের ভিতর যে কোন আদর্শ সঞ্চারিত হ'চ্ছে না—এ'তে বোঝা যায় শিক্ষকেরা আদর্শে শ্লথকৃতি। শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধানতম কর্ত্তব্যই হ'ল—আদর্শকে গরিমাময় করিয়া, বিশদ করিয়া, সস্নেহে ছাত্রের সম্মুখে ধরা। তা'দের ক্লাসে যা'বার আগেই নিজেদের মনোভাব এমনি ক'রে যে'তে হ'বে যা'তে ঐ ভাব আসে। আব, তজ্জন্য শিক্ষকদের হওয়া চাই কর্ম্মময়ভাবে এককেন্দ্রীভূত (actively unit-centric)—কোন মূর্ত্ত আদর্শে নিরলসভাবে অনুরক্ত থাকা। এমন কর্‌লে তাঁ'দের সর্ব্বদাই ছাত্রবৎ মনোভাব থাক্‌বে। তাঁ'দের আদর্শ ছাত্রদের ভিতর সঞ্চারিত কর্‌তে হ'লে দেশের প্রত্যেক শিক্ষককে মুখ্যভাবে প্রধানতঃ হ'তে হ'বে এমন ধারা ছাত্র;—আর এই ছাত্রবৎ সশ্রদ্ধভাব তাঁ'দের ভিতর যতখানি থাক্‌বে জাগ্রত কৃতকার্য্যতার সহিত সঞ্চারিত কর্‌তে পার্‌বেন ছাত্রদের ভিতর তাঁ'দের আদর্শকে।

"মানুষের জীবনে যদি দায়িত্বপূর্ণ কিছু থাকে তবে তা' শিক্ষকতা। শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রদের শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে এমনতরভাবে আক্রমণ করে যাহা তাহার পর-জীবনকে অবশভাবে চালাইয়া

লইয়া বেড়ায়; শিক্ষক যদি আদর্শে উন্মুখ না থাকে, তাহার চরিত্র যদি আদর্শের ভাবে অনুলিপ্ত থাকিয়া কর্ম্মমুখর না হয়, তাহার চরিত্র যদি ছাত্রের চাহিদার দরজাকে উন্মোচন করিয়া, প্রাণকে স্পর্শ করিয়া উন্নতিতে অবাধ না করিয়া তোলে, সে শিক্ষকতা যে অধর্ম্মের পরমাশ্রয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"তারপর শিক্ষাটা হ'বে কার্য্যকরী ও শিল্পপ্রধান। মানুষ 'আর্টই' পড়ুক আর বিজ্ঞানই পড়ুক—'আর্টের' সাথে এমনতর কার্য্যকরী কিছু অবশ্য-করণীয় থাকা উচিত যা'তে ছেলেরা তা' খাটিয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই তখনই তা'র উপর দাঁ'ড়াতে পারে; আর বিজ্ঞান—পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে এমনতর কার্য্যকরী শ্রমশিল্প-বিভাগসমূহে ভাগ করতে হয় যা'তে নাকি তত্ত্বসম্বন্ধীয় বক্তৃতার সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া তা'রা অধ্যয়ন-ব্যাপার শেষ করতে পারে। তা' হ'লেই তা'র ফলে তা'রা এমনতর কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে বে'রুবে যা'তে বাইরে এসে 'চাকর কিন্‌বে কে, চাকর কিন্‌বে কে'—ব'লে চেঁচিয়ে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হ'য়ে সর্ব্বনাশের ক্রোড়ে ঢ'লে না পড়ে। যদি সত্যই শিক্ষিত হইতে চাও হাতে-কলমে করাকে অবলম্বন কর, আর এই করার উপর দাঁড়াইয়া উপপত্তির অনুধাবন করিও,—দেখিও জ্ঞানী বেকুব হইতে হইবে না।

"আর অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য—আর্য্যদের আদিম সহজ শিক্ষা—যা'র উপর দাঁড়িয়ে তাঁ'রা নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতেন, সে কৃষিকার্য্যটা রাখা চাই বরাবর—তা'র যত রকম উৎকর্ষ হ'তে পারে হাতে-কলমে—যদি আর-কিছু নাই পায় তবে যেন অন্ততঃ মাটী নে'ড়েও চারটী খে'তে পারে।

"পুরুষ যেমন শিক্ষিত হ'বে মেয়েরাও সেইরূপ শিক্ষিত হ'বে—তবে ধাতের (temperament-এর) পার্থক্য থাকিবে। দু'জনেরই শিক্ষা যত বেশী হয় তত মঙ্গল,—মেয়েদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিতে যাহা যতটুকু প্রয়োজন তাহাই করণীয়। প্রয়োজন হইলে তাহারা সমস্তই করিতে পারে—আমাদের দেশে পূর্ব্বে অনেক মেয়েই লড়াই জানিত। তা' বলিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য লড়াই করা নয়, বা গোয়েন্দাগিরি করা নয়। অস্তিত্বকে উন্নত করিতে, সমৃদ্ধ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহাই তাহাদের করণীয় বলিয়া মনে হয়। নারীর এবং পুরুষের প্রভেদ হ'ল এই যে, নারী সম্বর্দ্ধিত ক'রে সুখী, পুরুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে সুখী; পুরুষের ধর্ম্ম হ'চ্ছে আহরণ ক'রে পূরণ করা, আর নারীর ধর্ম্ম হ'ল পুরুষ যাহাতে সম্বর্দ্ধিত হয় তাই করা আর পুরুষের সংবর্দ্ধন দে'খে সার্থক হওয়া। মেয়েদের তুষ্ট, পুষ্ট, সম্বর্দ্ধিত ক'রেই আত্মপ্রসাদ—আর ছেলেদের অভাব

পূরণ ক'রেই তৃপ্তি। পুরুষের কর্ম্মে বিস্তার বেশী, আর নারীর গভীরত্ব বেশী। নারীর কর্ম্মের প্রসার বেশী আসিতে পারে না, তা'রা দুনিয়াটাকে উপভোগ করে পুরুষের মধ্য দিয়া—তাই অন্তরতর আর তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত তা'দের কর্ম্মক্ষমতা। নারীর অন্তর্নিহিত ঝোঁক মাতৃত্বে, তাই মেয়েদের শিক্ষাও এই সংবর্দ্ধন করার জন্য,—এই মূল সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে নারীর যেমন যেমন করা উচিত তাহাই নারীর করণীয়, আর তা' হ'লেই দেখা যায় পুরুষকে সংবর্দ্ধিত করার জন্য—তা'কে উন্নত ও সম্যকরূপে ভূষিত করার জন্য নারীরও সব-কিছু শেখা প্রয়োজন।

"মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে—নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। নারীকে শিক্ষিতা করিতে হইলে শিক্ষার ধারা এমনতরই হওয়া প্রয়োজন—যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্যে বর্দ্ধনশীল, উন্নতি-প্রবণ ও অব্যাহত হয় ;—তবেই সে শিক্ষা জীবন ও সমাজকে ধারণ, রক্ষণ ও উন্নয়নে সার্থক করিতে পারে—কারণ বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শিক্ষার অবতারণা করা, আর জীবনকে নপুংসক করিয়া দেওয়া একই কথা।

"বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া মেয়েদের শিক্ষা যতদূরই কেন অগ্রসর না হোক্—তা'র ভিত্তিতে যেন ধর্ম্ম কাহাকে বলে, আদর্শ কি, শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলে, শ্রেষ্ঠকে কি করিয়া চিনিতে হয়, শ্রেষ্ঠকে কেমন করিয়া বরণ করিতে হয়, সতীত্ব কাহাকে বলে, সতীত্ব মানুষকে কেমন করিযা তোলে, সেবা কি, শ্রদ্ধাভক্তি কাহাকে বলে, কি করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়, কিসে সুসন্তান লাভ হয়, পারিবাবিক শান্তি রক্ষা করিযা কি-করিয়া উন্নতিকে ডাকিযা আনা চলে, পতিত্বকে কি-করিযা চিনিতে পারা যায়, সন্তানকে কি-কবিয়া পালন করিতে হয, কি-করিয়াই বা শিক্ষা দিলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বলতব হইয়া দাঁড়াইবে, সঞ্চয়ের নিয়ম কি, অন্যের কষ্টের সৃষ্টি না করিয়া কি-করিয়া তাহার উন্নতি করা যায়—ইত্যাদি বিশেষ করিয়া অভিনিবেশ-সহকারে চরিত্রগত করিবার ব্যবস্থা থাকে।

"শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শিশু তা'র পারিপার্শ্বিকের বোধগুলি বহন করে চোখ দিয়ে। তাই দেখা যায় শিশু মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চায়, হাসে, কাঁদে। চোখই প্রথমে তা'র ভিতরে পারিপার্শ্বিককে নিযে যায় অনুভবের সহিত ; আর মস্তিষ্ক ছাপ নেয়, সক্রিয় হয়, সম্বর্দ্ধিত হয়। চোখ দিয়ে প্রথমে, তারপর খোলে তা'র কাণ, তারপর অন্য সব। তা'হলে শিশুকে ভালভাবে পালন করতে হ'লে প্রথমেই চাই পিতামাতা এবং পরিবারের এমনতর চাল-চলন যা'তে সেই ছাপগুলি উত্তর জীবনে তা'কে উদ্বর্দ্ধনের দিকে নিয়ে যায় ; আর ওখানে গলদ হ'লেই—বিশেষতঃ

মাতাপিতা ভাইবোনের ভিতর—তা' উন্মূলিত করা বড়ই কঠিনসাধ্য,—তা' তা'র জীবনকে অসংযত, বিকৃত, অবনতিপ্রবণ ক'রে তুলবেই। হিন্দুশাস্ত্রে তাই দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার হ'তে বহুবিধ সংস্কারের বিধি দেওয়া আছে,—আর ওগুলিকে সংস্কার ব'লেই অভিহিত করা হ'য়েছে। আসল কথাই হ'চ্ছে পিতামাতার ভিতর অনুরাগ। স্ত্রী পুরুষকে যেমনতর ভাবে সংবর্দ্ধন করিয়া আমন্ত্রণ করে সন্তানের জন্মগত ঝোঁক এবং প্রবৃত্তিও তেমনতর হয়। তা' হ'লে ধরতে গেলে ধাতু, চরিত্র আর শিক্ষা নির্ভর ক'চ্ছে মাতাপিতার উপর--মুখ্য এবং গৌণভাবে। আর সংস্কার মানে সেই সংস্কার বা সম্যক্ করা যা' আমাদের উদ্বর্দ্ধনের ও উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়।

"সুতরাং বিশেষ কবিযা মা ই শিশুর শিক্ষার ভিত্তি। ছেলেমেয়েদের বোধের পাল্লা মায়ের যদি নখদর্পণে না থাকে—কি সে পছন্দ করে, কেমন কথায় ভয় করে, আঁৎকে ওঠে কেমন করিয়া, কেমন করিয়া তা'র ভিতর সন্দেহ বা বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারা যায ইত্যাদি প্রয়োজনমত প্রয়োগ করাই হইয়া ওঠে না ;—আর বোধের মাপকাঠি হাতে থাকিলে অতি সহজেই এই সমস্ত সম্ভব হইয়া শিশু বা ছেলেকে ভবিষ্যৎ বিপদের হাত হইতে অনেক সহজেই রক্ষা কবা যায়। তাই বলি,---নারী ! তুমি ভুলিও না—মানুষের—সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের—শিক্ষা মায়েদের বোধ, বাক্য, চলন, চরিত্র ও দক্ষতা হইতেই পাইয়া থাকে ; তোমাদের এইগুলি যতই পুষ্ট ও পটু হইবে, মানুষের—অন্ততঃ ছেলেমেয়েদেব—শিক্ষার ভিত্তি ততই নিরেট হইবে ; হিসাব করিয়া চলিও—পশ্চাতে পস্তাইতে হইবে না। ছেলেমেয়েদের সম্মুখে এমনতর কিছুই ধরিও না--যাহা বর্দ্ধিত হইয়া তাহার পরবর্ত্তী জীবনে জাহান্নমের জয়গান করে। সন্তানেব সম্মুখে এমন কিছু করিও না যাহাতে তাহার ভক্তি বা তোমার প্রতি টানের কোনরূপ অপলাপ ঘটে ;—টানের অপলাপে তোমারও কষ্ট তাহারও সমূহ বিপদ ; তাই তাহার ধাতু, চরিত্র ও অবস্থা যেন তোমাতে সব-সময় জাগরূক থাকে। কোন শিক্ষা দিতে হইলে—বেশ করিয়া বুঝিয়া, প্রয়োজন ও অবস্থাতে নজর রাখিয়া, ভাব ও ভাবের গতির প্রতিক্রিয়ার সময়ে যদি বোধ ও মীমাংসাকে আনিয়া দিতে পারে—আদর ও সহানুভূতি লইয়া—দেখিবে শিক্ষা তাহার সহজেই চরিত্রকে স্পর্শ করিয়াছে। ছেলেদের, মেয়েদের এবং শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাই আমার চুম্বক কথা।"

সমাজ

বিবাহ-সংস্কার :—

"বিবাহ করাটা মানুষের একটা normal hankering (স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা)—তা'দের একটা inner instinct-ই (ভিতরের প্রবৃত্তিই) যেন তা'রা বহু individual-এ (ব্যক্তিতে) পরিণত হ'তে চায়—আর এই hankering (আকাঙ্ক্ষা) থেকেই হ'য়েছে স্ত্রীপুরুষের মিলন-প্রবণতা। তাই এই মিলন-প্রবণতাকে এমনতর ভাবে manage (নিয়ন্ত্রিত) করতে হ'বে যা'তে superior (শ্রেষ্ঠ), efficient (সুদক্ষ), individual embodiment-এর (ব্যক্তি প্রতীকের) আবির্ভাবটা এক রকম normal (স্বাভাবিক) হ'যে উঠে। তাই বিবাহ-সংস্কার যদি বিধিমত না হয়, তা' হ'লে এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

"আবার এই মিলনে যদি উভয়ে উভয়ের cherishing and nourishing (তৃপ্তিকর ও পুষ্টিদায়ক) হ'যে উন্নতিকে excite (উত্তেজিত) না করে, তা'হ'লে being-এর (সত্তার) longevity affected (আয়ু বিপদগ্রস্ত) হ'য়ে একটা ভীষণ deterioration-এ (অবনতিতে) নিয়ে যায়। তবেই বিবাহ ক'রতে হ'লেই বিধিমত তা'কে apply (ব্যবহার) ক'র্‌তেই হবে—যদি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের normal (স্বাভাবিক) কামাই হয়,—তা' নয় কি? তবে যা'দের এমনতর অবস্থা হ'য়েছে বিয়ে না-ক'রেই তা'দের উন্নতি অবাধ হ'তে পারে, কিংবা বিয়ে ক'রলে যা'দের অধোগতি অনিবার্য্য—তা'দের এ ব্যাপার হ'তে দূরে থাকাই যুক্তিযুক্ত।

"আবার মহাপুরুষেরা এমনতর কোন কথা বলেন নি যে, বিয়ে ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুক্‌লে ধর্ম্ম করা অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া হ'বে না,—বরং গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢু'কে যা'তে মানুষ ঐ ধর্ম্মকে অটুট রে'খে অনায়াসে চল্‌তে পারে তা'র কথাই বেশী বলেছেন—তা'দের সম্মানও বেশী দিয়েছেন; আর বাস্তবিক হয়ও তাই। এমন খুব কম ঋষির কথাই বোধ হয় জানা যায় যাঁ'রা গার্হস্থ্যাশ্রমী ন'ন, বরং অনেকেরই বহু পুত্র-কলত্রাদিই ছিল,—তা' হ'লে তাঁ'রা অমন কথা কি ক'রে বলেন?

"মানুষের ঐ normal hankering-টাকে (স্বাভাবিক কামনাকে) জয় করা ধর্ম্ম বটে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই,—কিন্তু জয় করা মানে extinct (নির্ম্মূল) করা নয়। জয় করা মানেই হ'চ্ছে যা'কে আমি জয় করি সে আমার property (সম্পত্তি) হ'য়ে থাকে,—আমার ইচ্ছামত আমি তা'কে যা' ইচ্ছা করতে পারি। যা'কে জয় ক'রেছি সে আমাকে তা'র মত

চা'লাতে বা entice (প্রলুব্ধ) কর্‌তে পারে না,—তাই এই কামকে যে জয় কর্ত্তে পারে নাই তা'র তো সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। Environment (পারিপার্শ্বিক) তা'কে তো শকুনের মতন ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সর্ব্বনাশে নিঃশেষ ক'রে দেবে সত্বরই।

"তাই কাম যা'কে কামুক কর্‌তে পারে না, সে যে স্বভাবতঃই মুক্ত,—তাই ধর্ম্ম তা'কে সহজেই ধ'রে রাখ্‌তে পারে। তাই যে পুরুষ কামুকতায় inclined (প্রবৃত্ত) হ'য়ে বিবাহ কর্‌তে চায় সে বিবাহ-ব্যাপারে একদমই অনুপযুক্ত। আর যতদিন তা'র এমনতর সম্বেগ আছে, ততদিন তা'র ইহা করাও উচিত নয়। পুরুষ যা'তে বিয়ে-পাগলা হ'য়ে কামপরায়ণতায় মেয়েদের দিকে অস্বাভাবিক ভাবে inclined (প্রবৃত্ত) না হ'য়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

"শাস্ত্রে আছে—মেয়েরা পুত্রার্থী হ'য়ে, সদ্ভাবে সিক্ত ও সমুন্নত হ'য়ে স্বামীকে আরাধনা কর্‌ত,—আর সেই ভাবদ্বারা স্বামী যদি inclined (ইচ্ছুক) হ'তেন তবেই তাঁ'রা শ্রেষ্ঠ সন্তানের জনক-জননী হ'তেন। তাই সিদ্ধ ব্রহ্মচারীই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র হ'তেন। কাম তাঁ'দেব বিবাহকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌ত না,—তাই হিন্দুর বিবাহ কামজ ছিল না,—আব তা' সাধারণতঃ হওয়াও উচিত নয়। বিবাহের ঘটক ছিল নারীর শ্রদ্ধা, ভক্তি।

"সমাজে অধুনা-প্রচলিত বিবাহ-ব্যাপারটা যত শীঘ্র rectified (পরিশুদ্ধ) হ'বে, দেশের atmosphereও (আবহাওয়াও) তত শীঘ্র পরিস্কৃত হ'তে থাক্‌বে,—becile personalityও (বীর্য্যবান ব্যক্তিত্বও) ততই grow (জন্মগ্রহণ) কর্‌বে,—আর তা' দিয়ে তখন আদেশ, দশ ও দেশ সবগুলিই উন্নত হ'বে। আব এই বিবাহের জন্য এখনই আমরা মেয়েদের consent (মত) নিয়ে তা'দেব সম্বন্ধ সংঘটন কর্‌তে পাবি; আর মেয়েরা যদি তা'দের বর অমনতর consent (মত) দিয়ে accept (গ্রহণ) করে, তবে তা'দের conscience-ই (বিবেকই) whip (আঘাত) কর্‌বে তা'দের স্বামীকে বহন করতে with a cherishing and nourishing attitude (তৃপ্তিদায়ক এবং পুষ্টিপ্রদভাবে),—তা'হ'লে নারীর বধূ-আখ্যা অনেকটা fulfilled (সার্থক) হ'বে মনে হয়।

"আর যা'তে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবদ্ধ থাকে এমনতর difference of age and intellect (বয়স ও বুদ্ধির পার্থক্য) যা'তে হয় তা'ও আমাদের কর্‌তে হ'বে। মহামুনি সুশ্রুত ব'লেছেন—মেয়ে ও ছেলের ভিতর অন্ততঃ দশ হইতে বার বছর age-difference (বয়সের পার্থক্য) না হ'লে, সন্তান সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল লইয়া জন্মগ্রহণ করে,—আমারও মনে হয় তাই। আরো

শাস্ত্রকারগণ নাবালিকা কন্যাকে ঋষি বা তত্তুল্য বরে যেমন সম্প্রদানের কথা ব'লেছেন তেমনি puberty set up ক'রেছে (যৌবন আরম্ভ হইয়াছে) এমনতর মেয়ে—পিতামাতা উপযুক্ত বরে দিতে না পারলে,—অপেক্ষা ক'রে স্বেচ্ছায় বর নির্ব্বাচন করবে একথাও ব'লেছেন। মেয়েরা তা'দের পছন্দমত বিয়ে করলে পছন্দেরও কত ভুল হ'তে পারে, কারণ আমাদের মেয়েরা শিক্ষাই পায় না! এও হ'তে পারে, কিন্তু তা'রা যে শিক্ষা পায় না তা'র ফলও আমরাই ভোগ করি! আর পছন্দ ক'রে যে ভুল হয় তা'র একটা পার আছে, কারণ সে বুঝ্‌তে পারে যে তা'রই স্বেচ্ছাকৃত এই ভুল—এই ভুলকে সংশোধন ক'রে নিতে হ'বে তা'রই অথবা বইতে হ'বে তা'কেই বিনা বিরক্তিতে—তা'ই সাধারণতঃ চেষ্টাও আসে তেমনতর। আর এখন যতখানি ভুল হ'চ্ছে consent (মত) নিয়ে করলে তা'র চাইতে কম ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তাই গড়ে সমাজও পা'বে সুস্থের সংখ্যা বেশী।

"বিয়ে ঠিকমত হ'লে আমাদের জাতির সব-রকমের সংস্কার দেখ্‌তে দেখ্‌তে হ'য়ে যা'বে। আমরা কি দেখ্‌তে পাই? সাধারণতঃ পুরুষ মেয়েদের কাছে admired (প্রশংসিত) হ'তে চায়, উদ্দীপ্ত হ'তে চায়, honourably (সম্মানিতভাবে) উদ্দীপ্ত দেখতে চায়—মেয়েদের কাছে গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকা পুরুষের যেন একটা তৃপ্তি। ছেলেদের একটু বয়স হ'লেই, যৌবন স্পর্শ করলেই দেখতে পাওযা যায় তা'দের পরণ-পরিচ্ছদ চাল-চলন সব বদ্‌লে যা'চ্ছে—অবশ্য মেয়েদেরও তেমনি। তা'র মূলে আছে unconsciously (অজ্ঞাতসারে) উভয়ে উভয়ের নিকট admired and attracted (প্রশংসিত ও আকৃষ্ট) হ'তে চায়। তা'হ'লেই মেয়েদের চাহিদা যদি অমনতর উন্নত হয় তবে পুরুষের একটা normal inclination (স্বাভাবিক প্রবৃত্তি) হ'বে তা' fulfil (পূর্ণ) করা—এতেই যে একটা কি pushing thrash (প্রেরণা) দেবে towards up-heaval অর্থাৎ উন্নতির দিকে—তা' বলা যায় না! আর এই পছন্দের ব্যাপারে এক বর্ণের মেয়ের অন্য বর্ণের ছেলের প্রতি পছন্দের প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহের লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মানুষের ভিতর যে instinct (স্বাভাবিক প্রবৃত্তি) থাকে সেগুলি quality-র (গুণের) বীজ-স্বরূপ, আর temperament (স্বভাব) হ'চ্ছে সেই বীজগুলি থাকতে পারে এমনতর আধার এবং insulation—তাই instinctকে (স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে) qualification-এ (গুণে) উদ্দীপ্ত করতে হ'লে temperament (স্বভাব) মাফিক nourishment-এর (পুষ্টির) দরকার। তা' না দিলে সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যে বর্ণেরই হউক তা' germinateও করে না

(জন্মায় না), আর germinate করলেও (জন্মাইলেও) তা'র educated growth হয় না। তাই যে temperament-এ (স্বভাবে) যেমনতর nourishment (পুষ্টি) দরকার, উপযুক্তভাবে তা'র তেমনতর পরিচর্য্যা ও পরিবেশনের উপর তা'র উপযুক্ত growth (বৃদ্ধি) নির্ভর করে—আর তা' করলেই আপনি দেখতে পাওয়া যা'বে কেমনতর কি হয়!

"কোন কিছুর আবাদ কম হ'য়েছে এমনতর জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় সেই soil-এর (মাটির) উপযোগী বীজগুলির একটা এমনতর virile growth (বলশালী জন্ম) হয়, কোন আবাদ বেশী হ'য়েছে এমনতর জায়গায় উত্তম পরিপোষণেও তা' হয় না। সেইজন্য আবাদ কম হ'য়েছে এমনতর জায়গায় যদি সাধারণতঃ আবাদ হয়, এমনতর জায়গায় যদি উত্তম বীজ উপ্ত করা যায় তা'র ফসল যে খুব ভাল হয় তা'তে কাহারও সন্দেহ নাই। তাই উচ্চবর্ণের ছেলে যদি গ্রহণোপযুক্ত নিম্নবর্ণের মেয়ের সহিত মিলিত হয়, সাধারণতঃ ফল ঐ রকম উত্তমই হইয়া থাকে। তাই ইহা ধর্ম্মদ ও শাস্ত্রানুমোদিত, কিন্তু প্রতিলোম ঠিক তা'র উল্টো। প্রতিলোমে যেমন উচ্চ সহজ সংস্কারগুলি অপহৃত অনাদৃত হইয়া নিম্ন সংস্কারে বাধ্য ও বি-নীত হয়,—তাই সে যেমন নিম্নকে আরও দুর্ব্বল করিয়া মূর্ত্ত করে অবসন্ন করিয়া তা'র শিশুকে,—তা'র পিতা ও মাতার সহজ ও পুষ্ট সংস্কার হইতে—আর সেইজন্যই সে অসম হইলেও পাপ;—অনুলোম তেমনই পুরুষের উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিকে আগ্রহে আনন্দে বিস্মিত হইয়া ধারণ করে বলিয়া সে মূর্ত্ত করিতে পারে তা'র শিশুকে—আরোতর করিয়া—তা'র পিতা ও মাতার উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিতে—তাই সে বিষম হইলেও পুণ্য ও পবিত্র! তাই আমি বলি, অনুলোম যেমন উন্নত প্রসব করে প্রতিলোম তেমনি অবনতিকে বৃদ্ধি করে;—তাই প্রতিলোম বিবাহ এমনতর পাপ যাহা নিজের বংশকে ধ্বংসে অবসান তো করেই, তাহা ছাড়া পারিপার্শ্বিক বা সমাজকেও ঘাড় ধরিয়া বিধ্বস্তির দিকে চালিত করে। অনুলোম জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্রমোন্নয়নে অধিরূঢ় করে বলিয়া তাহা ধর্ম্ম ও পুণ্যের প্রসবিতা; আর প্রতিলোম সংসর্গ জাতির বংশানুক্রমিক অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের অপঘাত ঘটাইয়া—হীনত্বে সংবর্দ্ধিত ও পরিচালিত করিয়া মূর্ত্ত করে বলিয়া—তাহা অধর্ম্ম, হীনতা ও পাপেরই জননী।

"উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের একটা সহজ শ্রদ্ধা থাকেই। তা'ছাড়া, যদি মেয়েরা স্ব-মনোনীত কোন উচ্চবর্ণের পুরুষকে লাভ করে,—তা'হ'লে সে শ্রদ্ধার উৎকর্ষ কতখানি active (কর্ম্মঠ) হ'য়ে ওঠে ভাবিলেই বোঝা যায়। আর উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী যদি হয়,—তা'হ'লে তা'দের

সন্ততি সুস্থ ও সবলদেহ এবং উচ্চবর্ণানুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন স্বভাবতঃই হ'য়ে থাকে। তাই সুপ্রজননের দিক দিয়া ইহা তুচ্ছ নয়। আর সমাজের দিক দিয়া এই প্রকার বিবাহে প্রত্যেক বর্ণের ভিতর একটা অচ্ছেদ্য জমাট ভাব বজায় থাকাই স্বাভাবিক। আর বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণই আর্য্যজাতি,—difference of cultural heredity হিসাবে (কৃষ্টিগত বংশানুক্রমিকতার প্রভেদে) এই বিভাগ। অতএব জাতির দিক দিয়া বা species-এর দিক দিয়া কোন প্রকার বৈষম্য নাই। সুতরাং সুপ্রজননের উৎকর্ষ এমনতর ভাবে বজায় থাকাই স্বাভাবিক। আরো কথা, higher culture-এর (উচ্চতর কৃষ্টির) সাথে lesser culture-এর (নিম্নতর কৃষ্টির) মিলনে lesser (নিম্নতর) higher-এ (উচ্চতরে) পর্য্যবসিত হয়; আর higher (উচ্চতর) আরও higher-এর (উচ্চতরের) দিকে যায় —যদি higher-এর (উচ্চতরের) সহিত lesser-এর (নিম্নতরের) মিলনের ভিত্তি regard ও admiration-এর (শ্রদ্ধা ও প্রশংসার) উপর দাঁড়ায়। যেমন, কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে শিক্ষা দেন, তবে ছাত্রের উৎকর্ষের সাথে সাথে শিক্ষকের জ্ঞানেরও উৎকর্ষ আসে—ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয়, তাই ঋষিগণ অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের এমনতর প্রশংসা করিয়াছেন। কোন্ কুক্ষণে কেমন করিয়া অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ও আদর্শ শিক্ষা পীড়িত বিধ্বস্ত হইয়াছিল, আর তখন থেকেই জাতি, সমাজ ও দেশ অধঃপাতের দিকে অবাধে ছুটিয়াছে।

"আবার এই বিবাহ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের দিকেও লক্ষ্য করিবার আছে। ধাতু বা temperament হ'চ্ছে বৈধানিক বৈশিষ্ট্য (characteristics of the system), যা' নাকি অনেকখানি মানুষের বোধ, চিন্তা, চরিত্র ও চলনকে নিয়ন্ত্রিত করে; তাই পুরুষের বৈশিষ্ট্য জীবনকে উপ্ত করা—নারী সেখানে ধারণ করিয়া মূর্ত্ত করে ও বৃদ্ধিতে নিয়োগ করে, আর এটা সাধারণতঃ এককালীন একককে;—পুরুষ এই সময় বহুতে উপ্ত করিতে পারে, তাই নারীর বৈশিষ্ট্য একগামিনী হওয়া, আর এটা তার সুস্থ মনের সম্পদ। পুরুষ কিন্তু স্বভাবতঃই বহুগমন-প্রবণতা লইয়া জীবনধারণ করে। তাই আমি বলি, 'হে নারী! তোমার স্বামী আদর্শে, চরিত্রে, জ্ঞানে ও সেবায় উচ্ছল থাকিয়াও যদি বহুভার্য্যাসম্পন্ন হন, আর তা' যদি তোমার স্বামীর পক্ষে অমঙ্গলপ্রদ না হয়,—দুঃখিত হইও না, বরং ভালবাস, যত্ন লও;—দেখিবে তোমাতে তোমার স্বামী আরো তুমি-প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন,—চিন্তা করিও না!' পুরুষ যদি উপযুক্ত হয়, ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট ও আপ্রাণ থাকে—জীবনটা যা'র একটা incessant

পুরী সমুদ্রসৈকতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, জননীদেবী ও অনন্তনাথ

(সপত্নীক মিঃ এ, সি, পাল দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন)

(নিরন্তর) বিজলী-রেখার মতন দীপ্তি দিতে দিতে ব'য়ে যায়, তা'দেরই বহু-বিবাহ একান্তই সমীচীন—সমীচীন কেন, নিতান্তই দরকার। আর যা'রা স্ত্রীতে inclined (আনত) হ'য়ে পড়ে, স্ত্রী-নিষ্ঠা যা'দের ভূতের মতন ঘাড়ে চে'পে বসে—তা'দের বহু-বিবাহ ত' দূরের কথা, মেয়েদের মুল্লুকেও যাওয়া উচিত নয়—তা'দের নিজের sexual satisfaction-এর (কাম-চরিতার্থের) জন্য জাতিটাকে, বর্ণ ও জীবনগুলিকে জাহান্নামে দেওয়া উচিত নয়। পুরুষের স্ত্রী-নিষ্ঠা একটা অসম্ভব ব্যাপার; ইষ্ট-নিষ্ঠাই হ'চ্ছে স্বাভাবিক কথা। স্ত্রীতে থাক্‌বে ভালবাসা, মমতা ইত্যাদি—স্ত্রী হ'বে তাহার সহধর্ম্মিণী। পুরুষের স্ত্রী-নিষ্ঠা যখনই হয়, জাতি ত' তখনই সাবাড় হওয়া সুরু করে—আর আজকাল ব্যাপারও তাই হ'য়েছে। স্ত্রী-নিষ্ঠা যদি হয় তবে তো বহু স্ত্রী হ'লে সর্ব্বনাশের ব্যাপার—একটা বিরাট ঘনীভূত কিম্ভূত কিমাকারে পর্য্যবসিত হয়ই বা হ'বেই। যিনি আদর্শে অটুট, আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ, নারী যাঁ'র তাহারই ইন্ধন হওয়া ছাড়া আর কিছুতেই তাহাকে নিজেতে অবনত করাইতে পারে না, এমনতর পুরুষই বস্তুতঃ বহু স্ত্রী গ্রহণে সমর্থ;—নতুবা ইহা যাহার নাই বহু স্ত্রী গ্রহণে সে খিন্ন, দুর্ব্বল ও মূঢ় হইয়া পড়িবে তাহাই আশা করা যায়। ঐ অমনতর ইষ্টনিষ্ঠ পুরুষের যদি বহু স্ত্রী হয় এবং উপযুক্তরূপে বিধি-মাফিক যদি breed (সন্তান উৎপাদন) করে, তা'হ'লে সমাজ ও দেশ তেমনি মহান্ সন্তান-সন্ততিতে ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌বে। ঋষিরা ইহাই চাহিয়াছিলেন,—তাই বিধিও সেইরূপই দিয়াছেন। উৎকৃষ্ট পুরুষকে বহু স্ত্রী বরণ করিলে সেই পুরুষেরই বহু উৎকৃষ্ট সন্ততি জন্মিতে পারে এবং সমাজের ভিতর যাহারা নিকৃষ্ট আছে তাহারা যাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট, তেমনতর অন্য স্ত্রী তাহাদের খোঁজ করিবে এবং বিবাহ করিবে;—তার ফলে আর্য্যসমাজ-দেহই পুষ্টিলাভ করিবে এবং যাহারা তেমন উৎকৃষ্ট নয় তাহারা উৎকৃষ্টের পূজক হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিবে;—ইহাই বোধ হয় জীবের স্বাভাবিক উৎকৃষ্টে অভিমুখী হইবার সহজ ও সাধারণ উপায়।

"একগামিনী হওয়া নারীর বৈশিষ্ট্য হইলেও অবস্থাবিশেষে বিধবা-বিবাহও সমাজের পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্রে এইজন্যে বিধবা-বিবাহের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন বিধবা নিঃসন্তান হয় আর বিবাহে ইচ্ছুক হয়, বুঝিতে হইবে সে তাহার স্বামীকে গ্রহণ করে নাই—তাহার বৃত্তিগুলি কাহাতেও সার্থক হয় নাই—তাই তা'র ঐ ক্ষুধা অতৃপ্ত। তাহাকে এমনতর অবস্থায় উপযুক্ত পুরুষে ন্যস্ত করাই সমীচীন—নতুবা তাহার দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। বিবাহ করিলে সে নিজে এবং সমাজ দুই-ই

অবনতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। আর মানুষের যখন ঐ ক্ষুধা প্রখর হয়—সে যখন কোন-কিছুতে দাঁড়াইতে না পারে, তা'র কাছে শত নিয়ম, শত সৎকথা, শত বিভীষিকা নিষ্ফল,—অতএব তাহাকে পরিণীত না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা এক রকম দুঃসাধ্য—তা'র বিবাহই বাঞ্ছনীয়।"

প্রসঙ্গক্রমে আর্য্য বিবাহপদ্ধতির মহান সম্পদ ও সুদৃঢ় সমাজবন্ধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা:—

"আমার মনে হয় আর্য্যদ্বিজগণের অনুলোমী অন্তর-বর্ণের মিশ্রণে যে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা বাস্তবতায় পিতৃবর্ণেরই হ'য়ে থাকে—মাতৃবর্ণানুপাতিক ঐ পিতৃবর্ণের ভিতরে gradation বা থাকের যা-কিছু difference (প্রভেদ) হয় মাত্র। আবার এঁদের ভিতর বিবাহাদি ব্যাপারও ঐ থাক-অনুপাতি অনুলোমক্রমেই হওয়া উচিত—আর এর ভিতর দিয়ে যে advent of hereditary instincts (বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব) through অনুলোম Eugenics হয় সেগুলি জাতি ও কৃষ্টির একটা মহান সম্পদ স্বরূপ। কারণ, ঐ মাতৃবর্ণের temperament-এর ভিতরে ঐ evolving, higher fulfilling instinctগুলি admiration-উদ্বুদ্ধ enchanting urge-এর nurture-এ এমনতরভাবে গজিয়ে উঠ্তে থাকে, যা'তে জাতি ও কৃষ্টির evolution with all its phase, invention-এর আশীষ্ বহন কর্তে কর্তে গরিমামণ্ডিত হ'য়ে পরিস্থিতির অমরণ সম্বৃদ্ধির আধিপত্য বাস্তববাহী ক'রে তোলে। আর এই প্রত্যেক পিতৃবর্ণ বা প্রত্যেক পিতৃ-থাকের একটা elating affectionate urge স্বতঃই থাকার দরুণ মাতৃবর্ণের প্রতি-প্রত্যেকের তা'দের প্রতি একটা ovational urge থাকায় normal ইষ্টীপূত কৃষ্টিসূত্রে সমগ্র জাতিটা যেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রে'খেও charming ovation-এর cohesive urge-এ একটা normal বিরাট ক্রমবিবর্দ্ধনী crystallisation-এ উপনীত হ'য়ে থাকে—দেখলে মনে হয়, সব মিলে যেন বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী একটা পুরুষ। এতে class-war তো স্থানই পায় না বরং class-worth এত বে'ড়ে যায় যার ফলে কেউ-হারা হ'লে সবার অস্তিত্ব যেন কেঁপেই ওঠে। প্রতি-প্রত্যেকেই যেন চায় তা'র পরিস্থিতির প্রতি-প্রত্যেককে নিয়ে আরো আরোতে বিস্তার লাভ ক'রে নিজেকে হরদম আরো ক'রে তুল্তে। কারণ প্রতি-প্রত্যেকেই মনে করে, তা'র পরিস্থিতির প্রত্যেকেই যেন তা'র নিজের পক্ষে বাঁচা-বাড়ার পরম সম্পদ—বিপদে আপদে রক্ষা পাওয়ার সহজ ও দুর্ভেদ্য দুর্গ, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক প্রত্যেকের উন্নতিই যেন প্রত্যেক নিজের উন্নত হ'বার পরম স্বার্থ। এটা তা'রা প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনে দেখ্তে

থাকে, প্রত্যক্ষ করতে থাকে—যা' আমরা আমাদের চক্ষুতে এখন আর তেমনতর দেখায় অভ্যস্ত নই—যদিও বাস্তবিক আমাদের পারিপার্শ্বিক থেকেই আমরা উন্নতভাবে বাঁচা-বাড়ার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে থাকি আর নিজেদের বাহাদুরী ফলাতে গিয়ে অম্লানবদনে একটা ঢোক গিলেই একছের ঐ পরিস্থিতির অবদানগুলিকে,—nurture-কে অস্বীকার ক'রে ফেলি।

"আর্য্যকৃষ্টি কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা'র ঐ মৌলিক দর্শনের উপরেই। ঐ দর্শনটা যা'দের কাছে যত কঠোর বাস্তব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁ'রাই হ'য়েছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই তাঁ'রা ছিলেন কৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক। আবার ঐ তাঁ'দের instinctগুলি Eugenics-এর ভিতর দিয়ে যখন normal characteristic হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, একটা 'স্যাকে' পরিণত হ'য়েছিল, তাঁ'দের সেই সন্তান-সন্ততিদিগকে বিপ্র বলা হ'ত—বিপ্র মানেই হ'চ্ছে born with perfect fulfilling instincts. আবার এই বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের ভিতর অনুলোমক্রমিক সেই সেই অন্তর-বর্ণের সন্তানসন্ততি যা'রা উৎসৃষ্ট হ'তে লাগল, ঐ higher instinctগুলি মেয়েদের admiring enchanted urge-এর ভিতর দিয়ে reverential affectionate nurture-এ তা'দের temperament-এ সংস্থিত ঐ higher instinctগুলি peculiarly blended হ'য়ে, মূর্ত্ত হ'য়ে, জাতির instinctগুলিকে finer ও rich in varieties ক'রে তুলল। তাই তা'রা কোনক্রমে সমাজ হ'তে discarded তো হ'তই না—বরং গভীরভাবে compact-ই হ'য়ে উঠ্‌ত।

"আর, জনের—প্রতিজনের—অমনতর ovational homage-ই হ'চ্ছে ঐ cohesive urge—যা' দিয়ে জাতি পরস্পর একাদর্শপ্রাণতায় আকৃষ্ট হ'য়ে কৃষ্টিপরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে, অনুলোমী Eugenic uplift-এ, একগাট্টায় normal evolution-এ evolve ক'রে থাকে। শুধুমাত্র material interest of equalisation—যা' দিয়ে person-এর প্রতি person admiration বা affection-এ entwined নয়, তা'তে ওই cohesive urge weakened হ'তে হ'তে একটা বিরাট বিকৃত pulverisation-এ উপনীত হয়—এক সংসারে পিতায় শ্লথভক্তিসম্পন্ন, equally interested ভাইদের ভিতর ভ্রাতৃদ্রোহিতা যেমন ক'রে স্থান পে'য়েছে—এই তো দুনিয়ায় হরদম দেখ্‌ছি!

"তাই আবার ওঁরা পরস্পর প্রত্যেকেরই সর্ব্বতোভাবে, আচরণীয় বলেই ঋষিরা ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন। অবশ্য এ সবই অনুলোমক্রমিক homage and admiration-এর ভিতর দিয়ে—জোরের দাবী দিয়ে নয়কো—পুত্রের দাবী পিতার কাছে যেমনতর কিংবা শিষ্যের দাবী গুরুর কাছে যেমনতর—এই তো আমি যা' বুঝি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য ঃ—

"বর্ণ জাতি নয়কো। বর্ণভেদ মানেই classes of culture (কৃষ্টির শ্রেণী)—যা' নাকি একটা বা কতগুলি family-র (পরিবারের) ভিতর পুরুষ-পরম্পরায় চল্‌ছে—তাই নিয়ে হ'ল বর্ণ। আর সেই সেই family-তে (পরিবারে) সেই culture-এর (কৃষ্টির) instinct (বৈশিষ্ট্য) গুলিও প্রত্যেক individual-এর (ব্যষ্টির) ভিতর more lively (আরও জীবন্ত)—তাই এই রকমে অনেক বর্ণ স্বাভাবিকই। সেইগুলিকে চারিটী grand division-এ (প্রধান বিভাগে) ভাগ করা হ'য়েছে—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আর এ সব-দেশে আছেই, আর থাক্‌তেই হ'বে। যে বর্ণ বা বর্ণগুলি nourish (পুষ্ট) করে এবং elate (উল্লসিত) করে ও fulfil (পরিপূর্ণ) করে through love and service (প্রেম ও সেবাদ্বারা), সেই বর্ণ বা সেই সেই বর্ণ যা'দিগকে fulfil (পূর্ণ) কর্‌ছে, তা'দের কাছে normally regard and admiration (স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা) পে'য়েই থাকে ; কারণ তা'দের interest (স্বার্থ) elated ও elevated (উল্লসিত ও উন্নত) হ'চ্ছে with love, nourishment and service (প্রেম, পুষ্টি ও সেবাদ্বারা)। সেই রকমে ব্রাহ্মণ যা'রা তা'রা অন্যান্য বর্ণের সকলকে fulfil (পরিপূর্ণ) করে ব'লে তা'রা বলে, তা'রাই বলেছে—'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।' ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও যেখানে যেমন যতটুকু—সেই জায়গায় ঠিক তাই তেমনি admiration and regard (প্রশংসা ও শ্রদ্ধা) পে'য়ে এসেছে।

"তা'হ'লে বর্ণভেদ—জাতিভেদ নয়কো। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরায় এদের ভিতর কোন difference (পার্থক্য) নেইকো, শুধু honourable treatment (সম্মানজনক ব্যবহার) ছাড়া। তাই যে বর্ণ যত অধিককে service (সেবা) দিয়ে fulfil (সার্থক) কর্‌তে পারে বা পে'রেছে, regard বা admiration-এর (শ্রদ্ধা বা প্রশংসার) আসনও সেখানে ততখানি সে পায় বা পে'য়ে এসেছে—তা'তে আর বলবার কি আছে? কারণ এ রকমটা করাই সমাজ ও জাতির দিক দিয়ে স্বস্থতা ও উন্নতির লক্ষণ।

"বর্ণভেদটা যদি ঠেলে নিয়ে জাতিভেদে পর্য্যবসিত করা যায় তবে যা' গোলমাল হওয়া উচিত তাই হয়—তাই বোধ হয় হ'য়েছেও। বর্ণগুলি তো জাতি হিসাবে একই, কিন্তু বর্ণ তো জাতি নয়? কারণ জাতি তা-ই যা' নাকি কোন-একটা stock (গুচ্ছ) থেকে descent করে (উদ্ভূত হয়), যা'র ভিতর কোন সমাজ বা individual-এর (ব্যক্তির) difference

(পার্থক্য) থাকে না। আমরা সবই Aryan stock-এর (আর্য্যবংশের) মানুষ, তাই জাতিরও difference (পার্থক্য) নাই। আর মানুষের জীবনের ও যাপনের প্রয়োজনীয় যা' কিছু তা'র এক-একটা, এক-একটা family (পরিবার) যদি প্রধানতঃ culture করে এবং সবাইকে fulfil (সার্থক) করে service (সেবা) দিয়ে, তা'হ'লে যা'দের fulfil (পরিপূর্ণ) ক'চ্ছে, যা'দের interest-কে (স্বার্থকে) elated (উল্লসিত) ও active (কর্ম্মঠ) ক'রে তুল্‌ছে, তা'দের সাথে difference (পার্থক্য) হওয়াটাই যে ঘোর অস্বাভাবিক ব্যাপার।

"তাই সত্যিকার বর্ণাশ্রম কোথায়ও কোনপ্রকার অবনতি তো আন্‌তেই পারে না, বরং বর্ণাশ্রমের অভাবই সমূহ ক্ষতি এনে দিয়ে থাকে—আর হ'য়েছেও তাই। দিক্ দেখি বর্ণাশ্রম মাথাতোলা তা'র সমস্ত serving zeal (সেবার উৎসাহ) নিয়ে—দু'দিনের ভিতর কি দাঁড়ায় দুনিয়াটা অবাক্ হ'য়ে দে'খে নেবে। আর আর্য্যের বর্ণাশ্রম কতখানি যে scientific (বিজ্ঞানসম্মত), কতখানি reasonable (যুক্তিযুক্ত), আর কতখানি efficient (কার্য্যকরী) তা' দে'খে স্তম্ভিত হ'তে হ'বে না এমনতর কেউ থাক্‌বে ব'লে মনে হয় না।

"বর্ণাশ্রমে hatred (ঘৃণা) কোথাও নাই—বরং আছে admiration (প্রশংসা), আছে honour (সম্মান), আছে respect (শ্রদ্ধা) and respectful (সশ্রদ্ধ) inclination (আনতি)। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে hatred (ঘৃণা) ঢুকিয়ে দিই তাহা পূর্ব্বতনদিগের কথিত বর্ণাশ্রম, না ইহা আপনাদের তৈরী বর্ণাশ্রম? আপনারা অহং-কণ্ডূতির জালায় অস্থির হ'য়ে hatredful (ঘৃণাপূর্ণ) বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তৈরী ক'রতে পারেন, কিন্তু তাই ব'লে ত' তাঁ'রাও যা'কে বর্ণাশ্রম ব'লেছেন তা' তো আর তা' হ'বে না। আপনাদের হয়ত—পূর্ব্বতনদের ভাব, ভাষা ও নিদেশগুলিকে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখ্‌তে পারেন—তাঁ'দের প্রতি এমনতর অনুগ্রহ কর্‌বারই অবসর নেইকো। তাই ব'লে বিধান-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য-বর্ম্মাবৃত সেই মহান্ পুরাতনরা কখনই খিন্ন হ'বেন না। যতই আপনাদের চক্ষু যত বেশী ও যত finer (সূক্ষ্মতর) আলোক-সহনশীল হ'য়ে উঠ্‌বে, সে আলোকে তাঁ'দিগকে দেখ্‌তেই হ'বে—দেখ্‌বেনও—আর ভক্তি-অবনত হ'য়ে এখন-অশরীরী সেই তাঁ'দের চরণে মাথাটা কৃতার্থ হ'য়ে লুটে পড়্‌বেই পড়্‌বে—আমি ত' দেখতে পাই এই হ'চ্ছে তাঁ'দের বিরাট বৈশিষ্ট্য। Equality-র (সাম্যের) যুগই আসুক, fraternity-র (ভ্রাতৃত্বের) যুগই আসুক, বর্ণ থাকবেই—সে লোক হ'তে লোকান্তর ঘুর্‌বেই, মানুষের বাঁচা-বাড়াকে সার্থক

ক'রে তুল্‌বেই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'রা বাঁচা-বাড়ায় সার্থক হ'তে চায়। তবে এই বর্ণাশ্রম যত acquisition-এর (অর্জ্জনের) ভিতর দিয়ে instincts (স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য) হ'তে হ'তে heredity-কে (বংশানুক্রমিকতাকে) অতিক্রম ক'রতে ক'রতে চলে, এর knack (কৌশল) ও fineness (উৎকৃষ্টতা) ততই বাড়্‌তে বাড়্‌তে গিয়ে জাতি ও জনসমাজকে ততই আরোতর উন্নতিতে অধিষ্ঠিত ক'রে চালাতে থাকে;—আর যেখানে তা' হয় না, সেখানে প্রত্যেককেই যে যে বর্ণের করণীয় যা' তা'র প্রথম ভাগ থেকেই স্বরু কর্‌তে হয়—আর এর ভিতর দিয়ে জনগণের উন্নতির ভালমন্দ তারতম্য ইত্যাদি ঘটে' থাকে—আর heredity (বংশানুক্রমিকতা) বর্ণাশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই।

"কিন্তু ঋষিরা বলেন, সবাইকেই ব্রাহ্মণ হ'তে হ'বে ঐ বর্ণাশ্রমের ভিতর দিয়েই—প্রাণপাত আলিঙ্গনে কৃষ্টিকে বা আর্য্যকৃষ্টিকে অবলম্বন ক'রে। আর ব্রাহ্মণ মানেই হ'চ্ছে—নখদর্পণে তা'র যা-কিছু জাতির বাঁচা-বাড়ার উন্নতি চলনার নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ ও লওয়াজিমা।

"বর্ণভেদের গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে culture (কৃষ্টি), যা' দিয়ে জীবনকে বৃদ্ধির পথে উন্নত কর্‌তে হ'বে। যা' যা' জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে—দৈনন্দিনই হউক আর যেমনই হউক—নিত্য প্রয়োজনীয়, তারই এক-একটা division (বিভাগ) নিয়ে বা এক-একটা aspect (দিক) নিয়ে যা'রা work out ক'রে (কাজে লাগিয়ে) তা'র আবার উন্নত নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষের necessitiesগুলি (প্রয়োজনগুলি) fulfil (পরিপূর্ণ) ক'রে তা'দের being and becoming-কে (জীবন ও বৃদ্ধিকে) service (সেবা) দিয়ে, তা'দিগকে উন্নত সম্বেগশালী ক'রে তুল্‌ছে, সে বা তা'রাই হয় বর্ণ of culture for that aspect; আর এ যে-দেশে যা'রাই জীবন-বৃদ্ধির উন্নতপন্থী তা'দের দেশেই যেমন ভাবেই হউক—এ থাক্‌তেই হ'বে; কারণ ওগুলি হ'চ্ছে মানুষের বেঁচে থাকা, উন্নত স্তরে চলার লওয়াজিমা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। প্রয়োজনের সবগুলিকেই প্রত্যেকেরই যদি সব aspect (দিক) নিয়ে deal (ব্যবহার) ক'রে নিজের জীবনকে ওগুলি supply (সরবরাহ) ক'রে উন্নত স্তরে চালাতে হয়, তা' এক-রকম অভাবনীয়—আর যদি করেও, তা'-হ'লে জীবন-চলনা এমনতর মন্থর হ'য়ে উঠ্‌বে, যা'র ফলে তা'কে অচল বল্লেও অন্যায় বলা হ'বে না। তা'হ'লেই ঐ division (বিভাগ) বা aspect (দিক)গুলিকে work out ক'রে জীবনের needs (প্রয়োজন)গুলি fulfil (পরিপূর্ণ) ক'রতে হ'লেই কা'কেও বা কা'দেরও ওর এক-আধটা নিয়ে work out কর্‌তে হ'বে—তা' বংশানুক্রমিক ভাবেই হউক আর

profession (ব্যবসা)স্বরূপ ধ'রেই হউক—কিন্তু ক'রতেই হ'বে তা'। ক'রতে হ'বে না, একথা কি আমরা কখনও কল্পনা ক'রতে পারি? আর ঐটে যখন সন্তানসন্ততিক্রমে বংশানুক্রমিকভাবে চল্‌তে থাকে, তখন ঐ skill to work out the thing or affair (কোন কিছু করার নৈপুণ্য)—ওটা ক্রমশঃই সন্তান-সন্ততিদের ভিতর instinct-এ (স্বভাবে) পরিণত হ'যে উঠ্‌তে থাকে। আবার তার ফলে সেগুলিকে finely (সূক্ষ্মভাবে) and superiorly (শ্রেষ্ঠভাবে) easily (সহজে) out put (উৎপাদন) করার capacity (সামর্থ্য) with an inventive genius (উদ্ভাবনী প্রতিভাদ্বারা) মাথাতোলা দিয়ে ক্রম-পরিপুষ্টিতে চ'ল্‌তে থাকে। তা'র ফলে মানুষ ঐ অমনতর elevative (উন্নয়নকারী) চলনার লওয়াজিমাও তা'দের as a service of being and becoming (জীবন-বৃদ্ধির সেবাস্বরূপ) পে'তে থাকে। তারই ফলে আবার সমাজ ও দেশ প্রত্যেক individual (ব্যষ্টি) হিসাবে একটা উদ্দীপ্ত দীপক সম্বেগশালী হ'য়ে নির্ব্বাধভাবে চল্‌তে চল্‌তে চলে। এই হ'চ্ছে heredity-র বংশানুক্রমিক বর্ণের তাৎপর্য্য।

"আবার এই বংশানুক্রমিক বর্ণের গোড়ার ব্যাপারই কিন্তু ঐ আর্য্য culture-কে (কৃষ্টিকে) with service as a division of labour (শ্রমবিভাগ হিসাবে স্ব স্ব সেবাদ্বারা) work out ক'রে প্রত্যেক being-কে (জীবকে) accelerate (ক্রমবর্দ্ধমান) করা—আর এতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে fulfil (সার্থক) ক'চ্ছে ব'লে, প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের মতন important and admired—(প্রয়োজনীয় ও প্রশংসিত)—কাউকে কাউর ignore (অস্বীকার) করা অসম্ভব। আর তা' যত সম্ভব হ'য়ে থাকে, বিপ্রবস্তিপ্রাণ সর্ব্বনাশও ততদূর ও ততখানি সম্ভব হ'য়ে ওঠে। তাই আমার এ idea (ভাব) যা'রা being and becoming-এর (জীবন ও বৃদ্ধির) পক্ষে elating and reasonable (উন্নয়নকারী ও যুক্তিযুক্ত) মনে করে, তা'রাই তা' কর্‌তে পারে। এর সুবিধা যে এক্টার, যে-দেশেই হোক না কেন কিছুদিন এ চালালে আমার মনে হয় তাহাদিগকে এ ঠিক পে'তেই হ'বে। অবশ্য এটা সাধারণতঃ দেশকালপাত্রভেদেই—অবস্থামাফিক নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে; তাই যেখানে যেমন আকারে এটা সম্ভব—more profitable (আরও লাভজনক), সেখানে তেম্‌নি ক'রে এটাকে apply কর্‌তে (কার্য্যে লাগাতে) হ'বে।—এই হ'চ্ছে আমার কথা!

"প্রত্যেকটী সমাজই যেন এক একটী পূর্ণ বিধান (system)—আর এই বিধানের প্রধান প্রধান অঙ্গই হ'চ্ছে—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ;—যে-কোন

প্রকারেই হউক, যে সমাজ বাঁচিয়া আছে ও উন্নতিতে অগ্রসর হইতেছে সেখানেই এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া (function) আছেই; আব তা' যেমন সুস্থ ও সবল হইবে, সমাজের উন্নতিও তেমনতর হইবে! তাই আমি বলি—

'যিনি বা যাঁহারা ইষ্টে উপাসনা ও অনুরক্তিকে অটুট করিয়া—অধ্যয়ন, গবেষণা, অধ্যাপনা, তাঁহার ও তাহার যজন ও যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহের সহিত প্রত্যেক ব্যষ্টিকে নিজেরই বিভিন্ন মূর্ত্তিবোধে, তাহার জীবন, যশ ও বৃদ্ধির সেবা করিয়া ব্রহ্ম বা বৃহতের ভাবে অবস্থান করেন তিনি বা তাঁহারাই ব্রাহ্মণ; যদি সার্থক হইতে চাও—ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা কব,—আর তাহা এমন করিয়া, যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব তোমাব স্বভাব ও চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তোমাকেই মূর্ত্ত ব্রহ্ম বলিয়া মানুষ বোধ করিতে পারে।

'আবার যিনি বা যাঁহারা ইষ্টে উপাসনা ও অনুরক্তির সহিত জানা, গবেষণা ইত্যাদির অনুধাবন করিয়া, জীবকে ক্ষত ও বেদনা হইতে ত্রাণ ও নিবাময় করিয়া জীবন, যশ ও বৃদ্ধির সেবায় জীবনকে বাস্তবভাবে উৎসর্গ কবিযাছেন—তিনি বা তাঁহাদেরই ক্ষত্রিয় বলা যায়; যদি বীরত্বই তোমার কাম্য হয়, নিষ্ঠার সহিত ক্ষত্রিয়ত্বকে অভ্যর্থনা কর।

'আর যিনি বা যাঁহারা ইষ্টপ্রাণ হইয়া উপাসনা ও অনুরক্তির সহিত জানা, গবেষণা ইত্যাদির অনুধাবন করিয়া তাহার উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, সেবায় মানুষের প্রয়োজন পূরণ কবিযা, অর্থ ও ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া, তৎ-উন্নতিকল্পে মানুষেব উদ্বর্দ্ধনের জন্য দান করিয়া সার্থকতাকে অর্জ্জন কবেন, তিনি বা তাঁহারাই প্রকৃত বৈশ্য; যদি তোমার ইষ্টপ্রতিষ্ঠাদ্বাবা জনসেবায় মানুষকে সমৃদ্ধ কবিয়া নিজে সমৃদ্ধ হইতে চাও,—তবে বৈশ্যত্বের আরাধনা হইতে বিমুখ হইও না।'

"তা'হ'লেই এখনই আমরা আগাদ্বিজ সমাজের এইভাবে সংস্কার করিতে পারি। যাঁহাবা ব্রাহ্মণ আছেন, এঁদেব প্রথম চাই খুব ক'রে আঁ'কড়ে ধরা ইষ্ট-প্রাণতাকে—আর এটা বাক্য ও কর্ম্মেব ভিতর দিযে জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে—স্বাস্থ্যের সমীচীন নিয়মগুলির সহিত আচরণে। দৈনন্দিন জীবনে যা' Brahminic culture (ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টি), তা'ব সাধনা কিছু-না-কিছু ক'রতেই হ'বে। আর এগুলি নিয়ে যতদূর সম্ভব tremendously (ভীমবেগে) public-এর (জনসাধারণের) প্রত্যেককে সেবার ভিতর দিয়ে তা'দের অন্তরে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে। ব্রাহ্মণরা চাকরী বাকরী যাই-কিছু করুন—তাঁ'দের জীবনকে উক্তরূপে চালিয়ে—আর যা'-কিছু-সব!

"আমার মনে হয় এমনি করতে করতে ইষ্ট ও পূর্ত্তের সেবাই তাঁ'দের হ'য়ে উঠ্বে normal (স্বাভাবিক) চাকুরী—আর এই চাকুরী অযাচিত-ভাবে তাঁ'দিগকে ভরণপোষণ ক'রে পরম সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যা'বে। ব্রাহ্মণদের ভিতরে যদি সুপ্তভাবেও Brahminical instinct (ব্রাহ্মণ্য ধারা) বজায় থে'কে থাকে—তা'দের যদি শিখান যায় with vigorous impulse (আপ্রাণতার সহিত)—তোমার সামনে যা-কিছু দেখ্ছ এগুলি তোমার বা তোমার ইষ্টেরই বিভিন্ন জাজ্জ্বল্যমান মূর্ত্তি, তোমার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ যা' কিছু চাহিদা ঠিক তেমনতরই ভাবে নানা রকমে এঁদের ভিতরে জাগরূক আছে—অতএব Do to others as you wish to be done by them (অন্যের প্রতি তেমন ব্যবহার কর, তুমি অন্যের নিকট যেমন ব্যবহার পাইতে চাও)—দেখ্বেন ঘাম দিয়ে তার ignorance-এর (অজ্ঞতার) জ্বর ছু'টে যা'বে—চলন, বলন ও সেবা—তৎক্ষণাৎ এমনতর একটা pose (হাবভাব) নিয়ে তা'র চরিত্রকে উদ্দীপ্ত ক'রে—আরম্ভ হ'বে যেন আর সে মানুষই নাই, সব বদ্‌লে যা'চ্ছে—এটা এইজন্য বল্লাম, যাঁ'রা সত্যিকার ব্রাহ্মণ ছিলেন এটা তাঁ'দের normal instinct (স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য) ছিল। তাঁ'দের সন্তান-সন্ততি—যাঁ'রা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায়ও জীবনযাপন ক'চ্ছেন ignorance-এর (অজ্ঞতার) কোলে—ধাক্কা বেশ ক'রে দিতে জান্‌লে তৎক্ষণাৎই সাড়া পাওয়া যে'তে পারে।

"আর বর্ত্তমানে যাঁ'রা কায়স্থ আছেন সাধারণতঃ তাঁ'দের ক্ষত্রিয় ব'লে গণ্য করা যায়; তাঁহারা ইষ্ট বা আদর্শ ও Brahminic culture-কে (ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টিকে) আপ্রাণ অবলম্বন করিয়া মানুষের প্রত্যেক individual-এর (ব্যষ্টির) service (সেবা) দিয়া being and becoming-এর (জীবন ও বৃদ্ধির) যা-কিছু বাস্তব ক্ষত ও অন্তরায় তাহাদের প্রতিরোধ করিয়া অপসারণ করতঃ তাহাদের রক্ষা করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। আর এখন এই উদ্দেশ্য-পরিপূরণার্থ সাম্রাজ্যের শান্তি রক্ষা করা ও executive functions (শাসন-সংক্রান্তকার্য্য)গুলি adopt (গ্রহণ) করিতে পারেন—আর তাঁ'দের আর্য্য আদর্শ ও কৃষ্টির পরিপোষণ-উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া চাকুরীকে অবলম্বন করিলেও উন্নয়নের পথ নেহাৎ রুদ্ধ হইবে না, যদি চাকুরী তাঁ'দের জীবনের temperamental function-কে (ধাতুগত কার্য্যকে) অপঘাত না করে। যেখানে অপঘাত করে সেখানে তাঁ'রা যদি principle-কে (আদর্শকে) ত্যাগ ক'রে চাকুরীকেই principle (আদর্শ) করিয়া লন তবে কিন্তু সর্ব্বনাশ!

"বৈশ্যদের main function (প্রধান কর্ম্ম) হ'চ্ছে ব্যবসা, industry

(শ্রমশিল্প), commerce (বাণিজ্য) ও manufacture (বস্তুনির্ম্মাণ)-এর ভিতর দিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সেবা করিয়া সম্পদ-আহরণে ইষ্ট ও culture-এর (কৃষ্টির) পরিপোষণ করিয়া সার্থকতার ভিতর দিয়া নিজের ও পরিবার-পরিজনের পুষ্টি! তাঁ'দেরও দৈনন্দিন জীবন অনেকটা ব্রাহ্মণের দৈনন্দিন জীবনের তুল্য হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। তাহা না হইলে পাতিত্যের আক্রমণ হইতে এড়াইয়া থাকা এক-রকম অসাধ্য, কারণ, সর্ব্বপ্রকার সম্পদ সর্ব্বদাই তাঁ'দের সেবা করিয়া থাকে। তাঁ'দের মধ্যে যদি ঐ সম্পদ আধিপত্য করিতে পারে তাঁ'রা কেন—সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ একদম সটান চলে এসে সবটাকে সাবাড় করতে কিছুই লাগে না। যখনই সম্পদ এই আর্য্য বৈশ্যদের হৃদয়ে আধিপত্য করিয়া আদর্শ ও কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করিয়াছে, কৃতঘ্নতার লেলিহান ছুরি মদমোহিত বৈশ্যদের হাতের ভিতর ঢুকিয়া অমৃতবাহী Brahminic culture-কে (ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টিকে) অবসাদগ্রস্ত রক্তাক্ত কলেবরে ঘাড়-ধাক্কা দিয়া বিদায় দিয়াছে—আর তা'রই ফলে সর্ব্বহারা, দিশাহারা, ক্ষীণজ্যান্ত জাতি আর্য্যাবর্ত্তের বুকে শিয়াল-কুকুরের মতন অনাদর ও অবহেলায় অবশ ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ বেকুব চলনে ঘু'রে বে'ড়াচ্ছে। আজ যদি বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বে সেবার শূল নিয়ে রুদ্র অমৃতের ডাকে হুঙ্কার ছে'ড়ে, বুক পে'তে আদর-আপ্যায়িতের সহিত প্রত্যেককে আগ্‌লে ধরে—আর্য্য উমা কি ভঙ্গিতে যে এখনই নেচে' উঠে' জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে অঢেল ক'রে দেন—তা' আমাদের সুখ-কল্পনার দিগ্বলয়েরও ও-পারে।

"আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী aborigines (আদিম অধিবাসী) যাঁ'রা তাঁ'রাই বাস্তবিক শূদ্র—এক-কথায় তাঁ'রাই হ'চ্ছেন শুচীকৃত বা আর্য্যকৃত আদিম অধিবাসী। তাঁহাদের বৃত্তি এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক কার্য্যে সাহায্য করা—আর এই হ'চ্ছে তাঁ'দের সেবা—হাতে-কলমে কৃষিকার্য্য করিয়া raw material produce (কাঁচা মাল উৎপন্ন) করিয়া জাতির সমৃদ্ধির সৃষ্টি করা—আর এই Brahminical culture-এর (ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টির) সেবা করিতে করিতে practically (কার্য্যতঃ) এই Brahminical culture-এর (ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টির) যত functions (কর্ম্ম) আছে তা'র output (উৎপাদন) করিতে করিতে যে নিনড় experience (অভিজ্ঞতা) লাভ করা যায় সেই experience-এর (অভিজ্ঞতার) ভাণ্ডার লইয়া জাতিকে সর্ব্বতোভাবে গড়ে' তোলা। এই আর্য্যজাতির uphill motion এর (ঊর্দ্ধগামী গতির) acceleration-ই (বিবৃদ্ধিই) হ'চ্ছে front-এ (সম্মুখে) ব্রাহ্মণ আর back-এ (পিছনে) শূদ্র।

"চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ কতকটা আমাদের body-system-এর (শরীর বিধানের) মতন। শূদ্র হ'চ্ছে এই whole system-এর (সমুদয় বিধানের) carrier (বাহক) এবং supporter (সহায়ক), যা'র উপর ভর দিযে এই সমাজদেহ চল্‌ছে। বৈশ্যদের function (কর্ত্তব্য) হ'ল সমাজদেহকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখা by the supply of proper nutrition and food (যথোপযুক্ত পুষ্টি এবং খাদ্য সরবরাহ দ্বারা)। বৈশ্যশক্তি এই function discharge (কর্ত্তব্য সম্পাদন) করতে যেদিন পরাঙ্মুখ হ'ল, সেদিন এই সমাজদেহ ভে'ঙ্গে পড়্‌লো। Stomach (পাকস্থলী) যদি boycott (অসহযোগ) করে, আমাদের body-system-এর (শরীর বিধানের) যে অবস্থা হয় তাই হ'ল। এই বৈশ্যশক্তি যদি আবার জাগে এবং legs, heart ও brain-কে (পা, হৃদ্‌পিণ্ড ও মস্তিষ্ককে) proper nutrition supply করে (উপযুক্ত পুষ্টি যোগায়), তবে আবার সমাজদেহ জে'গে উঠ্‌বে। Body-system-এর মধ্যে heart (হৃদ্‌পিণ্ড) যেমন, সমাজদেহের মধ্যে ক্ষত্রিয় তেমন। Heart-এর মধ্যে দু'রকম cells (কোষ) আছে :—(1) White cells (সাদা কোষ), (2) Red cells (লাল কোষ)। Red cells-এর (লাল কোষের) কাজ হ'চ্ছে body-কে fit (কার্য্যক্ষম) রাখা এবং maintain (পরিপোষণ) করা by the proper distribution of red blood (লাল রক্ত উপযুক্ত ভাবে বিতরণ দ্বারা)· এবং white cells-এর (সাদা কোষের) কাজ হ'চ্ছে body-কে protect (রক্ষা) করা। ক্ষত্রিযত্বের মধ্যে এই দু'টি function (কার্য্য) আছে, একটী সমাজদেহকে fit (কার্য্যক্ষম) রাখা ও maintain (প্রতিপালন) করা, আর একটি disease-এর (রোগের) হাত থেকে protect (রক্ষা) করা। কিন্তু এই দুই blood-এর supply (যোগান) নির্ভর করছে stomach-এর (পাকস্থলীর) উপর।

"সমাজদেহের brain (মস্তিষ্ক) হ'চ্ছেন ব্রাহ্মণ, যাঁ'দের working (কার্য্যতা) নির্ভর করছে ক্ষত্রিয়শক্তি, বৈশ্যশক্তি এবং শূদ্রশক্তির উপর। তাঁ'রা যেমন যেমন এই তিন শক্তির নিকট support and help (সাহায্য ও সহানুভূতি) পা'চ্ছেন, তেমন তেমন এই তিনকে regulate, control (নিয়মিত ও আয়ত্ত) করতে পারছেন। এই চারিশক্তির মধ্যে কেহই ছোট বড় নয়। একটা harmony (সমন্বয়) ও co-ordination-এর (সমবায়ের) যোগে এদের মধ্যে একযোগে একতানে কাজ হ'চ্ছে। কিন্তু body-র মধ্যে brain-এর স্থান যেমন সর্ব্বোচ্চে এবং সর্ব্ব উচ্চে থাকাটা legs, stomach ও heart-এর existence-এর পক্ষে নিতান্ত

দরকার, তেমন ব্রাহ্মণকে উচ্চ ব'লে স্বীকার করাতে লাভ হ'চ্ছে অন্যান্য বর্ণের বেশী। ব্রাহ্মণকে উচ্চ place দেওয়াতে, যে উচ্চতা তাঁ'র মধ্যে inherent (স্বাভাবিক) হ'য়ে আছে, অন্যান্য বর্ণ চল্‌তে পারছে ঠিকমত তাঁ'রই guidance-এ (নির্দ্দেশে)। Head-কে বড় স্বীকার করা যেমন body-র অন্যান্য অঙ্গের পক্ষে লজ্জার নয়, বরং পরম গৌরবের, তেমনি অন্যান্য বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণকে বড় ব'লে মানা তা'দের বাঁচা-বাড়ার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। Superior-এর উপর শ্রদ্ধা রে'খে যদি তুমি সমাজকে পুনর্গঠন করতে লেগে যাও, তবে সে সমাজ টিক্‌বে—তা'র growth হবে healthy. কোন প্রকার jealousy-র (ঈর্ষার) স্থান এ সমাজে থাক্‌বে না—অথচ full co-operation (পূর্ণ সহযোগ) থাক্‌বে।

"বৈশ্যেরা যদি ভারতীয় culture-কে (কৃষ্টিকে) betray (অবজ্ঞা) না করত তবে আমাদের দশা আজ এমন হ'ত না। যেদিন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ্যশক্তি বৈশ্যশক্তির active support এবং co-operation (বাস্তব সাহায্য ও সহানুভূতি) হা'রাল সেই দিন থেকেই সুরু হ'ল ভারতীয় culture-এর (কৃষ্টির) অধঃপতন! তা'রা করল কি জানেন? ব্রহ্মদেশ, জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, এমন কি সুদূর মেক্সিকো পর্য্যন্ত তা'রা বাণিজ্য-ব্যপদেশে চ'লে গেল; দেশ-বিদেশের রত্নরাজি ও বিবিধ ধন-সম্ভার এনে তা'রা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ্য-শক্তিকে বাচিয়ে রে'খেছিল। তা'দের সঙ্গে সঙ্গে গেল কিছু কিছু ক্ষত্রিয়েরা এবং ব্রাহ্মণেরা। তখনকার দিনে এই তিন শক্তির মধ্যে full co-operation ছিল। এমনি ক'রেই Indian আর্য্য culture দূর দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু কালক্রমে হ'য়ে পড়্‌ল বৈশ্যেরা selfish. বিদেশে তা'রা বিয়ে করতে আরম্ভ করলো এবং বিদেশের সঙ্গে এই বৈবাহিক সম্পর্ক তা'দিগকে self-centred (আত্মসর্ব্বস্ব) ও আর্য্যকৃষ্টি-বিমুখ ক'রে তুল্‌ল। তা'রা চল্‌তে লাগ্‌ল তা'দের অনার্য্য স্ত্রী ও শ্বশুরের কথা মত। অনেকে বিদেশে বসবাস করতে লাগ্‌ল আর্য্যকৃষ্টির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে। বৈশ্যদের মধ্যে যা'রা দেশে র'য়ে গেল তা'রাও ঐ বাহিরের বৈশ্যদের দেখাদেখি culture ও state-কে (কৃষ্টি এবং রাষ্ট্রকে) support (সাহায্য) করা বন্ধ ক'রে দিল। এমনি ক'রেই বৈশ্যদের বিরাট অর্থ ও সামর্থ্য culture ও state-এর সেবায় ব্যয়িত না হ'য়ে ব্যয় হ'তে লাগ্‌ল তা'দের নিজেদের সুখ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিকরণে। Service (সেবা) বাদ দিয়ে enjoyment-এর (ভোগের) sense (চাহিদা) বেড়ে উঠ্‌ল, ফলে যা' হ'বার তাই হ'ল। এখানে বাহিরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধই আমাদের সর্ব্বনাশ এনেছে এরূপ বলা যাইতে পারে না,

কারণ বাহির থেকে new blood ত' চাই-ই আমার। তা' না হ'লে জাতি ত' পুষ্টই হয় না। তবে আদর্শের ভাবানুযায়ী ও-রকমটা হওয়া চাই, নতুবা একদম সর্ব্বনাশ! আর্য্য বৈশ্যেরা চিরকালই বাহির থেকে কন্যা নিয়ে এসেছে এবং through proper filtration (উপযুক্ত পরিশ্রুতির মধ্য দিয়া) তা'দের আর্য্য ক'রে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টির সঙ্গে যোগ রে'খে যদি বৈশ্যরা চল্‌ত তা'হ'লে এই বাইরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ তা'দের আত্মসর্ব্বস্ব ক'রে তুল্‌তে পারত না।

"এখনও যদি বৈশ্যেরা ইষ্টপ্রাণতার সহিত ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া তা' দিয়ে ইষ্টের সেবা ও প্রতিষ্ঠার জন্য লেগে যায় তবে সে instinct আবার মাথা তু'লে দাঁড়াবে। Instinct কখনও মরে না, dormant (সুপ্ত) থাকে। সুযোগ ও সুবিধা পে'লে আবার দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠে। Instincts হ'চ্ছে করার ঝোঁক বা knack (কৌশল), যা' এক-এক মানুষে এক-এক রকম। যা' heredity-র ভিতর দিয়ে acquired (আয়ত্ত) হ'য়েছে তা' কখনও মর্‌তে পারে না। বাহির থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, মরে গেল কিন্তু ভিতরে বেঁচে থাকে। এই instinct যদি passion-এ (কামে) যুক্ত হয় তবে মানুষকে অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়, আবার ইষ্টে inclined হ'লে তা'কে tremendous (ভীমকর্ম্মা) ক'রে তোলে, প্রকৃত স্বাধীন ও অবাধ ক'রে তোলে।

"আর সব বর্ণেরই ব্রাহ্মণ হওয়া লক্ষ্য ছিল। ব্রাহ্মণ তিনিই যিনি সমস্ত রকম করাকে এবং তা'র কৌশলকে এস্তামাল ক'রে practically (বাস্তবভাবে) সমস্ত জানাকে জে'নে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়েছেন। সুতরাং practical জানার ভিতর দিয়া হাতে-কলমে তিনি বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বকে জে'নে পরে তিনি ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছেছেন। এইজন্য ব্রাহ্মণ যিনি, তাঁ'র পক্ষে অপর সমস্ত জানাকে control ও manipulate (নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য) করা সহজ ও স্বাভাবিক। এই জন্যই আমি বলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রত্যেকের বাড়ীতে একটা laboratory (গবেষণাগার), অন্ততঃ একটা cottage industry (কুটীরশিল্প) এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় তরিতরকারী উৎপাদন-উপযোগী কৃষি থাকবে, আর এ শিক্ষা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে। আর এই শিক্ষা যদি আমরা এখনই introduce করতে পারি তা'তে যে social order গ'ড়ে উঠ্‌বে সেখানে যদি কখনও এক বর্ণের co-operation নাও পাওয়া যায় তবে whole system ভেঙ্গে পড়্‌বে না, replace করা সহজ হ'বে। আর বিপ্র যা'রা তা'দের ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছাইতে গেলেই বৈশ্যত্বের ও ক্ষত্রিয়ত্বের সব জানাকে আয়ত্ত করতে হ'বে। এই

রকমটা হ'লেই সমস্ত বর্ণের মধ্যে একটা co-ordination এবং cultural co-operation থাকবে। আর অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ভেতর দিয়েই এই cultural co-ordination এবং co-operation (কৃষ্টিগত মিলন) সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'বে।"

চতুরাশ্রম :—

"ঋষিপ্রবর্ত্তিত আর্য্য চতুরাশ্রমের যেদিন থেকে বিলোপ-সাধন হইয়াছে, তখন হইতেই জাতির অধঃপতন সুরু হইয়াছে। জাতিকে বাঁচাইতে এবং বৃদ্ধি পাওয়াইতে হইলে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জীবনে উক্ত চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা প্রতিপালন অবশ্যকরণীয়। কারণ Life-কে (জীবনকে) চার ভাগ করিয়া acquisition-এর (অর্জ্জনের) gradual development-এর (ক্রমোন্নতির) জন্যই বিশেষ শ্রম করিয়া knowledge and experience (জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা)কে অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে ঋষিরা এই চতুরাশ্রমের রকমারি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"যে জায়গায় থেকে হাতে-কলমে পরিশ্রম ক'রে অনুসরণ, পর্য্যবেক্ষণ, অধিগমন ও ধারণার ভিতর দিয়ে জানাকে অর্জ্জন করে' সত্তা অর্থাৎ যাহা জীবন ও বৃদ্ধির পোষণীয় ও যা'তে তা' বৃদ্ধির পথে চল্‌তে পারে, তা'কে লাভ করা যায়, তা'কেই আশ্রম বলা হয়। আশ্রম—খাও দাও আর ফূর্ত্তি কর, পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার ধার ধেরো না, খেয়াল-খুসীকে বেপরোয়া চালাও—এমনতর জায়গা নয়, বা এমনতর কিছু নয় :—বরং অটুট ইষ্টপ্রাণতায় উদ্দীপ্ত হ'যে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটা পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধির বাধাকে স'রিয়ে যথাযথভাবে তা'র পোষণীয় ও ভরণীয় যাবত যা'-কিছুর ব্যবস্থা ক'রে, প্রতি-প্রত্যেককে জীবন ও বৃদ্ধির দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে, প্রত্যেক অন্তরে নিনড় ও নির্ঘাত-ভাবে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় তা'দিগের অবাধ চলনে অমরণের দিকে চালিয়ে দেওয়া—আর এই করতে গিয়ে মানুষের ভক্তি, জ্ঞান ও সহজ-কর্ম্মপ্রবণতার চলনে ইষ্টসাক্ষাৎকার হ'য়ে আপ্রাণ মঙ্গলময়তায় যা' হ'বার তাই হয়—এই তো গেল আশ্রমের কথা!

"আর মানুষের যে চতুরাশ্রমের কথা বলা হ'য়েছে ও হ'চ্ছে, মানুষের জীবন ও চলনার ক্রমবিকাশ ও বিবর্দ্ধনের চারিটী থাক্। প্রথমেই হ'চ্ছে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থাৎ যাহাতে মানুষ বৃদ্ধি পায়, আর যা' দিয়ে সে অজানার ভেতর থেকে জানাকে কুড়িয়ে নিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রত্যেক অন্তরে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—ইষ্টপ্রাণতা অবলম্বন ক'রে—তাঁ'রই চিন্তন ও আচরণ—এই

হ'চ্ছে সত্যিকার ব্রহ্মচর্য্য। আর এই করতে গেলেই মানুষের যা-কিছু বৃত্তি আছে সবগুলিকেই এতে লাগাতে হ'বে—তা' সব রকমে, আর সে বৃত্তিগুলি লাগাতে গেলে ঐ করার অপলাপ হয় সেগুলিকে আলাদা ক'রে অকেজোভাবে রাখ্‌তে হ'বে। আবার যখন তা'র দরকার হ'বে সেই রকম স্থান বা অবস্থায় তা'তে তেমনি ক'রে প্রয়োগ করতে হ'বে যা'তে নাকি ঐ সত্য—অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি—পোষিত হয় বা উদ্দীপ্ত হয়;—এই হ'চ্ছে ব্রহ্মচর্য্যের কায়দা।

"কিন্তু এটা বেশ ক'রে মনে রাখ্‌তে হ'বে—এর প্রথম ও পরম উপাদানই হ'চ্ছে অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা; এ যেমন ক'রেই হোক—এটাকে পুষ্ট করতে হ'বে—আর খুব-সে ক'রে অমোঘ ও নিনড়ভাবে বাড়াতে হ'বে। আর এ যত পুষ্ট ও পরিষ্কার হ'বে, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা একটা শান্ত অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে ততই তীব্র হ'য়ে দাঁড়াবে—আর এই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাই হ'চ্ছে ঐ পথ অতিক্রম করার একমাত্র পদক্ষেপ। যখন এমন ক'রে মানুষ তা'র ঐ ইষ্ট-আশ্রয়ে অটুট হ'য়ে, সত্যকে জেনে স্থায়ী হয় অর্থাৎ যেমন ক'রে বা যা' করলে যেমন যা' হয়—আর তা' যা' ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে—তা' জানা একটা সহজ নিশ্চয়তা লাভ করে;—তখনই সে তা'র অন্য পারিপার্শ্বিককে স্থান দিয়ে রক্ষা, পরিপোষণ ও পরিপালন করতে পারে। সে তখন তা'দের আশ্রয়স্থল হওয়ার উপযুক্ত পাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়—আর এই হ'ল গৃহস্থ আশ্রমের সুরু জীবন।

"আবার এমনি ক'রে সেবা, সাহচর্য্য ও সহানুভূতির ভিতর দিয়ে ভূয়োপর্য্যবেক্ষণের চলনায় চল্‌তে চল্‌তে, করার ভেতর দিয়ে জানাকে অর্জ্জন করতে করতে, ইষ্টপ্রাণতায় আরোতর হ'তে হ'তে তোমার অন্তর এমনতর একটা বিস্তারে এসে পৌঁছুবে—যা'তে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে স্থিত হ'য়ে, অন্যের স্থিতির উপযুক্ত হ'য়েছিলে তার দরুণ তোমার ঐ গৃহস্থাশ্রমে থেকে তোমার পরিবার-পারিপার্শ্বিককে যেমন যেমন যা' ক'রেছ—সেটা আর তোমার জীবনের পক্ষে অত্যন্তই ছোট্ট, দম-আট্‌কান মতন ব'লে মনে হ'বে, বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের ডাক তোমাকে উদ্ব্যস্ত ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুল্‌ছে ব'লে নিয়তই তোমার মনে একটা ছেঁৎছেঁতানি ভাব মাথাতোলা দিতে থাকবে—মনে হ'বে তোমার ইষ্ট-উপভোগ ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে আরোতর বেগে না চল্‌লে যেন জীবনটা তোমার নিনড় স্থবির হ'য়ে উঠ্‌ছে।—ঐ হ'চ্ছে তোমার বানপ্রস্থের ডাক—অর্থাৎ বিস্তারে গমনের ডাক—বন মানেই হ'চ্ছে বিস্তার। তোমার চলনাকে আর কেউ আট্‌কাবার নেই,

তাই ঐ বিস্তারের স্থান বনকেই মানুষ ঠিক ক'রে নিয়েছিল তখন,— যখন তুমি গৃহস্থাশ্রমে অমনতর ভাবে দাঁড়াতেই পার্‌লে না, করার ডাক, চলনার ডাক তোমাকে নিয়ত এমনতরই ক'রে তু'লেছে, যা'তে তোমার জীবনধারণ-উপযোগী প্রয়োজনগুলো ধীরে ধীরে আরো আরো ভাবে ক'মে যা'চ্ছে, অথচ এই কম দিয়েও তুমি বেশ ঝর্‌ঝরেভাবে জীবনযাপন ক'র্‌তে পার্‌ছ। এতে ঐ গণ্ডীতে থাকা তোমার আরও মুক্তিতে যেন জোর ক'রে হাত ধ'রে একটা পরম আবেগময় টানে বিস্তারের প্রলোভনে বিহ্বল ক'রে তুল্‌ছে—তুমি কি আর দাঁড়াতে পার? তোমার ছেলে, মেয়ে, নাতি, পুতি যা'রা আছে তা'দের উপর তোমার ঐ আশ্রমে যা' কিছু ক'রেছ বা যা' কিছু কর্ত্তব্য তা'র ভার দিয়ে দিলে ছুট্‌—আর কি!

"আরম্ভ হ'লো তোমার বৃহত্তর জীবন—নন্দিত বিস্তার-বানপ্রস্থ আশ্রম। এই বিস্তারের বুকে দাঁ'ড়িয়ে তোমার জীবনের চলনা আরোতর বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। গৃহস্থাশ্রমে অনভ্যাসের দরুণ তোমার জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ—যেমন যেমন কর্‌লে তোমার এই চলা আরও অবাধ হ'তে পারে তার জন্য হয়তো বেহিসাবী ভাবে আপ্রাণ টানে কত কৃচ্ছ্র সাধনা ক'রে তোমার এই বাঁচন ও বর্দ্ধনটাকে যা'তে আরও কায়েম কর্‌তে পার অতি নগণ্য প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় তা' সব করায়ত্ত ক'রে নিলে; তা'তে সিদ্ধ হ'লে তুমি—জীবনের চিন্তাও ভুলে গেলে, মৃত্যুকে ভাব্‌বারও আর অবসর রইল না—ভৃত্যের মতন পরম গতিতে অবলোকন কর্‌তে কর্‌তে, স্থির চিত্তে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পথে তা'রই সেবায় আপনভোলা উদ্দাম ইষ্টপ্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্তা, চলন, বাক্য ও কর্ম্মে জীবের জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের পরিবেশন নিয়ে আত্মপ্রসাদের আবেগে চল্‌তে লাগ্‌লে।

"এর ভেতরেও ইষ্টপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ তোমার পর্য্যালোচনা, পরিবেক্ষণ, পরিবেশন ও নিযন্ত্রণ ইত্যাদি চল্‌তেই লাগ্‌লো। তারপর এমনতর চল্‌তে চল্‌তে ঐ চলনাই নিয়ে এল তোমার সন্ন্যাস;—অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম থেকে এতদূর পর্য্যন্ত যা' ক'রেছ, যা' হ'য়েছ, এমনকি তোমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যা' কিছু সব ইষ্টনিক্ষিপ্ত হ'যে তা'তে ন্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—আর এই হ'লো তোমার সন্ন্যাস আশ্রমের সুরু। তা' হ'লে একবার কল্পনা ক'রে দেখুন, প্রত্যেক আর্য্য দ্বিজেরই একটা শেষ পরিণতি হ'ত ইষ্ট-উদ্বুদ্ধ একটা বিরাট সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বে—প্রত্যেকেই যেন একটা বিরাট জন-সাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি—মায় তা'দের প্রত্যেক খুঁটিনাটীর—আর এই গজিয়ে উঠ্‌তো একটা অটুট আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার মেরুদণ্ডের উপর।

সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়

তা'হ'লে দেখুন এ সভ্যতা ছিল কি সভ্যতা! দুনিয়ার কোন জাতিই এখনও এর পরিকল্পনাও করতে পে'রেছে? প্রত্যেকেই ছিল বাস্তব হাতে-কলমে-গড়া ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের জ্যান্ত উৎস।"

অস্পৃশ্যতা :—

"স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই এক সময়ে ছুঁৎমার্গের প্রচলন হইয়াছিল। প্রাচীন যুগে ইহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত ও ঘৃণিত কর্ম্মজীবীদিগের মধ্যে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ইহা সমাজ ও জাতিগত হইয়া উঠিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকলেই নানারকমে দুষ্ট ও অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষকে নির্য্যাতিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন দিনই এ প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। শুদ্ধ স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে এবং সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তাঁহারা এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্যাধিগ্রস্ত, কু-আচারসম্পন্ন ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হইতে দূরে থাকা যে সমীচীন তাহা বৈদ্য এবং মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ঋষিরাও এইজন্যই ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়াছেন, ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া নহে—কেবলমাত্র শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য-প্রতিপালনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।

"ঋষি, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা বলেন, অন্ন বা আহার্য্যবস্তু এমন কি দাতার মানসিক ভাবকেও বহন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই কাহারও নিকট অন্ন গ্রহণ করিতে হইলে যাহাতে উন্নত মানসিক ভাবকে পাইতে পারি তাহাই করা উচিত। আবার যাহাতে ঘৃণা, অপ্রবৃত্তি, অস্বচ্ছন্দতা বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এমনতর স্থান, পাত্র ও আহার্য্য হইতে বিরত থাকাই উচিত। কারণ স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে মনও তেমনি স্বাস্থ্যকে বশে আনিতে পারে,—তোমার মন যত শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে, তোমার স্বাস্থ্যও অনেকাংশেই তা'র অনুসরণ করিবে;—আর এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলেই নজর রাখিতে হইবে তোমার পারিপার্শ্বিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি; অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য ও মনকে যত বিগ্‌ড়াইয়া দিতে পারে এমনতর আর কমই আছে।

"ব্যক্তি, স্থান এবং অবস্থা-বিশেষে খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে স্পৃশ্যতা বা অস্পৃশ্যতার কথা উঠিতে পারে, তাই বলিয়া কোন সম্প্রদায়বিশেষ কখনও অস্পৃশ্য হইতে পারে না; তাই সামাজিক হিসাবে স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা কোন কথাই আমি বলি না। এখানে সৎসঙ্গে যা'র যেমন ইচ্ছা সে তেমন করে,

কেহ মুসলমানের সঙ্গে খায়, কেহ খায় না। যে খায় না তাহাকে খাইতেই হইবে এমন কথা আমি বলি না। সকলের হাতে খাইলেই যে আমরা উদ্ধার পাইয়া গেলাম সে বুদ্ধিও আমার নাই; আবার সকলের হাতে না খাইলেই যে শুদ্ধ হইলাম তা'ও বলি না। স্পৃশ্যতা, অস্পৃশ্যতার আন্দোলন দিয়া দেশের বেশী-কিছু উন্নতি হইতে পারে সে বিশ্বাস আমার নাই। যখন ভাই ভাইকে পৃথক্ করিয়া দেয়, এক ভাই আর এক ভাইয়ের সঙ্গে একত্র খাইয়াও বিরোধিতা করে, তখন খাইলেই যে মিল হইবে তা' নয়। আমার মনে হয় সেবা আগে দরকার। অন্যের রাঁধা খাই বা না খাই কা'রও সুখ-সুবিধা যা'তে আমার দ্বারা হয় সেজন্য যদি চেষ্টা করি, তা'তে যতটা ফল হ'বে—তা'র তুলনায় অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের ফল কিছুই নয়।

"অনুন্নত, অস্পৃশ্য—এ সকল কথা আমার স্বীকার করতেই ইচ্ছা করে না। আমার মনে হয় তা'দের হীন, অস্পৃশ্য ব'লে ব'লে আরো হীন ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে, আর তা'দের আলাদা সম্প্রদায় ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে! তা'দের উন্নত করতে হ'লে প্রাণপণে তা'দের সেবা দাও, তা'দের ভালবাস, তা'দের সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতি কর এবং তা'রা যা'তে উৎকৃষ্টদের সংস্পর্শে বেশী থাকতে পাবে তা'র উপায় কর। এমনি না করলে কি অমন ক'রে হয়? আর জাতির ভিতর জমাট বাঁধন থাকে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহে —যাহা এক জাতি হ'তে অপর জাতিতে ছিট্‌কে যে'তে দেয় না অথচ বর্ণবিভাগ বা শ্রেণীগুলি থাকে ঠিক; কাজেই বিধিমাফিক অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের যতদুর সম্ভব প্রচলন অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের প্রধান ও একমাত্র উপায়।"

ছুঁৎমার্গ হইতেই 'অনুন্নত' 'অস্পৃশ্য' ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। আর সাম্প্রদায়িক সমস্যাই আজ দেশ ও জাতির পুনরুত্থানের পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। এই অস্পৃশ্য ও অনুন্নতের কল্যাণ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া হইতে পারে তাহা লইয়া নানা মতবাদ এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে দেশ ও জাতি বিধ্বস্তির চরমে পৌছিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে জাতি-সংগঠন উদ্দেশ্যে এই মহান্ অন্তরায়ের সমাধানের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে যে মীমাংসা-বাণী দান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার আলোচনা উদ্ধৃত করা হইল:—

প্রশ্ন। বাংলার নবশায়কেরা কোন্ জাতীয়? আচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুসারে তো বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পর্য্যন্ত নাই—সবই নাকি শূদ্র?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নবশায়কেরা আমার মনে হয় ঐ বৈশ্যবর্ণেরই অন্তর্গত

নয়টী শাখা বা বৈশ্যাচারপরায়ণী নয়টী শাখা। বিশেষ বিশেষ বৈশ্যবৃত্তিকে ওরা পুরুষানুক্রমে specialise (বিশেষভাবে অনুশীলন) ক'রে চল্‌ত— বিশেষতঃ যা' নাকি মানুষের immediate নিত্যনৈমিত্তিক service-এ লাগে।

জানি না আচার্য্য রঘুনন্দন কি ব'লে গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি হয়ত সংস্কারহীন দ্বিজ—আর্য্যকৃষ্টির আচার ও নিয়মকে যা'রা মান্‌ত না, না মেনে পাতিত্য অভিমুখে চল্‌ছিল—ঐ তা'দিগকে নির্দ্দেশ ক'রেই ওই কথা ব'লেছিলেন। দ্বিজগণ যদি আর্য্যাচার ও সংস্কারবিহীন হন, পাতিত্য তা'দিগকে শূদ্র category-তে (শ্রেণীতে) নিয়ে যে'তে থাকে—সেই হিসাবে তা'রা শূদ্র হ'তে পারে। তা'ই ব'লে তা'রা শূদ্রজাত নয়কো। কিন্তু আচার-বিহীন হ'লেও মানুষের অন্তর্নিহিত instinctগুলি দশ বিশ হাজার বছরেও নাকি ম'রে যায় না—এ আপনাদের বিজ্ঞানেরই কথা।

তবেই তা'দের যদি গোত্রজ্ঞান থাকে—আর যদি আর্য্যাচারপরায়ণ হয়, আর্য্য ইষ্ট ও কৃষ্টিকে যথাযথ আপ্রাণতায় অবলম্বন করে, তা'হ'লেই আবার তা'রা যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমার তো কোনই সন্দেহ নাই। তাই আমি বলি, 'ফে'রো, উঠে দাঁড়াও, ইষ্ট ও কৃষ্টিকে আপ্রাণতার সহিত আঁ'কৃড়ে ধর, আর্য্যাচার ও সংস্কারাদির যত পার অনুধাবন কর্‌তে থাক—স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হ'যে তোমার সব দিগন্তকে তাক্ লাগিয়ে দাও!'

প্রশ্ন। তা'ছাড়া, বাংলার সাহা, শুঁড়ি ও সুবর্ণবণিকগণেরও তো অন্নজলাদি অস্পৃশ্য—তা'ই বা কেন? এদের এত হীনত্ব এলো কোত্থেকে? এরই বা প্রতিবিধান কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাহা, সুবর্ণবণিক ইত্যাদিরা বৈশ্য ব'লেই আমার মনে হয়। সাহা—যাহারা মদ চোলাই কর্‌ত, মদের ব্যবসা কর্‌ত, দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক জে'নেও নিয়মকে অস্বীকার ক'রে তা'দের ঐ উপজীবিকা চালা'তে থাক্‌ল, তা'রাই চোলাই-করা সাহা শুঁড়ি ব'লে পাতিত্য-লাভ কর্‌ল। প্রতিলোমজ শৌণ্ডিক এরা নয়—শৌণ্ডিকের ব্যবসা অবলম্বন ক'রে দেশের অকল্যাণ সাধন ক'চ্ছিল ব'লে এরা হয়ত শুঁড়ি নামে অভিহিত হ'য়েছে। আর সুবর্ণবণিকেরা দেশের precious wealth (বহুমূল্য সম্পত্তি), সোণা অন্যদেশে রপ্তানী ক'রে, দেশের wealth-কে manipulate ক'রে অন্যদেশের wealth বাড়িয়ে, দেশকে দুর্ব্বলতায় সমাহিত ক'রে নিজেদের বৃত্তিস্বার্থের সেবা কর্‌ত ব'লেই তা'রা পতিত হ'য়েছিল—আরো শুনি, এরা নাকি আর্য্য আদর্শকেও বহুদিন ধ'রেই ignore-ই (অস্বীকারই) ক'রে আস্‌ছিল, তা'ও

একটা কারণ হ'তে পারে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ওরা খাঁটি বৈশ্য ব'লেই মনে হয়। আর সব পাতিত্যেরই প্রতিবিধান হ'চ্ছে, পাতিত্য-উৎপাদনী প্রবৃত্তিগুলিকে purposely (ইচ্ছাপূর্ব্বক) inhibit ক'রে (বাধা দিয়ে), ignore (অগ্রাহ্য) ক'রে সপারিপার্শ্বিক নিজের উন্নতিপ্রদ যা' তা'কে actively অটুটভাবে আঁ'কড়ে ধরা—ইষ্ট ও কৃষ্টিকে জীবন্ত ক'রে তোলা, আর সেই আচার ও অভ্যাসে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা যে আচার ও অভ্যাসের ফলে ইষ্ট, জাতি ও কৃষ্টির স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণভাবে সম্বৃদ্ধি-তৎপর যা'তে হয় তা'কেই নিজের বা নিজ প্রবৃত্তি-চাহিদার স্বার্থ ক'রে তোলা—আর ওরই ভিতর দিয়ে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, উন্নত ও সংবৃদ্ধ ক'রে তোলা —এই হ'চ্ছে যা-কিছু অবনতিরই মোক্‌থা উন্নত প্রতিবিধান—সহজভাবে যা' আমার মনে আসে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, অন্নজলাদি কোন্ কোন্ জাতির গ্রহণীয় ? অবিলম্বে কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে অন্নজলাদি প্রচলিত হইলে জাতির সমূহ উন্নতি অনায়াসে হইতে পারে ? আর কোন্ principle-এর (নীতির) উপর দাঁড়াইয়া আর্য্যসমাজে এই বিধি প্রচলিত হইয়াছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অন্নজলাদি ভোজন-সংস্রব ইষ্ট-প্রাণ দ্বিজসংস্কারী যা'রা শুধু তা'দেরই ভিতর চলিতে পারে। আর ইষ্টপ্রাণ শূদ্র, অনুলোমী উচ্চ শূদ্র —এদের সাথে জলের সংস্রব রাখাই আর্য্যঋষিগণের ব্যবস্থা—আবার যাহারা বাহ্যজাতি তা'দের সহিত উপযুক্তমত যথাবিহিত শুধুমাত্র সেবা-সংস্রবই আর্য্যঋষিরা ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। কিন্তু যা'রা bad hygienic affairs (স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক কার্য্য) নিয়ে deal করে (ব্যবসায় করে) শুধু তা'দেরই সঙ্গে আর্য্যঋষিগণ ছুঁৎ-সংস্রব নিষেধ ক'রে গেছেন—কারণ ঐ ব্যাপারে নিয়ত থাকতে থাকতে তা'রা immune হ'য়ে যায়, কিন্তু immune হ'লেও যা'রা ঐসব ব্যাপারে accustomed (অভ্যস্ত) নয় ওরা carrier (বাহক) হ'য়ে তা'দিগকে সহজেই contaminate (দুষ্ট) করতে পারে—এই বিবেচনায়ই ঐ ছুঁৎদোষের বিধানের আবির্ভাব হ'য়েছিল।

কিন্তু এমন যদি হয়—ঐ রকম বাহ্য জাতির যা'রা ঐ জাতীয় bad hygienic profession-এ (স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর কর্ম্মে) বহু পুরুষ ধ'রে লিপ্ত নয়কো বা ঐ সংস্রবে নিজদিগকে মিশ্রিতও করে না, অথচ মানুষের মঙ্গলপ্রদ পবিত্র profession (পেশা) ও কৃষ্টি নিয়ে ইষ্টপ্রাণতার সহিত জীবনযাপন ক'চ্ছে, তা'দের কিন্তু ছুঁৎদোষ ঋষিরা ধ'রেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। আরও আমার মনে হয় ঐ অমনতর reformed (সংস্কৃত) যা'রা—যা'দের অভ্যাস এমনতর চরিত্রগত হ'য়ে গেছে যে উন্নত সংস্রবে, উন্নত নিয়ন্ত্রণে না

থেকেই বা না চ'লেই পারে না, কোথাও কোথাও তা'দের জলও যে চ'লে গেছে খুঁজ্‌লে তা'ও হয়ত অনেকই দেখা যা'বে।

এই আর্য্যবিধানের elevationগুলি habit, behaviour, চলন-চরিত্রের ভিতর দিয়ে স্বতঃ হ'য়ে উঠে'ই promotion পায়। প্রকৃতিই automatically (স্বতঃই) promotion (উন্নয়ন) দিয়ে থাকে। কতগুলি লোক অনুকম্পাবশতঃ যে তা'দিগকে অর্থাৎ ছোটকে বড ক'রে তোলে ঠিক তেমনতর নয়কো—এই হ'ল আর্য্যবিধান-যন্ত্রের একটা পরম বৈশিষ্ট্য আমার যা' মনে হয়।

মানুষ যখন ছোটদের আচার, ব্যবহার, চলন, চরিত্র, পছন্দ, পরিশ্রম, জানা, কর্ম্মপটুত্ব, অভ্যাস, আদান-প্রদান ইত্যাদিতে তা'দের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'যে ওঠে—হরদম দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঐ ছোটদের অন্নপানীয়ও—অযুত-কৃতার্থ অন্তঃকরণে তা'দেব বিশেষ আপত্তি ও দীন অনুনয়ে নিবারণ সত্ত্বেও তা' উল্লঙ্ঘন ক'রে—সাগ্রহ সমাদরেব সহিত বড়রা গ্রহণ ক'রেছেন। এর লাখ প্রমাণ আছে, এখনও আমি অনেকই দে'খে থাকি। অশ্রদ্ধায় যদি বিপ্রও অন্নপানীয় দান করে তা'ও গ্রহণ করা নিষেধ—আর শ্রদ্ধায় উপযুক্ত অতি ছোটও বিনীত অবদানেব সহিত যদি পবিত্র কোন অন্নপানীয় বাঁচা-বাড়ার অনুকূল ক'বে নিবেদন করে—আর তা'তে যদি সে দীপ্ত, তৃপ্ত ও পুষ্ট হয়, তা'ও গ্রহণ করাই আর্য্যবিধি। আবার দ্বিজ হ'যেও যদি কেহ কুকর্ম্মান্বিত ও কুচিন্তাপরায়ণ হয়—বাঁচা-বাড়াব প্রতিকূল, ইষ্ট ও কৃষ্টির অবাধ্য হয়, তা'র অন্নজলাদিও সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য—ইহাও শাস্ত্রেব বিধান।

প্রশ্ন। আপনি যে বল্লেন, আর্য্য খাওযা-দাওয়া, আচার-বিচার সমস্তই 'hygienic standpoint থেকে, তবে আমরা যে নিমন্ত্রণ খাই তা' কেমন ধারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সম্বন্ধে উচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী যাঁ'রা তাঁ'দের wishes (ইচ্ছা), liking (পছন্দ), habits (অভ্যাস) ও idiosyncrasies (মেজাজ) যা'তে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ বা formality or courtesy-র sake-এ (আচার-নিয়ম বা ভদ্রতার খাতিরে) compromise কর্‌তে (মেনে নিতে) বাধ্য না হন তা'র জন্য ভোজনে তাঁ'দিগকে নন্দিত ক'রে নিজের তৃপ্তিলাভ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লেই তাঁ'দের খাদ্যসম্ভার নিজে বহন ক'রে নতিনন্দিত চিত্তে তাঁ'দিগকে দিয়ে আসাই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ ও সমীচীন। আমাদের দেশে সিধে দেওয়ার চল বোধ হয় ঐ থেকেই হ'যেছে। এই প্রথায় তাঁ'রা ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে খে'য়ে তৃপ্তিলাভও কর্‌তে পারেন; তা'র জন্য কোন formality-র obligation-এও পড়্‌তে হয় না, আর সাধারণতঃ এতে তাঁ'রাও তৃপ্তিলাভ

ক'রে থাকেন—তুষ্টও হন, নন্দিতও হন, hygienic administration-ও কোন formality কি obligation-এ লজ্জিত বাধ্য না হ'য়ে যথোপযুক্তই হ'য়ে থাকে আর উভয় পক্ষেরই time ও হাঙ্গামাও saved হয় ঢের।

আর এর চাইতে একটু হীন হ'চ্ছে—কেউ যদি ইচ্ছা ক'রে কারু হাতে বা কারু বাড়ীতে খে'তে চান তখন তাঁ'র চাহিদা-মাফিক hygienic principle-কে (স্বাস্থ্যের নিয়মকে) observe ক'রে (পালন ক'রে) তাঁ'কে তা' ক'রে দেওয়া। এটা সমানদের পক্ষেও সমীচীন। আর্য্যদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে hygienic principle follow করার (স্বাস্থ্যের নিয়মপালনের) প্রতি আবহমান কাল থেকে বড়ই আদর ও মনোযোগ। তা'র কঙ্কাল যতই বিকৃত আকার ধারণ করুক না কেন, আর্য্যদের ছিটে-ফোঁটা যেখানে আছে সেখানেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আর সব চেয়ে হীন হ'চ্ছে—অনুরোধের obligation-এ ফে'লে, নিজের ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে, সম্বন্ধে উচ্চই হোক, শ্রেষ্ঠই হোক্, সম্মানীই হোক্, সমানই হোক্ বা ছোটই হোক্ সবাইকে খাওয়ান—যেমনতর আমাদের চল্‌তি ভোজ দেওয়ার প্রথা। এতে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি তো observed হ'য়েই থাকে না, কত লোকের হয়ত কত দুষ্ট ব্যাধি আছে, অপকৃষ্টি দুষ্কর্মী immune—যা'দের দিয়ে হয়ত কত কত লোক infected (আক্রান্ত) হ'তে পারে, এমনতর লোকের হাতে তা'দের পরিবেশনে না খে'লে prestige-ই থাকে না—বাধ্য হ'য়ে এমনতর অবস্থায় উপনীত হ'তে হয়। কত কত মানুষ কিছু-না-কিছু ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েই পড়ে —কেউ জানে না, পাঁচ বছর পরে হয়ত এমন রোগে ধ'রে বস্‌ল, জীবন নিয়েই টান পাড়াপাড়ি—তা'র কারণ খুঁ'জে পাওয়াই দুষ্কর। সমাজের অতটুকু বেকুবীতে হয়ত কত flowers of the society অকালে অজ্ঞাতসারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হ'ল—একি ভাল, একি সমর্থনযোগ্য ?

তাই কেহ ইচ্ছা ক'রে না চাইলে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'যে কাউকে নিজের হাতে পক্ক অন্নজল ইত্যাদি আহার্য্য খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে নাই। ইহা সৌজন্যের পরিচায়ক হইলেও বাঁচা-বাড়ার সাধারণতঃ অপঘাতকারীই হ'য়ে থাকে। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে কোথাও আহার্য্য উপকরণাদি খাওয়ানর মতলব হইলেই কিংবা কোথাও কর্ত্তব্য মনে করিলেই সেখানে সিধা দেওয়াই স্বস্তি ও পুষ্টিপ্রদ—আর তা-ই হ'চ্ছে বাস্তবিক সাত্ত্বিক নিমন্ত্রণ। অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত কেহ আসিলেই তাহাকে সিধা দিবার প্রস্তাব করা উচিত, অবশ্য অশক্তের বেলায় অন্য কথা। সে-প্রস্তাব সত্ত্বেও সে যদি পক্কান্নাদি যাচ্ঞা করে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধাচারী হইয়া সরবরাহ করাই সমীচীন।

দারিদ্র্য-ব্যাধি

"Pauperism মানেই আমি বুঝি দারিদ্র্যে পাওয়া। এই দারিদ্র্যে পে'তে হ'লেই মানুষের প্রথমে থাকা চাই—Superior Beloved ব'লে—ইষ্ট বা আদর্শ ব'লে—কিছু না থাকা, বা with service fulfil করার urge as an interest বাস্তবতায় উপ্‌চে উঠে এমনতর প্রিয় ও পূজ্য ব'লে কিছু না থাকা—আর থাক্‌লেও তাঁ'কে নিজের প্রবৃত্তির ইন্ধনের প্রতীকরূপে place ক'রে রাখা। তা'র আদিম আসক্তি বা libido প্রায়শঃই একটা uphill enthusiasm-এ কাউকে সার্থক কর্‌তে বা কাউতে সার্থক হ'তে active হ'য়ে তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পারে না। আর এই থেকে, বা কারু bad nature, nurture বা manipulation-এর ফলে, কিংবা libido যখন distorted রকম ধ'রে চল্‌তে থাকে—তখনই মাথায় জন্মে motor ও sensory স্নায়ুর inco-ordination বা distorted co-ordination.

"যে মুহূর্ত্তে এই incoordination আস্‌তে থাকে, তখন থেকেই তা'র চিন্তা, বিচার ও বিবেচনা অর্থাৎ sensory impulse-মাফিক কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু বা motor nerve response দিয়ে active হ'য়ে ওঠে না, তা'র ভাব করাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এই জন্য তা'কে প্রথমেই একটু নজর ক'রে দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়, সে irresponsible. তা'র ঘাড়ে কোন একটা responsibility চা'পালেই সে যেন জলে-ডোবা মানুষের মতন আঁকুবাঁকু কর্‌তে থাকে, কখন বা বিরক্ত হয়, কখন অবসাদগ্রস্ত হয়, কখনও বা চ'টেই লাল! কথায় আছে 'আল্‌সেকে কাজের কথা বল্লে সে পণ্ডিতের মতন বুঝাইয়া দেয়,'—তা'র বাক্‌বিলাসিতা বা বাক্যবাগীশী প্রকৃতি with cautious rationality মাথাতোলা দিতে থাকে!

"যা'কে আমরা কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু বল্‌ছি, তা'কে আমরা শিল্পী-স্নায়ুও বল্‌তে পারি। আল্‌সে মানে হ'চ্ছে—ঐ শিল্পী-স্নায়ুর সহিত বোধপ্রবাহী স্নায়ুর এমন একটা incoherence বা অসঙ্গতি, যা'র ফলে মানুষ ক্রমে ক্রমে বৃত্তি-প্রলোভী হ'য়েও অবশ, হতাশাদর্শী ও নিষ্কর্ম্মা হ'তে থাকে। সে সংশ্লিষ্ট হ'তে চায় না কোন কাজে—কোন-কিছুতে সংশ্লিষ্ট হওয়াই যেন তা'র পক্ষে বিরাট শাস্তি বা তা'র উপর একটা বিরাট injustice.

"তা'র motor nerve-এর ঐ রকম শিথিলতার দরুণ জীবন-যাপনের চাহিদা কিন্তু থে'মে যায় না;—আর প্রবৃত্তির চাহিদার তোড়ে জীবন-যাপনের necessityগুলিকে fulfil করার জন্য ফাঁকিবাজী মতলব

সর্ব্বতোভাবে justified হ'য়ে real মূর্ত্তি নিয়ে তা'দের বিবেচনায় আবির্ভূত হ'তে থাকে। না-ক'রে-পাওয়ার philosophy with every zeal তা'র ভাল ক'রে এস্তামাল হ'য়ে ওঠে,—মানুষের কাছ থেকে নিয়ে, সে নিজের জীবনকে nourish করতে চায়; আর তা' না-ক'রেও তা'র উপায় নেই; কিন্তু তা'র পারিপার্শ্বিক যখন তা'দের জীবন-যাপনের কোন বিষয়ের জন্য তা'র কাছে হাজির হয় কিংবা চায়, তখন বিবেকের শাসন যতই তা'কে ওই দেওয়ার ব্যাপারে induce করতে থাকে, অথচ কার্য্যতঃ তা' করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি একটা diverted বা distorted স্বার্থের nature-এ এসে তা'কে তা' করতে দেয় না, বৃত্তিস্বার্থ তখন এমনতরই তা'র philosophising dictation-এ তা'দের induce ক'রে তোলে যে, সে innately যতই নিজেকে meanly inferior ভাবতে থাকে,—with every philosophical trick, ingratitude-কে সে ততই support করতে থাকে—এর ফলেই সে হয় normally ungrateful.

"আবার ungrateful হ'য়েও পারিপার্শ্বিকের কাছে justified হ'তে চায়। পারিপার্শ্বিক তা'কে otherwise consider করতে পারে, এই আশঙ্কায়ই সে হামবড়াই চালবাজীকে zealously মানুষের সম্মুখে ধ'রে নিজেকে establish করতে চায়।

"এই সব রকম থেকেই আসে তা'র সন্দেহ-বিলাসিতা। সব সময়েই doubt করে,—আমি তো যা' বলার তা' বল্লাম, যা' করার তা' করলাম, মানুষ ব্যাটারা কি ভাবলে তা' কে জানে, আর তা' জানতে পারা যায়ই বা কি ক'রে? তা'ই মনের কথা জানার আগ্রহ আপশোষের মতন তা'র অন্তঃকরণে উঁকি মারতে থাকে।

"এরই ভিতর দিয়ে সে demonstrate করতে থাকে মানুষের সামনে, সে মস্ত-বড় মানী লোক—তা'কে সম্মান না করা মস্ত-বড় অন্যায়, সব সময় দেখতে থাকে, কে তা'র প্রতি কেমনতর attitude দেখালে, তা'তে সে কতখানি ignored হ'ল!

"এমনই ক'রেই সে অত্যন্ত honour-sensitive হ'য়ে পড়ে। Irresponsibility ভূতে তা'কে গোড়াতেই পে'য়ে ব'সে আছে। প্রতি পদক্ষেপে সে মানুষের কাছে অবিশ্বাসী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—তা' বু'ঝেও, সে যে বিশ্বাসী তা' খুব ক'রে মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করতে চায়, honour-কে বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে নিয়ে, তা'কে যে injustice করা হ'ল, dishonour করা হ'ল, disbelieve করা হ'ল—প্রত্যেক affair-এর ভিতর দিয়েই সে তা' বোধ করতে থাকে। কিছু করার জন্য কিছু পয়সা দিয়ে তা'র কাছে

account চাইলেই সে বিরক্ত, দুঃখিত, মর্ম্মাহত বা রাগান্বিত হ'য়ে বল্বে, 'মশাই, বারে বারে account চা'চ্ছেন, আমাকে disbelieve ক'চ্ছেন? আপনার এই মিথ্যা অপমানসূচক ব্যবহার নেহাৎই অসহ্য,'—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"'অন্তর্নিহিত mean inferiority থাকার দরুণ মানুষের sympathy-কে তা'র প্রতি আকর্ষণ করার মতলবে saintly-posed ugly attitude-এ চল্‌তে থাকে। এমনই ক'রেই will to ugliness-এর সে যেন একটা prey হ'য়ে দাঁড়ায়—স্নান না করা, যেখানে সে খায়, থাকে—প্রস্রাব, থুথু, কাশ এদিক ওদিক ছিটিয়ে ফেল্‌তে থাকে, unhealthy চিমৃশে দুর্গন্ধ অপরিষ্কার বিছানা—তা' হয়তো কোন রকমের অস্বচ্ছন্দতা উৎপাদন করে না, অথচ শরীর-সর্ব্বস্ব—এটা তা'র normal characteristic হ'য়ে দাঁড়ায়। শুধু এই লক্ষণ দে'খেই তা'র সবটাকে determine করা যে'তে পারে।

"Ugly woman থেকে তা'র sexual impulse excited হয় বেশী—আবার এটা যখন অনেকটা insanity-র আকার ধারণ করে, তখন আবার দেবী ও উচ্চজাতীয়া সুন্দরী ইত্যাদির কল্পনা ঐ ugly atmosphere-এ থেকেও তা'কে নন্দিত করতে থাকে।

"সে philosophy of negation-এর একটা মহান্ দ্রষ্টা ঋষি। তা'র কাছে যদি কেউ এমনতর কোন topic সুরু করে, বা এমনতর কোন admirable জীবনের কাহিনী বল্‌তে থাকে, যা'তে তা'র characteristic-গুলিকে down করার ইঙ্গিত আছে সেই সব ব্যাপারে সে thoroughly wanting in admiration; কাউকে তা'র সম্মুখে ভাল বল্লে পরে, তা'তে যদি তা'র inferiority affected হয়,—তা'কে down করার পণ্ডিতকল্প কণ্ডূতি হ'তে সে কিছুতেই যেন রেহাই পে'তে পারে না। বহুলোকের যিনি admiration-এর পাত্র, তাঁকে down না করলে যেন তা'র অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন। তা'ই সে যে-কোন-প্রকারেই হউক, একটা twisting passion-exciting blasphemy-র সাহায্যে ঐ শ্রেষ্ঠকে opposition দিয়ে মানুষের কাছে down করার জন্য দল করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এই সমস্ত জায়গায় সে যেমন prudent ও active—তা' দেখ্‌লে মনেও হয় না, সে কখনও আল্‌সে irresponsible বা ungrateful.

"এই inferiority যা'দের পে'য়ে ব'সেছে, তা'রা আবার স্বভাবতঃই, যা'রা ইতর, ungrateful, treacherous, idle philosophers—

সাধারণতঃ generous justifying support-এ ঐ শ্রেষ্ঠদের অমন ধারা complex-ওয়ালা neighbour-দের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হ'য়ে উঠেই থাকে। তাই তা'রা generous, able, constructively active, prosperous, great men-দের স্বভাবতঃই নিন্দাবাদ করতে থাকে,—হয় তো ব'লে ওঠে, 'চোর বেটারা না হয় বিশ পঞ্চাশ টাকা চুরি করে, আবার ধরা প'ড়ে জেলেও যা'চ্ছে, আর এই যে ব্যাটারা মানুষকে ঠকিয়ে লাখো-লাখো টাকা সংগ্রহ করছে, মানুষ ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে ভক্তিবিহ্বলতায় যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে এদের পূজো করছে—এ ব্যাটাদের আর কিছুই হয় না, এদের ধ'রে সাজা টাজা দেবার উপায়ও নেই কো—যা'রা দিয়ে ফতুর হ'চ্ছে তা'রাই আবার এদের supporter.

"এদের মনে এমনতর হওয়ার কারণই হ'চ্ছে ঐ inferiority-অনুস্যূত পরশ্রীকাতরতা। তা'রা কখনই কোনরকমে মানুষকে বড় দেখ্‌তে পারে না, মানুষ যা'তে বড় হয় এমনতর serviceable হ'তেও পারে না। মানুষকে জব্দ ক'রে ঠকিয়ে যা'তে নিজের দিন-গুজরানি আহরণকে বজায় রাখ্‌তে পারে, সেই ধান্দাতেই পরিশ্রান্ত আর সেই ধান্দাতেই ব্যস্ত। নিজেদের ভিতরে philosophising justification of theft বা ঠকিয়ে জব্দ ক'রে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন রকমের পথ আছে, বা সবাইকে ভাল লাগিয়ে মানুষকে profitably active ক'রে উদ্বুদ্ধ ক'রেও piously earn করা যে'তে পারে—তা' এদের ইয়াদে আসাই মুস্কিল! কেউ যদি কোন বড় কাজ করে, কোন constructive work—যা' মানুষকে profitable ক'রে তোলে এমনতর কিছু নিয়ে দাঁড়ায়, মস্ত-বড় একটা দুর্ব্বলের রক্ষক এমনতর generous pose নিয়ে, ঐ কাজগুলির against-এ যা'রা দাঁড়িয়েছে, সেই inferior mentality-র idle, treacherous, ungrateful-দিগকে,—যা'রা ঐ সৎকর্ম্মগুলিকে নানারকম ষড়যন্ত্র ক'রে নষ্ট করতে ন্যায়-অন্যায় কোন চিন্তাই করছে না, তা'দিগকে support ক'রে, তা'দিগকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রবীণ ক'রে নিজের শোভাবর্দ্ধন করার প্রলোভন যেন সে ছাড়্‌তেই পারে না।

"সে কখনও Beloved-এ তৃপ্ত নয় ব'লে তা'র সমস্ত বৃত্তিগুলি কারু তৃপ্তি, স্বার্থ বা চাহিদার স্বেচ্ছাসংবেদনায় বিশেষ-রকম খতিয়ে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সার্থক হ'তে পারে—এমনতর কেউ নেই ব'লে পারিপার্শ্বিকের impulse যখনই যে বৃত্তিকে excite করে, তখনই সে সেই দিকেই এমনতর ঝুঁকে পড়ে, যেন সামলান বেজায় মুস্কিল—যদি কোন রকম thrash না পায়; আর এই জন্যই তা'র thoughts and opinions সব সময়ই vary

করতে থাকে, শ্রেয়ঃ কি তা' সে যেন কিছুতেই ঠিক করতে পারে না, urge to fulfil principle-এর চাইতে sexual urge যেন তা'র prominent; আবার সেইজন্য তা'র বজ্রের মত তেজস্বিতাও এক হুম্‌কিতেই coward-এর মত দিশেহারা হ'য়ে যায়।

"আবার এমনতর ব'লেই, অনেকের tenacity ও intensity এক রকম নেই বল্লেই হয়। এটা follow করে distorted calculation-এর রাহাজানি চলনার সহিত। আবার কোথাও intensity-র দপ্‌দপানি এত বেশী—তা' যেন তা'কে সব সময় বিক্ষিপ্ত ক'রে রে'খেছে!

"আর একটা মজা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—এদের higher Ideal বা principle বিষয়ে কোন commanding push দিতে গেলেই কেমনতর একটা turn নিয়ে, ঐ রকম push-এ তা'র যে complex excited হয় তা'রই support-এ incoherently নানারকম pose-এ কথা বলতে থাকে —যাতে নাকি ঐ principle-টাই astern হ'য়ে তা'র interest-কে সাবাড় ক'রে দিল। কিন্তু ঐ fits কে'টে গেলেই যা'রা একটু sensibly sentimental, অন্ততঃ তা'রা একটা depressive আপশোষ নিয়ে অনুতাপ করতে থাকে।

"আরো একটা মজার ব্যাপার হ'চ্ছে এই সে মনে করে, তা'র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে তা'র পারিপার্শ্বিকের কেউ যেন উপযুক্তই নয়কো। তাই সে কাউকে কোন দিক দিয়ে কোন রকমে support ক'রে active sympathetic-ও হ'তে পারে না, এবং sympathetic and serviceable manipulation-এ কাউকে কাজেও লাগা'তে পারে না,—কেউ কোন proposal দিলেই তা'কে না বু'ঝেই প্রাণপণে protest করতে থাকে; সবাই যেন তা'র কাছে inferior, unworthy—বেকুব। কেউ আবার মনে করে, দুনিয়ার প্রত্যেকের কাছেই সে যেন ignored, তা'কে যেন কেউ বুঝ্‌তেই পারলে না, আর এই বুঝ্‌তে পারে না ব'লেই তা'র চাল, চলন, অভ্যাস, আচার, ব্যবহার কারু কাছে justified হয় না, সে অতবড় honourable হ'য়েও এমনতর দুনিয়ায় জ'ন্মে inferiorly থাকতে বাধ্য হ'চ্ছে,—অথচ তা'র philosophy-তে নিজের বেলায় বাস্তবতায় কাজে responsibility ব'লে কিছু নেই কো; service ব'লে কিছু নেই কো; sympathy বা অনুকম্পা ব'লে কিছু নেই কো;—আর এগুলি কাউতে সার্থক হ'তে পারে এমনতর ব'লে তো কিছু নেই-ই, সে কোথায় কি ব্যাপারে কাহার দ্বারা inferiorly behaved বা insulted হ'য়েছে তা'র খতিয়ানী জমা-খরচ তা'র কাছে সজাগ। কারণ সে inferiorly

যদিও live করে, তা'র চাইতে superior তো কেউ নেই! আর, superior যদি না হ'ল, তা'হ'লে কি তা'র শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে!

"Underlying foolish বা wickedly mean inferiority তা'কে সব সময় follow করে ব'লে, elating কোন কিছুই হউক, কোন বড়লোকের কথা হউক, কি কোন বড় কাজের কথাই হউক—সবাই যেন তা'র ego-কে wound-ই করতে থাকে। তাই সে সব সময়ই তা'র ego-কে বাঁচানর জন্য পণ্ডিতি reasonable দোষ-দৃষ্টির weapon নিয়ে সব সময়েই সজাগ থাকে—তাই সে সেই-সব বিষয়ে কোন কিছুই ভাবিবার আগেই এক চোটে তা'র প্রত্যেক পদকেই দোষদৃষ্টির গহরায় দুষ্টবাক্যজালে অবশ বা নিকেশ ক'রে দিতে কোন দিকে দিক্‌পাত করে না। ফলকথা, যেখানেই দেখ্‌বেন, দে'খে বোঝে না, ভে'বে বোঝে, যা'দের ভাবা দেখাকে sordid ক'রে বুঝদারী বেপরোয়া খারাপকে প্রতিপন্ন করে—দোষদৃষ্টি যা'দের মুখ্যভাবে fore-front-এই থাকে, যা'রা giant philosophers of negation, অমনতর রকমের wise pauperism যে তা'দের জগৎকে একাধিপত্যে govern ক'চ্ছে এ একটা নিশ্চিতই লক্ষণ।

"এই দারিদ্র্য-রোগ এতই contagious, এদের সাথে কিছুদিন বসবাস করলেই মানুষের তা' টের পে'তে বেশী বিলম্ব লাগ্‌বে না। সে যতই জোরদার মানুষ হোক না কেন, কিছু-না-কিছু contaminated হ'বেই। তাই, এ সমস্ত ব্যাপারে nourishing and elating protest না ক'রেই থাকা বা ফেরা উচিত নয়কো। কিন্তু সাবধানে নজর রাখা চাই—ওরা vitally depressed না হ'য়ে ওঠে।

"ঐ motor sensory incoherence-এর জন্য এবং বৃত্তির চাহিদার জবরদস্তির জন্য তা'রা প্রায়ই অস্বাভাবিক ভক্তিসম্পন্ন হ'য়ে থাকেন। কারণ তা'রা করতে পারবে না, কিন্তু বৃত্তির চাহিদা-মাফিক পাওয়া তো চাই-ই! ঐ রকম ভক্তির ভিতর দিয়ে যদি পাওয়াটা সার্থকই হ'য়ে ওঠে, তা'তে আর আপত্তি কি? তাই এরা অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠপ্রাণতার pose নিয়ে ভক্তি-ঢল-ঢল উচ্ছৃঙ্খলতায় বৃত্তিস্বার্থকে সহজ ও সুগম করতে প্রয়াসশীল হ'য়ে ইষ্ট বা মহাপুরুষদের কথাগুলিকে বা তাঁ'দের চলন-চরিত্রকে মানুষের কাছে distortedly narrate ক'রে লোভবিহ্বলতায় ভিতর ভিতরে cruel designing attitude নিয়ে চলতে থাকে; হাব, ভাব, চলন, চরিত্রকে এমন unnatural অস্বাভাবিক সুন্দর ক'রে তোলে, তা' যেন তা'র normal temperament-এ খাপই খায় না—তা'র কথা ও চলার সৌন্দর্য্য এবং শ্রেষ্ঠকে সার্থক করার বাস্তব করণের সাথে হরদম একটা বিরাট গরমিল বা difference-ই দেখতে

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (চত্বারিংশৎ বর্ষে)

পাওয়া যায়। সে আবার ঐ গরমিলটা যা'তে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রাখ্‌তে পারে, তা'র জন্য uncalculating বিশ্বাস করার pose-এ ডুবুরী সে'জে নিজের চলনকে মানুষের কাছে justified করার জন্য অনুকম্পাকে আকর্ষণ ক'রে চল্‌তে থাকে। কিন্তু এই difference—যা' আগে বল্‌লাম—এইটাই সততই তা'কে definitely identify করে।

"তাই এরা প্রায়শঃই বহুনৈষ্ঠিক, এই নিষ্ঠা আবার বেশই discrete. কোন নিষ্ঠা কাউকেই integrate ক'রে develop ক'রে তোলে না। এই লক্ষণটা যে-জীবনে দেখ্‌তে পা'বেন, বুঝ্‌বেন, তা'র জীবনে disintegration মাথা গুঁজে ব'সে চোরের মতন silent creeping-এ চল্‌ছে—আরো বু'ঝে ব'লে দিতে পারেন, ত'ার জীবনের প্রায় ব্যাপারই অমনতরই।

"এরা খুব miracle বা mysticism পছন্দ করে, হেতুবাদ শুন্‌লে এরা বড়ই depressed হ'য়ে পড়ে। তা'রা বলে, এমনই হঠাৎ বা অযাচিতভাবে যদি মনোবাসনা পূর্ণই না হ'ল, তা'হ'লে ভগবানের অহৈতুক কৃপাসিন্ধু নাম কি মিথ্যা? সাধু ধ'রে তাবিজ-কবচ নিযে কাজ-বাগান বুদ্ধি অর্থাৎ যা' যেমন ক'রে কর্‌লে পাওযা যে'তে পারে তা' না-ক'রে-পাওযার বুদ্ধি থেকেই ওবা অমনতর ক'রে থাকে। কিন্তু এমনি ব্যাপার—এই না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধি নিযে চল্‌তে তা'রা এতই পরিশ্রম করে, কিন্তু service দিযে বা ক'রে-পাওযাটা সে তুলনায হযত অনেকই অনাযাসসাধ্য হ'ত—এ হিসাবটা তা'দের ইয়াদে কিছুতেই উপস্থিত হ'তে চায় না।

"আর এদের আরো একটা characteristic লক্ষণ হ'চ্ছে—প্রাযশঃই তা'রা পরশ্রীকাতর হ'বেই হ'বে। অন্যের উন্নতির ভিতর এরা নিজেদের interest কিছুতেই যেন বোধও কর্‌তে পারে না বা ধর্‌তে পারে না,—আর অন্যের উন্নতি যেন এদের existence-কে অবসন্নই ক'রে তোলে। সমস্ত nerve system-এ এমনতরই uncomfortable sensation feel করে—মনে হয, তা'দের nerveগুলিকে ঐ যা'রা উন্নতিপরাযণ, তা'রা যেন কামারের তৈরী করা জাঁতি বা জন্তরীর ভিতর ঢুকিয়ে সাঁড়াশী দিয়ে টেনে লম্বা কর্‌তে ব'সেছে। তাই তা'দের down কর্‌তে with zealous depressive eloquence এদের বদ্ধপরিকর না হ'য়েই যেন উপায় নেই। আর এটা হয়—consciously-ই হোক আর unconsciously-ই হোক তা'দের underlying inferiority in contrast with them—বুঝি ধরাই প'ড়ে গেল, তা'রা অকাতরে যে অজান মানুষদিগকে গোঁপে তা দিয়ে honourable pose নিয়ে exploit ক'রে চল্‌ছিল, বুঝি এখনই conscious না অচিরেই ধরা প'ড়ে যা'বে, এই আশঙ্কায়। আর এই জন্য উন্নতচলনশীল

যা'রা তা'দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিছুতেই চল্‌তে পারে না। ছেলেপুলে কোন অন্যায় করুলে তা'দের বাপ বা guardian-এর কাছে এগুলো যেমন খুবই মুস্কিল ব্যাপার—অদৃষ্ট কি একটা ভূত যেন এগুতে গলা ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়—এদেরও অবস্থা প্রায় অমনতরই হয়! তাই তা'রা ঐ অজানা ধাক্কার অত্যাচারে বেদম রঙ্গীন নিন্দা আরম্ভ ক'রে দেয় —অযাচিত নিন্দা বা না-দেখে নিন্দা বা দেখে অযথা distortedly তা'কে narrate করাও তা'দের characteristic লক্ষণ।

"Becoming-এর কোন-কিছু যে achieve করুতে করার চলনে চল্‌তে হয়, বৃত্তি বা প্রবৃত্তির চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়—এ সবই যেন তা'দের পক্ষে বৃশ্চিকের তুল্য ভীতিসঙ্কুল। বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে উন্নতিস্বার্থী করতে হ'লেই সে বল্‌বে—'ওসব ব্যাপারে আমি নেই,—গরীব আমি, এক কোণায় প'ড়ে আছি, আমাকে নিয়ে টান-পাড়াপাড়ি কেন বাপু?' আবার বৃত্তিচাহিদা-পূর্ণ না-ক'রে-পাওয়ার 'ন্যাক্' অনুস্যূতভাবে মন্দাকিনীর মতন এদের অন্তরে প্রবহমান থাকার দরুণ এদের কাছে যদি কেউ কোন service পাওয়ার জন্য—অর্থ ই হউক বা সামর্থ্যই হউক—ন্যস্ত করে, সে তা'কে তা'র প্রবৃত্তিপূরণী ইন্ধন ক'রে নিজে প্রবৃত্তির বা হামবড়াই উদারতার মতন ক'রে ব্যবহার করবেই করবে। আর এই স্বভাবটা এমনতরই, মানুষের বাস্তব উন্নতিতে যেন একটা বজ্র-কপাট। এ স্বভাব থাকলে তা'দের বুদ্ধিবৃত্তি এমনতরই হয়, তা'দের নিজেদের কোন profitable concern এ'লেই তা'কে twist ক'রে diverging রকমে চলে—যা'র ফলে তা'রা মানুষের কাছে ব'লে বাহাদুরীপূর্ণ অনুকম্পার সৃষ্টি করতে থাকে—এই এক মিনিটের জন্য এমনতর একটা profitable ব্যাপার হ'যে উঠ্‌ল না—সব ঠিক-ঠাক, প্রস্রাব ক'রে ফিরে আসতে আসতেই অন্যে কাজটা বাগিয়ে নিলে। সে হয়তো ২।৩ ঘণ্টা ধ'রে প্রস্রাব চে'পে রে'খে প্রস্রাবের প্রয়োজনটা ঠিক for that moment রেহাই দিতে পারলে না।

"আর এরই জন্য becoming-এর অনুসন্ধিৎসা—যা'তে সে profitable হ'তে পারে—তা' যেন সব সময়েই তন্দ্রাকুল চাহনী নিয়ে পরিশ্রান্তের মতন চল্‌তে থাকে, কিন্তু তা'র ঐ mean inferiority-র ego যেখানেই সংঘাতবিদ্ধ হ'তে পারে বা হয়, তা'তে সে বড় conscious—তা'র বেলায় অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি নেহাৎ কম নয়কো। সে সব সময় ওরই ফন্দিবাজী বুদ্ধি নিয়ে ভাবে ও চলে—তাই তা'রা প্রায়ই যেন ভেবেই দেখে, ভেবেই শোনে। আবার দেখার চাইতে তা'দের ঐ নীচতাকে support করে, এমনতর শোনার প্রস্বস্তি যেন বেশী।

"আবার আর এক মজা ;—এই রকম বিধ্বস্ত যা'রা, তা'রা অন্য সবাইকে ভাবে—'ওরা pauper', কিন্তু নিজের দিকে নজর করে না। নিজের দিকে নজর না করারও মানে আছে। নিজের দিকে নজর কর্‌লেই তা'রা এমনতর depressed হ'য়ে পড়ে,—মনে করে hopelessly damaged হ'য়ে গেছে—সেই জন্য তা'রা হরদমই resist কর্‌তে থাকে, অমনতর অনেকেই, কিন্তু সে নিজে নয়কো। বুদ্ধি খাটিয়ে তা' justify কর্‌তেও কসুর করে না। আবার সেই জন্যই, সে যে তা' নয় এইটাকে demonstrate করার খেয়ালেই হউক, আর যা'তেই হউক, অন্যকে correct করার বুদ্ধি কম জেয়াদা নয়কো।

"পূর্ব্বে যা' বল্লাম, এমনতর যা'রা, তা'রা নিজের profitable concern-এ হয়তো নেতিয়েই পড়ল, কিন্তু যা'তে তা'র কিছুমাত্র profit নেই, তা'তে হয় তো ভূতের মতন খাট্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—অমনতর খে'টেও সে হয়তো বাড়ী ফির্‌ল একটা নিন্দার পদক নিয়ে, pity-র পাত্র হ'য়ে। এমনতর খাটে কেন, তা' জানেন ? ভিতরে mean inferiority থাকে, তাই তা'র মানের চাহিদা যথেষ্ট—মানুষের চক্ষে সে মানী হ'য়ে দাঁড়াবে, এই আশায় তা'র মানুষ বা পারিপার্শ্বিকের তা'কে যে একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে, মুখ্যতঃ তা'কে সেইটাকে demonstrate করা।

"Inferiority মানুষের মস্তিষ্ককে যদিও অনেক রকমেই আক্রমণ ক'রে থাকে, তবুও একজাতীয় inferiority-র একরকম প্রধান অগ্রদূত হ'চ্ছে—পুংমৈথুন স্বভাব। বিশেষতঃ এর object-রা অতি সত্বরেই inner masculineness-এর দারিদ্র্যে down হ'য়ে একটা dull depressing inferiority নিয়ে বসবাস করে। এদের প্রধান characteristic-ই হ'চ্ছে—যা'রা treacherous, ungrateful, যা'দের দ্বারা বংশ ও জাতি আহত হয়, যা'রা treacherously depressor,—তা'দের with a zealous mood support ক'রে খুবসে বাহাদুরী নিয়ে, নিজের masculinity establish করার আহাম্মুকী rationalising চালিয়াতী হ'তে কিছুতেই যেন বঞ্চিত হ'তে পারে না। এরা সাধারণতঃ বেশী maso-effiminately well-dressed হ'য়ে বসবাস করে, কথাবার্ত্তাও কয় ম্যাদাটে masculine মাফিক—যেন কেমনতর rationalising sentimental ম্যাদাটে আব্দারে মতন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি normal খাতির—যা' মানুষের থেকেই থাকে—তা' যেন স্থানই পায় না। এরা সব ব্যাপারেই এদের masculinity establish কর্‌তে ব্যতিব্যস্ত।

"ভাল কিছুতে obeisance বা conviction আসা তাই এদের বড়ই মুস্কিল, কারণ এদের ভালমন্দে বড় বেশী তোয়াক্কা নেই, এরা চায় শুধু

তাই-ই, যা'তে এদের ঐ pauper masculinity glorified হ'য়ে মানুষের কাছে—'পুরুষ বটে'—এই আখ্যা পে'তে পারে। সেই জন্য আপন-পর, ভাল-মন্দ, obeisance বা obligation যা'তে নাকি পুরুষের পুরুষত্ব—তা'র distressed consideration—সে-সবের ধার-টার এরা কিছুতেই ধারতে চায় না।

"মনে করুন, কোন চোর কোথাও যদি চুরি ক'রেও থাকে, সাধারণতঃ মানুষে চেষ্টা করে, তা'র চৌর্য্য যা'তে অপনোদিত হয়;—এরা করবে কিন্তু উল্টো; with glorious zeal ঐ চৌর্য্যের support ক'রে যদি তা'র masculinity-র কোন রকম establishment পায়,—আপ্রাণ হেতুবাদে এরা তা'কে support-এর জন্য fight করবেই করবে।

"এদের থেকে আরো ঝুনো যা'রা, তা'রা nuisance-like বসবাস করে—জীবনে কোন aspiration-এর ধার ধারে না। Fetid humour-এ রাগান্বিত হ'তে তা'দের প্রায়ই দেখা যায় না। Dull spirited অথচ fetid luxury নিয়ে ইয়ারকি, ফাজ্‌লামো, তামাসার চালিয়াতী ফূর্ত্তিতে তারা মন্দ মস্‌গুল থাকতে পারে না—ইত্যাদি অনেক কিছু।

"Inferiority কাউকে enchanted হ'য়ে obey করতে পারে না—তা'র nerveগুলি কোন একটা pressure-এ থাকতে বা কোন principle-এ enchanted হ'য়ে নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারতপক্ষে একদমই নারাজ। আতঙ্কে তা'দের nerves যখন paralytic হতভম্ব হ'য়ে ওঠে, তখন তা'রা বড় সহজ মানুষ। Obeisance বা obey করার ব্যাপারগুলি যেন তা'র কাছে cynic insulting ব্যাপার। সে সব সময়েই চিন্তা ক'রেই সুখী হ'তে চায়—তা'কে তা'র efficiency হ'তে বঞ্চিত ক'রে রে'খেছে তা'র environment-এর তথাকথিত efficient-রা। আর তাই philosophy of weakness, philosophy of inability, really efficient-দের স্বার্থপরতার mal-psychology খুবসে এস্তামাল ক'রে একটা sordid rational অর্থ-সার্থকতায় micro-twisting-এর ভিতর দিয়ে plainly and highly magnify ক'রে মানুষের কাছে ধ'রে নিজের দল বৃদ্ধি ক'রে careful carelessness-এর pose নিয়ে তা'দের নেতা হওয়ার সখ অত্যন্ত। আর ঐ urge-ই অমনতর ক'রে তা'দের active ক'রে তোলে—ভিতরে ভিতরে বুদ্ধি এই,—ব্যাটাদের কোন রকমে হাতিয়ে নিয়ে efficient superior ব্যাটাদের বেশ ক'রে দেখিয়ে দিতে হ'বে—আমি কি চীজ্!—আর তা'তে তা'র দুনিয়ার principle-শূন্য বৃত্তিস্বার্থপ্রধান চলনাও হাল-সে-বেহাল, অবাধ চলনায় চলতে থাকবে;—inferior অর্থাৎ আদর্শবিহীন,

irresponsible, utopian, inactive idler-দের common interest-ই তাই ঐ হিসাবে তা'র interest. ঐ inferior-দের able, active ও efficient ক'রে superior efficiency-তে নেওয়া কোন রকম auto-initiative service-এর ধন্ধা তা'দের তো নেই-ই—বরং ওসব কথায় বিরক্ত হ'য়ে এমনতর vague উত্তর দেবে, হয়ত বল্‌বে—'এখন সাত মণ তেলও জুট্‌বে না, রাধাও নাচ্‌বে না!'

"Inferiority-র আর-একটা প্রত্যক্ষ peculiarity হ'চ্ছে—সে যা'দিগকে superior ব'লে মনে করে,—নানা কেরদানি, উদার নীতি ইত্যাদি নানা রকম philosophy আওড়িয়ে নানা রকম entice ক'রে তা'দের নিজের থাকে এনে একৃশা ক'রে তৃপ্তিলাভ করে! কিন্তু যা'দের সে inferior ব'লে মনে করে তা'দের সাথে কিছুতেই একৃশা হ'তে চায় না। তখন তা'র নীতি-ফিতি, philosophy অন্যরূপ।

"এমনি এমনি আরো যে কত তা'র ইয়ত্তা নেই! এর ভিতরে যা'দের অসুস্থতার জন্য বা ill nurture-এর জন্য motor-sensory co-ordination ভে'ঙ্গে গেছে বা অনভ্যাসে অবশ হ'য়ে গেছে, তা'র সহজেই easy nurturing-এই শ্রেষ্ঠপরায়ণ হ'য়ে উঠ্‌তে দেরী লাগে না। তা'রা curable-ও হয় easily ;—যা'দের libido damaged হ'য়ে গেছে, এমন-কি damaged হ'য়ে wreckless-ও হ'য়ে উঠেছে, শ্রেষ্ঠপ্রাণতা তা'দের ভিতর একটা crying hankering-এর মতন—curative force-এর মতন জেগেই থাকে। তা'রা হয়তো প্রতি দীর্ঘনিঃশ্বাসেই বলে,—'ধ'রে তোল, কে আছ কোথায়?' এই দারিদ্র্যে-পাওয়া রোগ cure কর্‌তে তা'দের বড় বেশী জঞ্জাল পোয়াতে হয় নাকো। আর এগুলি তেমনতর heredity-কেও আক্রমণ করে না—আক্রমণ কর্‌লেও খুব কম।

"কিন্তু libido যা'দের distorted হ'য়ে গেছে, তা'দের সমস্যাই কঠিন। আর এটা যেন syphilis-এর মতন heredity-কে আক্রমণ করে! অত্যন্ত কঠোর ও cautious nurture-এ এদিগকে manipulate ক'রে যদিও অনেকটা ঠিক করা যে'তে পারে, তথাপি পুনরায় ঐ রোগগ্রস্ত হওয়ার ভয় কিছু-না-কিছু তা'দের থেকেই যায়!

"আমাদের জন্মের সাথে সাথেই সাধারণতঃ প্রকৃতিই আমাদিগকে sensory ও motor nerve-এর temperament-মাফিক co-ordination ক'রেই দিয়ে থাকে। ছেলেদিগকে ভাল করার প্রলোভনে, বিদ্যাবুদ্ধিতে দিগ্‌গজ করার প্ররোচনায় guardian-রা—কি একটা কথা আছে—'Spare the rod, spoil the child!'—এই motto অনুসরণ ক'রে প্রকৃতি-প্রদত্ত

ঐ motor ও sensory co-ordination-কে ভে'ঙ্গে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের জানা ও চিন্তাগুলিকে করার বাস্তব পরিণতিতে আনার ঐ প্রকৃতি-প্রদত্ত ঝোঁকের নিকেশ ক'রে দিয়ে বাক্-বিলাসী, বাঁচা বাড়ার পথহারা, বিক্ষিপ্ত, ধোঁয়াটে, ধাঁধাল ও ঝাঁঝাল দুর্ব্বল inferiority-ওয়ালা ক'রে ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত হতদরিদ্র জীবন-লাভের দিকে জোর ক'রে নিক্ষেপ করতে থাকেন।

"Guardian-রা যা' আশা ক'রে ঐ রকম ক'রে তা'দের ছেলেপুলেকে acquisition-এর ভিতর দিয়ে brought up করতে চান, করার আনুপাতিক যা' হ'বার তাই যদিও হ'য়ে থাকে, কিন্তু অজ্ঞ জানা যে আশা দিয়ে তা'দের ঐ রকম ক'রেছিল, তা' মোটেই না দেখতে পেয়ে, না উপভোগ ক'রে অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়ে হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে জীবনকে প্রতারিত ও পরিচালিত করতে থাকে;—আর সাধারণতঃ ঐখান থেকেই সুরু হ'তে থাকে ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ জীবনের অদৃষ্ট পথ চলা,—যদিও এর অনেকাংশই জাতক তা'র বাপ, মা ও পূর্ব্বপুরুষ-নিঃসৃত instinct বা সংস্কারেব ভিতর থেকে লাভ ক'রে থাকে,—আর আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ পারিপার্শ্বিককে তা'র বাঁচা-বাড়ার অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতে না পে'রেও অনেকটা ঘটে' থাকে। এই আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা থাকলেই প্রথমেই পাবিপার্শ্বিকেব সংঘাত থেকে একটা হপ্‌কান ভাবের সৃষ্টি হ'য়ে নিজের বাঁচা-বাড়াব ক্ষুন্নিবৃত্তিব আবেগে ভালমন্দর সঙ্গে একটা compromising প্রবৃত্তি ভূতের মত পেছু নেয়। তা'রা তা'কে যেন কিছুতেই shake off করতে চায়ও না, পারেও না। এই রকম ক'রেই তা'রা dolls of environment হ'য়ে পড়ে। যাক্ সে অনেক কথা।

"এই থেকে রেহাই পে'তে হ'লেই মানুষ নিজের complexগুলির প্রভুত্বে তা'র personality ও individuality পারিপার্শ্বিক ও প্রলোভনের টানে নানারকমে পর্য্যবসিত হ'য়ে disintegrated না হ'য়ে পড়ে, সেই জন্য guardians বা যা'দের প্রতি তা'দের আস্থা আছে, তা'দের কর্ত্তব্য—কোন একটা Superior Personality-কে তা'দের Superior Beloved-রূপে এমন ক'রে দাঁড় করান, যা'র ফলে তা'দের libido বা আদিম আসক্তি তাঁ'তে অকাট্যভাবে বাঁধা পড়ে' যায়;—আর, তা' এমনতরভাবে সেই Superior Personality বা Superior Beloved-এর wishes-গুলি বাস্তবভাবে fulfil করার ঝোঁক এমনতর উপ্‌চে' ওঠে—যেন, তা'দের তা' না-ক'রেই উপায় নেই—তা' না করলে দুনিয়ায় তা'র যেন আর-কিছুই ভাল লাগে না—তাঁ'র wish-fulfilment-ই যেন সে তা'র নিজের স্বার্থ ও উপভোগ ব'লে মনে করতে পারে—এমন কি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার

সহিত জীবনের চলনার ভালমন্দের হিসেব-নিকেশগুলিও ঐ তা'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মেপে মেপে চলাই জীবনের সহজ ও সাধারণ 'ন্যাক্' হ'য়ে ওঠে। আর, দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে মান, অভিমান, আলস্য, আত্মম্ভরিতা, সন্দেহ-বিলাসিতা ইত্যাদি—যা' নাকি দারিদ্র্যের অকপট অনুচর ও মোসাহেব —ঐ Superior Beloved-এর fulfilment-এর নেশায় ওগুলির বেকুবী প্রশ্নই যেন মনে না উঠ্‌তে পারে।

"যা'দের অমনতর হয়েই-ছে, তা'দের বিচার, বিবেচনা ও manipulation দিয়ে ওগুলি হ'তে অতি সত্বর নিবৃত্ত হওয়াই চাই ;—নতুবা উন্নতিতে কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে। আর এর সাথে সাথেই ভাল ব'লে যা' মনে হ'চ্ছে—ঐ ইষ্ট বা প্রেষ্ঠের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অনুকূলভাবে—তা' প্রবৃত্তিগুলির চাহিদার পড়তায় পড়ুক আর নাই পড়ুক—যতদূর সম্ভব পারিপার্শ্বিক বা পারিপার্শ্বিকের অন্য কারুর ক্ষতিজনক না হয়—অন্ততঃ এমনতরগুলিকে—কাজের ভিতর দিয়ে বাস্তবে পরিণত করা চাই-ই।

"আর, এদের reform কর্‌তে হ'লে কোথাও hope, sympathy-র নানারকম pose নিয়ে চল্‌তে হয়, প্রত্যেকের profitable অনুসন্ধিৎসার excite কর্‌তে হয়,—তা'দের সম্মুখে specially profitable কিছু তা'দের consciously না ধ'রে—কিন্তু earn কর্‌তে পারে এমনতর নানা রকম arrangement সামনে রে'খে, কোথাও বা জায়গা মতন shock দিয়ে manipulate কর্‌তে হয়। আবার, ঐ instigation-এর ভিতর দিয়ে, খুব enthusiastically প্রেষ্ঠ-আনতিতে আকৃষ্ট, উদ্দীপ্ত ক'রে তুল্‌তে হয়। তা'র সঙ্গে সঙ্গে কোন-কিছুর করার ভিতর দিয়ে—যা'রা খুব gross, তা'দের অন্ততঃ agriculture-এর ভিতর দিয়ে—উদরান্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। নেহাৎই না পারে যখন, সে বুঝ্‌তে পারে না—এমনতরভাবে তা'র উদরান্নের জন্য সাহায্য কর্‌তে হয়। আবার এই ক'রেও উপায়ের ভিতর দিয়ে উদরান্নের সংস্থান ঘটানর ভিতরেই তা'রা যা'তে নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে কিছু দিয়ে আনন্দ পায়—সেই রকমগুলিতে বিশেষভাবে তা'দের elate কর্‌তে হয়।

"এই রকম কায়দা-কানুনের ভিতর দিয়ে, তা'দের প্রেষ্ঠবান্ ক'রে, motor-sensory-র co-ordination এনে দিতে পার্‌লেই অনেক রক্ষা।

"ক'রে,—তা'র পরিণতিগুলিকে যে উপভোগ করা একটা বিরাট আনন্দ, হামেসা তা'দিগকে এমনতর atmosphere-এই রাখ্‌তে হয়। আর প্রবৃত্তিগুলি যা'তে প্রেষ্ঠস্বার্থী হ'য়ে becoming-এ নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে, cautiously এমনতর ইচ্ছা তা'দের ভিতর জাগিয়ে রাখ্‌তে হয়—যেন সেগুলি না ক'রেই তা'রা পারে না।

"আর, যা'র যে দোষগুলি prominently active হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, through manipulation-ই হউক, shock দিয়েই হউক, যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—তা'র নিরসনেই তা'দিগকে অভ্যস্ত ও সহজ ক'রে তু'লে চল্‌তে হয়। এমনি ক'রে cautiously চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে মানুষের চরিত্র থেকে দারিদ্র্যে-পাওয়া ভূতকে তাড়ান যে'তে পারে। আমি সাধারণতঃ চুম্বকভাবে distortion caseগুলিকে উপলক্ষ্য ক'রেই দারিদ্র্যে পাওয়াকে narrate ক'রেছি;—ওর ভিতর যেগুলি distorted নয়কো—অনেকটা easy—তা'ও প'ড়ে যায়, এই ভে'বে।

"এমনি ক'রে ক'রে সহজ একটা অনুকম্পার ভাবের ভিতর দিযে responsibility নেওয়ার বুদ্ধি—as a luxury—ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠামূলক fulfilment-এর ভিতর দিয়ে খুবসে বাড়িযে তুল্‌তে হ'বে। Responsibility shirk করার বুদ্ধি যা'তে কিছুতেই না আস্‌তে পাবে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে কঠোর হ'তে হ'বে।

"আর, এই কর্‌তে গেলেই সেবা-প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ মাথাতোলা দিতে থাক্‌বে। একটা firm conviction, being-টাকে আকৃষ্ট ও আপ্লুত ক'রে তুল্‌বে,—তা'র ফলে যাজন-প্রবৃত্তি তুখোড় তর্‌তরে তীব্র ও স্নেহলদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে। তখন যজন যাজন দুইই দীপ্ত প্রতিভার মতন profitable অনুসন্ধিৎসা ও activity-র সহিত উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন ক'রে জীবনাকাশে শুক তারার মতন নানা রং-বেরঙে অশেষ দীপ্তিতে, ঢলঢল কঠোরতায় তীব্র রঙ্গীন হ'যে বাস্তব বিজ্ঞানে জ্বল্‌তে থাক্‌বে। এই রকম চল্‌নাব ভিতর দিযে যখনই আপনি দেখ্‌তে পাবেন, সে service-এর ভিতর দিয়ে, অনুসন্ধিৎসার সহিত তা'র পারিপার্শ্বিককে elate ক'রে সহজ ও সুন্দরভাবে আত্মপ্রসাদময়ী আহরণপটু হ'য়ে উঠেছে,—তা'র ভিতরকার pauperism-ও তেমনি ক'বেই সাবাড় হ'চ্ছে—নিশ্চিতভাবেই বুঝ্‌বেন। এই হ'চ্ছে আমার pauperism থেকে রেহাই পাওয়ার অভিজ্ঞতার তুক্‌তাক্।

"দেশ যখনই এই Superior Beloved-চ্যুত বা ইষ্টচ্যুত হয়, pauperism তখন তা'র রাক্ষসী লালসায় মুখব্যাদান কর্‌তে কর্‌তে ক্রমেই জনসমূহকে, অর্থাৎ—ঐ ইষ্ট ও আদর্শচ্যুত জনগণকে আক্রমণ কর্‌তে থাকে।—তা'রা হ'য়ে ওঠে বাক্‌বিলাসী, অপটু ও বিক্ষিপ্ত কর্ম্মী, আলস্যপ্রবণ, philosophers of negation, immense contaminators of প্রবৃত্তি-পূরণী depressed unfulfilment, leading pioneers of poverty—অন্যকে পুষ্ট বা profitable না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধিচাতুর্য্যপুষ্ট ঠক্—জোচ্চোর,

—মান, অভিমান, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, সন্দেহবিলাসী হুকুমদার—নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না ক'রে আত্মপ্রবৃত্তিমুগ্ধতায় পারিপার্শ্বিককে ভাল হওয়ার প্ররোচনা দেখিয়ে উপভোগ-ইন্ধন-আহরণী বৈজ্ঞানিক যাজক ;—equalisation অর্থাৎ আমার মতন সব তোমরা হও—এমনতর philosophy-র বক্তা, ঋষি, মুনি ইত্যাদি!"

শ্রমশিল্প ও বেকার-সমস্যা

"অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য যদি না হয় কি ক'রে অন্যের পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন আনা যে'তে পারে, তবে শ্রমশিল্পের উদ্বোধন মানুষের ভিতর কি-ক'রে হ'তে পারে? 'Industry' মানেই হ'ল building up from within (ভিতর হইতে গঠন করা)। তা'হ'লে 'ইণ্ডাষ্ট্রির' বা শ্রমশিল্পাদির মূলসূত্রই এই—মানুষের কাছে যাওয়া, তা'দের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তা'দের সুবিধা অসুবিধা দেখা, আর তা-ই চিন্তা করা কি-ক'রে তা' পূরণ করা যায়—যা'তে তা'রা পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত হ'তে পারে, দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধার হাত হ'তে বাঁচ্‌তে পারে,—আর এই রকম অভাব ও বেদনা জানার সংঘাতেই সাহায্য করে to build up from within (অন্তর হইতে গঠন করা)—তা'তে লেগে যাওয়া আপ্রাণ হ'য়ে—অভাবের পূরণ কর্‌তে। আর এই থেকেই আসে লাভজনক পরিচালন—কি-ক'রে কোথায় কেমন ব্যবস্থা কর্‌লে অধোগতিকে পরিহার ক'রে উন্নয়নকে অক্ষুণ্ণ করা যায়;—আর এই কর্‌তে গেলেই আমাদের সকলের সাথে মধুর ও অকপটভাবে ব্যবহার কর্‌তে হ'বে,—আর এই সেবাপরায়ণ ভাব ও লাভজনক পরিচালনায় সযত্নে কর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে অটুটভাবে অবিরাম লেগে থাকা চাই। তাই শ্রমশিল্পের এইগুলি অর্থাৎ এই চরিত্রগুলি প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট সেবক,—এ যা'তে নাই তা'র শ্রমশিল্পাদি করা একরকম আকাশকুসুম। জগতে দেখা যায় না এমনতর মানুষ বড় হ'য়েছে যা'র ভেতর এমনতর চরিত্র স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেবার ভিত্তির উপর শ্রমশিল্প যদি হয়,—উদ্দেশ্য যদি হয় পরকে সেবা করা, আর যদি মানুষের উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার তা'কেই সার্থক করে,—তখনই তাহা সুবিধা, সুখ ও জীবনকে সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষকে profitably elate (লাভজনকভাবে উৎফুল্ল) না ক'রে, service (সেবা) দিয়ে তা'কে সমৃদ্ধ করার প্রলোভন দেখিয়ে শু'ষে যে তা'র কাছ থেকে বাঁচা ও ভোগের লওয়াজিমা আদায়ের বুদ্ধি নিয়ে, তা'কে বেকায়দায় ফেলে' চিপে' অন্তঃসারশূন্য করার পাণ্ডিত্য—এই যে ফাঁকি তাই জমায়েৎ হ'য়ে অতগুলি soil-কে (স্থানকে) possess (অধিকার) ক'রে বেকার ক'রে তু'লেছে।

দেখিতে গেলে তাহাকে অধিকার করিয়া যাহা যাহা আছে তাহা দৃষ্টি-গোচর হয়ই,—আর সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান—সেই জ্ঞানই আধ্যাত্মিকতা। বৈজ্ঞানিকের জানাও পর্য্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া, আর সাধকের জানাও পর্য্যবেক্ষণ ক'রে। বৈজ্ঞানিক বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে যা'চ্ছে আর সাধক কারণকে লক্ষ্য ক'রে তাহার অনুসন্ধান ক'রছে। তাই, উভয়ের বোধেরও তফাৎ হ'চ্ছে। সাধকের বোধ অনুভূতির ভিতর দিয়া আসে, আর বৈজ্ঞানিকদের বোধ কোন বিশেষ ইন্দ্রিযেব মধ্য দিয়া—আর তা'র সঙ্গে সঙ্গে অনুমান। বৈজ্ঞানিকের ঐ রকম মনোভাব এলে তবে সে সাধক হ'তে পারে।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধ বিষয়ক কথা উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুব বলিতেছিলেন,—

"কোন একটা বস্তু partially (আংশিকভাবে) হইয়া তাহার above-এ (উর্দ্ধে) থাকিয়া যে বোধ তা'কে বলি অনুভূতি বা sensation,—যেমন যখন আমরা electric battery-র (তাড়িত কোষের) shock (ধাক্কা) feel কবি (অনুভব কবি),—অন্যটা যেমন চোখ দিযে দেখা, কাণ দিয়ে শোনা,—তা' আমাদের being-কে (সত্তাকে) affect করে না (রঞ্জিত করে না)। কণাদ, Kekule-র অণুপরমাণুব নর্ত্তন জানাটা with sensation (অনুভূতি দিযা), St. Augustine, Swedenborg প্রভৃতিরও যা' শু'নেছি তাই। সাধকের অনুভূতি—যেমন কাচের উপর কোন-একটা-কিছুকে প্রতিফলিত করা যায়, কাচ তাহা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয বটে কিন্তু তাহাই হইয়া যায় না এমনতর।"

"বৈজ্ঞানিক যদি যুগপৎ সাধক ও গবেষণা-তৎপর হয়, তবে যে সমস্ত দর্শন তাব সম্মুখে এসে হাজির হয়—তা' অনুভূতি দিয়ে, আর তা'কে স্থূলভাবে গবেষণার ভিতর দিয়া মূর্ত্ত কবাব মনোভাব যদি থাকে,—তা' হ'লেই অনুভূতি দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ ক'রে পর্য্যবেক্ষণ এই দুইয়েরই সামঞ্জস্য আসিয়া বস্তুজগতেব পরিপূর্ণ বোধ অর্জ্জিত ও আয়ত্ত হ'তে পারে। সাধকের মনোভাব মানেই—সে চায় নিজের বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া কারণকে বাহির করিতে—(আর এই বৃত্তিগুলি আসে পারিপার্শ্বিক হইতে)—তাই, কারণে তা'র আসক্তি প্রগাঢ়। সুতরাং তোমার যদি আদর্শানুসরণ না থাকে, গবেষণা করা তোমার পক্ষে একটা ভেল্কীর কণ্ডূতি ছাড়া আর কিছুই না; তোমার অসংবদ্ধ জানা শৃঙ্খলিত হইয়া পূর্ব্ব ও পরের সহিত কোন মতেই উপনীত হইতে পারিবে না,—আর ভূয়োদর্শন তোমাকে চিন্তা ও করার জংলা পথে লইয়া হঠাৎ জোনাকি ঝিকিমিকি দেখাইয়া পথহারা করিয়া আরও বেকুব ও ভবঘুরে বৈজ্ঞানিক ছাড়া কিছুই করিতে পারিবে না।
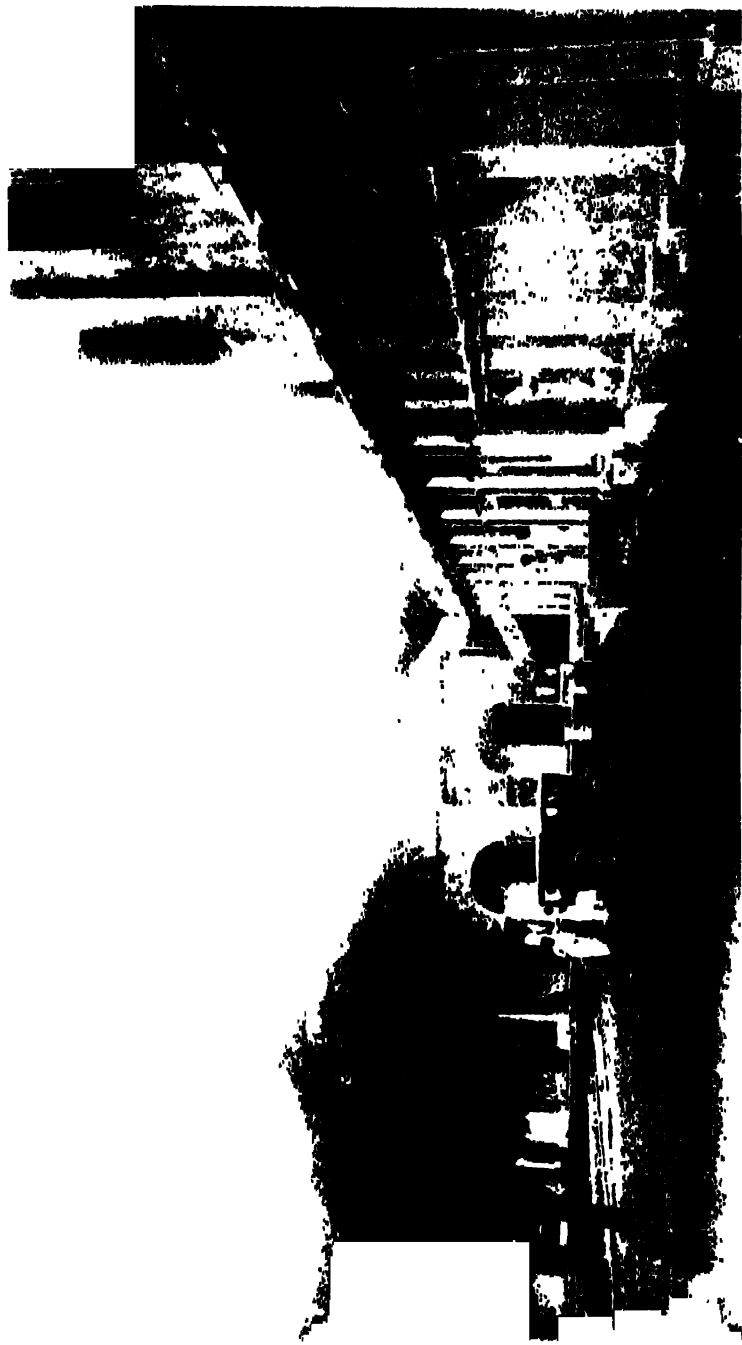
সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র

যদি সত্য সত্যই গবেষণাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এমনতর বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করিও যাহার পারম্পর্য্য অর্থ ও দর্শন লইয়া সার্থককে অনুসরণ করিতেছে।

"তা' হ'লে এই দাঁড়াচ্ছে, বস্তু বা বিষয়কে inquisitive (উৎসুক) পর্য্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে তা'কে জীবনের অনুকূল করবার ঝোঁক সৃষ্টি ক'রে হাতে-কলমে করার ভিতর দিয়ে common sense-কে (সাধারণ বুদ্ধিকে) normally grow করানর (স্বাভাবিক ভাবে জন্মানর) জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষা with a practical manipulation (কার্য্যকরী পরিচালনার সঙ্গে) করা চাই, আর theoretical aspect (উপপত্তির দৃষ্টি) যা' ওর ভিতর দিয়ে সহজভাবে যা'তে grow করে (জন্মে), তা'র ব্যবস্থা করা চাই।"

একদিন কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের বিরোধী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনাটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা:—

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার এখানে ত' বিজ্ঞানের খুব চর্চ্চা হয়,—রিসার্চ লেবরেটরী আছে,—যদি এখানে এমন-কিছু আবিষ্কার হয় যাহা গবর্ণমেণ্টের existence-এর (অস্তিত্বের) পক্ষে dangerous (বিপজ্জনক) তৎক্ষণাৎ ত' তাহা বন্ধ করিয়া দিবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কাহারও অস্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে এমনতর আবিষ্কার ত' মৃত্যুর কিঙ্কর—যদি সে ক্ষুণ্ণতা being in general-কে (জনসাধারণের অস্তিত্বকে) অধিকতর অক্ষুণ্ণ না করে—আর মঙ্গলের দিকে না নেয়। গবর্ণমেণ্ট মানে কি? গবর্ণমেণ্ট ত' আমরাই—মানুষই; তা'-ছাড়া একবার যদি আবিষ্কারই করিলাম—বন্ধ করিলেই বা তা'তে কি আসে যায়? লোহা গরম করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত আকার দিতে যদি শিখি আর কোন অসুবিধা নাই।

প্রশ্ন। সে আবিষ্কারকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে গ্রেপ্তার, এমন কি জেল, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে—অথচ কার্য্যে কিছু করিতে পারা যাইবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' নয়—গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা করিবার ইচ্ছা যদি আমার একদম না থাকে তাহা হইলে আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তাহারা বাধা দেবে না। কারণ, আমার আবিষ্কার শুধু বাঙ্গালী জাতির জন্য নয়—মানব জাতির জন্য,—সুতরাং বাধা আসিবে না। আমি যদি

লাট সাহেবকে মারার জন্য কিছু করি তবে তা'রা বাধা দিবে, তা' না হ'লে কেন বাধা দিবে? অশোক রাজ্যলোভে হিংসাপরবশ হইয়া জীবনে একটী-মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহাতে নৃশংস হত্যাই প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু তিনি কাহারও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পাইলেন না। পরে তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, আর তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তিনি যে পতাকা—culture-এর (উৎকর্ষের)—বহন করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতের গৌরববৃদ্ধি ও জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল,—মানুষ অশোকের অস্তিত্ব-রক্ষায় উদ্দাম হইয়া উঠিল,—কারণ তিনি ছিলেন মানুষের অস্তিত্বের অনুকূল।

রাষ্ট্র

"মানুষ সত্যিকার স্বাধীনতা তখনই পায় যখনই তা'র being-টাকে (সত্তাটাকে) পারিপার্শ্বিক তা'র প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে খিঁচ্‌রে ধ'রে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সাবাড় কর্‌তে না পারে—বরং তা'র আদর্শানুপ্রাণ প্রবৃত্তিগুলি পারিপার্শ্বিকের সেবার ভিতর দিয়ে তা'দের প্রত্যেকটাকে সন্দীপ্ত ক'রে becoming-এর (বৃদ্ধি পাওয়ার) দিকে অবাধ ক'রে তোলে—তখনই সেই হয় তা'র পারিপার্শ্বিকের common interest (সাধারণ স্বার্থকেন্দ্র)—আর তখনই সে স্বাধীন। স্বাধীনতার এই আদর্শের ধর্ম্মাশোক যেমনতর তা'র practical demonstration (বাস্তব পরিচয়) দিয়ে গেছেন এত বড়ভাবে আর কেউ দিতে পে'রেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। তা'-ছাড়া কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ইত্যাদি প্রেরিত বা অবতারগণ মানব-সাধারণের জন্য স্বাধীনতার বীজ অকাতরে ছিটিয়ে গেছেন আর সেই বীজকে যিনি বা যাঁ'রা যতটুকু পোষণ ও বর্দ্ধন ক'রে করা ও হাবভাবের ভিতর দিয়ে প্রকাশ ক'রেছেন তিনি, তাঁ'রা বা সেই জাতি বা দেশ ততটুকু বা ততবড় তেমনতর স্বাধীনতাকে উপলব্ধি ক'রেছেন।

"আর দেশ মানেই হ'চ্ছে আদেশ। যা'দের এমনতর আদর্শ নেই যাঁ'র আদেশ না মেনে চল্লে মানুষের being and becoming (জীবন ও বৃদ্ধি) উপোস ক'রে অবসাদে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে মৃত্যুতে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—বাঁচা আর বাড়ার আকুতি যদি এমন কোন আদর্শের আদেশ আঁ'কড়ে ধ'রে লাখ ঝঞ্ঝার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে না চলে, তা'র বা সে দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিকারী রোগীর চিন্তা ও প্রলাপে স্বাধীন হওয়ার মত—এই তো আমি বুঝি! অধুনা-প্রচলিত কোন 'ism'-এ কি আছে তা' আমি বুঝি না, আসল 'ism' ব'লে আমি একমাত্র তা'কেই বুঝি যা' নাকি

আদর্শকে বা ইষ্টকে অর্থাৎ becoming-কে উন্নতির পথে চালিত করে এমনতর প্রেমিক চরিত্র—যা' প্রত্যেক individual-এর ভেতর দিয়ে environment-এ চারিয়ে তা'দের ভিতর একটা বিবর্দ্ধনের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, মানুষকে ভালবাসা-মাখান সেবায় আশ্বস্ত ও উদ্বুদ্ধ করে—একটা tangible সার্ব্বাঙ্গিক সার্থক উন্নতির দিকে চালনা করে।

"তাই যেখানে মূর্ত্ত স্বাধীনতার আদর্শ, সেখানেই বাস্তব সেবা সহানুভূতি-ভালবাসার আবহাওয়ায় চারিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটী individual-কে (ব্যষ্টিকে) উদ্বুদ্ধ ক'রে collective body-কে (জনমণ্ডলীকে) সহজ অনুপ্রাণতায় উন্নতির দিকে অবাধ ক'রেই তোলে। আর যেখানে এমনতর হ'চ্ছে, আদর্শ সেখানেই। আবার ইহারই যেখানে যতটুকু হ'চ্ছে সেখানেই এই আদর্শের অভিব্যক্তিও ততটুকু।

"আরও এই collective body (জনমণ্ডলী) যাঁ'র উপর দাঁড়িয়ে বাস্তবের দিকে হাত বাড়িয়ে তা'কে অধিগত কর্‌বার প্রচেষ্টায় চল্‌ছে সেই আদর্শবান্ collective body-কেই (জনমণ্ডলীকেই) আমার মতে State (রাজ্য) বলা যায়।

"যেখানে ধর্ম্ম নেই, ধর্ম্মোদ্দীপ্ত আদর্শ নেই, আদর্শানুপ্রাণতায় সেবা ও চলা নেই, খামখেয়াল সেখানে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করে, রক্তারক্তি করে—অবশেষে সেই ক্ষতের পচা দুর্গন্ধে তিষ্ঠানই মুস্কিল। এই ত' ইউরোপের অবস্থা। তা' হ'লেই বুঝুন স্বাধীনতার পথ কোথায়?

"তা'হ'লে রাজনীতি বলিতে আমি এই বুঝি—কোন পারিপার্শ্বিকের—কাহারও being and becoming-কে (জীবন ও বৃদ্ধিকে) পুষ্ট না ক'রে যদি কেউ বাঁচ্‌তে চায় ও পুষ্ট হ'তে চায় তা'র ক্রমাগত আপশোষই পুষ্ট হ'তে থাকে, আর সে আপশোষের বাঁচা ভীম পরাক্রমে মানুষের অস্তিত্বকে হীনতায় অবসন্ন কর্‌তে থাকে। তাই পারিপার্শ্বিকের সেবা ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ—আর এ-ই প্রকৃত রাজ বা শ্রেষ্ঠ নীতি।

"আমাদের বৃত্তিগুলি একদম গোল—যেন একটা water-tight ball, আর মানুষের মন এমনি আলাদা আলাদা ছিন্নভিন্ন কতকগুলি বৃত্তিচুয়ানো চেতনা;—তাই এমনতর মানুষের কোন জানার সাথে কোনো জানার সাধারণতঃ সমাবেশ ও সার্থকতা নাই। এই বৃত্তিগুলি যখন সে-ছাড়া অন্য কোন ইষ্ট বা আদর্শে ভালবাসার টানে সার্থক হ'য়ে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—তখনই এগুলি ক্রম generalisation-এ বিন্যস্ত হ'য়ে একটী আর-একটীকে fulfil (পরিপূরণ) ক'রে পর্য্যস্ত হয়, আর তখনই তা'র বৃত্তিভেদ। আর বৃত্তিগুলি যেন আদর্শসূত্রে পারম্পর্য্যে

গ্রথিত হ'য়ে দীপ্তি পে'তে থাকে আর তখনই সে normal man (স্বাভাবিক মানুষ বা সহজ মানুষ); তাই এই নীতি যখন এমনতর মানুষের বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা' প্রকৃত রাজনীতি হ'তে পারে। তা' ছাড়া অবিন্যস্ত বৃত্তি-ভূতে-ধরা ভীমকর্ম্মা কোন পুরুষ-ধুরন্ধরের হাতে পড়ে' নিয়ন্ত্রিত হ'লেই যা' হ'বার তা' হ'বেই,—যুদ্ধ ও অস্ত্র ছাড়া তা'র কাছে সেবার সরঞ্জাম উত্তম আর কি হ'তে পারে?

"যেখানে এমনতর আদর্শ মানুষ নেই, যা'র আদেশ বহন করাই জীবনের সার্থকতা, সেখানে দেশ মানে কি হইতে পারে, আর সে সেবাই বা কি? তা'হ'লে দেশের সেবা করিতে হইলে আদেশকে সেবায় work out করিয়া তা'র success সমাধানে আদেশ-কর্ত্তার wish (ইচ্ছা) গুলির fulfilment (পরিপূরণ) আনিতে হইবে—নতুবা দেশের সেবা ব'লে যে কথার প্রচলন আছে তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করিবে, কারণ সেবার ভিতর দিয়া যদি আদেশ-কর্ত্তাকে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাতে প্রত্যেক individual-কে (ব্যক্তিকে) উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ uphill elevation-এ (উন্নতিতে) elate (উৎফুল্ল) করিয়া, তাঁ'কে প্রত্যেকের interest (প্রয়োজন) করিয়া না তোলা যায় তবে সেবা কি হইল? আর সে সেবা মানুষকে কি করিতে পারে? অসুখ হইলে ঔষধ দেওয়া, যা'দের খাবার নাই তা'দের খাবার দেওয়া, আলস্য ও অভাবগ্রস্তকে শুশ্রূষা করা, তা'দিগকে vitally elevate (সঞ্জীবতায় উন্নত) না ক'রে, তা'দের being-কে (সত্তাকে) curative state-এ (নীরোগ অবস্থায়) না তুলে', resisting capacity-কে (প্রতিরোধের শক্তিকে) excited (উৎচেতিত) বা illuminated (উদ্দীপ্ত) না ক'রে, opposition-গুলিকে manipulate (পরিচালিত) ক'রে useful (প্রয়োজন পূরক) করার knack-এ (তৎপরতায়) না তুলে', libido-কে (আসক্তিকে) unit-centric (আদর্শানুপ্রাণ) ক'রে Superior Beloved-এ (ইষ্টে) প্রতিষ্ঠা না করিয়ে যে দেশের সেবা সেই সেবা কি সত্যিকারের সর্ব্বনাশের সেবা নয়? এক-কথায় যে সেবা পারিপার্শ্বিকে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে না, পারিপার্শ্বিককে তা'র interest-এ (স্বার্থে) interested (সার্থক) ক'রে তোলে না, আদর্শকে fulfil (পূরণ) করতে পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেককে elated and elevated (উল্লসিত ও উন্নত) করে না, যে সেবা তা'র আদর্শ-পূজায় তৃপ্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে with sympathy nurse and nourishment-এর (সহানুভূতি, শুশ্রূষা ও পুষ্টিদানের) তীব্রতায় প্লাবনের মত পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের ভিতর উপচে পড়েনা, সে সেবা মানুষের being-টাকে (সত্তাটাকে) তা'র পারিপার্শ্বিকের

প্রত্যেকের বৃত্তি-ক্ষুধায় আহুতি দিয়া person-কে (ব্যক্তিকে) যে সাবাড় করে, একটু তাকালেই এন্তেমার দেখ্‌তে পা'বেন।

"মানুষ লাখ গবর্ণমেণ্ট হাত করুক না কেন, পারিপার্শ্বিকের এমনতর প্রকার সেবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র সম্যক্ interest (স্বার্থ) হ'য়ে না দাঁড়াচ্ছে, স্বার্থ মানেই টাকা নয়কো—সেবায় পারিপার্শ্বিককে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে elated (উল্লসিত) ক'রে তা'দের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার স্বার্থকেন্দ্র হওয়াই যে মানুষের প্রকৃত স্বার্থ—এ যতক্ষণ মানুষের ইয়াদে না দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ বিকৃত বিধ্বস্তি কি দেশকে ছাড়্‌তে পারে? না, তা' সম্ভব? মানুষ যে মানুষকে কোন প্রকারে সমৃদ্ধ না ক'রে ফাঁকি দিয়ে তা'র effect of activity (কর্ম্মের ফল) কে'ড়ে নিয়ে enjoy (উপভোগ) করে—এই ফাঁকির অস্তিত্ব ভূতের মতন আবছায়া জ্ঞান বা অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে যেখানেই soil (স্থান) পা'বে, তা'কে possess (অধিকার) না ক'রে, সে কোথায় দাঁড়াবে? সে তো দাঁও পে'লে ধর্‌বেই—এ তা'র—মানে ঐ ফাঁকির—বেঁচে থাকারই যে আপ্রাণ আকুতি।

"কল্যাণপ্রসূ মানবের জীবনবৃদ্ধিকর সেবা, সাহচর্য্য, সহানুভূতি যা'তে মানুষের বেঁচে থাকার সম্পদ, বড় হওয়ার লওয়াজিমা, সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌বার খোরাক ইত্যাদির জোয়ার লাগে এমনতর করার হাওয়া যে কোন রকমেই হোক তুলে' চালাতে পার্‌লেই আনাচে-কানাচে জীবন-প্লাবনের উৎস ওঠে' মরণ-পণে আরো জীবনে উদ্দীপ্ত সম্বেগে মানুষ চল্‌তে থাকে—অঢেলভাবে—তখন যা' হ'বার আপনিই উপ্‌চে ওঠে—আর ঐগুলির অভাব যেখানে, অথচ চাই স্বাধীনতা, leader (নেতা) হওয়ার থর্‌বরে নাচুনী, হাত-নাড়ার তালবেতাল ছন্দ, মাথা-কোটাকুটি, ভেবরি ছে'ড়ে কাঁদা—হাজার করুক—ঐ তা'র ফল যা' তা' আপনিই এসে মানুষকে যা' দেবার তা' দে'বে, যা' কর্‌বার তা' কর্‌বে—এই তো যা' বুঝি, যা' দেখি! মঙ্গলময় কথা কাজে যদি মূর্ত্ত হ'য়ে না ওঠে, কথার মঙ্গল কথার বোধেই, কথার ভাবেই থেকে যায় —বাস্তবের গায়ে তা'র যে কি হয় তা' যখন আর কোন ইন্দ্রিয়ই বোধ কর্‌তে পারে না, তখন ত' বাস্তব অস্তিত্ব—তা'র অবোধ্যই। তা'হ'লে সেই নীতিই রাজনীতি যা' নাকি মানুষকে ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় এবং চারিত্র্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্রমোন্নতির দিকে লইয়া যায়; আর যেখানে ইহা জীর্ণ, জটিল ও মসীলিপ্ত সেখানেই ব্যভিচার ও বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। এই রাজনীতি কখনই কৃতকার্য্য হ'তে পারে না, আদর্শ বা ইষ্টনীতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবমানিত হ'য়ে ম্লানমুখে করুণ চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চে'য়ে থাকে। তাই সমাধানই সেখানে, আদর্শ বা

ইষ্টপ্রাণতা যেখানে উদ্দাম, মুখর ও মুক্ত—রাজনীতি সেখানেই বাস্তবিক রাজনীতি।

"জনকে ক্রমোন্নতির দিকে বাঁচা-বাড়ার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে নিরন্তরতায় চালনা করাই হ'চ্ছে সেবা—আর এই জন দিয়েই হ'চ্ছে জাতি। জন বাদ দিয়ে জাতিকে স্বাধীন করার মরকোচ যদি রাজনীতির ব্যাপার হয় তা' আমার বুদ্ধিতে আসে না। স্বাধীন হ'বে কে? জন তো? না জন বাদ দিয়ে হাওয়ায় ঝোলা জাতি-নামধেয়—যা' নাকি মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর—এমনতর কিছু? তাই যদি হয়, তা'তে যে আমাদের লাভ কোথায় তা'তো বুঝ্‌তে পারি না। ঐশ্বর্য্যবান্—যা'দের দিয়ে তাঁ'র ঐশ্বর্য্য অনুগমনশীল তাহাদিগকে সেবা সাহচর্য্য যা'র যেখানে বাঁচা-বাড়ার পুষ্টি যেমনতর লাগে তেমনতর ক'রে দিয়ে,—বাঁচা-বাড়ায় পুষ্ট ক'রে ঐ স্বার্থপুষ্টির সরবরাহে নিজের স্বার্থকে পরমপ্রস্থ ক'রে নিয়োজিত করায়ই তো ঐ জন ও ঐশ্বর্য্যবান-বিশেষকে পরিবেষ্টিত ক'রে যে প্রত্যেকটী পারিপার্শ্বিক যখনই অমনতর চলনার মধ্যে বহুধা সমতায় নানা রকমারির ভিতর দিয়ে অথচ ঐ এক বাঁচা-বাড়াকে সমৃদ্ধ করার চলনায় চলে' চল্‌ছে—তজ্জাত হ'য়ে, তখনই ত' সেই জাতিকে স্বাধীন জাতি বলা যে'তে পারে,—না আর কিছু? অমনি ক'রেই তো স্বাধীনতা প্রকৃতি নিঙ্‌ড়ে আপনি বেরিয়ে আসে! এতে কোন দিন কোন রকম বিদ্রোহ সৃষ্টি কর্‌তে হয় না এই তো আমি জানি। কারণ প্রত্যেক অস্তিত্বই প্রত্যেক অস্তিত্বের বাঁচা-বাড়ার মুখ্য স্বার্থ, এর সঙ্গে কা'র বিদ্রোহ হ'বে? ঐ বুদ্ধির যখনই যেখানে অপলাপ, রবাহূতের ন্যায় গোলমাল তো সেখানেই এসে জোটে দেখ্‌তে পাই—আর অমনতর হ'লে স্বাধীনতা আপনা আপনি জাতিগতভাবে আসে, নতুবা আর কি ক'রে আস্‌বে? আর ও-ছাড়া কোনও দিক দিয়ে কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় নেই—দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তাই ওকেই রাজনীতি বল্‌তে হয়—আর এর চাইতে যদি শ্রেষ্ঠতর কিছু থাকে যা'তে ওই করে, তবে সেইটেই রাজনীতি—এই তো আমি যা' বুঝি।"

রাজা-প্রজার সম্বন্ধ

জমিদার ও প্রজার অধিকার

"শুনি রাজ্‌-ধাতু মানে হ'চ্ছে দীপ্তি, শোভা; বা রঞ্জ্‌-ধাতু মানে রঞ্জন, অনুরাগ, আসক্তি, বর্ণান্তরোৎপাদন। এই যদি হয়, তা'হ'লে আমার মনে হয়, যিনি বাস্তবিক রাজাই হন, তাঁ'র temperament ও instinct-এর ভিতর ওসবগুলিই আছে—আর থাকাই উচিত—তাই রাজা।

"আর প্রজা মানে—যা' শু'নেছি—প্র পূর্ব্বক জন্-ধাতু থেকে প্রজা হ'য়েছে। "প্র" মানেই হ'চ্ছে প্রকৃষ্টরূপে—perfectly; আর জন্ ধাতু মানে জনন, to grow—প্রাদুর্ভাব, to be in plenty.

"তা' হ'লেই দেখুন,—যা'রা প্রজা, তা'দিগকে রাজা এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন, যা'র ফলে তা'রা জ'ন্মে, বেঁচে, বাঁচার পথে চ'লে, perfectly grow করতে পারে, বাড়তে পাবে,—আর তা-ই তা'র অনুরাগ ও আসক্তি। আবার, through manipulation, through achievement প্রজা যা'তে lower instinct থেকে higher instincts-এ acquisition-এর ভিতর দিয়ে যথাক্রমে উন্নত হ'তে পাবে তাই তাঁ'র normal স্বার্থ, চাহিদা ও activity. এর ভিতর দিয়েই প্রজারা সর্ব্বতোভাবে perfectly grow ক'রে থাকে; আর এমনি হ'য়েই তা'রা plenty-তে পর্য্যবসিত হয় ও জীবন যাপন ক'রে বাড়তে থাকে; আর তাই প্রজাদের রাজার প্রতি অত অনুরাগ, তাই তা'রা রাজার আপ্রাণ মঙ্গলকামী ও কর্ম্মী।

"আমি এ কথাটা বলছি,—একটা কথার যে সৃষ্টি হয়, তা' মানুষের direct feeling ও sensation থেকে; তাই, কথাটাব ভিতর বীজাকারে statement of fact-ও নিহিত থাকে—আব, তাই দে'খেই আমরা বুঝতে পারি, কি ব্যাপারের বিসৃষ্ট কি শব্দ বা কথা। কথাটা যেন—বা শব্দটা যেন সাধারণতঃ কোন affair-এর বা বস্তুর direct impulse-এর formulated অভিব্যক্তি। তাই, ঐ কথাগুলির অবতারণা করতে ইচ্ছে হ'ল।

"আচ্ছা, তবে জমিদাররা রাজাকে যথাযোগ্য সম্মানী ও রাজস্ব দিয়ে কি রাজার ভূমি ও কর্ত্তব্য গ্রহণ ক'রে থাকেন না? জমিদাররা যে রাজার কর দেন, তা'র মানেই হ'চ্ছে রাজার কর্ত্তব্য বা করা—যা' তা'দের প্রতি তিনি ক্ষেপণ ক'রেছেন, তা'রই দক্ষিণা মতন নয় কি? কৃ-ধাতু মানে করা, আর কৃ-ধাতুর মানে শুনেছি ক্ষেপণ করা। তা'হ'লেই জমিদারের কর্ত্তব্য তা'দের প্রজার প্রতি ওই রাজারই অনুরূপ, আর প্রজারও কর্ত্তব্য ওই জমিদারের প্রতি অনেকটা ঐ রাজা—যা'হ'তে তিনি জমিদারী লাভ ক'রেছেন—তাঁ'রই মাফিক। তা'হ'লেই দেখুন, রাজার স্বার্থও যেমন প্রজা মুখ্যভাবে—প্রজার স্বার্থও তেমনি রাজা ও জমিদার মুখ্যভাবে। আর, এই পরস্পর পরস্পরের মুখ্য স্বার্থ সম্বন্ধে—যা'তে জমিদার ও প্রজারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝে' তদনুরূপ অনুরাগ ও করায় নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে, সেই বিধিই কি শ্রেষ্ঠ বিধি নয় কো? তা'হ'লেই প্রজার প্রতি রাজার যে ক্ষমতা আছে তা'দের নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে, তা'দের উদ্বর্দ্ধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে জমিদারেরও অনেকটা তদ্রূপ থাকাই কি উচিত নয়কো? আবার, প্রজাদেরও রাজাকে সম্বর্দ্ধিত করার

জন্য যে সমস্ত অধিকার থাকা উচিত, যথোপযুক্তভাবে রাজার nurture-এ পুষ্ট হ'য়ে, uplifting move-এ তা'দেরও কি তাই থাকা উচিত নয়কো ?

"তা'হ'লেই দেখুন, প্রজার ভিতর যা'দের sphere of direct responsible service যত বিস্তৃত ও বড়, যা'দের উন্নতি অবনতি দ্বারা যত বেশী প্রজা উদ্বর্দ্ধিত বা আহত হয়, যা'দের সর্ব্ববিধ উন্নতি যা'র direct স্বার্থ—এক-কথায়, প্রত্যেক individual-এর উন্নতির জন্য যা'র যত বেশী auto-initiative resposibility, তা'রাই তো তা'দের তত বড় প্রধান বা guardian. এমনতর প্রধান সম্মিলিত হ'য়ে ঐ প্রধান ও জমিদারদের সাহচর্য্যে যদি জমিদারী পরিচালিত হয়, সেই কি সব চেয়ে ভাল হয় না ?

"আমার মনে হয়, ঐ প্রজাদের অমনতর selected উপযুক্ত প্রধান সম্মিলিত জমিদারী-পরিচালনী পঞ্চায়েৎ এতেই ঋণসালিসী বোর্ড ও আজকালকার ইউনিয়ন বোর্ডের অনেক ক্ষমতা, উন্নতিকল্পী অনেক বিধান, খাজনা আদায়ী certificate ক্ষমতা ইত্যাদি যদি থাকে,—আর উপরে state-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত এমনতর কিছু থাকে, যা' বা যা'রা ঐগুলি inspect কর্‌তে পারে, মন্ত্রণা দিতে পারে বা খারাপ কিছুকে রোধ কর্‌তে পারে,—আরও প্রজাবর্গের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে তা'রা উন্নতিলাভ কর্‌তে পারে এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'লে কি ঐ জমিদারী-পরিচালনী পঞ্চায়েতী সুবিধাজনক হ'বে না ? এতে কি প্রজা ও জমিদার উভয়েই শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌বে না ?

"তারপর দেখুন, মানুষের জীবন-চলনাকে ভাগ কর্‌তে গেলে কতগুলি main category-তে ভাগ করা যে'তে পারে। যেমন, তা'র individual life-এ আছে—বাঁচা-বাড়ার পথে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিশিষ্ট চাহিদা, বিশিষ্ট temperament ও তদনুপাতিক উপভোগ, তা'র পরিবার পারিপার্শ্বিক নিয়ে co-ordination-এ ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ; আবার এরই থেকে আসে তা'র hygienic life, life of home and humour, life of acquisition and activity, social life, life in riches and rights. এ আবার একটা uphill prosperous and profitable enjoyment-এর ভিতর দিয়ে acquire and enjoy কর্‌তে গেলেই কতগুলি factors এসে দাঁড়ায়—যেমন, time, invention and output ; agriculture, industry and commerce ; rent and rates. আবার এই চলনায় চল্‌তে গেলেই কতগুলি drawback-কে প্রায়শঃই face ক'রে নিয়ন্ত্রণ ক'রে দাঁড়াতে হয়ই—তা' যেমন unemployment, war, accidents and differences, designings and culprits.

"People-এর এইগুলিকে with auto-initiative responsibility যিনি যত সুন্দরভাবে manipulate ক'রে তা'দের being and becoming-কে accelerating zeal-এ push দিয়ে প্রস্থিতির পথে চালাতে পারেন, তাঁ'র প্রতি মানুষ স্বতঃই অনুরাগমুগ্ধ হ'য়ে,—আবেগময়ী interest-এ interested হ'য়ে, সম্মানে সমাসীন ক'রে সেই personality-কেই তা'দের স্বার্থ ক'রে তু'লে থাকে। আর, সেই মানুষই হ'চ্ছে এই মানুষদের প্রকৃত প্রধান। আর, আমার মনে হয়, এই হ'চ্ছে তা'দের প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রদত্ত auto-vote by natural election.

"তবেই বুঝুন, এমনতর পাঁচজন নিয়ে জমিদার যদি নিজে উক্তপ্রকারে actively engaged থেকে, তা'র নিজের মুখ্য স্বার্থকে প্রজাদের ভিতর বাস্তবভাবে অবলোকন ক'রে তা'র জমিদারী পরিচালনার প্রয়াস পান, তা'হ'লে সে পরিচালনা কত সহজ ও কত সুন্দর এবং কত efficiently profitable হয়, তা-কি সহজেই অনুমেয় নয়?

"তা-ছাড়া, জমিদার নিজে যদি তাঁ'র প্রাপ্য অংশ হ'তে প্রজাদিগের অমনতর efficient uplift-এর জন্য certain percentage ব্যয় করেন, তবে কত সুন্দর হয়,—বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি? আর যে প্রধানদের যে জমিদারের জমিদারীতে এই uplifting efficiency-র ratio and percentage যত বেশী, তদনুপাতিকভাবে ঐ রকম auto-voting and natural election-এর রকমে আরো higher administration-এ যদি তাঁ'দিগকে engage করা যায়, তবে কি real and normal practical men দ্বারাই আমাদের administration পরিচালিত হ'তে পারে না?

"এমনি ক'রেই, through progress and development of administering capacity, যিনি হয়ত prime minister-এর পদের উপযুক্ত হ'বেন, তিনি কেমনতর মানুষ হ'বেন, তা' সহজেই অনুমেয়। শাসন-নিয়ন্ত্রণকে এই বিধি অনুপাতিক ক'রে যেখানে যেমনতর প্রয়োজন যতদূর সম্ভব নিখুঁত বিবেচনায়, তা' খাড়া ক'রে, সেই বিধিনিষেধ-মাফিক শাসন-সংস্কার কর্‌লে কি তা' আমাদের মঙ্গলপ্রদ হ'বে না? আর এতে freedom and uplift কি প্রত্যেক individual-ই অনুভব ও enjoy কর্‌তে পার্‌বে না?

"তা'হ'লেই দেখুন, এই যদি হয়,—প্রত্যেক individual-এর interest and freedom কতখানি palpably accelerated হ'তে পারে, তা' হয়ত একটু চিন্তা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এতে প্রজা ও জমিদার উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে বুঝ্‌বে, উভয়ের সম্মিলনে কতখানি শক্তি, সুবিধা ও স্বার্থ

উদ্বর্দ্ধনশীলতায় অভিনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌বে! আবার দেখুন, এই system-এ চল্‌তে চল্‌তে ঐ প্রধানদের ভিতর থেকেই হয়ত auto-election-এ premier, dictator হ'য়েও কি রাজা-প্রজার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাকে সুস্থ ও সবল করার শক্তি-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ান সম্ভব নয়?

"আমার বেকুব মাথায় যা' গজাল, যা' বুঝি, তা'র চুম্বক এই যা' বল্‌লাম। জমিদার ও প্রজা যতই মুখ্য উভস্বার্থী balance হা'রাবে, ততই, যেমনতর ক'রেই হোক, অচিরেই নানাপ্রকার সর্ব্বনাশা রকমের সৃষ্টি ক'রে, সর্ব্বহারা হ'তে থাকবে। আমি যদি বজ্রের মত শব্দ কর্‌তে পার্‌তাম তা'হ'লে তা' তেমনি ক'রেই বল্‌তাম।"

ধর্ম্ম

"ধর্ম্মের আদি উপাদানই হ'চ্ছে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আর এই বাঁচ্‌তে হ'লে, বৃদ্ধি পে'তে হ'লে চাই, যাঁ'কে ধ'রে এই দুনিয়ার পাঁচ ভূতের পঞ্চাশ রকমের কামড়ানি, পাঁচশ' রকম বেটক্কর ঠোকরানিকে এড়িয়ে তা'দিগকে কাবেজে এনে বা ক্ষতি না কর্‌তে পারে এমনতরভাবে জব্দে রে'খে চলা যায়; তা'হ'লেই এই চলাটা আমার তেমনতর হওয়া চাই তাঁ'র মাফিক, যাঁ'কে ধরায় আমার এই বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া মাথা-তোলা দিয়ে পরম পরিপোষণে মোটাসোটা হ'য়ে বেশ কায়দা-মাফিক চল্‌তে পারে—তা'হ'লেই এল, যাঁ'কে ধ'রে আছি, তাঁ'রই প্রতিপাদ্যের পথে বুক বাজিয়ে বেদল ঢঙ্গে গাল বাজিয়ে যাজন-ফোয়ারায় মস্‌গুল হ'য়ে এন্তার হওয়া। তা'হ'লেই তা'র মানে—যাঁ'কে ধ'রে আমার এই রকম জীবন সুরু হ'ল, তাঁ'র প্রতিপাদ্যের ভিতর মহান্ একমাত্র খুঁটিই দেখা যা'চ্ছে ঈশ্বর, তা'হ'লেই চাই—এই ধর্ম্মের ভিতর—বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার উপকরণের ভিতর—ঐ খোদা, ঈশ্বর, ভগবান, ঐ রসুল, ঐ কোরাণ, বেদ, গীতা, Bible, ঈশ্বরপুত্র—তাঁ'দের মহান্, উদ্দীপ্ত, অমৃত-ছিটান, জীবন-পথে চলার বিবেকময়ী চেরাগ। তাই এই খোদাকে বা ঈশ্বরকে যে না মানে, পয়গম্বর রসুলকে, অবতারকে, ঈশ্বরপুত্রকে যে না মানে, তাঁ'দের নির্দ্দেশকে যে না মানে, তা'রাই মরণ-পথের যাত্রী—কাফের। এই কাফেরদের সাথে আর্য্যদ্বিজ, মুসলমান বা খৃষ্টান বা বৌদ্ধ—যা'রাই হোক না কেন—ঢের ফারাক্ থাকতে পারে। কিন্তু এই যে ফারাক্ তা' শরীর ও জীবনে নয়কো,—চলার কায়দায়। তাই ভগবান যীশু ব'লেছেন, 'পাপীকে ঘৃণা ক'র না, পাপকে ঘৃণা কর।' আবার কোরাণে হজরতও সজোরে এই কথাই ঘোষণা ক'রেছেন। তা'হ'লেই দেখা যায় ধর্ম্মের দিক দিয়া,—আচরণে ধর্ম্মকে যাঁ'রা অনুভব ক'রেছেন

তাঁ'দের দিক দিয়া, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার দিক দিয়া, তা'র লওয়াজিমা যা'র যেমন দরকার তা'র দিক দিয়া কোথাও কোনও ফারাক্ দেখতে পাওয়া যায় না—আর নাইও। হিন্দু-মুসলমান তো দূরের কথা—মানুষে মানুষে যে ফারাক্, এই ফারাকের একমাত্র সমাধানই হ'চ্ছে ধর্ম্মে। ধর্ম্মে কোথাও দলাদলি, ভেদ, বিসম্বাদ থাক্‌তে পারে না। হিন্দুরা বলেন—পূর্ব্বগুরু বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব হয়, আর এই যে পরবর্ত্তী—তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীরই পরিণতি মাত্র। ভগবান হজরত রসুলও তাঁ'র শ্রীমুখ-নিঃসৃত কোরাণে এমনতরই বলিয়া গিয়াছেন।

"যখন বন্যায় সারা দেশ জলে ডু'বে যায়, ঘর-বাড়ীতে লোকের থাকা অসম্ভব হয়, জঙ্গলে জীব-জানোয়ার ত' দূরের কথা—শুনেছি বাঘ, ভালুক, বাঁদর, সাপ, মানুষ হয়তো এক গাছেই উঠে' নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার আগ্রহে হিংসা ভু'লে যায়, কেউ কা'কেও খায় না, কেউ কা'কেও কামড়ায় না। অস্তিত্ব বা জীবন আর তা'র রাখ্‌বার টান জীবের এমনতরই ভীষণ! জীবন বাঁচাবার টানে যখন জীব-জানোয়ারের এমন হ'তে পারে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এতো আর কি? তবে চাই অমনতর ধর্ম্মের প্রতি হাড়ভাঙ্গা টান—তা'হ'লে সব চুকে যায়। ঐ রকম টানের মানুষের ভিতর কি দেখা গেছে—আছে হিন্দু ব'লে কোন গণ্ডী, হিন্দু ব'লে কোন ভেদ, মুসলমান ব'লে কোনও গণ্ডী, মুসলমান ব'লে কোনও ভেদ, কি বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব'লে কোনও গণ্ডী, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব'লে কোনও ভেদ? জীবনজড়িত প্রাণময় প্রেমের প্লাবনে তা'দের কি ঐ সব হামবড়াইয়ের আইনগুলি ভে'ঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায় নি? ঐ সব গণ্ডী ফণ্ডী—তা'দের নামের দোহাই দিয়ে আত্মম্ভরিতার সেবাহারা ফাঁকিবাজির বদমাইসী ছাড়া কি আর কিছু বোঝা যায়?

"যখনই আমাদের দেশে এমনতর কোন পীর বা সাধুর আবির্ভাব হ'য়েছে,—যা'রা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে খোদায়—ঈশ্বরে উন্নীত ক'রে অসীম চলার সম্পদ দান ক'রেছেন, তা'দের কাছে গিয়া কি আমরা দেখ্‌তে পাই নি যে—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব এক-গাট্টা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন? স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়েও কি তাঁ'রা একপ্রাণ হ'য়ে ইষ্টে নিবিড়ভাবে গেঁ'থে ওঠেন নি? তবে ধর্ম্মের মিল নেই বা কেমন ক'রে হয়? আর কেউ কাউকে না-মানার কথাই বা কেমন ক'রে আসে? প্রবৃত্তি-উপভোগের পোদ-পাকাম যা'র যতদিন থাক্‌বে, তা'র কাছে ওসব শাস্ত্র-ফাস্ত্র, হদিসের মিথ্যা দোহাই-টোহাই গোঁফ পাকিয়েই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা জাগ্‌লে ওসব কিছু টিক্‌তে পারে না বাবা! যাঁ'রাই ধর্ম্মকে অবলম্বন

ক'রে ভগবানের দিকে চ'লেছেন, তাঁ'দের সবারই একই কথা, অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে যা' ফারাক্ দেখা যায় তা' ছাড়া। শাস্ত্রের কথা বা ধর্ম্মোপদেশগুলি যদি গুলিখোরি গল্পই হ'ত, তবে প্রত্যেক পীর পয়গম্বর অবতারদেরই বা ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তদেরই প্রত্যেক অবস্থার প্রত্যেক রকমের একই কথা হ'ত না। পাঁচশ' বছর আগেকার কথার সাথে পাঁচশ' বছর পরের কথার সাথে মিল থাক্‌তো না। ও বাবা। বিজ্ঞানের। পরীক্ষা বা experiment-এর data-র (ফলের) চাইতেও নিছক সত্যি।

"হিন্দুরা অবতার-বাদ মানেন, হিন্দুরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী, তা' ছাড়া কত মূর্ত্তিপূজার বিধিতে তা'দের শাস্ত্র ভর্ত্তি—এসকল কারণে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের গড়মিলের কথা অনেকে উল্লেখ করেন। কিন্তু ঋষিদের কেতাবে মূর্ত্তিপূজার কথা নাই। কোরাণ-শরীফ, বাইবেল বা বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও মূর্ত্তিপূজার কথা নাই। যেখানে ওসব ব্যবস্থা আছে,—দেবতা বা hero-দের পূজার কথা। ভগবান-পূজাব কায়দায়, ওসব পুতুল টুতুল, গরু, মহিষ—ওসব নাই বাবা! দেবতা কথার মানে হ'চ্ছে যিনি, যে, বা যাঁ'রা মানুষের প্রয়োজনকে পূরণ ক'রে তা'দের পরিপোষণে স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞ অর্ঘ্যের অধিকারী হ'য়েছেন। ঐ রকম পূজা-পার্ব্বণ যা'কিছু হিন্দুদের—তা' ভগবদনুগ্রহসম্পন্নদেরই। ভগবান-পূজার একমাত্র চিজই হ'চ্ছে জ্যান্ত পুতুল ঐ পয়গম্বর, পীর, ঋষি, আদর্শ বা ইষ্ট। এঁর বা এঁদের অনুসরণ না করলে, পূজা না করলে, ভক্তির টানে আনত না হ'লে, পোষণ ও বর্দ্ধনের সেবায় আপ্রাণ না হ'লে, বিন্যস্ত জ্ঞানের—বিন্যস্ত ভূয়োদর্শনের অধিকারী কিছুতেই হওয়া যা'বে না। আর এই দর্শন বিশেষ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ না হ'লে খোদাকে বা ঈশ্বরকেও উপলব্ধি করা কিছুতেই যা'বে না। এ বাবা কঠোর সত্য—সব মাণিকের এক জেল্লা! সবাই ঐ এক-কথাই ব'লেছেন। বাহ্য পূজার কথা আর্য্যঋষিরা অবজ্ঞার সুরে কেমন ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে ব'লেছেন—

'উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবঃ
ধ্যানভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমস্তপো জপশ্চ
বাহ্যপূজাঽধমাধমঃ ॥'

"এর মানে—এই অস্তি যাঁ'তে বিরাট হ'য়ে উঠেছে, তাঁ'র প্রতি যে প্রাণঢালা টান, যা' নাকি শত বিপ্লব-বিধ্বস্তির ভিতরেও একটা নিবিড় তৃপ্তির অনুসরণ সৃষ্টি ক'রে, চলার আনন্দে চলায়, সেই ভাবই হ'চ্ছে উত্তম। আর পর পর ওগুলি সব তা'র চাইতে অনেক কম। টান-ফান নাই অথচ বাইরের

পূজাপালি নিয়ে মত্ত, এতে কিছু হয় টয় না বাবা, ওতে শুধু যা' হ'বার তাই-ই হয়।

"ধর্ম্ম আচরণের দিক দিয়া হজরত রসুলও যা' বলে' গিয়েছেন, আর্য্যদের ধর্ম্মশাস্ত্র চিরকালই ঋষির নির্দ্দেশরূপে তাহাই বহন ক'রে আস্‌ছেন। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র তাই ছবি বা পুতুল-পূজা এমনতর বিকট তাচ্ছিল্যের সহিত নিরস্ত কর্‌তে ঘোষণা ক'রেছেন। তবে আর্য্যঋষিদের প্রত্যেক মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার এমন একটা ঝোঁক ছিল যা' নাকি হজরত রসুলের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়—এমন-কি আরো আরো অনেক কামেল-পীরের ভিতরেও একটু বুভুক্ষু আগ্রহের মতন নজরে আসে। আর তা'র জন্যই ঐ পুতুল-পূজার ভিতর দিয়াও মূঢ়রা যা'তে সেই পথে চল্‌তে চল্‌তে একদিন ঐগুলির বাস্তব ব্যাপার বু'ঝে শু'ঝে, তা'হ'তে বিরত হ'তে পারে এমনতর ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে অধমাধম ব'লেও একদম নাকোচ ক'রে দেন নি। আর দেখা যায়, হজরত রসুলও একরকম তা-ই ব'লেছেন। যা'রা পুতুল-পূজা নিয়ে পুতুলকেই ভগবান ক'রে একটা বেপরোয়া জড়ত্বের আরাধনায় মস্‌গুল হ'য়ে আছে, কায়দা-কলম ক'রে তা'দিগকে ঐ পুতুল বা ছবিপূজার অনিষ্টকারিত্ব বুঝিয়ে ওগুলি যে নিরেটই অধম, তা'দের তা' বিবেচনার ভিতর এনে, অন্তর থেকে তা' যা'তে মু'ছে যায় তা'রই মতলব মত কথার ভিতর দিয়ে কত রকমে দিযেছেন তা'র ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি ত' একথা কখনও বলেন নাই, যা'রা পুতুল পূজা ক'রেছে তা'দের ইয়াদে অর্থাৎ জ্ঞানে তা'র অপকৃষ্টতা বোঝ্‌বার মতন হ'লেও, সে যদি সত্য অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধির ধর্ম্মাচরণকে অবলম্বনও করে আল্লাতাল্লাহ তথাপি তা'দের প্রতি কৃপাপরবশ হ'বেন না। তা'হ'লেই এই ধর্ম্মপথে যে যে আচরণ মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উৎকর্ষে উন্নত ক'রে তোলে, সে ব্যাপারে এঁদের কা'রও ভিতরে মতান্তর কোথায়? মতান্তর ভাবি আমরা অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন যা'রা। খোদা সকলেরই একজনই—খৃষ্টানের খোদা, আর্য্যদের খোদা, মুসলমানদের খোদা, বৌদ্ধদের খোদা—এ আলাদা আলাদা নয়। আলাদা আলাদা খোদা এসব আলাদা আলাদা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন নাই। তাই তাঁ'কে যা'রা অনুভব কর্‌তে পে'রেছেন সবারই এক কথা। তবে অবস্থাভেদে ঐ একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। আর দেবতা মানে হ'চ্ছে যাঁ'রা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির সেবা ক'বে উৎকর্ষে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তা'দের হৃদয়ে উজ্জ্বল আবেগে স্মৃতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা পে'য়েছেন।

"তাঁ'রাও একদিন জ্যান্ত-শরীরী, দীপ্তকর্ম্মা ও সেবা-উদ্দীপ্ত হ'য়েই প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথেই নিয়ন্ত্রিত ক'রেছিলেন, যে স্মৃতি

মানুষ ভুল্‌তে পারে না,—তা' খৃষ্টানই হউক, আর্য্যই হোক, মুসলমানই হোক, বৌদ্ধই হোক, জৈনই হোক বা যেই হউক বা যা'ই হউক। এই দেবতাদের গুণকীর্ত্তন হজরত রসুল যে কত-রকমে ক'রে গেছেন তা' বলা যায় না, আর প্রত্যেককে তা'দের স্তুতি ও পূজা কর্‌বার কথা যে কত-রকমে ব'লে গেছেন তা'রও ইয়ত্তা নাই। ঐ জ্যান্ত-শরীরী খোদাতাল্লার সেবক, মানুষের প্রিয়কারী, জীবন ও বৃদ্ধির হোতাদিগের জীবন্ত জ্ঞানবিকীরণকারী জীবন যে মানুষের জীবন-চলনায় কত অমৃত উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে দেয় তা' বলাই বাহুল্য। হজরতের তাঁ'দের প্রতি বহুল প্রশংসা ও ধন্যবাদ তারস্বরে তাঁ'দিগকে এখনও অভিনন্দিত কর্‌ছে।

"হিন্দুর জন্মান্তর লইয়া মুসলমান বা খৃষ্টানের সাথে কি কোন গোল আছে? বুঝের গোলই সব গোল এনে দেয়। খোদার কাছে কি কোন দিন ফিন আছে? দিন-রাত ব'লে কি কিছু আছে? না, এখন পাঁচটা বাজ্‌ল, তখন সাতটা বাজ্‌ল ব'লে কি কিছু আছে? যখন যা' হয়, তা'ই তখন তাঁর দিন। 'রোজ কিয়ামত' বা re-surrection মানেই হ'চ্ছে—রোজ কায়ামৎ বা re-rise—কায়াম হওয়ার রোজ বা আবার হওয়ার দিন! কর্ম্মফল অনুযায়ী এ'তো দুনিয়ায় হরদমই হ'চ্ছে রোজ। যেদিন সে হয় তা'রই দিন—ধাতার বিধানের বিচারে তা' যে অনবরত আপনা-আপনি চল্‌ছে।

"তা', তাঁ'রা তো আর আমাদের মতন অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন একটা যা'-তা' বলার কেউ ছিলেন না যে, কারু সাথে কারু মিল থাক্‌বে না! আমরা আমাদের বুঝ-মাফিক মারামারি করি। ঐ মারামারির ভয়ে বাস্তব যা', তা'তো আর অস্তিত্বপ্রকৃতিহারা হ'তে পারে না; যা' আছে তা' আছেই, যতদিন যা' থাক্‌বার থাক্‌বেই।

"আর অবতার-বাদের কথা যা' বলা হয়—দুনিয়ার যা'-কিছু সবই তো তাঁ'র অবতার—তা' থেকে তো সবই অবতরণ ক'রেছে, আর অবতরণ ক'রেও সর্ব্বতোভাবে তো তাঁ'তেই সবাই আছে! তবে হিন্দুরা তাঁ'দিগকেই অবতার ব'লে থাকেন—খোদায় যাঁ'রা চেতন আছেন বা থাকেন—আর তাঁ'রাই হ'চ্ছেন, ঐ খৃষ্টানরা যাঁ'কে বলেন ঈশ্বরের সন্তান, মুসলমানেরা যাঁ'কে বলেন খোদার দোস্ত। আবার এঁ'রা যেমনই হউন বা যাহাই হউন না কেন, ঋষি তে বটেন-ই। কারণ খোদার দর্শন বা চেতনা এঁ'দের প্রত্যেকের ভিতরই মস্‌গুল্ [illegible]মান। কোরাণের ভিতরও তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় এমনতর বহুত আছে। ইহাদিগকে যাঁ'রা মানেন না, কোরাণের কথায় তাঁ'রা তো মুসলমানই নয়। একটা লাঠি সোজা ক'রে ধর্‌লেই লাঠি হয়, আর ফেরালেই তা'কে কোৎকা বলে। লাঠিই বল আর কোঁৎকাই বল—যা' ইচ্ছা বল্‌তে পার, কিন্তু জিনিষ যা'

জন্মোৎসব-অভিষেকে জননীদেবীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

(১৩৪০ সনের ভাদ্র)

তা' থাক্‌বেই; তা'র যা' গুণ, তা' দিয়ে যা' হয়, তা' তুমি কিছুতেই মু'ছে ফে'লে দিতে পার্‌বে না। তা'হ'লে গরমিল কোথায় তা'তো ঠাহর পাওয়া গেল না। না, ঠাহর পে'য়েছে কেউ বল্‌তে পাবে? খোদাকে এ দুনিয়ার প্রত্যেকটীকে যে নিয়মের ভিতর দিয়া সৃষ্টি কর্‌তে হ'য়েছে, এ দুনিয়ায় আমাদের উদ্ধাতারূপে আস্‌তে হ'লেও তেমনি শরীরী হ'য়েই আমাদের মত সুখদুঃখের বোদ্ধা হ'য়েই, জীবন ও বর্দ্ধনের পোষণ-লিপ্সু হ'য়েই তাঁ'র পরম অস্তিত্বকে আবৃত ক'রে শরীরী হ'তে হ'য়েছে; আর তা' না হ'লে এই বেভুল-স্বত্বশালীদের উপায় কি হ'ত? তা' না হ'লে এরা পথহারা দিগ্‌বিদিক-হারা, বিভ্রান্ত, শুধু মরণপ্রবণই থেকে যে'তো হয়তো! তাই আবার এই ভগবৎচেতনা-বিমুখ—যাদের চল্‌তি কথায় জীব বলে—তা'দের জীবত্বটুকু বাদ দিলে তা'দের অস্তি ব'লে কিছু থাক্‌তে পারে? আর তা যদি না-ই পারে ঐ অস্তির অস্তিত্ব যদি একমাত্র রহমান খোদাই, ঈশ্বরই, ভগবানই হন, তবে ত' আর ঐ কাঠখোট্টা জ্ঞান-খেলাপী দ্বন্দ্বের আস্তিন-গুটানোর জায়গাই নাই। এই জীবশালা যখনই ঐ খোদ-চেতনায় চেতন হয়, ঐ রহমান রহিমে, ঈশ্বরে, ভগবানে আমজ্জিত না হ'য়ে যায় কোথা? খোদার দোস্ত সে ত' কেবল তখনই হ'তে পারে। তাই আর্য্যেরা ব'লেছেন, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম এব ভবতি।' দিনদুনিয়ার খোদ অশরীরী একমাত্র কারণেরই—দিন দুনিয়ার খোদ একমাত্র চেতনার—জ্যান্ত, আব্রহ্মস্তম্বচিৎসম্পন্ন জৈব-উপাধিসম্পন্ন, দোস্ত নরনারায়ণ মানুষের মুক্তির একমাত্র অমৃত-মথিত রাজপথ—যা' নাকি সব আলিঙ্গনে এক-চুমুকে মানুষের মৃত্যুকে নিঃশেষ ক'রে অসীমের জ্যান্ত চলায় চলায়মান ক'রে তুল্‌তে পারে! আমরা শালা বৃত্তি-ভাঙ্গীর দল, মরণ-পীরিতের প্রেমিক, অমন পুরুষকে আমাদের ভাললাগে না? ভাব্‌তে গেলে বুকটা যে পাঁচ হাত ফু'লে ওঠে না?

"তা'হ'লে মানুষের ঠিক চলার পথ একটাই। এক খোদ বা ভগবানে বিশ্বাস, তাঁ'র প্রেরিত পয়গম্বর ও প্রকৃত ভক্তদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ, আর তাঁ'দের নির্দ্দেশগুলিকে মেনে তাঁ'কেই আপ্রাণ অনুসরণ—এই হ'চ্ছে ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। এক-কথায় যা' নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথে চালনা করে, আসক্তির বা টানের আচরণে সেই পথে চলা। বিশেষ বিশেষের বিশেষ কোন জীবনপ্রদ ব্যাপার নিয়ে অবজ্ঞা বা বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে, প্রত্যেকের প্রত্যেক পারিপার্শ্বিককে সেবায় উন্নত চেতনা দিয়ে সংবৃদ্ধ ক'রে, আদর্শ-প্রতিষ্ঠার স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে, জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রত্যেককে সমুন্নত ক'রে খোদের চেতনায় অসীমের পথে চলা। এই ত' হ'ল যা-কিছু সব ব্যাপার। প্রত্যেকের এই বুদ্ধি এলেই ত' সব মিটে গেল।"

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর মানব সাধারণের সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের পরিপূরক, যত-কিছু সমস্যার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যে অভ্রান্ত সার্ব্বজনীন মীমাংসা-বাণী দান করিয়াছেন, আমরা এইবার প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করিব।

প্রশ্ন। ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থ তো আসে না? ধর্ম্ম আর অর্থে তো চিরদিনই বিরোধ;—ধর্ম্মে আর দারিদ্র্যেই তো চির-বন্ধুত্ব? আপনি ধর্ম্মের সঙ্গে এত এত শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তন ক'রেছেন কি উদ্দেশ্যে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি তো অনেকবারই আপনাদের ব'লেছি—ধর্ম্ম মানেই আমি বুঝি সেই নিয়ম, সেই আচার,—মানুষের বাঁচা-বাড়াকে যা' ধ'রে রাখে। তা'হ'লে এই বাঁচ্‌তে গেলে, বাড়্‌তে গেলেই, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা' যা' করণীয় সেইগুলিই ধর্ম্মকে সার্থক করে—আর এ individual জীবনেও যেমনতর, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনেও সেই হিসাবে তেমনতর। তা'হ'লেই বুঝুন্ ধর্ম্মের লওয়াজিমায় আমি industry-র কথাই বা বলি কেন, education-এর কথাই বা বলি কেন, আর আদর্শ ও পারিপার্শ্বিকের সেবার কথাই বা বলি কেন?

Individual-এর ধর্ম্ম যথাযথভাবে বজায় না থাক্‌লে জাতীয় ধর্ম্ম কি ভাবে বজায় থাক্‌তে পারে? আর রাষ্ট্রের বা জাতির ধর্ম্ম যদি individual ধর্ম্মকে পরিপুষ্ট না করে, আবার তেমনই individual যদি তা'র পারিপার্শ্বিককে নিয়ে ধর্ম্মে সংস্থিত হ'যে রাষ্ট্র বা জাতিকে fulfil না করে তা'হ'লে individual জীবনই হোক আর রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনই হোক্—কি ক'রে কোথায় দাঁড়াতে পারে তা'ও তো বু'ঝে উঠ্‌তে পারি না?

তাই, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনকে অটুট ও অক্ষত রাখ্‌তে গেলেই পারিপার্শ্বিক তা'র রঙ্গিল বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি পরস্পরকে যথাযথভাবে পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধন-সার্থকতায় সমুন্নত ক'রে না তোলে, আর এই যদি প্রতি-প্রত্যেকের মুখ্য স্বার্থ হ'য়ে না দাঁড়ায় তা'হ'লে লাখ স্বার্থের চেঁচামিচি কাউকে কি কখনও সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে?

আর আমাদের দেশে যখনই আর্য্য-বর্ণধর্ম্মের এই সার্থক শৃঙ্খলা ছিন্ন ভিন্ন হ'যে বৈশিষ্ট্যের রংগুলি কাউকে সার্থক না ক'রে আত্মস্বার্থের বদরোলে বিশৃঙ্খল হ'য়ে প'ড়েছে, অধঃপতন দানবী চীৎকারে তখন থেকেই আমাদিগকে নিঃশেষ-প্রয়াসী হ'য়ে আক্রমণ চা'লাচ্ছে, তা'কি এখনও কারু বুঝ্‌তে বাকী আছে?

তাই আমি বলি—বিপ্র-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যকে interwoven ক'রে, বিপ্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব আর বৈশ্যত্ব interlocked in activity and অনুলোম Eugenic relations হ'লে তবে solution of economic and all problems হ'তে পারে।

দ্বিজমাত্রেরই সবর্ণের normal cultural trait prominent রে'খে অন্য বর্ণের traitগুলিরও secondary culture হিসাবে family life-এর ভিতর দিয়ে practical life-provision-এর মতন নৈমিত্তিকভাবে চর্চ্চা রাখা উচিত, যেমন, বিপ্রদের সবর্ণের culture-কে prominent রে'খে executive and industrial traitগুলির চর্চ্চা রাখা; ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় culture-কে prominent রে'খে বৈপ্রিক এবং industrial চর্চ্চাকে নৈমিত্তিক গৃহস্থ-জীবনে মন্ত্রের ভিতর রাখা; আবার বৈশ্যদের নিজেদের commercial and industrial trait-কে prominent রে'খে বৈপ্রিক এবং ক্ষাত্র চর্চ্চাকে গৃহস্থ-জীবনে নৈমিত্তিকভাবে জাগরূক রাখা, আর এটা এমনতর হ'লে এই cultural chain almost unbreakably থেকে যা'বে—আপৎকালে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিধ্বস্তির পথ-চলনে নিঃসহায় হ'যে বিশৃঙ্খলায় এমনতর ছিন্ন-ভিন্ন আর নাও হ'তে পারে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের জাতির স্বাধীন উপার্জ্জন-ক্ষমতা বাড়ে কিসে তা'তো কিছুই বল্লেন না? স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি—যা'ই বলুন না কেন, সমস্তই সংস্কার করা সম্ভব, যদি আমরা অর্থবান্ হই, পরাধীন দরিদ্র দেশে প্রতি ব্যক্তি ও পরিবার অধিকতর উপার্জ্জনক্ষম হ'বে কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করার ক্ষমতা নির্ভর করে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ প্রেষ্ঠ বা Superior Beloved-কে fulfil করার urge-এর উপর—যা' মানুষের underlying sentiment-কে উস্কে দিয়ে, fulfilment-এর আনন্দে বাক্ ও বাস্তবতার সহজ প্রশ্নশূন্য সঙ্গতির সহিত normal serving zeal-এ উদ্বুদ্ধ ক'রে রাখে—এই এমনতর ভাবেই educated হওয়ার রকমের উপর যা'তে motor ও sensory nerves-এর সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ co-ordinated habit-এর culture চরিত্রে normal and natural way-তে দাঁড়িয়ে যায়। তা'হ'লেই মানুষের জীবনে দুনিয়ার জানাগুলি সার্থক পর্য্যায়ে পর্য্যয়ীকৃত হ'তে হ'তে always integrating রকমেই বাড়্‌তে থাকে, আর তা' না-হ'লে মানুষের প্রবৃত্তি ও জানাগুলি—যা' তা'র জীবন কত রকম বিচ্ছিন্ন চাহিদা ও অবস্থার ভিতর দিয়ে অর্জ্জন ক'রেছে—সব ঐ অমনতর বিচ্ছিন্ন রকমেই চল্‌তে থাকে; কোনও চাহিদা বা কোনও

জানা তা'র অন্য চাহিদা বা অন্য জানাকে fulfil ক'রেই উঠ্‌তে পারে না। এমনতর মানুষগুলো জানায় living library হ'তে পারে কিন্তু জানায় বিবর্দ্ধনশীল মানুষ হ'তে পারে না। Profit দিয়ে profit পে'তে হয় তা' তা'রা বুঝ্‌লেও তা'দের জানার দখলে যেন তা' নেই! তাই তা'দের ভাতা নিয়ে চাকুরী করা ছাড়া অন্য উপায়ই যেন থাকে না—ঐ এক রাস্তা ছাড়া profitable অন্য সব রাস্তা তা'দের জীবনের কাছে দুর্লক্ষ্য ও দুশ্চিন্ত্য।

আর এই দে'খে শু'নেই আমি আপনাদের প্রত্যেক individual life-এর যা'তে daily একটা normal culture of motor-sensory co-ordinating habit হ'বেই হ'বে তা'র জন্য স্বস্ত্যয়নীর বিধি দিয়েছি।* এই স্বস্ত্যয়নী বিধির ভিতর আছে—

নিজের শরীরকে ইষ্ট-পূজার যন্ত্র বিবেচনা ক'রে বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ক'রে শরীরকে সহনপটু ও সুস্থ রাখ্‌তে সজাগ থাকা।

তার পরেই আছে,—মনের কোণে যে প্রবৃত্তিই উঁকি মারুক্ না কেন, তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠামুখী ক'রে তুল্‌তে সজাগ থাকা।

আবার এরই সাথেই যখনই যা' ভাল ব'লে বিবেচনায় আস্‌বে, ভরসা ও শক্তি-সাহসের সহিত সেগুলি বাস্তবভাবে অবিলম্বে কাজে ফুটিয়ে তুল্‌তে সব সময়েই প্রয়াসশীল থাকা চাই।

আবার এমনতর tendency ও attitude নিয়ে পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়াকে নিজের বাঁচা-বাড়ার বাস্তব স্বার্থ বিবেচনায় জীবন-বৃদ্ধিদ ইষ্টানুগ যাজন-সেবায় তা'দের প্রতি-প্রত্যেককে শুভ ও সম্বর্দ্ধনাপ্রবণ করতে সানুসন্ধিৎসু প্রয়াস নিয়ে চলা—আর এইগুলির প্রত্যেকটী যথাযথভাবে daily life-এ observe ক'রে নিজের জীবন-যাপনের আহার্য্য-আহরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন নিজের Superior Beloved বা ইষ্টের জন্য নিজের সামর্থ্যের যথাসম্ভব স্বাধীন প্রয়োগে সেবা ও সম্বর্দ্ধনাযুক্ত অন্ততঃ দুই বেলার আহার্য্যাদির অনুকল্পে প্রতিদিন প্রত্যূষে পান-ভোজনের পূর্ব্বেই অর্ঘ্য নিবেদন করা, আর প্রতিমাসে এই প্রাত্যহিক নিবেদিত অর্ঘ্য হ'তে ন্যূনকল্পে ৩৲ টাকা ইষ্টের সেবা, সম্বর্দ্ধনা ও দুই বেলার আহার্য্যাদির অনুকল্পে পাঠিয়ে বাকী যা' থাক্‌বে তা' কোন-রকমে নষ্ট না হয় এমনতরভাবে নিজের আয়ত্তে মজুত রাখা—

আর এমনতর ক'রে অর্থ মজুত ক'রে পরে profitable concern-এ সেই

*স্বস্ত্যয়নী সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অর্থগুলিকে ইষ্টোত্তর ক'রে রে'খে তা'রই income দিয়ে যা'তে ইষ্টের wishesগুলি complied হয় এমনতর ক'রে ইষ্ট ও পারিপার্শ্বিকের service-এ সেগুলি নিয়োজিত করা, আবার এইগুলি management ও supervision-এর জন্য ঐ invested ইষ্টোত্তরের আয়-মাফিক নিজের উত্তরাধিকারীদের ভিতর বড় যে অর্থাৎ যা'র উপর নিজের সংসারের ভার ন্যস্ত থাকে তা'র ভাতা নির্দ্দেশ করা। ঐ ভাতা ঐ invested money বা সম্পত্তির আয়ের এক-পঞ্চমাংশের বেশী না হয়।

এই ভাতা নিয়ে কেউ যদি ঐ প্রকার ইষ্টানুগ জীবনবৃদ্ধির যাজন-সেবায় প্রতি-পারিপার্শ্বিককে যথাসম্ভব পরিপালন না করে তা'হ'লে ঐ বংশের ক্রমসূত্র হিসাবে যেই তা'তে উপযুক্ত তা'তেই ঐ ভাতার ও ঐ ইষ্টোত্তরের বর্ত্তনের নির্দ্দেশ রাখা।

আরো এই রকম বাৎসরিক মজুত ইষ্টার্ঘ্য হ'তে নিজ সংসারের আপন প্রয়োজনে এক-দশমাংশ মাত্র বৎসরান্তে নেওয়া যে'তে পারে। এ ইষ্টের দান ব'লে যা'তে অন্যায়ভাবে খরচ না হয় এইভাবে বিশেষ নজর রে'খে গ্রহণীয়।

মানুষের জীবনে এইগুলিকে fanatically and sentimentally observe করাকেই আমি ভাল-থাকার পথ বা স্বস্ত্যয়নী ব'লে থাকি। ইহাতে দারিদ্র্যরোগ, বুদ্ধিবিপর্য্যয়, কিছু বা কারুদ্বারা possessed হ'য়ে পথভ্রষ্ট হওয়া—এক-কথায় যা'কে গ্রহদোষ বলে—তা' এবং নানারকম বিধ্বস্তির হাত হ'তে প্রতি-প্রত্যেকে সংসার-চলনে শুভ চলনায় না-চ'লেই পারে না।

জাতির সত্যিকার আদর্শে বা ইষ্টে যখন প্রত্যেক individual এইভাবে যুক্ত হ'বে তখন জাতির উন্নতি না হ'য়েই থাকতে পারবে না—নানা প্রকার অবসাদ ও অবিধি অপঘাত হ'তে জাতির প্রায় প্রত্যেকে যথাসম্ভব রক্ষা পা'বেই পা'বে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

এই ছোট্ট টোট্‌কা ব্যাপারটী যদি প্রত্যেক individual-এর অবশ্য পালনীয় হয় তা'হ'লে কত রকমে কি হ'তে পারে তা' আপনারাই একটু ভে'বে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তেই পারেন। আর এটা আমার ছোট্ট অথচ বিরাট psycho-industrial তুক্‌—যে industry মানে হ'চ্ছে to build from within—যা' দিয়ে individual এবং জাতির স্বাধীন উপার্জ্জন-ক্ষমতা তো আরো বে'ড়ে যা'বেই তা' ছাড়া ঐ রকমেই মজুত অর্থও মেরুদণ্ডের মতন individual ও জাতিকে ধ'রে রাখ্‌বে—এই আমার স্থির বিশ্বাস।

আবার এই স্বস্ত্যয়নী কোন দোকান, কারবার, জমিদারী ইত্যাদি যে-কোন concern-ই হোক না কেন সেই সেই নামে তা'র তরফ থেকেও করা যে'তে পারে, আর তা' সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ব্রতের প্রত্যেকটা নিয়ম তখন ঐ concern-এর তরফ থেকে পালন কর্‌তে হয়, আর বৎসরান্তে বিশেষ প্রয়োজনে এক-দশমাংশ লইলে ওই concern-এরই উন্নতিকল্পে তাহা প্রযোজ্য। যে concern-এর তরফ হ'তে এই স্বস্ত্যয়নী ব্রত পালন করা হ'বে, ব্যক্তিগত জীবনের মত ঐ concern-ও এই ব্রতের প্রত্যেকটা বিধি-মাফিক ঠিক ঠিক চালিত হ'লে সর্ব্বতোভাবে flourishing হইয়া উঠিবেই উঠিবে। তাই আমি এটা দ্বিজাচারের একটা প্রধানতম আচার ব'লে গণ্য ক'রে থাকি। এটা না থাক্‌লে, আমার মনে হয়, দ্বিজত্বের যেন অনেকখানিই খাক্‌তি থেকে গেল।

প্রশ্ন। আপনি বলেন পারিপার্শ্বিকের প্রযোজন ও অভাব পূরণ কর্‌তে শ্রমশিল্পের দ্বারা, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অতি সাধারণ চাহিদা ও প্রয়োজনটা এত সস্তায় বিদেশীয়গণের দ্বারা পরিপূরিত হ'চ্ছে যে শ্রমশিল্প আরম্ভ কর্‌লেই তো আমরা হ'টে যা'চ্ছি—এর প্রতিবিধান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এর পূর্ব্বেই আমি দ্বিজদের প্রাত্যহিক দ্বিজাচারের ভিতর প্রধান দ্বিজাচার গণ্য ক'রে "স্বস্ত্যয়নীর" কথা ব'লেছি। সেই স্বস্ত্যয়নীর ভিতর একটা clause আছে, পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়াকে নিজের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ জ্ঞান ক'রে অনুসন্ধিৎসার সহিত সজাগ থাকা—যা'তে পারিপার্শ্বিককে ইষ্টানুগ সেবা ও যাজনে উদ্বুদ্ধ ক'রে প্রয়োজনানুপাতিক service-এ পরিপূরণ কর্‌বার প্রয়াস নিয়ে চল্‌তে পারা যায়।

এই clause-এর faithful observation থেকেই আসে industrial upliftment-এর বৃদ্ধি—যা'তে সুন্দর ও সহজভাবে, যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ের ভিতর দিয়ে পারিপার্শ্বিকেব প্রয়োজনগুলিকে supply ক'রে নিজেকে profitable করা যে'তে পারে। আর এই জন্যই দ্বিজাচারের যেমন মুখ্য আচার "স্বস্ত্যয়নী", আবার দ্বিজ গৃহস্থের এক মুখ্য গৃহস্থাচার—বাড়ীতে পরিবারের ভিতর cottage industry-র ব্যবস্থা রাখা, আর এরই সঙ্গে scientific culture-এর জন্য একটা ছোট্ট laboratory-র equipments রাখা—যা'র ভিতর দিয়ে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারই মাথা খাটিয়ে বে'র কর্‌তে পারে, মানুষের প্রয়োজনগুলিকে কত সহজ, সুন্দর ও স্বল্পব্যয়ের ভিতর দিয়ে comply করা যে'তে পারে।

এগুলি মেয়েরা যদি তা'দের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ঘরকন্নার ভিতর দিয়ে উদ্ভাবনপ্রসূ অনুসন্ধিৎসার সহিত বাস্তব জীবনে কর্‌তে থাকে, তা'হ'লে ছেলেমেয়েরা ঐ instinct-গুলির যথাযথ nurture পে'তে পে'তে এমনতর বিরাট fulfilling প্রভায় হয়ত প্রভান্বিত হ'য়ে উঠ্‌বে—যা'র ফলে দুনিয়ায় ভক্তি, বিনয়, বিস্ময়ে তাক্ লে'গে যা'বে

আবার এই উদ্দেশ্যেই মেয়ে ও পুরুষ উভয়েরই motor-sensory co-ordination হ'তে পারে এমনতরভাবে educate করবার ব্যবস্থা ক'রে—বিশেষতঃ মেয়েরা ঘরকন্নার ভিতর দিয়ে সহজেই অল্প সময়ে অন্ততঃ Matriculation যা'তে পাশ করতে পারে সে কথা আপনাদের অনেকবার অনেক রকমেই ব'লেছি, যা'তে তা'রা বাইরের informationগুলি নিয়ে নিজেদের ভিতর থেকে দেশের needsগুলির কি ক'রে সুন্দর সহজ স্বল্পব্যয়ের ভিতর দিয়ে পূরণ করতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে তৎকরণে প্রয়াসশীলতায় সাহস লাভ ক'রে তা'তে ব্রতী হ'তে পারে।

এটা যদিও এখন চিন্তা করতে গেলে দেশের মন, অর্থ ও অবস্থা দে'খে রূপকথার মতই মনে হয়, কিন্তু বার বার service ও যাজনে প্রত্যেকের ভিতর এই জাতীয় incentive গজিয়ে তুলতে পারলেই এ অসম্ভব সহজ সম্ভব হ'তে হয়ত কিছুই লাগবে না। বিধাতা তাঁ'র প্রকৃতিকে এমনতর বৈশিষ্ট্য দিয়েই সৃষ্টি ক'রেছেন, যা'তে নাকি ধরতে গেলে, প্রত্যেক মানুষেরই পিছনে এমনতর একটা বিরাট বিশ্ব-পারিপার্শ্বিক দিয়েছেন—যা'কে service দিয়ে প্রয়োজন পূরণ ক'রে প্রতি-প্রত্যেকেই profitably grow করতে পারে। চাই আপ্রাণ, অটুট ও অকাট্য ইষ্টস্বার্থকতার উদ্দীপনী incentive নিয়ে অনুসন্ধিৎসাপ্রবণ, ইষ্টানুগ জীবন-বৃদ্ধিদ auto-initiative responsible, profitable, serving and enterprising attitude, এ যদি থাকে—কি-যে না হ'তে পারে, আমার মনে হয়, তা' ভাবাই কঠিন।

আমাদের এদেশীয় মানুষ হয়ত মনে করতে পারে—আমরা সাজ-সরঞ্জাম ক'রে এমনতর রকমে যতক্ষণে দাঁড়াতে যা'ব, অন্যদের চাপে তদ্দিনে হয়ত আমাদের সব সাবাড়ই হ'য়ে যা'বে। আমি বলি,—আমরা আমাদের নৈমিত্তিক চলনাকে ঠিক এমনতর রকমেই মোড় ফিরিয়ে এখন থেকেই যদি চলতে থাকি, যে rate-এ সাবাড় হ'চ্ছি, নিঃশেষ হওয়ার পূর্ব্বেই হয়ত এমনতর মোড় ফি'রে যে'তে পারে যা'তে এমনতর বিশেষ বৈশিষ্ট্যে দাঁড়াতে পারি,—fulfilment ফাগুন-উষার রঙ্গিন রাগে র'ঙে আমাদের "স্বাগতম্" ব'লে অভ্যর্থনা করতে পশ্চাৎপদ হ'বে না।

তাই, আমি বলি—যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থা ও সামর্থ্যের ভিতর দিয়েই, আমাদের চলনাগুলিকে majority-র ভিতর উন্নতির জন্য যা' যা' করণীয় ব'লেছি তেমনতর মোড় না ফিরিয়ে যা-ই কিছু করতে যা'ব দিগ্দারী অট্টহাস্যে পিঠ চাপড়িয়ে আমাদিগকে বিদায় ক'রে দেবে—তা'র রেখা লক্ষণ আপনারা কি নৈমিত্তিক জীবনেই পাচ্ছেন না? তাই বলি, হ'টে যে যা'ব না—তা'র প্রতিবিধান কি এতেই নেই?

দ্বাদশ অধ্যায়

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থ সংখ্যায় দশখানি। তন্মধ্যে 'সত্যানুসরণ' সর্ব্বপ্রথম রচিত হয়। তৎপর ১৩৩৩ সনে 'তাঁর চিঠি' মুদ্রিত হয়। 'নানাপ্রসঙ্গে', 'নারীর পথে', 'চলার সাথী', 'নারীর নীতি' এবং 'The Message'—এই পাঁচখানি পুস্তক ১৩৪১ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কথাপ্রসঙ্গে' ও 'ইসলাম-প্রসঙ্গে' এই দুইখানা কথোপকথন-গ্রন্থ সৎসঙ্গের মুখপত্র "সৎসঙ্গী" পত্রিকায় ১৩৪২ সন হইতে ১৩৪৪ সন মধ্যে ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছে এবং গত বৎসর 'চলার রীতি' নামে আর একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্নমুখী ভাব-ধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

সত্যানুসরণ

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। গ্রন্থ-প্রণয়ন উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা রচনা করেন নাই। বহুকাল পূর্ব্বের কথা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে একব্যক্তি বাজিতপুর ষ্টীমার-ঘাটের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন। অবসর পাইলেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সস্নেহ ব্যবহারে এবং বৈষয়িক ও পারিবারিক নানা বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ পাইয়া তাঁহার প্রতি অতুলবাবুর অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তি জন্মিয়াছিল। এস্থান হইতে অন্যত্র বদলী হওয়ার কালে অতুলবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"এতদিন প্রতিবিষয়ে আপনার পরামর্শে কত সাহায্য পাইয়াছি। জীবন-যাত্রার পথে যাহাতে অবাধে চলিতে পারি, আমাকে এমন কতগুলি উপদেশ লিখিয়া দিতে হইবে।" উক্ত ভদ্রলোকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর কতকগুলি বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতুলবাবুকে সম্বোধন করিয়াই তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

"অতুলদা,

আমাদের সর্ব্বপ্রথম দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে হ'বে। সাহসী হ'তে হ'বে, বীর হ'তে হ'বে, পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ঐ দুর্ব্বলতা, তাড়াও, যত শীঘ্র পার, ঐ রক্তশোষণকারী

অবসাদ-উৎপাদক vampire-কে। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ কর তুমি পরমপিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যা'বে তোমার ধর্ম্মরাজ্যে ঢোক্‌বার অধিকার জ'ন্মেছে।"

এক-রাত্রিতে এক-আসনে বসিয়া একটানা লিখিয়া, পকেট সাইজের মুদ্রিত শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকার বিষয়-বস্তুর রচনা সমাপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন শয়ন করিতে গিয়াছিলেন। এই উপদেশগুলিই পরবর্ত্তী কালে 'সত্যানুসরণ' নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ হয় ১৩২৫ সনে। তৎপর অদ্য পর্য্যন্ত বহুসংস্করণে এই পুস্তকের প্রথমে এবং শেষে বহু নূতন বাণী সংযোজিত করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

'সত্যানুসরণের' এক-একটী কথা যেন হীরকখণ্ডের মত জ্বল্‌জ্বলে,—মন্ত্রের মত সূত্রাকারে গ্রথিত। ইহার সহজ, সরল, ভাবপূর্ণ বাণীগুলি দৈনন্দিন জীবনে মানব-মনের সকল সমস্যার অপসারণ করিয়া কেমন সুন্দর সমাধান আনিয়া দেয়। চিত্তবৃত্তির নানা ভাব-ধারার অপূর্ব্ব নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যের উপায় ইহার প্রতিছত্রে স্পষ্ট দেদীপ্যমান। কথাগুলি এত সতেজ, তীক্ষ্ণ এবং অর্থপূর্ণ—পড়িলেই যেন অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া পৌছে, আর তাহা চিরদিন স্মৃতিতে জাগরূক থাকে। দুর্ব্বলতার কথা বলিতে গিয়া ঘোষণা করিতেছেন—

—"হ'টে যাওয়াটা দুর্ব্বলতা নয়কো, চেষ্টা না-করাই দুর্ব্বলতা। তুমি কোন-কিছু করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফল-মনোরথ হও, ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ো না। ঐ অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যা'বে। * * * * * দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নাই। পরের দুর্দ্দশা দে'খে, পরের ব্যথা দে'খে, পরের মৃত্যু দে'খে নিজের দুর্দ্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা ক'রে ভেঙ্গে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁ'দে আকুল হওয়া—ওসব দুর্ব্বলতা। যা'রা শক্তিমান্‌, তা'রা যতই করুক, তা'দের নজর নিরাকরণের দিকে,—যা'তে ও-সব অবস্থায় আর-না-কেউ বিপন্ন হয়, প্রেমের সহিত তা'রই উপায় চিন্তা করা। বুদ্ধদেবের যা' হ'য়েছিল। ঐ হ'চ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত!"

অনুতাপকারীকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন—

"অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ কর যেন পুনরায় অনুতপ্ত হ'তে না হয়। যখনই তোমার কুকর্ম্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হ'বে,

তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আর ক্ষমা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আস্‌ছে, আর তা' হ'লেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হ'বে।"

একস্থানে দেখিতেছি, দুই চারিটী সহজ সরল কথায় কামরিপু-দমনের কি সুন্দর প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বলিতেছেন—

"জগতে মানুষ যত দুঃখ পায় তা'র অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে বৃত্তিলোলুপ আসক্তি থেকে আসে—ওথেকে যত দূরে স'রে থাকা যায় ততই মঙ্গল। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হ'য়ে পড়েন। বিষ অমৃত হ'য়ে গেল। আর মা মা-ই, কামিনী নয়কো। মার শেষে গী দিয়ে ভাব্‌লেই সর্ব্বনাশ। সাবধান! মাকে মাগী ভে'বে ম'রনা। প্রত্যেক মা-ই জগজ্জননী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ এমনতর ভাব্‌তে হয়।"

দুঃখের কি সুন্দর সংজ্ঞা এবং তাহা নিরাকরণের কেমন সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন! পড়িবামাত্রই কতদিনের পুঞ্জীভূত অজ্ঞান অন্ধকার-রাশি এক মুহূর্ত্তে বিদূরিত হয়, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবস্থা হয়। বলিতেছেন—

"চাওয়াটা না-পাওয়াই দুঃখ, কিছু চেও না, সব অবস্থায় রাজি থাক, দুঃখ তোমার কি কর্‌বে?"

গুটিকয়েক কথা, কিন্তু কেমন প্রাণস্পর্শী! এত বড় কঠিন সমস্যার কি সহজ সরল মীমাংসা!

আবার, আত্মসমর্পণ-বলে দুঃখ দূর করিয়া আনন্দ পাইবার সহজ উপদেশ দিতেছেন—

"পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর—তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল, আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হ'বে, আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—আর তা'র জন্য তুমি রাজি থাক—আনন্দে থাক্‌বে, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে না।"

সরল ও কপট ব্যক্তির তুলনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—

"সরল ব্যক্তি ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন চাতকের মত, কপটী নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক; বড় এবং উচ্চ হ'য়ে নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি? কপট হ'য়ো না, নিজে ঠ'কনা, আর অপরকে ঠ'কিও না"

পরনিন্দার কুফল উল্লেখ-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"এটা খুবই সত্যি কথা যে মনে যখনই অপরের মঙ্গলবিহীন স্বার্থবুদ্ধি থেকে কারু দোষ দেখ্‌বার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতর এসে বাসা বেঁধেছে। পরনিন্দা করাই পরের দোষ কু'ড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভাল হ'য়ে পড়ে।"

এই বলিয়াই আবার সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—

"তাই ব'লে কোন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি কর্‌তে নেই। সে ত' খোসামোদ। সেক্ষেত্রে মন মুখ প্রায়ই এক থাকেনা। সেটা কিন্তু খুবই খারাপ, আর তা'তে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হা'রিয়ে যায়।"

ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সাধারণতঃ কত জটিল। ছোট কয়েকটী মোক্‌থা কথায় ধর্ম্মতত্ত্বের একটা স্পষ্ট ধারণা তিনি পাঠকের মনে জন্মাইয়া দিতেছেন। যথা—

"যাঁ'র উপর যা' কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম্ম একই, আর তা'র কোন প্রকার নাই। মত বহু হ'তে পারে, এমন কি যত মানুষ তত মত হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম্ম বহু হ'তে পারেনা।"

শ্রীঠাকুর যখন 'সত্যানুসরণের' বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেন, তখন তিনি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এই তরুণ বয়সেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি মত। কোনও মতের সঙ্গে কোন মতের প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের—একটাকেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব।"

সদ্‌গুরুকে চিনিবার সঙ্কেত এবং তাঁহাকে ধরিবার উপায় নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

যাঁ'র কোন মূর্ত্ত আদর্শে কর্ম্মময় অটুট আসক্তি, সময় ও সীমাকে ছাপিয়ে তাঁ'কে সহজভাবে ভগবান ক'রে তু'লেছে—যাঁ'র কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান মনের ভালমন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে ভেদ ক'রে ঐ আদর্শতেই সার্থক হ'য়ে উ'ঠেছে তিনিই সদ্‌গুরু।"

"হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে তা'র জ্যোতিঃ বেরোয় না তিনিও তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তাঁ'র দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, প্রেমীই তাঁ'কে ধর্‌তে পারে, প্রেমীর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হ'বেন।"

"পরীক্ষক না সে'জে, সঙ্কীর্ণ-সংস্কারবিহীন হ'য়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহঙ্কার হ'য়ে যে'তে পার্‌লে তিনি কৃপা করেন, ধরা দেন। অহঙ্কারের কষ্টিপাথরে তাঁ'কে কষা যায় না।"

'সত্যানুসরণের' প্রত্যেকটী কথাই যেন এক একটী 'মটো'র মত গভীর-ভাবব্যঞ্জক ও অর্থগরিমাময়। অসংখ্য বাণীর মধ্যে গুটিকয়েক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"তুমি ঠিক ঠিক জেনো যে, তুমি তোমার, তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।"

"স্কুলে গেলেই তা'কে ছাত্র বলে না—মন্ত্র নিলেই তা'কে শিষ্য বলে না। হৃদয়টী শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ রাখ্‌তে হয়।"

"দিয়ে যাও, নিজের জন্য কিছু চেও না, দেখ্‌বে তোমার সব হ'য়ে যা'চ্ছে"

"যত পার সেবা কর কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।"

"বল্‌তে বিবেচনা কর—কিন্তু ব'লে বিমুখ হ'য়ো না। যদি ভুল ব'লে থাক—সাবধান হও ভুল করো না।"

"কখনও নিন্দা ক'র না কিন্তু অসত্যের প্রশ্রয় দিও না।"

"ধীর হও, তাই ব'লে আল্‌সে দীর্ঘসূত্রী হ'য়ে প'ড় না।"

"ক্ষিপ্র হও, কিন্তু অধীর হ'য়ে বিরক্তিকে ডে'কে এনে সব নষ্ট ক'রে ফেল না।"

"নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা' ত্যাগ কর্‌তে না পার—তবে কোন মতেই তা'র সমর্থন ক'রে অন্যের সর্ব্বনাশ করো না।"

"নিজেকে প্রশংসা দিতে কৃপণ সাজ, কিন্তু অপরের বেলায় দাতা হও।"

"যদি মানুষ হও ত' নিজের দুঃখে হাস, আর পরের দুঃখে কাঁদ।"

"হাসো, কিন্তু বিদ্রূপে নয়। কাঁদো কিন্তু আসক্তিতে নয়—ভালবাসায়, প্রেমে।"

"বল, কিন্তু আত্মপ্রশংসায় বা খ্যাতি বিস্তারের জন্য নয়।"

"যেমন করিয়া যাহা পাইতে হয় তাহা না করিয়া সেজন্য দুঃখিত হইও না।"

"স্পষ্টবাদী হও, কিন্তু মিষ্টভাষী হও।"

"সত্য বল কিন্তু সংহার এনো না।"

"সংযত হও—কিন্তু নির্ভীক হও। সরল হও কিন্তু বেকুব হ'য়ো না। বিনীত হও, তাই ব'লে দুর্ব্বল-হৃদয় হ'য়ো না।"

"সাধু সেজো না, সাধু হ'তে চেষ্টা কর। তোমার মন সৎএ বা ব্রহ্মে বিচরণ করুক—কিন্তু শরীরকে গেরুয়া বা রংচঙে সা'জাতে ব্যস্ত হ'য়ো না—তা'হ'লে মন শরীর-মুখী হ'য়ে পড়্‌বে।"

"ধনী হও ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন ও দাতা হও।"--এইরূপ অসংখ্য বাণী পুস্তকের সর্ব্বত্র মুক্তাফলের ন্যায় ছড়ান রহিয়াছে।

'কর্ম্মফল' 'অদৃষ্ট' ইত্যাদি কথার অর্থ বুঝিতে গেলে তত্ত্বকথার কত নীরস দীর্ঘ সমালোচনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু 'সত্যানুসরণের' কয়েকটী সরল বাক্যে এ সম্বন্ধে কেমন একটা সহজ ধারণা জন্মিয়া যায়। পড়িলেই মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, আত্মকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকের মনে স্বভাবতঃই একটা প্রেরণা জাগিয়া উঠে। যেমন—

"তোমার দর্শনের—জ্ঞানের পাল্লা যতটুকু, অদৃষ্ট ঠিক তা'রই আগে; দেখ্‌তে পাচ্ছনা জান্‌তে পাচ্ছনা তাই অদৃষ্ট।"

"তোমার শয়তান অহঙ্কারী আহাম্মক আমিটাকে বের ক'রে দাও; পরমপিতার ইচ্ছায় তুমি চল, অদৃষ্ট কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট! কাজ ক'রে যাও, অদৃষ্ট ভে'বে ভে'ঙ্গে পড় না, আল্‌সে হ'য়ো না, যেমন কাজ কর্‌বে তোমার অদৃষ্ট তেমনি হ'য়ে দৃষ্ট হ'বেন।"

কাহারও প্রতি ক্রোধ হইলে সেই বিদ্বেষ-ভাব দূর করিবার জন্য কি সুন্দর পন্থা কহিয়া দিয়াছেন,—

"যা'র উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছ আগে তা'কে আলিঙ্গন কর। নিজ বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর, ডালা পাঠাও এবং হৃদয় খু'লে বাক্যালাপ না করা পর্য্যন্ত অনুতাপের সহিত তা'র মঙ্গলের জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর, কেননা বিদ্বেষ এলেই ক্রমে তুমি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়্‌বে; আর সঙ্কীর্ণতাই পাপ।"

অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হইলে তাহারও উপায় বলিয়া দিতেছেন—

"যদি কেহ তোমার কখনও অন্যায় করে আর একান্তই তা'র প্রতিশোধ নিতে হয় তবে তুমি তা'র সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর যা'তে সে অনুতপ্ত হয়, এমনতর প্রতিশোধ আর নেই—অনুতাপ তুষানল। তা'তে উভয়েরই মঙ্গল।"

তেমনি বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডীর বাহিরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে হাঁ না আছে, বিশ্বাসে হাঁ না নেই, সংশয় নেই। যা'র বিশ্বাস যত কম, সে তত undeveloped, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ।"

"বিশ্বাস যুক্তি তর্কের পার—যদি বিশ্বাস কর, যত যুক্তি তর্ক তোমায় সমর্থন কর্‌বেই কর্‌বে, তুমি যেমনতর বিশ্বাস কর্‌বে, যুক্তি তর্ক তোমায় তেমনতর সমর্থন কর্‌বে। বিশ্বাস না এলে নিষ্ঠা আসে না—আর নিষ্ঠা ছাড়া ভক্তি আস্‌তে পারে না, নিষ্ঠা রে'খো—কিন্তু গোঁড়া হ'য়ো না। বরং নিষ্ঠায় গোঁড়া হও।"

"সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে—আর অবিশ্বাসই জড়ত্ব। সন্দেহের নিরাকরণ কর, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও। হৃদয়ে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হউক।"

'সত্যানুসরণের' প্রত্যেকটী কথা যেন ওজন-করা, একটীর সঙ্গে আর একটী

যুক্তির সূত্রে গ্রথিত, পারম্পর্য্য হিসাবে বিন্যস্ত এবং নিপুণভাবে সজ্জিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

> "অহঙ্কার আসক্তি এনে দেয়; আসক্তি এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধি; স্বার্থবুদ্ধি আনে কাম; কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি; আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা।"

> "ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান; জ্ঞানেই সর্ব্বভূতে আত্মবোধ হয়; সর্ব্বভূতে আত্মবোধ হ'লেই আসে অহিংসা; আর অহিংসা হইতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে-কোন একটীর অধিকারী হ'বে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হ'বে।"

অপরাধীকে ক্ষমা করা এবং প্রতি-মানবের অনুসরণীয় সাধারণ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—

> "ক্ষমা করো, কিন্তু অন্তরের সহিত; ভিতর গরম রে'খে অপারগতাবশতঃ ক্ষমাশীল হ'তে যেয়ো না। পতিতকে উদ্ধারের কথা শুনাও, আশা দেও—ছলে, বলে, কৌশলে তা'র উন্নয়নের সাহায্য কর—সাহস দেও, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দিও না।"

মানবের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভের সুগম পথ কি এবং তাহার অন্তরায়ের হেতুই বা কি সে সম্বন্ধে কেমন স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন :—

> "ঋষি মানেই হ'চ্ছে দ্রষ্টা পুরুষ। সশ্রদ্ধ বিনয়াবনত ভক্তি, সেবা, ও পূজার সহিত এঁদের অনুসরণে মানুষ এঁদের অন্তর-নিহিত জানা ও বোধকে লাভ ক'রে—অপার সার্থকতায় ধন্য ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। তাই ঋষি বাদ দিয়ে যা'রা ঋষিবাদের উপাসনা করে, তা'দের অধিগম্য যা'-কিছু জ্ঞান, অন্ধ তমসাকেই সার্থক ক'রে তোলে।"

বন্ধুর সঙ্গে কি ভাবে 'অন্তরে শ্রদ্ধা রে'খে বিপদে আপদে কায়মনোবাক্যে' সাহায্য করিতে হয়, বন্ধু কুপথে গেলে কি ভাবে তাহাকে ফিরাইতে হয়, সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম কাহাকে বলে, প্রেম না থাকিলে—মানুষের শত শক্তি থাকিলেও যে তাহা কিছুই নয়, শিষ্যের কর্ত্তব্য কি, প্রকৃত শিষ্য কাহাকে বলে, গুরু কে, আদর্শ কি, কি ভাবে গুরু-সেবা করিতে হয়, কামে ও প্রেমে—আসক্তি ও ভক্তিতে তফাৎ কোন্ জায়গায়, লোকের যথাসর্ব্বস্বের অধিকারী হওয়া যায় কি করিয়া, দোষ-স্বীকারে কি ভাবে মনে সান্ত্বনা আসে, 'বলার চেয়ে কাজে যা'রা বেশী তা'রাই যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী'—ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় অতিশয়

পরিষ্কারভাবে সহজ কথায় 'সত্যানুসরণে' বলা হইয়াছে। আবার জীবনের উদ্দেশ্য কি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মানুষের মনে কখন উদিত হয়, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মীমাংসা কোথায়, সত্যিকারের নেতার কি কি গুণ থাকা চাই, আদর্শ প্রচারের অন্তরায় কি, ইত্যাদি তত্ত্বসমূহের আলোচনাও কেমন সংক্ষিপ্ত, সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী অথচ কত সহজ!

এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবনের বহুদর্শিতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাণীতে পূর্ণ। মানব মাত্রেরই জীবন-চলনার পক্ষে ইহা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

তাঁর চিঠি

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহস্র সহস্র নরনারী আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত। প্রত্যেকের মনের গোপন কথা, সুখ-দুঃখের সকল সংবাদ, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি যত-কিছু তাঁহাকে না জানাইয়া কেহই থাকিতে পারে না। পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ-বাণী লাভ করিয়া সকলে শোক-দুঃখ ভুলিয়া যায়, চলার পথের সন্ধান জানে এবং মনের নানা প্রবল দ্বন্দ্বাভিঘাতের সহজ মীমাংসা পাইয়া শান্ত হয়। কত অসংখ্য ব্যক্তির জীবন-যাত্রার পথে তাঁহার এক-একখানি চিঠি মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে তাহার অবধি নাই। সঙ্কলয়িতা তাই লিখিয়াছেন—"জীবনের গূঢ় মুহূর্ত্তে তাঁ'র অমৃত লেখনী-নিঃসৃত প্রত্যেকটী চিঠি যেন জীবন্ত আবির্ভাব—তাঁহার ভাষার অননুকরণীয় তীব্র ভঙ্গিমা যেন তাঁ'রই তীব্র সুকণ্ঠের ঝঙ্কার, সর্ব্বোপরি যেরূপ অবস্থার জন্য চিঠিগুলি লিখিত তাহা যেন সেই-সেই অবস্থার আর্ত্ত মানবের জন্যে আশা, উদ্দীপনার সুরে চিরন্তন কালের জন্য tuned হইয়া আছে। তাই এই চিঠিগুলি শুধু লিখিতে হয় তাই লেখা নয়, বা কল্পনার ও ভাষার অলস জাল-বুনানি নয়, নৈরাশ্য ও দৌর্ব্বল্য-পীড়িতের সত্যিকার হাহাকারে মানবের অন্তরাত্মারই আশা ও উৎসাহের চিরনবীন অমৃত সঙ্কেত।"

সর্ব্বপ্রথম চিঠি খানা পড়িলে মনে হয় সামান্য কয়েকটী ছত্রে ব্যক্তি ও সমাজের কত বড় একটা বিরাট সমস্যার কেমন সহজ মীমাংসা পাওয়া গেল।—হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া জীবন সার্থক করিতে হইলে, মানুষে মানুষে যত দ্বন্দ্ব তাহা নিরাকরণ করতঃ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে হইলে বাস্তবিকই "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিতেছেন—

"ভারতের অবনতি (Degeneration) তখন থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত্ত ভগবান অসীম হ'য়েছে—ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হ'য়েছে। তাই বলি,—

ভারত! যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করিতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভু'লে জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও,—আর তোমার মূর্ত্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও—আর তা'দেরই স্বীকার কর যা'রা তাঁ'কে ভালবাসে; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।"

ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ কি, কৃত্রিম ভালবাসাই বা কাহাকে বলে, সত্যিকারের ভালবাসা হইলে মনুষের চরিত্রে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার একখানি জীবন্ত ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন একখানা চিঠিতে। কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে চিঠিখানার একাংশ উদ্ধৃত করা গেল। যথা:—

"যা'কে মানুষ ভালবাসে—তা'র কষ্ট হয় যা'তে, খ্যাতির অপলাপ হয় যা'তে, অবসন্ন হয় যা'তে, বেদনা পায় যাতে,—তা' কি সে কখনো ক'রতে পারে? কারণ তা'র সর্ব্বপ্রকার তুষ্টি ও পুষ্টিই যে তা'র স্বার্থ, তা'র নিজের তুষ্টি পুষ্টি যা'কে সে ভালবাসে তা'র উপর দাঁড়িয়ে আছে;—মানুষ যখন তা'র নিজের সুখের জন্য—সে যা'কে ভালবাসে ব'লে মনে করে—তা'র বেদনার কারণ হয়, তা'র খ্যাতি তুষ্টি পুষ্টি ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য ক'রে অনুযোগ সহকারে আপন সুখ-লালসার পরিতৃপ্তিসাধনে ভাবা-ভালবাসার মানুষকে বাধ্য ও বদ্ধ করতে চায়, নিশ্চয়ই সে কাহাকেও ভালবাসে না,—সে ভালবাসে তা'র কল্পনাপ্রসূত ভোগলালসাকে—তাই, মানুষকে বেদনা দিতে বা বিব্রত করিতে তা'র মোটেই কুণ্ঠা বোধ হয় না—এমনতর মানুষ হ'তে মানুষের সাবধান হওয়া উচিত।

"কৃত্রিম বা স্বার্থান্ধ ভালবাসা প্রিয়র প্রিয়কে কিছুতেই প্রিয় ভাবিতে পারে না, সে সর্ব্বপ্রকারে তাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে;—ভালবাসা প্রকৃত না-হ'লে বুদ্ধি ক'রে চ'ল্লেও প্রায়ই বেফাঁস হ'য়ে পড়ে।

"ভালবাসা এলেই ভাবের বৃদ্ধি হয়,—মানুষ তদ্‌ভাবাপন্ন হয়,—আর তদ্‌ভাবাপন্ন হ'লেই বোধ বা বুদ্ধি জাগ্রত হয়,—তাই ভালবাসা যদি সত্যিকারেরই হয়, তবে তা'কে বুঝিয়ে দিতে হয় না যা'কে সে ভালবাসে তা'র কি প্রয়োজন,—তা'র কিসে খ্যাতি, কিসে বা অখ্যাতি, কিসে বা সুখ, কিসে বা দুঃখ, কি ক'র্‌লে তা'র ভাল হয় আর কি কর্‌লেই বা তা'র মন্দ হয়—আপনা-আপনি এ-সব তা'র মনে ভে'সে ওঠে—তাই তা'র চলনও বেফাঁস হয় না।

"ভালবাসা মানুষকে বদ্ধ করে না, কোণঠেঁসা বা একঘরে ক'রে তোলে না—বরং উদার করে, মুক্ত করে, সেবাপরায়ণ ক'রে তোলে, প্রাণবান্ ক'রে তোলে,—আটক রে'খে শুধু ভোগের খেলনা কর্‌বার কথা ভাব্‌তেও পারে না।"

"ভালবাসা তা'র মানুষকে ভুল্‌তে পারে না, ত্যাগ কর্‌তে জানে না,—মৃত্যুকে আড়াল ক'রে অমৃতের পথে নিয়ে চলে,—তাই তা'র অনুসরণে বিঘ্ন সৃষ্টি কর্‌তে দেয় না—ভয়, দুর্ব্বলতা, বিরক্তি ইত্যাদিকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়—নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ তা'র উত্তর-সাধকের মত মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে তোলে!—"

বিশ্বাসের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"মানুষ বিশ্বাসের যত গভীরতর দেশ স্পর্শ করে সে তত শক্তিশালী হয়, আর তা'র ভাব ও ভাষাও তেমনি শক্তিশালিনী হ'য়ে দাঁড়ায়; তখন তা' প্রত্যেক হৃদয়কে গভীরভাবে আঘাত করে, আর তখন প্রত্যেক হৃদয় পাগল হ'যে তা'র প্রতিধ্বনি করে। তা'-না-হ'লে—সিদ্ধ না হ'লে—বিশ্বাস মজ্জাগত না হ'লে মনের কল্পনা মনে ওঠেই লয় হয়, জগতে তা'ব সাড়া পাওয়া যায় না, আর তা'তে কাজও খুবই কম হয়। * * * * গুরুগোবিন্দের কথা ত' জানেন, দাদা! তিনি কর্ম্মসাগবে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার আগে বিশ্বাসকে মজ্জাগত কর্‌বার জন্যে কি গভীর সাধনাই না ক'রেছিলেন! তাই, অমনতর জাতি সৃষ্টি হ'য়েছিল—কত ঝড় বাতাস বিপত্তিতে একটু কাঁপে নাই।"

সাধন-পথের যাত্রীকে অগ্রসর হওয়ার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—

"রীতিমতভাবে নাম সাধ্‌তে গেলে প্রথম প্রথম হৃদয়ের আবর্জ্জনাগুলি ভে'সে ওঠে—সংশয়, দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস, কাম,

ক্রোধ ইত্যাদি। কিন্তু তা'তে নজর দিতে নাই, তা'তে attached হ'তে নাই, কারণ সেগুলি মলিনতা—যা' মনকে মেঘ-মলিন অন্ধকারময় ক'রে রে'খেছিল; ওর সাথে attached হ'লে মন আবার মলিন হ'য়ে ওঠে।

"তারপর, সূর্য্য-প্রকাশের পূর্ব্বে যেমন মেঘগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে কে'টে যায় সূর্য্যও প্রকাশ পায়, আকাশও মেঘমুক্ত হয় এ-ও তেমনতর; নাম কর্‌তে কর্‌তে কু-মেঘগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে কে'টে যায়, অমনি ধীরে ধীরে জ্যোতিঃও প্রকাশ পায়, মনও শান্ত হয়, মনাকাশে ধীরে ধীরে নাদেরও উদ্বোধন হয়—আর আস্তে আস্তে সমস্ত তত্ত্বগুলিই প্রকট হয়। চাই, গভীর বিশ্বাসের সহিত সাধনা।"

এ সম্বন্ধে অন্যত্র, আর একটী ভাইকে উপদেশ দিতেছেন—

"* * * * প্রথম প্রথম নানাপ্রকার মিশ্রিত শব্দই পাওয়া যায়—মনোনিবেশ যতই স্থির হয় ততই মিশ্রিত শব্দ কমিয়া Whistle বা Bell sound-এ দাঁড়ায় এবং তারপর হইতে distinct পৃথক পৃথক শব্দ ও রূপ প্রকাশিত হয়।

"বামের শব্দে মনোনিবেশ করিতে নাই। 3rd তিল হইতে টিকি পর্য্যন্ত সোজা Lineএর ঈষৎ দক্ষিণ দিকে নানাপ্রকার শব্দের ভিতব যে continuous একটী শব্দ পাওয়া যায় তাহাতেই মন সংলগ্ন করিয়া Bell sound শুনিতে চেষ্টা করিতে হয়, আর এই উপায়েই অগ্রসর হওয়া ভাল, নতুবা বহু শব্দে মনোযোগ করিলে মন বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। একমাত্র সত্তার অনুভবকেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হওয়া বলে। ভঁমর গুফার অবস্থাকেই সোহং অবস্থা বলে।"

দুর্ব্বলদিগকে অভয় ও ভরসা প্রদান করিয়া লিখিতেছেন—

"মানুষ তো দুর্ব্বলই, মন তো কলঙ্কে ভরাই। তাই ব'লে তাঁ'র নাম কর্‌তে, তাঁ'র সঙ্গে প্রণয় কর্‌তে কেন বিমুখ হ'বে? তুমি কেন দুর্ব্বল ব'লে, কলঙ্কিত ব'লে, তাঁ'কে আলিঙ্গন কর্‌তে ছুটবে না? হও তুমি ছোট, তা'তে ক্ষতি কি? তুমি অন্ধকারময় হ'লেও তাঁ'র স্পর্শে আলোকিত হ'য়ে পড়্‌বে, কারণ তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তুমি দুর্ব্বল তা'তে কি হলো? আলিঙ্গন কর

পরমপিতাকে, নির্ভয় হও। তাঁ'কে স্পর্শ কর, তুমি পরম শক্তিমান হ'বে। ভাবনা কি? তিনি শক্তিস্বরূপ।"

সুদক্ষ সেনানায়কের মত যুদ্ধক্ষেত্রে অবসন্ন সৈনিকগণকে যেন উৎসাহিত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"আমাদের ত' এ এলিয়ে পড়্‌বার সময় নয়—শুধু অবসাদে গা' ঢে'লে দিয়ে রোদন কর্‌বার সময় নয়! এখন ত' তীব্র সাধনার তীব্র কর্ম্মের দিন এসেছে। সমস্ত ক্লীবত্বকে তাড়িয়ে দিয়ে লে'গে যে'তে হ'বে—ঝাঁপ দিতে হ'বে—প্রবল মহান্ কর্ম্মসাগরে, দুর্দ্দশার ভয়ে এলিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে না ত' দাদা! এখনও যদি ভাব্‌বার অবসর খুঁজি, এখনও যদি হিসাব নিকাশ করি লক্ষ্যতে পৌছিবার বিরুদ্ধে,—তবে কি আর নিস্তার আছে?"

কখনও বা শুনিতে পাই কর্ম্মীদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিতেছেন—

"ওরে লেগে যা তোরা লেগে যা—আর একবার ভীমবেগে লেগে যা—দীনভাবে গর্ব্বের সহিত স্মরণ কর্—আমরা তোমার সন্তান—আমরা তোমারই—আব প্রত্যেকে তাঁ'রই স্মরণ ক'রে আলিঙ্গন কর্—কোল দে,—সকল দ্বন্দ্ব সকল ব্যথা ভুলে গিয়ে সবার পায়ে লুটে পড়,—ওরে আবার মুছে দিক্ তোর কোঁচার কাপড়—যেখানে ব্যথা, যেখানে আছে ব্যথাভরা অশ্রুজল, অভিসম্পাতের দারুণ আঘাত—অনুতাপের তীব্র চাবুক—অশান্তি—অপঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা।"

বজ্রগম্ভীর স্বরে অন্যত্র বলিতেছেন—

"ওঠো—জাগো, আর সময় নেই—আর কারু অপেক্ষা ক'র না, যাও যেখানে-যেখানে দ্বন্দ্ব, যাও যেখানে-যেখানে তোমাকে—তোমার উদ্দেশ্যকে—তোমার লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে, নিন্দা করে, ঘৃণা করে, আর সেখানে তোমার কথা, তোমার ব্যবহার, তোমার আদব-কায়দা সর্ব্বোপরি তোমার বিশ্বাস আর তা'র প্রাণশক্তি—তা'র বিরুদ্ধতাকে জন্মের মত অবনত ক'রে তোমার faith-এর চরণতলে এনে তা'কেও তোমার মত উদ্যত, নিরভিমান, নিরলস ও নিঃশঙ্ক ক'রে তুলুক্।"

আবার কোথাও পরম দরদীর মত, কর্ম্মিবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া কত আব্দারের সহিত ভর্ৎসনা করিয়া লিখিতেছেন—

"ওরে আহাম্মক, ওরে সোহাগ-শিথিল মত্ত খেয়ালী, ওরে আদরে দুর্ব্বল—অপারক বেকুব দাম্ভিক—দাঁড়ারে দাঁড়া—এখনও ফিরে দাঁড়া—যদি লাল কণিকা এখনও তোদের ধমনী ত্যাগ ক'রে না থাকে, মৃত্যু-আঁধারের মূঢ় সম্মোহন যদি এখনও তোদের সংজ্ঞাকে আচ্ছন্ন ক'রে না থাকে—ফিরে দাঁড়া, ঝেড়ে দাঁড়া—বল্—আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বল্—ঠাকুর! আমি তোমারই—আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে সার্থক হউক—আমার বুদ্ধি তোমায় স্পর্শ করুক—আর তোমার ইচ্ছা আমার জন্ম ও জীবনকে ধন্য ক'রে তুলুক্।"—

প্রাণমাতান ওজস্বিনী ভাষায় কি মর্ম্মস্পর্শী বাণী! পাঠ করিবামাত্র উৎসাহ-উদ্দীপনায় বুকখানা ভরিয়া উঠে, শিথিল কর্ম্মপ্রচেষ্টা তীব্র উদ্দাম বেগ ধারণ করে, শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হয়, মৃতের দেহেও সঞ্জিবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়!

কোথাও আবার কেমন কোমলকণ্ঠে বুঝাইতেছেন—

"দুঃখ দে'খে দুঃখ করিস্ না মেয়ে,—তাঁ'র দেওয়া ব্যথা যে বড় মিষ্টি, তাঁ'র আঘাত যে বড় কোমল কারণ তা'তে যে তাঁ'র স্পর্শ আছে। তাঁ'র অনাদর, তাঁ'র অবহেলা মনটাকে যে তাঁ'র চিন্তায়ই অবশ ক'রে ফেলে—তা' কি চাস্‌নে মা? ব্যথার সুখ যে কেবল তাঁ'র-দেওয়া ব্যথায়ই আছে। তাঁ'র বিরহ কি তাঁ'র জন্যই মনপ্রাণ পাগল ক'রে তোলে না?"

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"দ্যাখ্ মা, জন্মিলেই তা'র কালের বেত্রাঘাত সইতে হ'বেই আর যতই মা আমরা বেতের দিকে নজর রাখ্‌ব ততই জর্জ্জরিত হ'ব কিন্তু সেই মা চতুর, সেই মা ভাগ্যবান্ যা'র মন পরমপিতায় মুগ্ধ, কারণ কশাঘাত তা'র মনকে স্পর্শ করতে পারে না; তাই আঘাতের ব্যথাও অনুভব করতে পারে না।"

ব্যথা যে তাঁহারই আগমনের অগ্রদূত, ব্যথা যে আমাদের কত সুহৃদ তাহা কেমন সুন্দর করিয়া বলিতেছেন—

"যখনই মানুষ দুঃখের কশাঘাতে অস্থির হ'য়ে উঠে, বেদনায় তা'র কোমল ফুর্ ফুরে হৃদয়খানা ছে'য়ে ফেলে, তখনই সে আকুল নয়নে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চারিদিকে তাকায় আর তা'র দরদীকে খোঁজ করে, কিন্তু সুখের সময় তা' হয় না,—যেন সে

তখন অবশ—ব্যথা নাই, তাই দরদীর খোঁজ নাই। তাই মেয়ে, ব্যথা যে বসন্তের কোকিলের মত; দরদীর আগমনের পূর্ব্বে ব্যথাই আসে, কেবল বলে 'দরদী এলো এলো এলো।' সেই প্রতীক্ষায় বুক বেঁধে শত শত শোক, অপমান, অবসাদকে সহ্য কর্ত্তে পারবি না? তাই বলি—সুখেই থাকিস্ আর দুঃখেই থাকিস্, কিছুতেই তাঁ'কে ভুলিস্ না আর চোখ দু'টো গ'লে গেলেও সে ছাড়া অন্যদিকে তাকাস্ নে—তা'তে তুই মরিস্ই আর বাঁচিস্ই—কি বলিস্?"

স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠীতে 'বিবাহ' কথাটীর কি অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আদর্শ ভালবাসার কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

"সংসারে সকলই নূতন। মনে ক'রে দেখ, কাল তুমি কেমন ছিলে আজ আবার কেমন হইয়াছ! আমি কাল বা কেমন ছিলাম আজ আবার কেমন হইয়াছি! আমাদের বাল্য, কৈশোর কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমরা কিছুই ঠিক পাই নাই। সংসারে বাহিরের সকলেই নিত্য নূতন— সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা দেখিতেছ, কাল আর তাহা দেখিবে না। রূপ-যৌবন, অর্থ-সম্পত্তি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি যাহা কিছু বলনা বা দেখনা, আজ যাহা বলিবে বা দেখিবে কাল আর তাহা বলিবে না বা দেখিবে না। সংসার চির-নূতন বা চির-পরিবর্ত্তনশীল, তবে বল দেখি কিসের পরিবর্ত্তন নাই? পরিবর্ত্তন নাই আত্মার। তুমি আমি যখন গর্ভে ছিলাম, প্রাণ বা আত্মা তখন যেমন ছিল আজও তেমনই আছে। এই আত্মাই এ বিশ্বসংসারে প্রধান কর্ম্মী। এই আত্মার যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং চিরকালই ঘটিবে। এই আত্মার মিলনই বিবাহ, বিচ্ছেদই বিরহ।

"চির পরিবর্ত্তনশীল মনকে যদি অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া চিরস্থির প্রাণের সহিত একত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিশাইয়া রাখিয়া যদি ভালবাসা যায়, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে এবং সেই ভালবাসার সহিতই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান থাকে। সে ভালবাসায় কামের ঘৃণিত লালসা নাই, সে ভালবাসায় ক্রোধের করাল মূর্ত্তি নাই, সে ভালবাসা লোভশূন্য, সে ভালবাসা মোহের ফাঁদে জীবকে জড়ায় না, সে ভালবাসায় নিম্নাকর্ষণকারী মায়া নাই, সে ভালবাসায় কেবল ভালবাসা—

পত্নী শ্রীযুক্তা ষোড়শীবালা দেবী

নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা। সে ভালবাসায় বিশ্ব বিকশিত হয়, সে ভালবাসায় বিরহ নাই, ভেদ নাই,—সে ভালবাসায় স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ এক হ'য়ে যায়; দেবতাগণের যত পৃথিবী আছে সমস্ত পৃথিবী একত্র হইলেও তাহাতে বিরহ আনিতে পারে না। যদি ভালবাসিতে হয় তবে ঐরূপ ভালবাসাই উচিত। * * * *"

কামদমনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া একস্থানে লিখিতেছেন—

"কামশত্রু তাড়ানর উত্তম মন্ত্র মাতৃভাবে মা-ডাক। যেখানেই দেখ্‌বেন কাম আপনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যা'চ্ছে, ছোট্‌বাব আর কোনও উপায় নাই সেখানে—আর কিছু নয় দাদা—ভাবে পাগল হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে বলুন—মা! আমি তোমারই সন্তান মা, আমায় রক্ষা কর,—আর বার বার ডাকুন মা মা মা—আর তেমনি চোখে দেখুন,—জড়িয়ে ধ'রে একদম্‌ কোলে চে'পে বসুন, দেখ্‌বেন সব ফরসা—একটা নূতন জগত আপনার চোখের সাম্‌নে ভে'সে উঠ্‌বে। অমনি ফিরে আসুন আর বেলতলায় যাবেন না, যতক্ষণ ভয়টা না কে'টে যায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে দীক্ষাগ্রহণের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আশ্রমে আসিবার জন্য খুবই উতলা হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যাবল্যে আসিতে পারিতেছিলেন না। সে-বার দেশবন্ধু যখন ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে যাইতেছিলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। কেমন মধুর ও কোমল কথায় চিঠীখানা পূর্ণ। নেহাৎ আপন জনের প্রতি ভালবাসা, আব্দার ও স্নেহের কি দাবী! গুরুশিষ্যের এই পরমনির্ম্মল গভীর আত্মীয়তার পরিচয়টী দিবার জন্য নিম্নে চিঠিখানার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেশবন্ধু, দাশদা আমার,

অনেকদিন দেখিনি দাদা আপনাকে। মাঝে মাঝে বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, দেখ্‌বার প্রলোভনটা থামিয়ে দিতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না।

শুনলেম্‌ আপনি ফরিদপুর আস্‌ছেন। ফরিদপুর আর পাবনা বেশী দূর নয়কো। আপনার কি আমার কাছে আস্‌তে খুব কষ্ট হ'বে দাশদা? আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা করে গোটাকত দিন আপনাকে নিয়ে স্ফূর্ত্তি করি। পরম পিতার দয়ায় তা'তে বোধ হয় আপনারও শরীর ভাল হ'বে।

মহাত্মাজীও নাকি বাঙ্গলা ভ্রমণে বেরুচ্ছেন। তাঁ'কে এখানে আসবার অনুরোধ করা এমন সাহস আমার নাই আর কাহারও এখানে আছে কিনা জানি না—আপনার দয়া যদি তাঁ'কে আন্‌তে পারে।

আমি জানি দাদা আপনাদের কাছে চিঠি লিখ্‌বারই উপযুক্ত নয়—তবে আপনি এই আমার সাহস, আর যেই হই বা যাহাই হই—সবারই গর্ব্ব আপনি—আমার ত নিতান্তই তাই—আমার আরও করে * * * *"

সেবার চেয়ে যে দুনিয়ায় আর বড় ধর্ম্ম নাই,—সেবায় মানুষকে কিভাবে পরম সার্থকতা দান করে তাহাই বলিয়া দিতেছেন—

"মানুষ তখনই সুখী হ'তে পারে, যখনই নিজের ভালমন্দ বিচার-শূন্য হ'য়ে, বা নিজে ভাল কি মন্দ এমনতর না ভে'বে, আদর্শ বা প্রেমাস্পদকে মহীয়ান্ গরীয়ান্ ক'রে তুল্‌বার প্রলোভনে, প্রিয়র বৃত্তি (complex, wishes) গুলি সার্থক কর্‌বার প্রলোভনে, নিজের ইচ্ছাকে এমনতর নিয়ন্ত্রিত করে—যে নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না রে'খে মানুষকে এমনতর সেবা করে, যা'তে তা'রা প্রাণবান্ হ'য়ে ওঠে, সতেজ হ'যে ওঠে, উন্নত হ'য়ে ওঠে, আর তা'র আদর্শ বা প্রিয়র রঙ্গে রঙ্গীন হ'য়ে সবাই মিলে একপ্রাণ হ'য়ে যায়,—আর তখনই সেবা সার্থক—আর তখনই সে সুখী।"

আবার কেমন করিয়া সেবা করিতে হয়, দেখিতে পাই তাহাও বলিতেছেন, যথা,—

"সেবা দেওয়া মানে তাই করা যা'তে তা'রা তোমার সাহায্যে উন্নতির দিকে অবাধ হয়। মানুষের অবনতি হয় যা'তে তা' কিন্তু সেবা নয়—সর্ব্বনাশ!

সেবা কর্‌বে সব রকমে—both physically and mentally—যখন যেখানে যেমন দরকার। এমনতর সেবায় মানুষ বর্দ্ধিত হয়,—তাই তোমাকে বর্দ্ধন করা মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সাবধান—নিজে বর্দ্ধিত হওয়ার আশা রে'খে সেবা কর্‌তে যেও না—সেবা বিকৃত হ'য়ে নিষ্ফল হ'তে পারে।"

সবটুকু মনপ্রাণ দিয়া ভগবানকে না ভালবাসিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না তৎপ্রসঙ্গে নানাস্থানে বলিতেছেন—

"তাঁ'কে ভালবাস্ মা, কেবল তাঁ'কেই ভালবাস্। এত ভালবাস্ যে ভালবেসে—তুমি মা—নিজে ফুরিয়ে যাও—অবশিষ্ট যেন কিছুই থাকে না। সে মা ভালবাসা-ছাড়া আর-কিছুতেই জব্দ থাকে না, আর ভালবাসা-ছাড়া আর-কিছুতেই বাঁচাতে পারা যায় না।

"আমরা বোধহয় সেইদিন থেকেই ধন্য হ'ব—সেইদিন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে থাক্‌ব যেদিন আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণুপরমাণু জান্‌বে আমি তোমারই—হৃদয় জান্‌বে আমি তোমারই—মর্ম্মের মর্ম্ম জান্‌বে আমি তোমারই। কেবলই জান্‌ব, ভাব্‌ব, বুঝ্‌ব, বল্‌ব—আমরা তাঁরই।"

"তখনই শত শত আঘাত শত অপবাদ, শত দুঃখ দৈন্য যন্ত্রণা আমাদের মনকে স্পর্শ কর্‌তেও পার্‌বে না; তখনই—কেবল তখনই মা—আমরা অক্লান্ত হ'তে পার্‌ব—নিমিষে গন্ধমাদন তু'লে আন্‌তে পার্‌ব—চন্দ্র সূর্য্য কোলে লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব।"

বীরের ধর্ম্ম কি—তাহার কি সুন্দর ব্যাখ্যা কেমন স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন—

"বীর হ'তে হ'বে আমাদের—সাহসী হ'তে হ'বে আমাদের,—আর আমাদের বীর হওয়া বা সাহসী হওয়া মানে মানুষ খুন করা নয় কিন্তু—বরং মৃত্যুকে অবনত ক'রে মানুষকে জীবনে আনয়ন করা—যা'তে মানুষ মঙ্গলের অধিকারী হয়—যা'তে মানুষ উন্নত হ'তে পারে—যা'তে মানুষ বিধ্বস্তি ও বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তি পে'তে পারে—নিঃস্বার্থভাবে, অম্লান-সাহসে, earnestly তাই করা। বীরের স্বভাবই মানুষকে মুক্ত করা, উন্নত করা, প্রশস্ত করা।"

সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য কি তাহা একখানা পত্রে কেমন বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—

"দ্যাখ্, সহধর্ম্মিণী হ'তে হ'লে স্বামীর wishes and inclinationsগুলি এমনতরভাবে নিতে হ'বে যা'তে তা' comply করা বা fulfil করাটাই তোর সুখের হ'বে—ভাব্‌তে, বল্‌তে, কর্‌তেই একটা আনন্দ হ'বে,—যেমনতর নিজের desire-গুলি ভাব্‌তে বা কর্‌তে আনন্দ হয়, enthusiastic attitude আসে—এগুলি comply করাটা যেন তোরই একটা বৃত্তি

(complex), আর সেগুলি নিয়ে এমনতরভাবে deal কর্‌তে হ'বে যেন তা' তা'র Lord, Master বা আদর্শকে fulfil করে অর্থাৎ আদর্শের wishগুলি successful ক'রে তোলে। দেখ্‌বি, এমন ক'রে চল্লে দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতরেও কত সুখে কত তৃপ্তিতে জীবনটাকে বহন করা যায়।

"শোন্, স্বামীর শরীরটা ভোগ করার চেয়ে যদি দেখ্‌বার হয়—যে দেখায় বা তদ্বিরে সে সুস্থ থাকে বা nourished হয় তাই কিন্তু ভাল—আর ভাল উভয়ের।

"আর মনটা হ'বে উপভোগের, অর্থাৎ তাঁ'র মনটা দিয়ে এমনতরভাবে deal কর্‌তে হ'বে—যা'তে পরিশ্রান্ত হ'লেই তুই হবি তা'র দখিন হাওয়ার দুগ্ধফেননিভ শয্যা, আরক্তিম (রাগে, দুঃখে, কষ্টে) বা বেদনাপ্লুত হ'লেই সে তোকে মন্ত্রঃপূত, বেদনানাশক, মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি স্নিগ্ধ প্রলেপের মত, তোকে পা'বে জীবনপ্রদ সাহসে, কর্ম্মের উদ্যম হর্ষে—সেবা ও সহানুভূতিতে তোর ভাষা তা'র কানে বাজ্‌বে দক্ষ Picloo বাঁশীর সুরের খেয়ালের মত —এমনতর ভাবে তোর আর তা'র সব—বুঝ্‌লি?

"অনেক সময় মেয়েরা ভুল ক'রে জিদ করে,—জোর করে, অন্যের তুলনায় ধিক্কার দিয়ে, দোষ দেখিয়ে, কথায়, চলনে, ব্যবহারে জব্দ ক'রে স্বামীকে বশে আন্‌তে চায়,—উল্টো, তা'রা সর্ব্বনাশকে নানাপ্রকারে নিমন্ত্রণ করে।

"দ্যাখ্ মা, মানুষের কেন জীবের একটা স্বভাবই এই সে যেখানে বা যা'র কাছে mentally এবং physically nourished এবং cherished হয় অর্থাৎ যা'কেই তা'র ভাল লাগে, তা'র কাছেই তা'র যে'তে ইচ্ছা করে, থাকৃতে ইচ্ছা করে—যা'র কাছে তা'র বৃত্তিগুলি (wishes) আশ্রয় পায়, adjusted এবং supported হয়;—আর তা'কে যখন সে দেখে তা'র desire এবং activityই এমনতর—তা'র সুখই হ'চ্ছে তা' মূর্ত্ত করা, তখন সে মানুষের তা'র সাথে ভাব না হ'য়েই যায় না; তা' নয় মা? * * * *"

উচ্চ লক্ষ্যে—উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—

"সে জীবন কতটুকু—সে লক্ষ্য কেমনতর—যা' নাকি দুনিয়ার সুখ দুঃখের আঘাতে অবশ হ'য়ে পড়ে—শিথিল হ'য়ে পড়ে—ছিঁড়ে যায়!

ওমা! আমরা চাই তাঁ'কে—কিন্তু পে'তে গেলে যা' কর্‌তে হয়, তা' ভে'বে বা দে'খে যেন কেমনতর হ'য়ে যাই—কেন মা।

"চাইতে হ'লেই কর্‌তে হ'বে—আর না কর্‌লে পাওয়া হ'বে না। কিন্তু কর্‌তে গেলেই পে'তে হ'বে দুঃখ, ব্যথা, অবসাদ। যখন তা' সহ্য ক'রেও,—যত অক্লান্ত মনে—অম্লান বদনে কর্‌তে পার্‌ব আর তা' যত বেশী হ'বে—পাওয়াটা আমাদের তত সুন্দর হ'বে, তা' নয় মা?'

অবসাদ কিভাবে মানুষকে ঘিরিয়া ধরে—আর তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কেমন সুযুক্তির সহিত সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—

"অবসাদ আমাদের লক্ষ্যমুখী গতির একটা ঘোর অন্তরায় —আর এই অবসাদের উৎপত্তি হ'ল 'না'-চিন্তা হ'তে। তাই অবসাদ এলেই তাঁ'র চিন্তা বা 'হ'ল' বা 'হ'চ্ছে' চিন্তা নিয়ে থাকৃতে হয়,—মনের দু'টি দিক আছে একটী 'হাঁ' একটী 'না'— 'হাঁ'-তে আছে প্রসারণ, আর 'না'-তে আছে সঙ্কোচ, দুঃখ, অবসাদ;—তাই আমাদের এগু'তে হ'লেই ভাব্‌তে হ'বে 'হাঁ', আর কর্‌তে হ'বে তেমনতর—আর এগিয়ে যাওয়ার অন্তরায়কে 'না' ক'রে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। 'হাঁ'-টাই ভালর দিকের চিন্তা ও কর্ম্ম, আর 'না'-টাই তা'র উল্টো।"

নারী-মূর্ত্তি তিনি কেমন দেখিতে চান, নারী কেমন হইলে তাঁহার মনের মত হয় তাহার কি সুন্দর অভিব্যক্তি একখানা চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা:—

"ডান হাতে তা'র সেবা—বামে সান্ত্বনা, বুকে আবেগ ও অনুরক্তি—মুখে সহানুভূতি, নাসারন্ধ্রে স্নেহমমতা—শ্রবণে বেদশ্রুতি, —মস্তিষ্কে বোধ ও বিবেচনা—চরণে ক্ষিপ্রতা ও কর্ম্মতৎপরতা, সর্ব্বাঙ্গে বৃত্তিনিবেদন—"

তেমনি আর একখানা চিঠিতে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে কি উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায়ই না লিখিতেছেন!—

"আমি যে সেই আশায় পথ চেয়ে আছি—একটা প্রত্যক্ষ প্রাণময়ী উপঢৌকন পে'তে। যেখানে আছে নারীত্বে রিপুদলনী সতীত্বের নিষ্ঠুর মন-ঝল্‌সান স্তব্ধকরা রশ্মিচ্ছটা, অবসাদে অমৃতময়ী সেবানিরতা উদ্দীপনা,—আশায় কর্ম্মনিপুণ অগ্রগামিনী পাগল-করা

ডাক,—ব্যথায় অবশ-করা ব্যথা-ভুলান আকুতি-মাখা সহানুভূতি ও সেবা, আর এ সবগুলি আছে মহামহীয়সী মাতৃত্বের পুণ্যময়ী মন্দাকিনীর অমরকরা বারিধারাসিক্ত প্রেমনির্য্যাসে—এ-ও কি হয়?—মানুষ কি তা' পায়?—এ ব্রাহ্মণসন্তান কি পাগল?

আবার অপর এক স্থানে আদর্শ নারীর কেমন সুন্দর জীবন্ত আর একখানা চিত্র আমরা পাইতেছি—

"তা'র হাসি ছিল মুখে—তৃপ্তি ছিল বুকে—কথায় ছিল তা'র সম্বর্দ্ধনা ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রেরণা—চাইত যখন সে,—তা'র করুণা-উচ্ছলিত দৃষ্টি আমার বুকখানাকে আশায়—ভরসায় উদ্দীপিত ক'রে তুল্‌ত,—তা'র বৃত্তিগুলি নিয়ে সে যেন সব সময় হাজির থাকৃত তামিল কর্‌তে—আমারই হুকুম আমারই মুখপানে চেয়ে,—কিছু বল্লে যেন ধন্য হ'ত—আর কাঁপন-শূন্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা' কর্‌ত,—তাই বলে' কিছু না-বল্লেও দুঃখিত হ'ত না সে—অথচ প্রস্তুত থাকৃত।

"আমাকে সেবা করা, স্তুতি করা, তুষ্ট করা এবং পুষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ করা—আর আমাকে অটুট রাখ্‌বার জন্যে আমার পারিপার্শ্বিকের শুশ্রূষা করা,—সুস্থ সবল ও পুণ্য ক'রে তোলা ছিল যেন তা'র স্বাভাবিক ধর্ম্ম—!"

পুত্রশোকে মুহ্যমানকে সান্ত্বনা দিয়া লিখিতেছেন—আর তাহাতে মৃত্যুর সম্বন্ধে কি গভীর তথ্যের আলোচনা করিতেছেন!

"ওরে আমার ব্যথিত, ওরে আমার বজ্র-নিপীড়িত, ওরে আমার—আমার দরদ-ক্লান্ত, স্তব্ধ ব্যাকুল নিরাশ্রয় শোকার্ত্ত ভাবুক! আমরা নিত্যই দেখি, কত-কি দেখি—বেদনার পিছে সান্ত্বনার অভয় আলিঙ্গন, ক্রন্দনের পিছে মমতার চুম্বন—মৃত্যুর পিছে অমৃতের আমন্ত্রণ,—দেখি না কি, দেখি না, দাদা?

"মৃত্যুকে ত কেহই রোধ করিতে পারেন নাই দাদা! আমাদেব অতীতের পরম দরদী শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ইত্যাদি—যাঁ'রা জীবের দুঃখে কাতর, আকুল, পাগল—তাঁ'রা কি-কর্‌লে—কেমন-ক'রে চল্‌লে—অবশ্যম্ভাবী দুঃখের হাত, হ'তে নিস্তার পাওয়া যে'তে পারে—বার বার ক'রে তাই ব'লে গিয়েছেন,—কিন্তু মৃত্যুকে রোধ কর্‌তে হয় কি-ক'রে তা'ত ব'লে যান্ নি—কিন্তু আবার নিরাশ ক'রেও যান্ নাই—ব'লেছেন—খুঁজ্‌লে বোধ হয় তা'ও হ'তে পারে।

"আচ্ছা দাদা! মৃত্যু কা'কে বলে? বোধ হয় উৎসে মমতাহীন চলন্ত স্রোতই স্তব্ধ হয়, সে আর চলন্ত থাকে না, আর যা' চলন্ত নয়, মৃত্যু তা'রই অনিবার্য্য। তা'হ'লেও হ'তে পারে কিন্তু! আচ্ছা, এত দেখ্‌তেই পাই—আমাদের সৃষ্ট বা সংগৃহীত বস্তুতে আমাদের যত মমতা,—আমরা যাঁ'র সৃষ্ট বা সংগৃহীত, তাঁ'র উপরে আমাদের তেমনতর কিছু নেই,—আমাদের ভিতর যাঁ'র একটু দেখা যায়—বুদ্ধিকরা কর্ত্তব্যমাত্র।

"তাই, তিনি আমাদের তাঁ'রই মত ক'রেছিলেন বোধ হয়; কিন্তু অহঙ্কারমুগ্ধ আমরা, আমাদিগকে তাঁ'র না ভে'বে—তিনিই আমরা এইরূপ প্রতীয়মান কর্‌তে প্রয়াস পে'লাম—অকৃতজ্ঞ হ'লাম, আর এমনই ক'রে বোধ হয় উৎস-বিমুখ হ'য়ে উঠ্‌লাম, স্তব্ধ হ'লাম, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দাঁড়াল!

"দাদা আমার! আমি মৃত্যুকে রোধ কর্‌তে পারি নাই,—তবে চেষ্টা করি,—আর তা' বোধ হয় সবাই করে। তবে নিস্তারের উপায়—যা' দে'খেছি, বু'ঝেছি—যা' তিনি জানিয়েছেন—তা' প্রাণপণে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করি—তা' যতদূর সম্ভব সতর্কভাবেই!

"দাদা! আমি নিজেই জরামরণশীল,—এখনও কি-ক'রে মরণকে স্তব্ধ কর্‌ব নিঃশেষ কর্‌ব—তা'র দয়ার এ দান পাওয়ার উপযুক্ত হ'তে বোধ হয় পারি নি,—তবে যতদিন থাকি, চেষ্টা কর্‌ব, প্রার্থনা কর্‌ব—পে'তে!

* * * * *

"প্রার্থনা করি দয়ালের কাছে—আপনার এই শোক তাঁ'র বিরহে পর্য্যবসিত হোক—কৃতজ্ঞতা তাঁ'র প্রতি আপনাকে আকুল ক'রে তুলুক, উদ্দাম ক'রে তুলুক,—তাঁ'কে আপনি নিবিড় ক'রে বুকে ধরুন—সব থাকৃতেই আপনি নিঃস্ব হ'ন—পৃথিবীতে মহান্ হ'য়ে দাঁড়ান্।"

সজ্ঘ-পরিচালনায় কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে কর্ম্মসচিবদিগকে কেমন সারগর্ভ সুন্দর কার্য্যকরী উপদেশ দিতেছেন—

"দেখ, আমার প্রথম কথা তোমরা honestly এবং tremendously work কর্‌তে প্রস্তুত আছ কিনা—আর তা'তে disabled হওয়া বাদে কোন condition থাক্‌বে না।

"তারপর ছ্যাখ্, এমনতর ভাবে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে কে-কে রাজি আছে?—তা'রা কত জন? তা'দের behaviour হ'বে সাধুর মতন, activity হ'বে military department-এর মতন, movement চাই প্রেমিক দেবতার মতন—এগুলি তা'দের ভিতর infuse করতে হ'বে। এক-কথায়, মানুষ তা'দের বল্‌তে বাধ্য হ'বে sweet man! কেউ কাহারও নিজের বাহাদুরীর কথা বল্‌বে না, কাহারও নিন্দা করবে না—বাহাদুরী দেবে একে অন্যেকে।

* * * * *

"তোমাদের ব্যবহারে sweet এবং ব্যবস্থা বা management-এ hard হওয়া দরকার। তোমাদের খুব নজর রাখা উচিত, যেন worker-রা বেঁচে থাকে, সবল থাকে, সুখে থাকে। তোমরা service-এর উপর না দাঁড়ালে—ভালবাসা ও বাহাদুরী দেওয়ার উপর না দাঁড়ালে—আশা কম। মানুষকে active ক'রে (সর্ব্ববিষয়ে) বড় করা তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া চাই! মানুষ চায় বড হ'তে—মানে, সম্পদে, হৃদয়ে—তা' যেন পায়।

* * * * *

"কোনও কাজে requesting mood ছাড়া commanding mood apply করবে না, কেবল যখন দেখ্‌বে Ideal fulfilled হ'চ্ছে না যেখানে, সেখানে vigorous but honourable opposition ছাড়া। যখনই কিছু করতে যাও বা করা'তে যাও, সম্মান এবং serving attitude-এর উপর দাঁড়িয়ে—তুমি সম্মানের আশা রে'খো না, সুখী হ'য়ো—বড় ক'রে, মান দিয়ে, সমৃদ্ধি দে'খে। রাজা হ'তে যে'য়ো না—মানুষকে রাজা ক'রে তোল।

"আর সবরকমে Idealকে represent করতে ভুলো না, Institution-কে represent করতে ভুলো না। যেখানে ideal যত honoured হ'বে তোমাদের দিয়ে, সেখানে তোমরা তত—এমন-কি আরও বেশী—honour পা'বে নিশ্চয়।"

ধর্ম্ম থাকিলেই কর্ম্মও থাকিবে, কর্ম্মহীন ধর্ম্ম যে সত্যিকারের ধর্ম্ম নয়—এই তত্ত্বটী কোন মহিলাকে কেমন সুন্দর উপমা দিয়া, সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"ধর্ম্মছাড়া কর্ম্ম—যেমন নারায়ণছাড়া লক্ষ্মী,—যেখানে নারায়ণ নেই সেখানে কি লক্ষ্মী থাকৃতে পারে? আর লক্ষ্মীকে অপমান ক'রে, জোর ক'রে, আটক ক'রে যদি কেউ রাখে, তবে রাবণের মত দশা হয় বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে তুষ্ট কেউ রাখ্‌তে পার্‌লে নারায়ণকে সে পা'বে—পা'বেই নিশ্চয়,—একথা সবাই বলে।—তাই মা, যে কর্ম্ম নারায়ণকে (সৎ—থাকা, বৃদ্ধি-পাওয়া) বরণ করে না, তা'তে শ্রী বা লক্ষ্মী (সেবা করা) অতুষ্ট বা অবমানিত, তা' সর্ব্বনাশ এনে দেয়,—তাই মা আমার—যে সাধনা কর্ম্মবিমুখতা আনে সে সবটা নাশের কোলেই তু'লে দেয়—সে কারণহারা নারায়ণহারা হয়—লক্ষ্মী বাদ দিয়ে—ক্রিয়া বা কর্ম্ম বাদ দিয়ে কি কারণ বা নারায়ণকে ধরা যায়—বোঝা যায়—জানা যায়?"

প্রতিষ্ঠা ও সফলতা লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন—

"প্রতিষ্ঠা আর সফলতা তা'রই সহধর্ম্মিণী হয় যে নাকি তা'র Idealকে বলায়, ব্যবহারে এবং কর্ম্মে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তোমার তাঁ'র প্রীতি, প্রেম, কর্ম্মানুরাগ ও নিরবচ্ছিন্নতা চরিত্রে ফু'টে উঠে যত লোককে মুগ্ধ কর্‌বে—জেন তত লোকে তোমার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অব্যাহত।"

প্রত্যেকটী মানুষকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপ দেখিতে চান—মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার চাহিদা কেমনতর, একখানা চিঠিতে তাহার অতি সুন্দর অভিব্যক্তি রহিয়াছে। যথা—

"আমি দেখ্‌তে চাই তোদের ভিতর সেবা, সহানুভূতি দয়াদাক্ষিণ্য, তেজ, বীর্য্য বুদ্ধি, বিচার, স্বস্তি, স্থৈর্য্য, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, প্রেম-মণ্ডিত হ'য়ে—মূর্ত্ত হ'য়ে তোদের দেবতা ক'রে তু'লেছে,—তোদের বুকে কত অন্যায়—কত নিরাশ্রয়, কত অলস—কত অকৃতকার্য্য স্থান পে'য়ে আশার জীবনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে—ধন্য হ'য়ে উঠেছে,—আর শত অপরাধী—শত অত্যাচারী তোদের স্পর্শে পবিত্র হ'য়ে জয়গানে জগৎকে মুখরিত ক'রে তুল্‌ছে,—আর তাই দে'খে আমি অঢেল হ'য়ে যা'চ্ছি—ধন্য হ'য়ে যা'চ্ছি—আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে যুক্ত করে পরমপিতাকে বলচি—আরো পরমপিতা, আরো দাও—অমর ক'রে দাও এদের—আরও করে' দাও তোমাতে।"

জীবনপথে চলিতে নিত্যই কত অবসাদ, দুঃখ, সন্দেহ, নৈরাশ্য—কত-কিছু

"তারপর ছ্যাখ, এমনতর ভাবে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ ক'র্তে কে-কে রাজি আছে?—তা'রা কত জন? তা'দের behaviour হ'বে সাধুর মতন, activity হ'বে military department-এর মতন, movement চাই প্রেমিক দেবতার মতন—এগুলো তা'দের ভিতর infuse করতে হ'বে। এক-কথায়, মানুষ তা'দের বল্‌তে বাধ্য হ'বে sweet man! কেউ কাহারও নিজের বাহাদুরীর কথা বল্‌বে না, কাহারও নিন্দা করবে না—বাহাদুরী দেবে একে অন্যেকে।

* * * * *

"তোমাদের ব্যবহারে sweet এবং ব্যবস্থা বা management-এ hard হওয়া দরকার। তোমাদের খুব নজর রাখা উচিত, যেন worker-রা বেঁচে থাকে, সবল থাকে, সুখে থাকে। তোমরা service-এর উপর না দাঁড়ালে—ভালবাসা ও বাহাদুরী দেওয়ার উপর না দাঁড়ালে—আশা কম। মানুষকে active ক'রে (সর্ব্ববিষয়ে) বড় করা তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া চাই! মানুষ চায় বড় হ'তে—মানে, সম্পদে, হৃদয়ে—তা' যেন পায়।

* * * * *

"কোনও কাজে requesting mood ছাড়া commanding mood apply করবে না, কেবল যখন দেখ্‌বে Ideal fulfilled হ'চ্ছে না যেখানে, সেখানে vigorous but honourable opposition ছাড়া। যখনই কিছু করতে যাও বা করা'তে যাও সম্মান এবং serving attitude-এর উপর দাঁড়িয়ে—তুমি সম্মানের আশা রে'খো না, সুখী হ'য়ো—বড় ক'রে, মান দিয়ে, সমৃদ্ধি দে'খে। রাজা হ'তে যে'য়ো না—মানুষকে রাজা ক'রে তোল।

"আর সবরকমে Idealকে represent করতে ভুলো না, Institution-কে represent করতে ভুলো না। যেখানে ideal যত honoured হ'বে তোমাদের দিয়ে, সেখানে তোমরা তত—এমন-কি আরও বেশী—honour পা'বে নিশ্চয়।"

ধর্ম্ম থাকিলেই কর্ম্মও থাকিবে, কর্ম্মহীন ধর্ম্ম যে সত্যিকারের ধর্ম্ম নয়—এই তত্ত্বটী কোন মহিলাকে কেমন সুন্দর উপমা দিয়া, সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"ধর্ম্মছাড়া কর্ম্ম—যেমন নারায়ণছাড়া লক্ষ্মী,—যেখানে নারায়ণ নেই সেখানে কি লক্ষ্মী [illegible] 'কতে [illegible] ? আর লক্ষ্মীকে অপমান ক'রে, জোর ক'রে, অ[illegible] ক'রে যদি কেউ রাখে, তবে রাবণের মত দশা হয় বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে তুষ্ট কেউ রাখ্‌তে পারলে নারায়ণকে সে পা'বে—পা'বেই নিশ্চয়,—একথা সবাই বলে।—তাই মা, যে কর্ম্ম নারায়ণকে (সৎ—থাকা, বৃদ্ধি-পাওয়া) বরণ করে না, তা'তে শ্রী বা লক্ষ্মী (সেবা করা) অতুষ্ট বা অবমানিত, তা' সর্ব্বনাশ এনে দেয়,—তাই মা আমার—যে সাধনা কর্ম্মবিমুখতা আনে সে সবটা নাশের কোলেই তু'লে দেয়—সে কারণহারা নারায়ণহারা হয়—লক্ষ্মী বাদ দিয়ে—ক্রিয়া বা কর্ম্ম বাদ দিয়ে কি কারণ বা নারায়ণকে ধরা যায়—বোঝা যায়—জানা যায় ?"

প্রতিষ্ঠা ও সফলতা লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন—

"প্রতিষ্ঠা আর সফলতা তা'রই সহধর্ম্মিণী হয় যে নাকি তা'র Idealকে বলায়, ব্যবহারে এবং কর্ম্মে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তোমার তাঁ'র প্রীতি, প্রেম, কর্ম্মানুরাগ ও নিরবচ্ছিন্নতা চরিত্রে ফু'টে উঠে যত লোককে মুগ্ধ করবে—জেন তত লোকে তোমার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অব্যাহত।"

প্রত্যেকটী মানুষকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপ দেখিতে চান—মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার চাহিদা কেমনতর, একখানা চিঠিতে তাহার অতি সুন্দর অভিব্যক্তি রহিয়াছে। যথা—

"আমি দেখ্‌তে চাই তোদের ভিতর সেবা, সহানুভূতি দয়াদাক্ষিণ্য, তেজ, বীর্য্য বুদ্ধি, বিচার, স্বস্তি, স্থৈর্য্য, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, প্রেম-মণ্ডিত হ'য়ে—মূর্ত্ত হ'য়ে তোদের দেবতা ক'রে তু'লেছে,—তোদের বুকে কত অন্যায়—কত নিরাশ্রয়, কত অলস—কত অকৃতকার্য্য স্থান পে'য়ে আশার জীবনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে—ধন্য হ'য়ে উঠেছে,—আর শত অপরাধী—শত অত্যাচারী তোদের স্পর্শে পবিত্র হ'য়ে জয়গানে জগৎকে মুখরিত ক'রে তুল্‌ছে,—আর তাই দে'খে আমি অঢেল হ'য়ে যা'চ্ছি—ধন্য হ'য়ে যা'চ্ছি—আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে যুক্ত করে পরমপিতাকে বলচি—আরো পরমপিতা, আরো দাও—অমর ক'রে দাও এদের—আরও করে' দাও তোমাতে।"

জীবনপথে চলিতে নিত্যই কত অবসাদ, দুঃখ, সন্দেহ, নৈরাশ্য—কত-কিছু

সমস্যা আসিয়া মানুষের কৃতকার্য্যতালাভের অন্তরায় সৃষ্টি করে; রিপুর তাড়নায় মানুষ কতই-না ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে! "তাঁর চিঠি" ব্যথিতের হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ, নিরাশার বুকে অমৃতের উৎস, দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের কাছে ধ্রুব-তারারই মত পথনির্দ্দেশক। যাহার অধিগমনে, সঙ্গে বা আলোচনায় মানুষ হিতে অধিষ্ঠিত বা উন্নীত হইতে পারে, তাহাকেই যদি আদর্শ সাহিত্য বলা যায় তবে 'তাঁর চিঠি' জাতীয়-সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন—শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী শ্রেষ্ঠ অবদান !

নানা প্রসঙ্গে

'নানা প্রসঙ্গে', 'নারীর পথে', 'কথা প্রসঙ্গে' ও 'ইস্‌লাম প্রসঙ্গে'—এই চারিখানা গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাজি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থগুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয়চরিত্র-নিয়ন্ত্রণে এই গ্রন্থগুলির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত, প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম্মের নামে নানা বিরোধের সৃষ্টি হয় কেন, কি-করিলে সম্প্রদায়গত বিরোধ দূরীভূত হইতে পারে, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় কোথায়, বিজ্ঞান-চর্চ্চার সার্থকতা কি ভাবে হইতে পারে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের কিরূপ সম্বন্ধ, স্বরাজের প্রকৃত অর্থ কি, কি ভাবে এবং কত দিনে তাহা লাভ করা যায়, স্বাধীনতা কাহাকে বলে, উদ্বর্দ্ধনশীল সাহিত্য কি, জাতীয় জীবন ও বৃদ্ধিদ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় কি ভাবে, অস্তিত্ব ও উন্নয়নের বিধি জানিবার জন্য ইষ্টারাধনার প্রয়োজনীয়তা, ভগবান কে, তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি, ধ্যানের উদ্দেশ্য কি, জীবন বা মৃত্যু কাহাকে বলে, জড় ও জীবনে তফাৎ কি, মৃত্যুর পরে আত্মা কখন কি অবস্থায় থাকে, জন্মমৃত্যুর গূঢ় রহস্য জানা যায় কি-করিয়া, মুক্তি মানে কি ইত্যাদি বহু বহু বিষয়ের মীমাংসা-বাণী 'নানাপ্রসঙ্গে' গ্রন্থখানায় প্রদত্ত হইয়াছে।

আবার সমাজগঠনে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় উন্নতির জন্য শ্রমশিল্প এবং আদর্শ শিক্ষার প্রবর্ত্তন, আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, নর ও নারী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও অতি পরিষ্কারভাবে ইহাতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, হরিজন-আন্দোলন, আদর্শ ষ্টেট্, রাজনীতি, হিট্‌লার, মুসোলিনী ও কামালপাশার কথা, জাতিগঠন এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্কেত—প্রভৃতি

নানা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে পুস্তকখানা হইতে কতিপয় প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা গেল। যথা :—

প্রশ্ন। ধর্ম্ম মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, যাহা আমাদের existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখে—তাহাই ধর্ম্ম। তা' যদি হয় তবে আমাদিগকে সেই সব কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অস্তিত্ব অব্যাহত ত' থাকেই বরং পাকা হয়।

ধর্ম্ম সব দিক দিয়া হয়। অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে অব্যাহত রাখিয়া বাঁচিবার জন্য, আনন্দের জন্য, সুখ-সুবিধার জন্য মানুষ যাহা যাহা করে তাহা ধর্ম্ম। আমার অস্তিত্ব চারিদিকের অবস্থার উপর নির্ভর করে, চারিদিক যদি সুস্থ থাকে আমি সুস্থ থাকিব—অসুস্থ থাকিলে আমিও অসুস্থ থাকিব। আমার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে তাহাদের দ্বারা বাহিরের সাড়া লইয়া যে জ্ঞান জন্মিতেছে—তাহাতেই 'আমি আছি' এই বোধ হয়। তা-ছাড়া 'আমি' বলিয়া আলাদা জিনিষ কিছুই নাই—থাকিলেও জানা যায় না। এমন জায়গায় যদি আমাকে রাখা যায় যেখানে কিছু নাই তাহা হইলে আমার আমি-ভাব ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি-বাদে যদি কিছু থাকে তবে আমি-জ্ঞান হয়। যেখানে আমি-ছাড়া কিছু নাই সেখানে আমিও নাই।

প্রশ্ন। অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে বজায় রাখিয়া আমার সুখ-সুবিধা সম্ভব কেমন করিয়া ?—তা' কি সব সময় হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি-ভাবের উদ্বোধন যদি environment-এরই (পারিপার্শ্বিকেরই) উপর নির্ভর করে, তা'হ'লে পারিপার্শ্বিকের উদ্বর্দ্ধনেই এই আমির-ও উদ্বর্দ্ধন হইবে নিশ্চয় ! তা'হলেই আমার কর্ত্তব্য যা'তে নাকি আমার পারিপার্শ্বিক উদ্বর্দ্ধিত হয়—আর তা' করতে হ'লেই পারিপার্শ্বিকের সেবা আমার থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অপরিহার্য্য, আর এই সেবাবিমুখ যত হইব তত আমি দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইব ; আর এই থাকার অপলাপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তা'হ'লেই দেখা যায় আমাদের এই সুখ-সুবিধার ব্যাপারে পারিপার্শ্বিকই মুখ্য জিনিস !

প্রশ্ন। তবে কি কর্ম্মীই ধার্ম্মিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, ধর্ম্ম মানে তাই যেমন ক'রে চল্‌লে, বল্‌লে, ভাব্‌লে আমাদের being ও becoming (অস্তিত্ব ও উন্নয়ন) বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়—সাধারণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা—অনেক তথাকথিত মহাপুরুষ অপেক্ষা—দাশদা (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) বেশী ধার্ম্মিক ছিলেন, কারণ তাঁ'র পারি-পার্শ্বিকের সেবা জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল।

প্রশ্ন। ইউরোপ সম্বন্ধেও কি সেই কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, তাহাদের সম্মুখে কতগুলি সুবিধা আছে। যখন যেমন অসুবিধা আসিয়াছে তখন তাহারা সেগুলি সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ক্রমশঃ ভিতরের দিকে যাইতেছে। জাতি যখন মারা যায় তখন তা'র ভিতর অনুসন্ধিৎসার অভাব ঘটে, স্বার্থান্ধ ভোগবুদ্ধি প্রবল হ'য়ে পড়ে। উদ্ভাবনার দিকে যখন নজর যায় তখন জাতি বড় হয়, স্বার্থান্ধ ভোগবুদ্ধির দিকে নজর গেলে সে উঁচুতে উঠিতে পারে না।

প্রশ্ন। আপনি যা' বল্লেন, ধর্ম্ম যদি তাই হয় তবে তা' নিয়ে আবহমান কাল থেকে এত মারামারি কেন? এত সরলই যদি ধর্ম্ম হ'ত তবে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ—ইঁহাদের করা, বলা, ভাবা, আর চলায় কোন তফাৎ-ই থাক্‌ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্মের মারামারি কখনো নাই, কোথাও নাই। কারণ, ধর্ম্ম মানেই হ'ল তাই করা যা'তে নাকি বেঁচে থাকা আর বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত থাকে, অটুট থাকে বর্দ্ধনশীল হয়,—আর এ প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বার্থ। তাই ধর্ম্মের আদিম নিয়মগুলির ভিতর কোথাও কোন গরমিল নাই। গরমিল আসিয়া পড়ে দেশ-কাল-পাত্রভেদে—আর তা' যে দেশের যে কালের বৈশিষ্ট্যে যেখানে যাহা করা প্রয়োজন তদনুসারে। যেমন মাদ্রাজে নাকি লঙ্কা বেশী না খাইলে লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে; শুনিয়াছি পেঁয়াজ কোথাও নাকি অমৃততুল্য—তাই এগুলি সার্ব্বজনীন নয়। আর এইগুলির উপরই মানুষ যখন দাঁড়াইয়া ধর্ম্মকে বিচার করে তখনই বোধ হয় দ্বন্দ্বের অভ্যুদয় হয়।

প্রশ্ন। তাই যদি হয় তবে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধ কেন?—আর হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানে যে এত বিদ্বেষ, এত হিংসা—এ কি-করে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ হিংসার কারণই না-জানা। আমার মতে প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক হিন্দুই মুসলমান-খৃষ্টান,—প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক মুসলমান-খৃষ্টানই হিন্দু;—আর ইহার ব্যতিক্রম যেখানে হইয়াছে সেখানেই অজ্ঞানার মুখোস-পরা ধর্ম্মের উল্লম্ফন মাত্র—আর কিছু না। মহম্মদকে মানাই যদি ধর্ম্ম হয়, আর 'খোদা এক' মানা যদি ধর্ম্ম হয়—আর তা'তে জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদের মানায় যদি কোন বাধা বা আপত্তি না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ থাকিয়াও আমি মুসলমান হইতে পারি, ক্ষত্রিয় হইয়াও আমার মুসলমান হইতে বাধে না—আবার মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে বাধা নাই।

প্রশ্ন। কিন্তু হিন্দুমাত্রেই ত মুসলমানের নিকট কাফের, ঘৃণিত,—মুসলমান-যে সে ত' কাফের হইতে পারে না?—আর খৃষ্টানদের কাছে যা'রা খৃষ্টান নয় তা'রা ত' পেগান্ বা হেদেন্।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊনপঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে পদ্মায় স্নানোৎসব

(১৩৪৩ সনের ৯ই আশ্বিন)

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি হয়ত না-ও বুঝ্‌তে পারি—'কাফের' মানে যদি ধর্ম্মে অবিশ্বাসকারীই হয় কিংবা ভগবান্‌ এক—যিনি খোদ—তিনি ছাড়া তাঁহার মত আর-কিছু বা কেহ নাই, আর সৎগুরু, কামেলপীর, পয়গম্বর বা Son (ভগবৎ-তনয়) যদি তাঁ'তে পৌছাবার একমাত্র পথ—ইহা যে-কেহ বিশ্বাস করে সে-ই যদি ধর্ম্মবিশ্বাসী হয়, তবে হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান এদের ভিতর কাহাকে কাফের বলা যাইবে? বরং এমনতর বিশ্বাসী যদি কেউ থাকে তাহাতে কাফের বা হেদেন বা ম্লেচ্ছ উচ্চারণ—এই ত ভগবদ্‌বিশ্বাসের ঘোর বিরুদ্ধ আচরণ।

* * * * *

প্রশ্ন। Guide আবার কি? এই Guide বা চালক নিয়েই ত যত সব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি!?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অস্তিত্ব এবং উন্নয়নের বিধি যাঁহাদের ভিতর প্রকট হইয়াছে বা হইয়াছিল তাঁহারাই Guide বা গুরু—তাই সব গুরু একই,—আর যাঁহা হইতে যে মুখ্যভাবে ইহা পায় তিনি তা'র আদর্শ, গুরু বা Guide. তিনি অনুসরণীয়, আর অন্যান্য যাঁহারা তাঁহারা ভক্তির পাত্র, পূজার পাত্র—তাঁহাদের জীবন ও কর্ম্মের আলোচনায় আমরা আদর্শে অটুট হই, অব্যাহত হই—তাই উন্নতি আমাদের কাছে অবাধ হইয়া আসে।

হনুমান নাকি ব'লেছিলেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।"

গুরুত্বে যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে গুরুত্বের অপলাপ নিশ্চয়ই—আর সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক, বৌদ্ধই হোক্‌। যাহার সংসর্গে গুরুভক্তির অপলাপ ঘটে সে সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—কারণ, তাহা অবনতিকে আমন্ত্রণ করে,—সে সংসর্গে গুরুত্ব নাই বরং আর উল্টো আছে। যেখানে গুরুত্ব আছে সেখানেই নিজের আদর্শ গুরু বা Guide-এর বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া তাঁ'দের সেবা-ভক্তি করাই সমীচীন—যদি তাঁহা হইতে আমাদের এমনতর ভাব না আসে যাহা দ্বারা আমরা আদর্শ হইতে বিচ্যুত বা পতিত হই। কবীর ব'লেছেন—

"সব সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে
সব্‌কো লীজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহো
বৈঠে' আপ্‌না ঠাম॥

অন্য গুরুতে অশ্রদ্ধাবান না হইয়া যদি কেহ আপন গুরুতে নিষ্ঠা ও

ভক্তি-পরায়ণ হয়, তা'র প্রতি প্রকৃত সমস্ত গুরুই সন্তুষ্ট থাকেন,—তাই বুঝি "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" কথার সৃষ্টি।

প্রশ্ন। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে অনেকেই ত বলেন; গুরু আবার কি?—ভগবান্ আছেন আর আমি আছি একজন মধ্যস্থের ত কোনই প্রয়োজন বুঝি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা যাহা লইয়া ভগবান্ তাহাই ভগবত্তা, আর এই ভগবত্তা অর্থাৎ যাহা যাহা লইয়া ভগবান্ তাহার আরাধনায় যিনি সেইগুলি চরিত্রগত করিয়াছেন,—যাঁহার ভাবে, চলায়, বলায়, করায় সেইগুলি প্রকট হয় তিনিই গুরু, তাঁ'তেই ভগবত্তা আছে; তাই, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি।' আর, এই মূর্ত্ত গুরুরূপী ভগবান্ ছাড়া আমাদের উন্নয়নের অন্য কোন পথ সম্ভব কি না জানি না! যীশু ব'লেছেন—'I am the way, the truth, the life—none can come to the Father but through me.' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন,—আমার মধ্য দিয়া ছাড়া কেহই পিতার নিকটে আসিতে পারে না)—তা'র মানে কি? এই কি নয়? তাই যা'র আদর্শ নাই, মূর্ত্ত আদর্শ নাই—আর তাঁ'তে প্রেম, ভক্তি বা আসক্তি ব'লে কিছু নাই, যিনি কাউকে actively fulfil করেননি অর্থাৎ কাহারও wishesগুলিকে fulfil ক'রে নিজেকে সার্থক করেননি তিনি কি-ক'রে গুরু হ'তে পারেন?

প্রশ্ন। তবে অনেকে গুরুবাদ শু'নে—বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠেন কেন? অথচ জগতের সব ধর্ম্মেই ত এই hero-worship, বীরপূজা বা গুরুবাদ র'য়েছে। কিন্তু আজকাল অনেকেই গুরুবাদকে ভয়াবহ মনে করেন,—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমতঃ কোন সদ্গুরু, কামেলপীর বা prophet-কে—পয়গম্বরকে না মানিয়া ভগবান্‌কে কেবলমাত্র নিরাকার করিয়া রাখা অনেক মানুষের অহংএর কাছে অনেকটা সুবিধাজনক, কারণ তাহাতে আমাদের খেয়ালগুলির কোনপ্রকার conflict—সংঘাত লাগার সম্ভাবনা নাই। আমার বৃত্তিগুলি অবাধে আমাকে যাহা-তাহা করিতে পারে,—আমি হয়ত বহুরূপী ভক্তের মত বলিয়া উঠিলাম—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এমনতর আমির কাছে এ হৃষীকেশ কিন্তু অরূপই কেবল। মানুষ বাহবা দিয়া উঠিল—ভাবিলাম বেশ হইয়াছে! এই আশু বাহবার প্রলোভন

হইতে কোন্ বেকুব অহং বঞ্চিত হইতে চায়—যদিও ইহাতে অজ্ঞাতসারে ধ্বংসের মুকুট আমাদের মস্তিষ্ক-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে!

Revolt (বিদ্রোহ) করার আর-একটা কারণ হ'চ্ছে অগুরুর গুরুত্বের দাবী—যা'রা কিছু জানে না, করে না, বোঝে না—সেবাসম্পদ ভক্তিপ্রেম ইত্যাদি কাহাতেও সার্থক হওয়ার জঞ্জাল বহন করে না—মাথায় পা তুলিয়া দিয়া, সর্ব্বনাশ হইবে ভয় দেখাইয়া তা'দের সালিয়ানা আদায়ের অত্যাচার;—আমার মনে হয় এইগুলিই মুখ্য কারণ। কিন্তু একথা ঠিকই যাহার গুরু বা আদর্শ নাই;—আদর্শ বা গুরু ব'লে মানা যা'র কোষ্ঠীতে ভগবান্ লেখেন নাই সে পতিত নিশ্চয়ই—আর, সে যত enlightened-ই (সুসভ্যই) হউক, তা'র পতনও তত enlightenedly (সুস্পষ্টভাবে)!

* * * * *

প্রশ্ন। আপনি মনে করেন death is a curable disease—মৃত্যু এমন একটা ব্যাধি যা'র থেকে মানুষ চিকিৎসা ক'রে আরোগ্য লাভ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনেক মৃত্যু curable (সাধ্য, চিকিৎস্য) বলিয়া মনে করি। যে সকল মৃত্যুতে organs (দেহযন্ত্রগুলি) নষ্ট হইয়া যায় না সে সকল মৃত্যু curable (সাধ্য) অন্ততঃ—যেমন হার্ট ফেল করা, জলে ডু'বে মরা, কলেরা ইত্যাদি। এসব মৃত্যুতে মানুষকে বাঁচান যায়—প্রাণীকে by induction of life energy (জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া) revive (পুনর্জীবিত) করা যায়।

প্রশ্ন। আপনি কি বাঁচাইয়াছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, মনে হয় বাঁচান যায়। শুধু আমার মনে হয় কেন, পাশ্চাত্য অনেক মনীষীরাই এ বিষয়ে এখন গবেষণা করিতেছেন।

প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে কোন Experiment (পরীক্ষা) করিয়াছেন কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Experiment-এর (পরীক্ষার) বুদ্ধি লইয়া কিছু করি নাই; তবে এমনতর ব্যাপার সংঘটিত হইল দেখিয়াছি,—

দেখিয়াছি—সে অনেকদিনের কথা—reviving-এর intention না লইয়া (বাঁচাইবার কোন মতলব না লইয়া) life energy excited হয় (জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়) এমন-কিছু মনের ভিতর revolve করাইয়া (জপ করিয়া)—যেমন বীজযুক্ত নাম—object-এর (কোন বস্তুর) দিকে খুব steadily gaze করিলে (একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে) কিছু-কিছু ফল হয়।

একটা তেলাপোকা দেখিলাম মরা। পনের মিনিট ধরিয়া দেখিলাম,

মনে ব্যথা পাইলাম, খুব নাম করিলাম—অনবরত করিলাম, স্নায়ুগুলি যখন খুব sensitive ও receptive (সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হইল)—পোকাটীর দিকে তাকাইলাম—আধ ঘণ্টার মধ্যে উহা সারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

আর-এক দিন একটা গুব্‌রে পোকা—আধখানা কিসে খাইয়া ফেলিয়াছে—তা'র দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে, এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে উহার হাত পা নড়িয়া উঠিল, অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিল, তারপর মরিয়া গেল। অন্য কোন কারণেও ঐরূপ হইয়া থাকিতে পারে জানি না; কিন্তু আমার মনে হইল ঐরূপ করায়ই ফল হইয়াছে, কারণ ঐরূপ করার আগে আমার বুদ্ধিমত উহা যে জীবনহীন তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

* * * * *

প্রশ্ন। মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মরার আগে মানুষ কি ছিল তাহা জানিতে হইবে। মানুষটা আসিল কেমন করিয়া—মানুষ কতগুলি idea'র (ভাবের) সমষ্টি—সেই idea (ভাব) বাহিরের কতকগুলি জিনিসে attached (যুক্ত) হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন। কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জায়া মানে পুরুষ যাহাতে জন্মে। পুরুষ জন্মে কি-করিয়া ?—যদি সে আবার জন্মিল তবে বাঁচিয়া থাকিল কি-করিয়া ?—তা'র মানেই হ'চ্ছে পুরুষ যে ভাবে অনুপ্রাণিত থাকে—জায়াতে যাইয়া তাহা মূর্ত্ত এবং প্রাণযুক্ত হয়। তাবপর প্রসূত হইলে যে ভাব প্রাণ পাইয়া জন্মিল অর্থাৎ সন্তান—ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তা'র পারিপার্শ্বিক—বিশেষতঃ মা—তাহাকে নানাপ্রকারে সংঘাত করিতে লাগিল। সংঘাত মানে impulse-এর (ধাক্কার) প্রেরণা। তাহার ফলে মস্তিষ্কে ক্রমে ক্রমে sensation-এর (বোধের) ভিতর দিয়া সেই impulseগুলি (ধাক্কা গুলি) recorded (লিপিবদ্ধ, অঙ্কিত) হইতে থাকিল। এমনি করিয়া ক্রমান্বয়ে শিশু শরীরে ও ভাবে পুষ্ট হইতে লাগিল। তাহা হইলেই যে ভাবগুলি পিতা হইতে প্রাণ পাইয়া মায়ের ভিতর মূর্ত্ত হইয়া জন্মিল, পারিপার্শ্বিকের ভিতর হইতে নানা রকমের সংঘাতের ভিতর দিয়া শিশু সেইগুলি সার্থক করিতে চলিল। এক-রকম ধরিতে গেলে তাই সার্থক করাই যেন মানুষের life-এর mission—জীবনের ব্রত।

আর, সংঘাতের ভিতর দিয়া নিজেকে সার্থক করিতে যাইয়া প্রতিকূলের সহিত দ্বন্দ্ব ও অনুকূলের আহরণের ভিতরেই মানুষের মস্তিষ্কে যেগুলি গভীরতর ভাবে অঙ্কিত রহিল, মৃত্যুর সময়ে তাহাদেরই ভিতর যেটা

গভীরতম তা'তে মুহ্যমান হওয়ায় অন্য ideaর linkগুলির সহিত (ভাবধারার সহিত) disconnected (বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন) হইয়া পড়িল—আর, তা'র ফলে পারিপার্শ্বিকের সংঘাত আর তা'র ভিতর ক্রিয়া করিতে পারিল না—সে তাহাতেই গত হইল—off হইল। যে ভাব লইয়া সে গত হইল মৃত্যুর পর তাহাই তাহার continuity (ক্রমাগতি)—অস্তিত্ব ও অবস্থার ধারাবাহিকতা—আর ইহা যেন ইথার সমুদ্রে ঐ ideaর tremor (ভাবের কম্পন) যেমন ঢেউ তুলিতে পারে এমনতরভাবে রহিয়া গেল। যাহাতে গত হইয়াছিল তাহা কিন্তু তাহার জগৎ হইতেই আহরণ। সে জন্মিবে সেইখানেই কোন মানুষে ঐ সম-জাতীয় ভাবতরঙ্গে যে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া উপগত হইয়াছে—যেমন Television-এর wireless photo-transmission (বৈজ্ঞানিকের দূরদর্শনের তারহীন আলোক-সঞ্চালনবৎ)।

* * * * *

প্রশ্ন। কেহ-কেহ যে বলেন মৃত্যুর পর মানুষ ক্রমশঃ উর্দ্ধ জগতে উঠিতে থাকে তাহাকে আর মর্ত্ত্যে আসিতে হয় না—একথা কি সত্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, মূর্ত্ত being (জীব) হইয়া না ফিরিলে সে further proceed করিতে (আর অগ্রসর হইতে) পারে না—কারণ, তাহা idea-র continuity (ভাবের ধারাবাহিকতা)। যতদিন পর্য্যন্ত আবার সে না জন্মিবে ততদিন উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না। স্বপ্নে মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তবে নূতন বস্তুর সন্ধান পায়। যতক্ষণ সে স্বপ্ন চলে, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানর পারিপার্শ্বিক লইয়া যাহা—তাহাই চলিতে থাকে। যতক্ষণ অন্য অবস্থা তাহাকে না ব্যাহত করিতেছে ততক্ষণ আর অন্যরকমের অবস্থায় আসা যায় না,—তাই তাহা ভাঙ্গিলে তবে অন্যবস্তুর সংঘাতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং অবস্থান্তরে proceed করিতে পারে (অগ্রসর হইতে পারে)।

জানার ক্রমান্তর অনুযায়ীই জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয় এবং পরবর্ত্তীর জানাতেই পূর্ব্ববর্ত্তীর সম্যক্ উপলব্ধি হয়, আর সেই-হিসাবেই মানুষের জানার জগতেরও বিস্তৃতি লাভ ঘটে। যেমন solid (কঠিন), liquid (তরল), gaseous (বায়বীয়), atomic (আণবিক) এবং electronic (ইলেক্ট্রনিক) পদার্থ আছে। Solid-এর (কঠিন বস্তুর) প্রকৃত জ্ঞান তখন জন্মে যখন liquidকে (তরল পদার্থকে) আমরা জানি। সেইরূপ gaseous (বায়বীয়) জিনিস জানিলেই solid ও liquidকে (কঠিন ও তরল পদার্থকে) প্রকৃত জানা যায়।

তেমনি, সৃষ্টি ও জগৎকে জানারও নানাজাতীয় স্তর আছে, নির্ব্বিকল্প

সমাধি আছে, বৈষ্ণবেরা বলেন 'পরম ধাম', বৌদ্ধেরা বলেন 'নির্ব্বাণ' এইরূপ নানাজাতীয় স্তর আছে।

আমাদের পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কে psychical (মানসিক) যেমনতর arrangement (বিন্যাস) হয়—সেটা যেমনতর তরঙ্গকে ধরিতে পারে তেমনতর being (জীব) physicalised হয় (মূর্ত্ত হয়)। তাই যে জানা যত অসাধারণ সে জানায় গত হইয়া জন্মও তেমনি কচিৎ কারণ, পারিপার্শ্বিকে তজ্জাতীয় ধারণাই বিরল—এই আমার মনে হয়।

* * * * *

প্রশ্ন। 'মুক্তি' মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মুক্তি মানে annihilation (আত্মার নাশ) নয়কো,—বৃত্তিভেদ।—আর যা'র বা যাঁ'দেরই যতটুকু এই বৃত্তিভেদ হইয়াছে তিনি বা তাঁ'রাই ততটুকু পারিপার্শ্বিকের সেবার অধিকারী হ'বেন।—আর, এই ভেদ-হইয়াছে-এমনতর বৃত্তির সংস্পর্শে পারিপার্শ্বিক যতই অনুরক্ত হয়,—ততই পারিপার্শ্বিকের বৃত্তিগুলি সুবিন্যস্ত হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে,—তাই, তাঁ'দের কাছে আত্মসমর্পণ মানুষকে মহীয়ান্, গরীয়ান্, জ্ঞানবান্ ও প্রেমিক করিয়া তোলে! তাই, মুক্তির তাৎপর্য্যই এইখানে—অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক আমাদিগকে তাঁ'র মত ক'রে বিশ্লিষ্ট ও বিভক্ত কর্‌তে পারে না। প্রত্যেকের হইয়াও তাঁ'র বৈশিষ্ট্য অটুট থাকে, তাই সুতোর চারিদিকে যেমন মিছরির crystal-গুলি দানা বাঁধে, পারিপার্শ্বিকও তাঁ'দের চারদিকে অমনতর একটা দানা বাঁধিয়া থাকে—as if সব নিয়ে যেন একটা ব্যক্তি। তাই, তাঁ'তে মানুষের কাছে ভগবত্তার উদ্বোধন হয়—তাঁ'কে ভগবান্ বলে। এইজন্যই বোধ হয় বৈষ্ণবেরা বলেন ভগবান্ই একমাত্র পুরুষ, তা'-ছাড়া আর-সব প্রকৃতি।

প্রশ্ন। তবে ত' মানুষই ভগবান্! মানুষ কি কখনো ভগবান্ হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা-যাহা লইয়া ভগবত্তা তাহাই ভগবান-ত্ব—তা' যেখানেই থাক্—রূপেই থাক্ আর অরূপেই থাক্,—সে সাকারই হোক্ আর নিরাকারই হোক্! মিষ্টত্ব যদি চিনিকে নির্দ্দেশ করে,—যাহাই মিষ্টি তাহাতে চিনি আছে—সে যাই হোক্!

* * * * *

প্রশ্ন। স্বরাজ সম্বন্ধে আপনার idea কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বরাজ বলিতে ইংরাজ-বিদ্বেষ বুঝি না। স্বরাজ মানে এই বুঝি—আমার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে যা' যা' করা

উচিত তা' যদি করিতে পারি তাহা হইলে সত্য স্বরাজ লাভ হয়। ভিতর এবং বাহির এই উভয় দিকেই যখন 'স্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তখনই প্রকৃত স্বরাজ পাইতে পারি। ইংরাজ যদি তাহাতে শত্রু হয়—সে আপনি চলিয়া যাইবে, মিত্র হইলে সে আমাদের সঙ্গে amalgamated (মিশ্রিত, মিলিত) হইয়া পড়িবে।

ধরুন, কাহারো শরীরে যদি Tuberculosis-এর (যক্ষ্মারোগের) বীজাণু থাকে, ডাক্তারেরা চেষ্টা করেন যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য ভাল হয়,—সেজন্য ভাল খাওয়া দাওয়া, fresh air (মুক্ত বায়ু) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। যখন রোগী সারিয়া ওঠে—তখন বলে he is out of danger (সে বিপন্মুক্ত); সেইরূপ, আমাদিগকেও আগে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইবে,—সেইজন্য কর্ম্ম-শক্তিকে উদ্বর্দ্ধিত কবিতে আর বুদ্ধিকে উত্তেজিত করিতে—ব্যাঙ্ক, কারখানা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

প্রশ্ন। কিন্তু ইংরাজের স্বার্থে যখন আঘাত লাগিবে তখন ত' সে এই সকল প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিবে—যেমন করিয়া তাহারা আমাদের বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিয়াছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নষ্ট যাহা হইয়াছে—আমাদের দোষে হইয়াছে,—দোষ যদি আমাদেব না থাকিত কেহ নষ্ট করিতে পারিত না।

প্রশ্ন। ইংরাজের গোলাগুলি, কামান বন্দুক, এরোপ্লেন আছে—অনায়াসে তাহারা আমাদের আয়োজন নষ্ট করিতে পারে। আমরা যদি কামান বন্দুক তৈরী করিতে যাই, ইংরাজ বাধা দিবে, উপায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' নাকি জীবজগতের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তরায়—এমনতর কিছু যদি আমরা করি, তবে ত' ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেওয়াই উচিত;—কারণ এ-কথা ত' ঠিক আমরা সবাই মরতে নারাজ। তেমনতর মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে পারি যা' নাকি অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যে'তে পারে। আমরা যদি এমনতর কিছু আবিষ্কার করতে পারি যা' মানুষের অস্তিত্ব ও উন্নয়নকে আরো অক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে তা' ত' সবারই স্বার্থ—সবাই চায়! তা' ভেঙ্গে চুরমার কেউ করবে না; আর কেউ যদি চুরমার করে তা'র বাঁচা আর বেঁচে থাকবে না।

অসুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে কামান বন্দুক নিজেরই মৃত্যুর কারণ হয়,—যাহা খাইলে হজম হয় না তাহা যদি খাই অথবা মত্ত পালোয়ানের মত যদি লোহা ভাঁজিতে যাই—শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইবে;—আগে চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্প এবং সমাজ।

নারীর পথে

সৃষ্টির রহস্য পুরুষ ও নারী। এতদিন বুঝিতে পারি নাই, জানিতে পারি নাই নর-নারীর মিলনের সার্থকতা কোথায়—তাহাদের পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কি, তাহারা কেমন করিয়া চলিবে? সৃষ্টির আদি যুগ হইতে পুরুষ ও নারীর সমস্যা লইয়া কত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কেহ বলিল—নারী নরকের দ্বার, চাহিল নারীকে জীবন-পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতে; আবার কেহ বা ছুটিল নারীর দেহের উপভোগে মরণের অতল পাথারে—! আজ আদর্শ-চ্যুত দিক্‌ভ্রান্ত সমাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছেন—নারীই জন্ম ও জাতির নিয়ন্ত্রী, মানবের মুক্তি-সাধনার পথে নারীই তাহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী—অমৃতপথের সহযাত্রী। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত "নারীর পথে" গ্রন্থখানায় নর-নারীর সকল সমস্যা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। গার্হস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য কিসে, ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, বিবাহের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ, সমাজ-জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, বিবাহে পাত্রের বর্ণ, বংশ, প্রতিষ্ঠা ও বয়স বিচারের আবশ্যকতা, অসবর্ণ অনুলোম বিবাহের উৎকৃষ্টতা এবং প্রয়োজনীয়তা, বিবাহে পুরুষ ও নারীর স্ব স্ব কর্ত্তব্য, হীনচরিত্র, বিকৃতমস্তিষ্ক, ক্ষীণায়ু সন্তান জন্মিবার কারণ, প্রতিভাবান ও দীর্ঘায়ু সন্তানলাভের উপায়, বিধবা বিবাহ,—স্বামী, ভর্ত্তা, বর, বধূ, স্ত্রী, পত্নী, জায়া—প্রভৃতি কথার তাৎপর্য্য, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা হয় কেন, পতিব্রতা ও সতীতে পার্থক্য কোথায়,—পারিবারিক বিশৃঙ্খলা কেন হয়, তাহা নিবারণের উপায় কি—স্ত্রীকে আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায় কি ভাবে,—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—কথার মানে কি, লজ্জা কি—নারী অসতী হয় কেন—পতিত বলিলে কি বুঝায়—পতিতা হইলে উদ্ধারের উপায় কি—প্রেম কি, প্রেমের লক্ষণ কি কি—প্রাপ্তি মানে কি—'ভগবৎ-প্রাপ্তিই' বা কাহাকে বলে—সমাজ, সংহিতা, বিবাহ, সুপ্রজনন প্রভৃতি নর-নারীর মিলন সম্বন্ধীয় যাবতীয় সমস্যার অপূর্ব্ব মীমাংসা এই "নারীর পথে" রহিয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে আলোচনা গুলির কিয়দংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা গেল।ঃ—

প্রশ্ন। "ব্রহ্মচর্য্য" বল্‌তে কি বুঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন-করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধির দিকে—elevation-এর দিকে—অগ্রসর হয়, তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক-কথায়,—তেমনতর আচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য।

আর, এই চিন্তাপরায়ণ হইলে মন একমুখী হইতে থাকে। অতএব

স্ত্রী-চিন্তা বা কামচিন্তা হইতে মন স্বভাবতঃই নিবৃত্ত থাকে,—তাই ব্রহ্মচর্য্যের secondary effect (গৌণফল) শুক্রধারণ।—আর এই ব্রহ্মচর্য্য হইতেই আমাদের জ্ঞান, বল ও বীর্য্যলাভ হইয়া থাকে,—তাই, 'ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।' বীর্য্যলাভ—বল বা শক্তিলাভ, শুধু শুক্রধারণই এর মুখ্য অর্থ নয়কো। শুক্ররোধ করিয়া সঙ্কীর্ণমনা হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না—আর তাহাতে বল-লাভও হয় না। ব্রহ্মচর্য্য মানে 'ব্রহ্মে চরণ করা' আর ব্রহ্ম কথাটা আসিয়াছে বৃংহ-ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়া) হইতে।

প্রশ্ন। বিবাহিত জীবনে occasional (মাঝে মাঝে) স্ত্রী-গ্রহণ সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা সম্ভব কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর প্রতি যদি মন নিয়ত কামাসক্ত না থাকে এবং সে (স্ত্রী) যদি পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যের সহধর্ম্মিণী হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাই হয়। আর স্ত্রী-সহবাস হইতে কেহ যদি বিমুখ থাকে আর সে যদি উচ্চচিন্তাপরায়ণ, উচ্চকর্ম্মনিরত না হয়, তবে তা'র পরিণতি subman হওয়া—মনুষ্যত্বহীন ক্লীব হওয়া। অতএব, উচ্চচিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তা বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণতার বিক্ষেপ না আনে এমনতর স্ত্রীসহবাসে বীর্য্যহানি হয় না অর্থাৎ বলের হানি হয় না।

* * * * *

প্রশ্ন। তবে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব যে ব'লেছেন—'কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাৎ—তফাৎ' তা'র মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামিনী যেখানে কামেরই কেন্দ্র হয়, মানুষ সেখানে মূঢ় হইয়া উঠে ; উন্নতিতে সার্থক হওয়ার –বৃদ্ধি পাওয়ার আকুতি লাঞ্ছিত হইয়া অবসন্ন হইয়া দাঁড়ায় ;—ফলে, অজ্ঞানতায় তা'র জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া ওঠে,—অবশেষে মৃত্যুতে তা'র শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হইয়া যায়, তাই গীতায় আছে—

'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥'

তাই, যে বুদ্ধি স্ত্রীতে কামলোলুপ করিয়া তোলে, তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্যই তাঁ'র (ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের) ঐ সাবধান বাণী—আমার এই মনে হয়।

আর, অর্থ যেখানে ভ্রান্ত স্বার্থ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিককে বঞ্চিত করিয়া নিজেকে সেবামূঢ় অথচ প্রতিপত্তি-প্রয়াসী করিয়া তোলে, সেই অর্থ হইতে দূরে থাকিবার জন্য ঐ সাবধান বাণী।

প্রশ্ন। নারী কি ? নারীর নারীত্ব কি-দিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারী সে-ই বা তা-ই যাহা ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায়। এই ধারণ ও পুষ্ট করানোতেই নারীর নারীত্ব।

প্রশ্ন। তা'র মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রকৃতিতে দেখ্‌তে পাই, এমনতর কোনো বীজ নাই যাহা আশ্রয় না পাইয়া without nourishment, without nutrition evolve করিয়াছে (অর্থাৎ পুষ্টির অভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে)। আর আমরা আশ্রয় বা ধারণ, nutrition এবং nourishment দেওয়ার tendency (প্রকৃতি) কেবল নারীতেই মুখর হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই; তাই, নারীকে মাটীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কারণ, মাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ধারণ করা, পোষণ দেওয়া এবং ফুটাইয়া তোলা। তাই, যাহা অর্থাৎ যে সত্তার বৈশিষ্ট্য ঐ ধারণ করিয়া বৃদ্ধি করানো, তাহাকে নারী বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। আর শুনিয়াছি, নারী কথাটীও নিষ্পন্ন হইয়াছে নারি-ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়ানো) হইতে।

প্রশ্ন। পুরুষ কথার মানে কি? পুরুষের পুরুষত্বই বা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ ব'লতে এক-কথায় তা'কেই বুঝায় যে বা যা' নাকি পূরণ-স্বভাব-সম্পন্ন—অর্থাৎ সে-ই বা তা-ই পুরুষ যাহা পরের অভাব পূরণ করে। অপরকে fulfil করা—সার্থক করা, successful করা, elevate উন্নত ও কৃতার্থ করা-ই পুরুষের পুরুষত্ব।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের পার্থক্য তা'-হ'লে—

শ্রীশ্রীঠাকুর। একটী বৃদ্ধি পাওয়ায়, অপরটী বৃদ্ধি পায়; একটা যেন মাটী আর একটা বীজ,—একটা negative prominent আর একটা positive prominent. পুরুষ তাই তা'র opposite equal-এর কাছে —বিপরীত অথচ সমজাতীয়ের কাছে—পুরুষ এবং নারীও তা'র opposite equal-এর কাছে নারী। তা'-হ'লে যে opposite sex-এর (নারীর) সংসর্গে পুরুষের পুরুষত্ব বা fulfil করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নারী সার্থক সেখানে।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের পরস্পরের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এর কারণ কি? উভয়ের প্রতি উভয়ের কি-যেন চাওয়া! এ চাওয়ার ফলে ত' দেখ্‌তে পাই মানুষ বিধ্বস্ত। ইহার সার্থকতা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ চায় নারীতে বিশ্রাম ক'রতে—নারী চায় পুরুষকে স্বস্থ কর্‌তে, সুস্থ কর্‌তে, বৃদ্ধি পাওয়াতে।—আর যেখানে নারী তা'র এই আদিম স্বভাবকে ব্যাহত ক'রেছে, সেখানেই সে তা'র ব্যর্থতার আলিঙ্গনে বিধ্বস্ত, বিব্রত, বিকৃত হ'য়েছে—আর নারীর নারীত্ব এতেই সার্থক হয়,

আর তা'র পোষণ, তা'র বৃদ্ধি, তা'র চিন্তায় পুরুষকে এমনতর ভাবে nourished (পুষ্ট) ক'রেই, বা এমনতর ভাবে উদ্দাম ক'রেই তা'র নারীত্বের সার্থকতা।—আর পুরুষ নারীর কাছে এমন পে'য়ে দুনিয়াটাকে এমন-ক'রে সেবা ক'রে জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে তা'র নারীর সম্মুখীন হ'য়ে তা'র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়—ইহাই পুরুষের সার্থকতা, আর এমনই ক'রে সে নারীকে পূরণ করে সর্ব্বতোভাবে; কারণ, নারী চায় পুরুষকে প্রাণের মুকুট মাথায় পরিয়ে দে'খ্‌তে—এতেই নারীর বৃদ্ধি বা পুষ্টি।

প্রশ্ন। পুরুষ ও নারী যদি সমান বা এক-ধর্ম্মী না-ই হয়, তবে পুরুষ ও নারীর অধিকার কখনো সমান হইতে পারে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ ও নারীর অধিকার তা'দের এইরূপ স্বভাব হ'তেই পরমপিতা নির্দ্ধারিত ক'রে দিয়েছেন। যেমন ধরুন, ছেলে দুধ খে'য়ে খুসী আর মা মাই মুখে ঠেলে দিয়ে খাইয়েই খুসী,—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খুব খা'চ্ছে—খুব পুষ্টি হ'চ্ছে—আর তা'তেই তা'র তৃপ্তি;—আর এই তৃপ্তিস্পর্শে মুগ্ধ সন্তান তা'র জগতের চারিদিকে যা'-কিছু সুন্দর দেখে, কুড়িয়ে এনে মায়ের কাছে হাজির করে;—আর মায়ের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব নেত্রে ক্ষণিকের জন্য স্থির হ'য়ে তাকায় শুন্‌তে—মা কি বলে—কেমন বাহবা দেয়;—আর মা'র একটু নয়ন-ভঙ্গীর বাহবাতেই ছেলে হেসে নেচে কুঁদে পাগল হ'য়ে আবার বেরুল কুড়ুতে—আর কি সুন্দর আছে, কিসে মা বল্‌বে—আহা কি ধন্যি ছেলে!

প্রশ্ন। এই যদি নারীর বৈশিষ্ট্য হয়—তবে নারীর স্বাধীনতা বা নারীর মুক্তি বল্‌তে কি বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর স্বাধীনতা তা'র বৈশিষ্ট্যে—অর্থাৎ, তা'র এই বৈশিষ্ট্য যেখানে আলুলায়িত হ'য়ে উঠে, মুখর হ'য়ে উঠে—প্রেরণা পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠে;—আর তা'র মুক্তি ইহারই সার্থকতায়।

প্রশ্ন। নারী পুরুষকে, আর পুরুষ নারীকে ঠিক-ঠিক চিন্‌তে পারে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বভাবতঃ।—কারণ, একজনের চাওয়া স্বতঃই আর-একজনে সার্থক হয়—এ' কথা আরো ব'লেছি। নারী, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই প্রসব করে।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের normal relation কি—এই সম্বন্ধের পরিণতি কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নরের বৃত্তিগুলি যে-নারীতে পরিপোষিত, পরিবর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ যে-নারী যে-নরের বৃত্তিগুলি লইয়া সন্তুষ্ট, পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনে যত্নবতী, সেই নর-নারীর মিলনই শুভ।—আর নারী সেই পুরুষকে তেমনতর ভাবে

সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহার বংশ বিস্তার করে—তাহাতেই তাহার পরিণতি। তাই, নারীর অন্তর্নিহিত ঝোঁক মাতৃত্বে (পরিমিতত্বে—figurisation-এ বা মূর্ত্ত করাতে),—বৃদ্ধি পাওয়ানোর দিকে ;—তা'র প্রকৃতিই তাই।

প্রশ্ন। প্রজননই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের একমাত্র প্রয়োজন ? না নর-নারীর এই মিলনের আর-কোনো উদ্দেশ্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ—আছে। যখন নারী পুরুষের স্ত্রী হয়, তখন সে চায় তা'র পুরুষকে তাই দেখ্‌তে—সে চায় তা'র পুরুষকে তাই কর্‌তে যা'তে তা'র পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিশীল হয় বা থাকে,—আর তা'র পুরুষের বৃদ্ধিশীলতার ওপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে নারীর উৎকর্ষ।

প্রশ্ন। কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মাটী তা'র প্রাপ্ত বীজকে পুষ্ট কর্‌তে গিয়ে যেমন গাছ বা তা'র ফলের refuseগুলি (আবর্জ্জনাগুলি) absorb ক'রে নিজের capacity of nourishment-কে (বর্দ্ধিত কর্‌বার শক্তিকে) excite ক'রে তোলে,—তা'র ফলে বীজকে এমনতর nourishment—এমনতর পুষ্টি দেয় যা'তে নাকি স্বস্থ, সুস্থ, বর্দ্ধনক্ষম গাছের চারা জন্মে,—আর মাটীর প্রকৃতিই এই ;—তাই তেমনি, জীব-জগতে নারী।

* * * * *

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর attachment (আসক্তি), নারী-পুরুষের পরস্পর এই আসক্তির ভিতর কোন পার্থক্য আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর attachment (আসক্তি) স্বামীতে concentrated (কেন্দ্রীভূত),—তাই, সে তা'র স্বামীর শুশ্রূষায় সর্ব্বতোভাবে স্বামীর ভিতরে উদ্দীপিত হইয়া জগৎকে উপভোগ করিতে চায়। পুরুষ আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকিয়া স্ত্রীতে nourished (পুষ্ট) হইয়া তাহার জগৎকে স্ত্রীর নিকট উপঢৌকন দিতে চায়। আর ইহাতে উভয়ে উভয়ের নিকট যেমনতর হয় তেমনি হয়,—তাই তা'দের সম্বন্ধ গুরুশিষ্য-তুল্য।

প্রশ্ন। এই যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ হয়, তবে ত' স্ত্রীর চলা, বলা, করা ইত্যাদি যা-কিছু স্বামীকে লক্ষ্য করিয়াই—স্বামীর প্রয়োজনেই হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যদি হয় তবে অপর male-এর (পুরুষের) সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃত্তিই থাকে না—স্বামীর প্রয়োজনে ছাড়া। অন্য পুরুষের সঙ্গ আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে যাবে। যদি দেখা যায় অন্য পুরুষের সংসর্গে যেতে ভাল লাগে—sexually (কামভাবে) না হইলেও—অথচ স্বামীর প্রয়োজনে নয়, সেটা হ'চ্ছে চরিত্রগত লক্ষণ যে সে তার স্বামীর সর্ব্ববৃত্ত্যনুসারিণী নয়।

পুরুষেরও তাই—তুনিয়াটা ঘোরে কিন্তু আদর্শের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য নিয়ে,—আর তা'হ'লেই হয় কি, ঝগড়া কচকচি মারামারি লুফালুফি সব চুকে গেল।

প্রশ্ন। স্বামীর আদর্শের সঙ্গে স্ত্রীর কি-রকম সম্বন্ধ থাকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শের সঙ্গে স্বামীর যেরূপ সম্বন্ধ তা'র স্ত্রীরও তাই, তবে তা'র বৈশিষ্ট্যে যা-কিছু প্রভেদ। অর্থাৎ স্বামীর আসক্তি যেমন হইবে আদর্শের ইচ্ছা বা বৃত্তিগুলি সার্থক করার—তা'র জীবন দিয়ে, তেমনি স্ত্রীর ঝোঁক থাকবে always স্বামীর complement বা পরিপূরক হওয়া;—তা'র মানেই আদর্শে উভয়ে মিলিয়া সার্থক হওয়া—তাঁ'র ইচ্ছাকে fulfil করিয়া; 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ মোদের জীবন-মাঝে'—এমনতর।

প্রশ্ন। আদর্শ হইতে স্বামী যদি বিচ্যুত হয়, তবে কি হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'পতিত' মানেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া, আর বিবাহে cement-ই আদর্শ। আর্য্যদের বিবাহের মন্ত্রেই আছে—'বৃহস্পতি তোমাকে আমাতে যুক্ত করিয়া দিউন। আর এই বৃহস্পতিই হ'চ্ছেন ভগবান্, গুরু বা আদর্শ।

এই সিমেণ্ট যদি কোনপ্রকারে ধ্বংস হইয়া যায় তা'দের অন্তর হইতে, তবে তুইটা আলাদা জিনিস স্বভাবতঃই যে আলাদা হইয়া যাইবে—তা'র আর কথা কি ? যে-স্থলে স্বামীর আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে সেখানে স্ত্রীর—আদর্শে যুক্ত থাকিয়া স্বামীর উন্নয়নের সংস্থান করা-ই শ্রেয়ঃ। তা'-ও যদি না হয় তবে স্ত্রীর আদর্শ-মুখর হওয়াই তা'র ধর্ম্মকে অর্থাৎ being and becoming-কে (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে) স্বস্থ রাখিতে পারে।

প্রশ্ন। পত্নীর যদি স্বামীর আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'-হ'লে ত' সাধারণতঃই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি টান থাকেই না। সে-স্থলে তা'-হ'তে যতদূর সম্ভব—অন্ততঃ আদর্শ-বিষয়ে তফাৎ থাকা-ই উচিত। আর, যদি সে আদর্শের বৃত্তিগুলি তা'র জীবনে fulfil (সার্থক) করার বাধা জন্মায়, তবে সে-স্থলে তা'-হ'তে দূরে সরিয়া থাকা-ই সমীচীন—সে-বিষয়ে কোন-প্রকার complementary (পরিপূরক) সাহায্যের আশা করাই উচিত নয়। ইহাতে হয়ত difference (অমিল) আরও বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু ইহার extreme limit-এ (চরম সীমায়) যাইয়া সুফলও ফলিতে পারে—যদিও শাস্ত্রে এমন স্থলে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগেরই উপদেশ দেওয়া আছে। আর এটা সত্যই,—কারণ, তাহা হইলে স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীত্ব-ই

সেস্থলে ঘুচিয়া যায়;—সে আর তা'র নারীও থাকে না, ভার্য্যাও থাকে না, পত্নীও থাকে না—শুধু কামক্ষুধা-পরিতৃপ্তির যন্ত্রমাত্র।

*　　*　　*　　*　　*

প্রশ্ন। মেয়েদের বিয়ে হ'লে পর শ্বশুরগৃহে গিয়া কি করা উচিত?—কি attitude-এ (ভাবে) থাকা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-মেয়ের সর্ব্বতোভাবে স্বামীর উদ্বর্দ্ধনই লক্ষ্য,—স্বামীকে চায় না যে তা'র ভোগের ক্রীড়নক কর্‌তে,—স্বামীকে তা'র আদর্শে পরিপূরিত করে' তোলা-ই যা'র জীবনের সার্থকতা, তা'র প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্যই—শ্বশুর, শাশুড়ী কিংবা তৎস্থানীয় যাহারা—ভাসুর ননদ যা'রা নাকি তা'র স্বামীর পোষণীয় পারিপার্শ্বিক, সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সেবা করা—যা'তে তা'রা হৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়। সে সংসারে নিজের সেবাদ্বারা সম্রাজ্ঞীর মত হ'য়ে দাঁড়ায়। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা মানেই হ'ল—তা'র স্বামীর basis of existence-এর (জীবনের ভিত্তির) সেবা। আর যে-স্ত্রী তা'-হ'তে বিমুখ, খুব দেখা যায় তা'রা কখনও শত ভালবাসার ধাঁজে দাঁড়িয়েও স্বামীকে পুষ্ট, তুষ্ট ও উদ্বর্দ্ধিত করিতে পারে না।—তাই, তা'র কাছে স্বামীর প্রতিষ্ঠাও এক-কথায় আকাশ-কুসুম। এ কথা ঠিক জান্‌বেন—স্বামীর শুভানুধ্যায়ী কোন স্ত্রী তা'র শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাবিমুখ হ'তেই পারে না—আর তা' জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাত-সারেই হোক্। এই সেবা মানে কিন্তু আদর্শকে sacrifice করা (বলি দেওয়া) নয়, বরং environment হইতে (চারিধার হইতে) আদর্শের interest-এর (স্বার্থের) পরিপূরণ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তা' ত' বুঝ্‌লাম। তা-হ'লে বাপ-মায়ের সেবা-শুশ্রূষায় যদি স্বামীর অমত থাকে তবেও কি স্ত্রীর তা'দের সেবা করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই। পিতামাতা original (আদিম) আদর্শ। তা'-হ'তেই তা'র যা'-কিছু উদ্বর্দ্ধন বা পুষ্টি,—তা'র আরম্ভ—এমন-কি prenatally imparted (জন্মের পূর্ব্ব হইতে সঞ্চারিত)। তাই, পিতামাতা প্রত্যেক মানুষেরই অব্যর্থ মঙ্গলকামী—অবশ্য এ'তে ভ্রান্তি থাকিতে পারে। তাই, স্বামীর যদি তা'র পিতামাতার প্রতি অনুরক্তি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সে তাহা-হইতে—যে কোনো-প্রকারে হউক—বিচ্যুত বা পতিত হইয়াছে; আর এ পতনের অনুসরণ করিয়া স্বামীকে আরো পতিত করা নারীর বৈশিষ্ট্যের ঘোর অবমাননা ছাড়া আর কি? তাই, স্বামীর অনুমতি বা ইচ্ছা ছাড়াও, যাহা করিলে স্বামীর উন্নতি অবাধ হইবে, অপঘাত করিবে না—মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ, তাহা স্ত্রীর অবশ্য করণীয়;—

আর ইহা না করিলে সে-স্ত্রী—যত ভালই হউক্—স্বামীর উন্নতিকে উদ্বেগ-সঙ্কুল ও অবসন্ন করিবে সন্দেহ নাই। তাই, স্বামীর পিতামাতা ভাই-ভগিনী ইত্যাদির সেবা-শুশ্রূষা করিয়া স্বামীর জন্য যতদূর করা সম্ভব তাই করা বরং উচিত।

আরো, পিতামাতা ভাই-ভগিনী ইত্যাদির সেবা করা পুরুষেরই কর্ত্তব্য। তাই, ইহা করিলে এই কর্ত্তব্য বা সেবা উল্লঙ্ঘন করার অপরাধ হইতে স্বামীকে নিষ্কৃতি দেওয়াই হইবে।

আরো কথা, সে যদি তা'র শ্বশুর-শাশুড়ীতে সেবাপরায়ণা না হয়, তা'রা (স্বামী-স্ত্রী) যা'র শ্বশুর শাশুড়ী তা-হ'তেও তাহারা সেবা ও শুশ্রূষা পাওয়ায় প্রায়শঃ বঞ্চিত হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে, ভ্রান্ত স্বার্থ আসিয়া পরিবারের প্রত্যেককে অধিকার করিয়া বসিবে,—দুর্দ্দশা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে—সুনিশ্চয়! অবশ্য এ সবই করিতে হইবে স্বামীতে সম্যক্ থাকিয়া—তাহারই জন্য। সুকৌশলে এবং যথাযথ ভাবে সেবায় সংসারে সম্রাজ্ঞী হওয়াই স্ত্রীর কাম্য ও আদর্শ।

* * * * *

প্রশ্ন। অনেক-সময়ে বড় লোকের অযোগ্য ও অপোগণ্ড ছেলে জন্মায় অথচ অনেক নিকৃষ্ট লোকেরই হয়ত এক genius (প্রতিভাবান্) ছেলে জন্মাইতেও দেখা যায়। এরূপ কি-ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যত বড়ই হোক্—স্ত্রী যদি তাহাকে কুৎসিৎ ব্যবহার ভাব ভাষা দিয়া রঞ্জিত করে, তা'র সন্তান তেমনতরই হইবে। তাই, হয়ত মহাবীরের সন্তান এক মহাভীরু জন্মগ্রহণ করে। মহাজ্ঞানীর সন্তান একটা মূঢ় অপোগণ্ড জন্মায়।

তেমনি, নিকৃষ্ট পুরুষের স্ত্রী যদি এমনতর হয় যা'র সাহচর্য্যে সে soothed, nourished and enlightened হয় অর্থাৎ বিনোদিত, পুষ্ট, ও উদ্ভাসিত হয়, তবে সে স্ত্রীর ভাগ্যে কুৎসিৎ পুরুষ হইতেও সুসন্তান লাভ ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন। তবে কি এই জন্যই সর্ব্বত্র শাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই নারী সালঙ্কারা সুপরিচ্ছদ-পরিহিতা সুগন্ধানুলেপিতা থাকিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের নারীর প্রতি, নারীর পুরুষের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যেখানে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, সেটা যদি তৃপ্তিপ্রদ, উৎসাহপ্রদ ও উন্নতিপ্রদ হয়,—তা'-হ'লে যে আসক্ত সে তা'-হ'তে এমনতর প্রেরণা পায় যা'তে নাকি অবসাদ তা'কে আগ্‌লে ধর্‌তে পারে না, আর active ও energetic হ'য়ে উঠে—কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রবণতা উৎকর্ষে অনুধাবিত হয়; তাই বোধ হয় শাস্ত্রের এমনতর ব্যবস্থা। আর, এইরকম

নৈসর্গিক টান আছে ব'লেই পুরুষের স্বাভাবিক ভাব হওয়া উচিত—তা'র আদর্শে গভীরভাবে অনুরক্ত হ'য়ে থাকা; আর, নারী যদি তা'র হাবভাব, চালচলন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদির দ্বারা তা'কে আরও উদ্দীপিত ক'রে তোলে—তা'হ'লে তা'র হয়ত ঐ অনুরক্তি অধিকতর কর্ম্মপ্রবণ হ'তে পারে,—এমন-কি তা'র being-কেও অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সত্তাকেও হয়ত অমনতরভাবে উন্মুখ ক'রে দিতে পারে।

প্রশ্ন। সুপ্রজননের দায়িত্ব কার?—পুরুষের, না নারীর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর। নারী তা'র সাহচর্য্যে পুরুষকে যেমনতরভাবে উদ্বর্দ্ধন করে পুরুষের সেই মনই স্ত্রীতে গমন করে এবং সন্তানরূপে মূর্ত্ত হয়*—তাই স্ত্রীকে জায়া বলে।

প্রশ্ন। অনেক সময়ে দেখা যায় বড় বড genius-দের (প্রতিভাবান লোকদের) সন্তান হয় না বা কুসন্তান হয়,—ইহার কারণ কি? বংশহানি কি কি কারণে ঘটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বড়লোক কখনও-কখনও এমন over-enlightened হয়—এত অত্যুদ্ভাসিত হয়,—এত above (উচ্চ) হয় যে স্ত্রী তা'কে reach কর্‌তে পারে না—তা'র নাগাল পায় না বা হাবভাব দ্বারা তা'কে রঞ্জিত কর্‌তে পারে না। এমন স্থলে প্রায়ই অল্প সন্তান বা নিঃসন্তান হয়।

আবার, স্ত্রীর এমনতর subnormal পুরুষও হইতে পারে যে স্ত্রীর impulse তা'কে তুল্‌তে পারে না। Normal deficiency (নৈসর্গিক পঙ্গুতা) যা' নাকি তা'র স্ত্রীর পক্ষে unhandle-able—যেমন ক্লীবত্ব,—সেখানেও সন্তান হয় না। অবশ্য, স্ত্রীর দোষেও বংশহানি ঘটিতে পারে; যেমন ধরুন্, স্ত্রী যদি তা'র স্বামীর প্রতি ক্রমাগত কদর্য্য ব্যবহারদ্বারা স্বামীর মনে এমন অভিঘাত জন্মায় যা'র দরুণ সে সহজ পুরুষ থাকা সত্ত্বেও ক্লীবত্বের অধিকারী হয়। এ-ছাড়া শারীরিক পঙ্গুতাও কারণ।

* কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিতেছিলেন—"যদি কোথাও unsolicited পুরুষ নারীর কাছে যায় এবং উপগত হয়, তবে বুঝ্‌তে হ'বে সেখানে being and becoming ক্ষুন্ন হ'য়েছে,—মরণ-ধর্ম্ম রাজত্ব কর্‌ছে। যদি কোথা'ও এই সঙ্গমের ফলে সন্তানের জন্ম হয় তবে সে সন্তান মূঢ় ও nervous না হ'য়েই পারে না। কিন্তু নারী যদি স্তুতির ভিতর দিয়ে তা'র পুরুষকে তা'তে আনত কর্‌তে পারে, সেখানে যে সন্তানের জন্ম হয় সে ভাল না হ'য়েই পারে না। সন্তানের মাতার স্তুতি ও admiration-এর দরুণ তা'র পিতার যে particular ভাব তা'র মাতার গর্ভে মূর্ত্ত হ'য়ে সন্তানরূপ ধারণ ক'রেছে, সে-সন্তানের ভিতর দিয়ে ঐ particular ভাব আরও developed হ'বে। স্ত্রীর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর কর্‌ছে ভাল ছেলে মন্দ ছেলে জন্ম হওয়ার secret (রহস্য)।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সাধনা দেবী, বি-এ

ভ্রাতুষ্পুত্রী ভগিনী শ্রীমতী গুরুপ্রসাদী দেবী ভ্রাতুষ্পুত্রী

প্রশ্ন। ব্যবহারের দ্বারা ক্লীবত্ব হ'বে কেমন-ক'রে? ক্লীবত্ব না একটা physical disease (শারীরিক ব্যাধি)?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-স্ত্রী স্বামীর দোষদর্শিনী, যা'র কাছে স্বামী বিদ্বেষভাজন, স্বামীকে ঘৃণা করে, তাচ্ছীল্য করে, হীন ভাবে, নানা অনুযোগ করে, নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া অনুতাপ ও আপ্‌শোষ করে;—এমনতর স্ত্রী লইয়া যে পুরুষ বাস করিতে বাধ্য হয়, তা'র স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, স্মৃতিহীনতা, দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা, শ্রবণশক্তিরাহিত্য, সম্পূর্ণ বা আংশিক রতিশক্তিহীনতা প্রায়শঃই অল্পবিস্তর হইতে দেখাই যায়। তাই, শাস্ত্রে অমনতর স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করা আছে এবং এই মিলনে অল্পায়ু, দুর্ভাগ্য, জড়মস্তিষ্ক, খিট্‌খিটে, অহংবিকারগ্রস্ত ইত্যাদি রকমের সন্তানের সৃষ্টি হয়।—তাই এই মিলনকে সামাজিক পাপও বলা যাইতে পারে।

* * * * *

প্রশ্ন। নারীর একবার কোন-রকমে অনিচ্ছাকৃত পদস্খলন হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করার জন্য সমস্ত সমাজ যেন বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—তা'র ফলে, সেই নারীর সর্ব্বনাশের পথই ত' মুক্ত হয়! এইরূপ নারীর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলে ঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনও যেখানে,—বুঝিতে হইবে সেখানে আত্মসংরক্ষণের sufficient intelligence-এর (যথেষ্ট ধীশক্তির) অভাব। এমনতর স্থলে তাহাকে বর্জ্জন না করিয়া, আশ্রয় দিয়া—যাহাতে সে নিজেকে রক্ষা করিবার বা অন্যকে রক্ষা করার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করাই উচিত। শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়া গ্রহণের উপদেশ করা আছে। কিন্তু যা'রা মোটেই পদস্খলন করে না, তা'দের চেয়ে lessly esteemed (কম আদরণীয়) হওয়া স্বাভাবিক। 'প্রায়শ্চিত্ত' মানে বোঝেন ত'? প্রায়শ্চিত্ত বলিতে আমি বুঝি—অনুতপ্ত হইয়া কেমন ক'রে ইহা হইল চিন্তাদ্বারা তাহা ধার্য্য করিয়া তাহার নিরাকরণ প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; প্রায়শ্চিত্ত বলিতে প্রায়শঃ কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানই ত' দেখা যায়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'পাপ' মানে যে আচরণ বা চিন্তায় মন ও শরীরকে অবসন্ন বা রুগ্ন করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে খিন্ন করে। আর, এই পাপের উদ্ভব অজানা হইতে,—কারণ কেহই জীবন ও বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না—ইহাই প্রকৃতি। তা'হ'লেই প্রায়শ্চিত্ত সে অজ্ঞানকে দূর করিয়া শরীর ও মনের শুশ্রূষা করিয়া মানুষকে সুস্থ করিয়া তোলে—তাই প্রায়শ্চিত্তের বিধি।

প্রায়শ্চিত্ত মানে চিত্তে গমন করা অর্থাৎ কেমন করিয়া সে দোষ চিত্তে ঢুকিয়াছে, চিন্তা করিয়া বাহির করিয়া তাহা নিরাকরণ করা। তাই বিধি আছে—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মন্ত্রজপ ও অনুতাপ, আহারের সংশোধন—যেমন চান্দ্রায়ণ (ক্রমে কমাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি) ইত্যাদি, ঔষধ-প্রয়োগ—যেমন বিল্বমূল, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মী, কুশজল, গোমূত্র, পঞ্চামৃতপান ইত্যাদি।

আর এই প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে সম্যক্‌ভাবে মস্তিষ্কে আশ্রয় লাভ করে তাহার জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থা। আমরা যদি কোন-প্রকার ইচ্ছা করি, আর তাহা যদি পারিপার্শ্বিক হইতে সঞ্চারিত না হয়—তবে সে ইচ্ছা আমাদের চরিত্র ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।—তাই বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তে—অন্ততঃ অনেকের জন্য—বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা আছে।

কথাপ্রসঙ্গে

ইহা একটা বিরাট গ্রন্থ। ধর্ম্মের যত-কিছু গূঢ় তত্ত্ব,—ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের যত জটিল সমস্যা তৎসমুদয়ই শ্রীশ্রীঠাকুর কার্য্যকারণসম্বন্ধ-সহ বিস্তারিতভাবে ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন। যুগপ্রবর্ত্তক মহামানবগণ নিজের চরিত্র, আচরণ ও কথিত বাণীর সাহায্যে মানুষের জীবন-চলনার যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যান তাহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বমানবের জন্য। 'এছ্‌লাম'—শব্দের অর্থ আল্লার নিকট আত্মনিবেদন—রসুলের নিকট আত্মনিবেদনই মুসলমান ধর্ম্মের গোড়ার কথা; তেমনি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—বাণী দ্বারা আত্মসমর্পণের কথাই দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিতেছেন; আবার যীশুও এই surrender-এর কথাই বলিতেছেন—"None can come to the Father but through me." এই একই আদর্শ-নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান পরস্পরে চির-বিবদমান। ইহার কারণ, প্রেরিত পুরুষের অবর্ত্তমানে কুটিল স্বার্থান্ধ অহংসেবী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবাক্যের নানা কুব্যাখ্যা দ্বারা জনসাধারণকে বিপথগামী করিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া থাকে আর তাই ধর্ম্মের নামে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরলের উৎপত্তি হয়। প্রেরিতের প্রদর্শিত পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে মানবকুল মহাপঙ্কে নিমগ্ন হয়, বাঁচার পথই খুঁজিয়া পায় না,—বিধ্বস্তির কবলে পড়িয়া ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। মানবের যুগ-যুগ-সঞ্চিত পাপরাশি যখন জাতি ও সমাজের ভিত্তিকে বিদীর্ণ করিয়া বিধিকেও ছাপাইয়া উঠিতে চায়, তখনই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়; রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, ব্যভিচারে মানুষ

ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া দরদীর খোঁজ করে; সে-ক্রন্দন বিশ্বপিতার প্রাণে গিয়া বাজে, তখনই আর্ত্ত মানবজাতির বক্ষে মূর্ত্ত নরবিগ্রহে দ্রষ্টাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহার বাণী ও আচরণে মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্বতন অবতার পুরুষগণের কার্য্যকলাপ, আচরণ ও বাণীর পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া সত্যপথের পুনঃ সন্ধান পায়, সকল দ্বন্দ্ব ও বিভেদ ভুলিয়া গিয়া আবার একই মহান্ লক্ষ্যের দিকে সকলে ধাবিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর নানা বিভিন্ন প্রচলিত মতবাদের আলোচনা করতঃ এই সত্যই প্রমাণ করিয়া সকল মানবের এক মহামিলন-ভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গের আলোচনা পাঠ করিলেও স্বতঃই মনে হয়, পরমপিতা যুগে যুগে হজরত, যীশু, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন কলেবরে আবির্ভূত হইয়া কোরাণ, বাইবেল, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারদ্বারা এইরূপেই মানুষের সেই একই আদিম আসক্তি "বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার" পন্থাই বারবার বলিয়া গিয়াছেন।

এই বৃহৎ পুস্তকের সামান্য পরিচয় দিতে গেলেও আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমরা এখানে গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত সূচী এবং বাণীর কিঞ্চিৎমাত্র উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। নিম্নে গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় এবং তাহা যে-সময়ে যে-বিশেষ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রশ্নকর্ত্তাদের রচনায় যেমন পাইয়াছি) সন্নিবিষ্ট করা হইল। যথা :—

২০শে ভাদ্র ১৩৪২ সন। পদ্মাতীর। ভাদ্রের পদ্মা সম্মুখ-বিস্তৃত চরভূমিকে ডুবাইয়া আশ্রমের বাঁধে আসিয়া ঠেকিয়াছে। জলের ঢেউগুলি সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছে—অবিশ্রাম ছলাৎ ছলাৎ শব্দ! বাঁধের উপরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট্ট তাঁবু খাটান। কয়েকজন তাঁহার চৌকির সম্মুখে ভূমিতে উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সম্মুখস্থ দিগন্ত-বিসারী জলরাশির দিকে চাহিয়া। প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, তন্মাত্র, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহংকার, মন্ত্র নেওয়ার অর্থ কি, বীজমন্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র ও কুলমন্ত্র কাহাকে বলে, মন্ত্রের সঙ্গে 'যন্ত্র'—তা'রই বা মানে কোথায় ইত্যাদি নানা প্রশ্ন হইতেছিল—শ্রীশ্রীঠাকুর যথাযথ উত্তর বলিয়া যাইতেছিলেন।

ভাদ্রের শেষ। পদ্মার জল অদূরে সরিয়া গিয়াছে। সেদিন বিকালে অনেক দাদা ও মায়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট্ট তাঁবুটীর ধারে আশ্রম-প্রাঙ্গনে বসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের পূর্ব্বদিন বলিয়া নানা

স্থান হইতে অনেকেই আসিয়া সমাগত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিতেছিলেন। সেদিন আলোচনা চলিয়াছিল নিম্নলিখিত বিষয় লইয়া। যথা:—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না কাহাকে বলে, কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগামিনী হওয়া মানে কি, ষট্চক্র ও চক্রভেদ—সংসার অনিত্য আবার মানুষ নিত্যানন্দ লাভ করিতে চায় তা'র মানে কি, কৃপা বৈরাগ্য নির্ব্বাণ মোক্ষ এসকল কথার তাৎপর্য্য, ঋষি ও মুনিতে তফাৎ কি—ভক্তি কাহাকে বলে, মুক্তি বা কি—সাধনা, সিদ্ধি, সন্ধ্যা, আচমন ও পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতির অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা।

আজ রবিবার ৫ই আশ্বিন। ৺শারদীয়া পূজা আগত প্রায়। পদ্মাচরের জল খানিকটা নামিয়া থমকিয়া আছে। শরৎ-প্রভাতের আকাশ-বাতাস-ধরণীতে কেমন একটা স্নিগ্ধ সাত্তিকতা বিরাজ করিতেছে। অনেক দাদারা ও মায়েরা উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট্ট তাঁবুটীতে তামাক টানিতে টানিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কথা বলিতেছেন। বাংলার আর্য্যদ্বিজগণ অনেকেই আচার ও কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া হীনবল হইতেছেন—তাঁহাদের উন্নতির প্রকৃত পন্থা কি, মুসলমানদের ভিতরে যেমন সার্ব্বজনীন প্রার্থনা প্রচলিত আছে বাংলার আর্য্য দ্বিজ-সমাজে তেমন কোন ব্যবস্থা আছে কি না—হ'তে পারে কি না; বাংলার আর্য্য দ্বিজ-সমাজ এবং আর্য্য মুসলমান-সমাজেব প্রাধান্য—উভয় সমাজের নেতৃগণই আর্য্যজাতীয়, উভয় সমাজেই বহু অনার্য্য রহিয়াছে কিন্তু অনার্য্যগণ অন্ত্যজভাবদুষ্ট নীচ কাম-প্রবৃত্তির পরিপোষণের জন্য আর্য্যনারীগণকে সম্ভোগকরণার্থ প্রলুব্ধ করে, আর্য্য দ্বিজ-সমাজ এবং আর্য্য মুসলমান-সমাজ ইহার কি প্রতিবিধান করিতে পারেন যাহাতে আর্য্যরক্ত প্রতিলোমজ সংস্পর্শে কলুষিত না হইতে পারে; বাংলার জাতীয় অভ্যুত্থানে আর্য্যদ্বিজ ও আর্য্যমুসলমান সমাজের জনবল বৃদ্ধির উপায়—ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন অপূর্ব্ব মীমাংসা-বাণী দান করিলেন।

আজ শুক্রবার। ৺শারদীয়া পূজার আর বেশী দেরী নাই। পদ্মার চরভূমি আবার বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়া থই থই করিতেছে, অদূরে জেলের নৌকাগুলি মাছ ধরিতেছে। প্রাতঃ-প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ছোট্ট তাঁবুটীতে পদ্মাতীরে আসিয়া বসিলেন। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি—তাহার মাঝে মাঝে বনানীর শরৎশোভা—এ যেন বর্ষা ও শরৎঋতুর অপূর্ব্ব মিলন-ছবি! অনেক দাদারা শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকীর সম্মুখে মাটিতে বসিয়াছেন, প্রশ্ন চলিতেছে—শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়া ঠেস দিয়া উত্তর দিতেছেন।

আর্য্যেরা তাঁহাদের পূজা প্রার্থনায় জড়কে কেন গ্রহণ করিয়াছেন, পুরুষ-পরম্পরায় চাকুরী বা গোলামী প্রভৃতি হীনবৃত্তি অবলম্বন করিলে দ্বিজত্ব বজায় থাকে কি না, আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণদের কিরূপ সংস্কার-সম্পন্ন হওয়া উচিত, ইষ্ট ও পূর্ত্তের সেবা কাহাকে বলে, বাংলায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি কাহারা—তাহারা কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত অনির্ব্বচনীয় উত্তর শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন।

শীতের প্রাক্কাল। সেদিন সকালে হিন্দী প্রার্থনা হইয়া গেল। সম্মুখের প্রান্তরে হেমন্তের আভা দেখা দিয়াছে। যাহা ছিল জলময় তাহা হইয়াছে এখন মৃত্তিকাময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট্ট তাঁবুটীতে প্রভাতের আলোক-রেখা আসিয়া পড়িল—প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। কুলগুরু যে তান্ত্রিকী দীক্ষা দেন তাহা কি,—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্ত্রের অর্থ কি,—বাংলার দ্বিজসমাজের নেতৃগণ কি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া এক শক্তিশালী বৃহৎ সমাজের সৃষ্টি করিতে পারেন, মাছ মাংস খাইলে ধর্ম্মানুসরণের ব্যাঘাত হয় কেন,—বাস্তব যজন আর যাজন কি—ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইতে পারে কি ভাবে?—প্রভৃতি বিষয়ে সেদিন আলোচনা হইল।

শীতকাল, সকাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অনেক মা ও দাদারা উপস্থিত। শীতের কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন প্রভাত—তখনও পূর্ব্বদিকের গাছের ফাঁক দিয়া তাঁহার ছোট্ট তাঁবুটীতে রৌদ্র আসিয়া পড়ে নাই—সম্মুখের মাঠ তৃণশ্যাম হইয়া উঠিয়াছে—উষর মাঠের ধূসর রূপ এরই মধ্যে সবুজ মখমলে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে—অদূরে শীর্ণ জলরেখা—ঝিলের জল প্রভাত-আলোকে চিকি মিকি দিয়া উঠিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতি-মানবের দীক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং আদর্শ দীক্ষা-গ্রহণ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় অমূল্য উপদেশ সেদিন লিপিবদ্ধ হইল।

শীতের প্রভাত। শীত বেশ একটু পড়িয়াছে। সম্মুখের মাঠে তপোবনের ছেলেরা বেড়াইতেছে—সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গনে লোকজন চলা-ফেরা করিতেছে—প্রভাতের সূর্য্যালোক আসিয়া বাঁশঝাড়ের মাথা থেকে সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গনে পড়িল—সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কাসির উদ্বেগের জন্য প্রার্থনায় গেলেন না। বিশ্বাস কি, বিশ্বাসহীনতার মূল কোথায়, বিশ্বাসঘাতকতার মূলে কি থাকে, আর অকৃতজ্ঞতাই বা আসে কেমন-করিয়া—ইত্যাদি বিষয়ের অত্যুত্তম মীমাংসা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদান করিলেন।

শীতের প্রাতঃকাল। সেদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রার্থনান্তে তাঁহার তাঁবুটিতে আসিয়া বসিলেন। কিছুদিন হইল তিনি বাংলা ভাষায় প্রার্থনা ও সন্ধ্যার কতকগুলি মন্ত্র দিতেছিলেন। প্রথমেই সেই মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, আচমন প্রভৃতির নূতন মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া সমবেত সকলকে শুনাইলেন। মন্ত্রগুলি বাংলা ভাষায়, কিন্তু সে-ভাষায় ছন্দোবিন্যাস এমনই অদ্ভুত যে সংস্কৃতের যাহা-কিছু গুরুগম্ভীর ও প্রাণস্বরূপ এবং মন্ত্রের মত যত শক্তি যেন সে ভাষাতে সংহত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন—শীতের রৌদ্র আসিয়া তাঁহার তাঁবুটীতে পড়িয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। যাজক, ঋত্বিক, হোতা, উদ্গাতা—এঁরা কি ছিলেন এবং আর্য্য-কৃষ্টির সঙ্গে এঁদের কি সম্বন্ধ ছিল—এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন কথা বলিয়াছিলেন।

শীতের সন্ধ্যাকাল। রবি অস্ত যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে আরক্তিম সূর্য্য আশ্রম-প্রাঙ্গনস্থ সৎসঙ্গবাসীগণকে রক্তবর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আশ্রমের বাঁধের নীচে বহুলোক মাঠের মধ্যে বেড়াইতেছিল। সন্ধ্যা সজীব চলাচলে ও কলকোলাহলে মুখরিত। শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা চেয়ারে বসিয়া দিগন্তপ্রসারী শ্যাম-শোভার দিকে চাহিয়া। সেদিন তিনি সর্ব্বমানব-মহামিলনের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে কি মর্ম্মস্পর্শী অমূল্য উপদেশই না দিয়াছিলেন! সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বচন-সুধা পান করিয়া ধন্য হইল।

পৌষমাস ১৩৪২। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। পশ্চিমাকাশে রক্তসূর্য্য হরিৎ-বনানী-সীমায় অৰ্দ্ধ-অস্তগত—আশ্রম-সম্মুখস্থ ক্ষীণতোয়া বিচিত্র ঝিল আরক্তিম-সবিতৃ-রাগ-রঞ্জিতা। সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গন ও বাঁধের নিম্নস্থ শ্যামক্ষেত্রে বহুলোক ভ্রমণ করিতেছিলেন। অনেকে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়ারের পাশে সমবেত হইলেন—সে সান্ধ্য মহিমা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয়ে সার্থক গার্হস্থ্য জীবনানুসরণে বাংলার আদর্শ, জাতীয় অভ্যুত্থানে সেবা ও সাধনার প্রয়োজনীয়তা, বেকার-সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গুরুগম্ভীর অনুপম মীমাংসানিচয় লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল,—সকসে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

১২ই পৌষ ১৩৪২। রাত্রি সাড়ে সাতটা। শীতের আতিশয্যে বড় কেহ বাহিরে নাই। বাঁধের ধারে তাঁবুর ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুর অৰ্দ্ধশায়িত।

কথাপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইতেছিল। সেদিনের বিষয় ছিল—প্রকৃত যোগতত্ত্ব ও ব্রহ্মদর্শনের স্বরূপ-কথন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ও 'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য, বিজ্ঞান ভূমি ও ভগবদনুভূতি।

১৫ই পৌষ ১৩৪২। রাত্রি সাড়ে সাতটা। দুইদিন যাবত শীত খুব বেশী পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে কন্‌কনে হাওয়ায় হাত-পা যেন জমাট বাঁধিয়া আসে। তাই সন্ধ্যার পর বাঁধের ধারে বেশী লোকজন ছিল না। বড় দিনের ছুটীতে যাঁহারা যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ-কেহ চলিয়া গিয়াছেন। নূতন দুই চার জন আসিয়াছেনও। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর ভিতরে তক্তপোষের উপর। সম্মুখে বৈদ্যুতিক আলো-তলে দাদারা উপবিষ্ট। সর্ব্বভূতে ইষ্টদর্শনের স্বরূপ—মুক্তি কি, মুক্তির সাধনা কিরূপ—কর্ম্মক্ষয় কাহাকে বলে—কৃতকার্য্য হওয়ার গুপ্তমন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব মীমাংসাবাণী লিপিবদ্ধ হইল।

১৮ই, ১৯শে, ২০শে পৌষ ১৩৪২। এই কয়দিন প্রাতে মঙ্গলাচরণের পর শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি বাণী দান করিলেন। তখন মিষ্টি রোদে সমস্ত আশ্রম-প্রাঙ্গন ছাইয়া গিয়াছে। বাঁধের ধারে বহু নর-নারী চলা-ফেরা করিতেছে। কেহ বা রৌদ্র-সেবন করিতে করিতে নানারূপ আলোচনায় ব্যাপৃত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর ভিতরে তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট। সম্মুখে দাদারা বসিয়া আছেন। বৃত্তিগুলিকে ইষ্ট-স্বার্থ-পরায়ণ করাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সব বৃত্তিই সৎ বা অসৎ ব্যবহারভেদে, বিচক্ষণ বা শ্রেষ্ঠ কে, বেদম ও অটুট অনুরক্তি সম্পাদনের উপায়, নামধ্যানে দর্শন ও অনুভূতি, নাম—নামের মহিমা—নামের দ্রষ্টা, প্রকৃত সিদ্ধি, বীজমন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, অনাহত নাদ ও জ্যোতিঃ-দর্শন, বীজাত্মক নাম—বিভূতি, আসন, মুদ্রা—নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ—প্রভৃতি নানা জটিলতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিত-হাস্যে অপূর্ব্ব মীমাংসা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন আর তাহা লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

২৫শে পৌষ শুক্রবার ১৩৪২। কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। ইঞ্জিনের গোলযোগের দরুণ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়াই আবার নিবিয়া যায়। এইসব কারণে লেখা আরম্ভ হইতে সেদিন একটু দেরী হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। আগের দিনের লেখার আলোচনা হইতেছিল। পূর্ব্বদিন যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইলে পর আবার প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বভাবসুলভ

স্মিত-হাস্যে উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। সেদিনের বক্তব্য বিষয়—পুরুষোত্তম ও নিত্যসিদ্ধ সাঙ্গোপাঙ্গ, ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা অবতার পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ ও অবতার পুরুষে পার্থক্য।

৩রা মাঘ শুক্রবার ১৩৪২। কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি—প্রাতের বিনতি ও প্রার্থনার পর বেলা ৮টা—তখনও শীতের কন্‌কনে হাওয়া আসিতেছিল বলিয়া তাঁবুতে উত্তর দিকের পরদা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট। পূর্ব্বদিক হইতে সূর্য্যালোক আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে পড়িতেছিল। সকলে তক্তপোষের সম্মুখভাগে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবিষ্ট। পূর্ব্ব প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সুমধুর ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন। বিগত কয়েক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্দ্দি ও ফেরেঞ্জাইটিসের দরুণ লেখা বন্ধ ছিল তাই আজ কথাপ্রসঙ্গে এমনই জোর বাঁধিয়াছিল যে বেলা ১টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেদিনের প্রশ্নোত্তরের বিষয় ছিল—নিত্যশুদ্ধ ও বৃত্তি-বুভুক্ষু সাঙ্গোপাঙ্গ—বৃত্তি-চোর্য্য অপলাপেব নেহাৎ লক্ষণ অকৃতজ্ঞতা—বিধির নিয়ন্ত্রণ—ইষ্টানুরক্তি—বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষত্ব—অস্তি-বৃদ্ধি-উপভোগ কাহাকে বলে—ইত্যাদি। ঐদিন রাত্রেও প্রায় বার ঘটিকা পয্যন্ত কথাপ্রসঙ্গ চলিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অক্লান্তভাবে অনর্গল উত্তর দিয়া যাইতেছিলেন। পূর্ণাবতার, অংশাবতার ও কলাবতার—ভারত ও অবতারবাদ—জীবকোটী ও ঈশ্বরকোটী দুই রকমের লোক—ভগবৎপ্রাপ্তি ও সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে কাম-দমন প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনির্ব্বচনীয় বচন-সুধা সকলে মুগ্ধ হইয়া পান করিতেছিলেন।

৫ই মাঘ রবিবার ১৩৪২। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে অনেক দাদারা উপস্থিত। সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন। প্রশ্নোত্তর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পূর্ব্বের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হওয়াতে লেখা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

৯ই মাঘ ১৩৪২। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখভাগে সন্ধ্যার পরে তাঁবুতে সকলে একত্র হইলে পর আলোচনা আরম্ভ হইল। উপস্থিত সকলে মহাহর্ষে আবিষ্টবৎ শুনিতে লাগিলেন—নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা করিলেন—যথা :—

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ইহকাল কি পরকাল—ভোগ, মরণের নিশ্চয়তা ও মোহমুদ্গর—বাণীর কদর্থে ব্যাখ্যাতার কের্দ্দানী, মৃত্যুর সহিত জীবনের

প্রতিমুহূর্ত্তে লড়াই, ধর্ম্মে ভোগবাদী ও ত্যাগবাদী, অস্তি-বৃদ্ধি-সম্পাদনী-অমৃত, সেবা কথার তাৎপর্য্য, অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ, অকৃতজ্ঞকে সেবা, উপকারের প্রতিদানে অপকার-স্বীকার, নিষ্কাম কর্ম্ম ও তাহা করার সহজ-গ্যাক্, কর্ম্মফল-ত্যাগ ও শ্রেষ্ঠ-নির্ব্বাচন।

১০ই মাঘ শুক্রবার ১৩৪২। সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছিল। সন্ধ্যার পর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিল, সকলে যাইয়া তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসিলেন। সেদিন লেখা অধিকদূর অগ্রসর হইল না। তারপর দিন আবার প্রাতে—আকাশের মেঘলা তখনও কাটে নাই—তিন দিকের পর্দ্দা ফেলিয়া আবার কথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অমৃত-নিষ্যন্দী অপূর্ব্ব ভাষায় কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা—গীতায় উক্ত রাজযোগের তাৎপর্য্য—পুরুষোত্তমকে পাইলে পুনর্জ্জন্ম সম্ভবে না কিরূপে—পুনর্জ্জন্ম-কথন—মৃত্যুর পরে ভাব-ভূমিতে বাস, ভাব-ভূমি কত রকমের আছে, প্রেতাত্মা দেখা যায় কিনা, মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক প্রভৃতি ভোগ, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা-দেহ, কল্পনাকে মূর্ত্ত করিবার অভ্যাস,—ইত্যাদি কথার আলোচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

১৩ই মাঘ সোমবার ১৩৪২। শ্রীশ্রীঠাকুর আহারান্তে বিশ্রামের পর কারখানা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পিতৃদেবের কটেজের ভিতর তক্তপোষের উপর বসিলেন; তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা। ক্রমশঃ অনেক লোক আসিয়া জুটিল—কথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বর্গে দেবতার বাস, মৃতের শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ, ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা, সবই তো ব্রহ্মের রূপ, তবে দেবতা কে?—প্রতিমা-পূজার উদ্দেশ্য—প্রতিমা-পূজায় বিপদস্থষ্টি, গুরুপ্রতিষ্ঠা-প্রাণ জ্যান্ত জলজলে দেবতা—গণেশ-পূজা—প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলিলেন।

১৪ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ২২শে মাঘ ১৩৪২। এই কয়দিন শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে খুবই জোর দিয়াছেন। দিন নাই, রাত্রি নাই—তাঁবুটির ভিতরে বাঁধের ধারে অধিকাংশ সময়ই নানা আলোচনা নিয়া ব্যস্ত থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরিয়া বিরাট সভা বসিয়া যায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিতে থাকে আর শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিত-মুখে অনির্ব্বচনীয় ভাবব্যঞ্জনা-সহকারে বিষয়গুলির যথাযথ মীমাংসা প্রদান করিয়া যাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লিপিবদ্ধ হইতেছে। এই কয়দিন যে সকল অসংখ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা:—

প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য, প্রতিমাপূজা অধমাধম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত কেন, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, দক্ষিণা না দিলে সিদ্ধির পথ কণ্টকাকীর্ণ হয় কেন, সদ্‌গুরু,—অবতার গুরু—গুরু পুরুষোত্তম—তাঁ'র আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান ও বংশ—আগতের আগমন গতের মহান পূরণে—বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহার উদ্ভব—বেদ সনাতন ও অপৌরুষেয়, পারিপার্শ্বিককে পুষ্ট না ক'রে নিজ পুষ্টির সাধন হিংসার নামান্তর—দেব-পূজায় বলিদান-বিধি ও অহিংসার সামঞ্জস্য—তীর্থে পাপক্ষয় হয় কিরূপে—ব্রত কাহাকে বলে—ব্রহ্মচর্য্য ও ঊর্দ্ধরেতা কথার তাৎপর্য্য কি ?—আমিষ ও নিরামিষাহার—দৈববাণী ও দূরশ্রবণ—অদৃষ্ট ও পুরুষকার—ব্রহ্মজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা—ভারতীয় জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য—মায়াবাদের স্বরূপ কি—গোপী-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-প্রসঙ্গ—বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত শান্ত, সখ্যাদি পঞ্চভাব-প্রকরণ—মন, বোধ, বুদ্ধি—জড় ও চেতন—তন্ত্রমতের মদ্যমাংসাদি পঞ্চ-মকার-প্রকরণ—বাঁচা-বাড়ার আকুতি হইতেই এগুলির উদ্ভব—ভগবান্ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীশ এবং মূর্ত্তশরীরী—ভগবৎ-প্রাপ্তি কথার তাৎপর্য্য ও স্বরূপ ইত্যাদি।

১৩৪৩ সন ফাল্গুন মাস। অনুভূতি কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়দিন ধরিয়া নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব্ব দর্শনসমূহ ও তাহার বিভিন্ন স্তরের বিশদ বিবরণ ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বলিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জনা উপনিষণ্ণ শিষ্যগণের মনে এক অনির্ব্বচনীয় রসাবেশের সঞ্চার করিত। বোধ হইত যেন শ্রীশ্রীঠাকুর বর্ণিত ভাব-ভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিতেছেন। এমনি-ভাবে দিনের পর দিন, সকাল বিকাল সন্ধ্যা বাণীর অফুরন্ত উৎস চলিয়াছিল। এই সকল বর্ণনা সাধারণ মানবের ধারণারও অতীত—অপার্থিব স্বর্গীয় বস্তু—শুনিতে শুনিতে শ্রোতাকে স্বপ্নরাজ্যের কোন্ অজানা দেশে লইয়া যায়। ইহা শুধু উপভোগ করিবারই জিনিস! সহস্রবার সে বর্ণনা পড়িলেও পুনরায় ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সাধ্যের অতীত। নিম্নে দুই-চারিটী কথায় বর্ণিত বিভিন্ন ধামের নাম ও অবস্থার উল্লেখ করা গেল। যথা :—

মূ াধার ভূমি ও তাহার বিবরণ, সাধিষ্ঠান-ভূমি ও তাহার বীজ জ্যোতিঃ, মণিপুর-ভূমির বর্ণনা, তত্রত্য অগ্নিতত্ত্ব ও অগ্নিবীজ, অনাহত-ভূমিতে বায়ুতত্ত্ব ও বায়ুবীজ-বিবরণ, বিশুদ্ধ-ভূমিতে গগনবীজ এবং আজ্ঞাচক্র ও তত্রত্য বীজের উদ্ভব-বর্ণনা, প্রান্তরীভূত সহস্রদল-কমলের অভিব্যক্তি, সন্তগণ-বর্ণিত বঙ্কনাল, ত্রিকূটী ও হংসতত্ত্বের অনুভূতির বিশদ বিবরণ—বম্‌বম্-ফাটা গোলাপী রাগোদ্দীপ্ত প্রভাতসূর্য্যোদ্ভাসিত প্রণবের উদ্ভব, চন্দ্রমা-সমুদ্ভাসিত সারঙ্গ-খরতালধ্বনি-মুখরিত ররং-তত্ত্বের বিবরণ, ইষ্ট-

আলিঙ্গন-নিবিড় নিঝুম সত্তার বাহ্যিক বিকাশহারা আঁধার কুণ্ডলীর পাকে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার অনুভূতি, মহাভীতির নিরেট নিবিড় সঙ্কোচন-ক্ষুব্ধ সত্তার পুনঃ প্রসারণে বোধায়িত অন্ধকার ফুটিয়া বংশী-স্বননোৎফুল্ল শ্যাম দিগন্তে পীতচ্ছায়ার আবির্ভাব, বংশী-স্বননমুখর দহন-স্নিগ্ধ সূর্য্যোদ্ভাসিত সোঽহং তত্ত্বের বিকাশ, উত্তালতাহীন উন্মাদনাকর বীণাঝঙ্কৃত সৎ, অসীমচলনের অলখ রকমের চলায় বোধের পথে দৃশ্য-বিহ্বল ব্যস্ততা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১৬ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৪৩। পদ্মার তীরে বাঁধের ধারে খাটানো তাঁবুতে প্রাতঃকালীন মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে অনেক দাদারা উপনিষণ্ণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুভূতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইতেছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া যাইতেছিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, চোখ-মুখ দিয়া যেন কি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—প্রত্যেকটী কথা আলাহিদা করিয়া, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাইতেছেন। বলিতে বলিতে তপস্যার চরমে সর্ব্ব-সার্থকতার ভিতর দিয়া ইষ্টমুখর জাগরণে রক্তমাংসসঙ্কুল ইষ্টের দর্শন-লাভের বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল সহসা অভূতপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল—দেখিতে দেখিতে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, অবশেষে "রক্তমাংস-সঙ্কুল" কথাটী বলিয়াই হঠাৎ "ও বাবা!" বলিয়া লাফ দিয়া উঠিলেন। শব্দ শুনিয়া অনেকে ছুটিয়া আসিলেন—প্রায় এক মিনিট কালের মধ্যে আবেশের চকিত চমক হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেকে সহজ অবস্থায় সামলাইয়া লইয়া সুমধুর হাস্যরঞ্জিত অধরে অনুভূতি-বর্ণনার অবশিষ্টাংশ সমাপন করিলেন।

আরও কয়েকদিন এই ভাবে তপস্যাকালীন নানা অনুভূতির সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশদ বর্ণনা দান করেন। অনুভূতি-লাভ ও মহাপুরুষত্ব, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দর্শনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক—নূতনতর বোধের জাগরণ,—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় বাস্তব জগতের তুলনায় অনুভূতির জগতের পূর্ণত্ব ও আনন্দ, অনুভূতি-জগৎ ও যন্ত্রজগৎ, অনুভূতি-রাজ্যে লয় বা অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ অবস্থার কত কথা শ্রীশ্রীঠাকুর লিপিবদ্ধ করাইলেন।

এতদ্ব্যতীত জাতির জীবন ও বৃদ্ধিপ্রদ আরও অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। যথা:—আদর্শ ষ্টেট, রাজনীতি, হিন্দুমুসলমানের মিলন-সমস্যা, জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজনীয়তা, মহাপুরুষ কে—যুদ্ধই মুক্তির উপায়, না সেবা ও শ্রম দিয়া কোন জাতি মুক্তি-লাভের অধিকারী হইতে পারে, নারীর একগামিনীত্ব এবং পুরুষের

বহুগামিনীত্ব—স্ত্রীপুরুষের মিলনাদর্শ ও বর্ত্তমান প্রগতি—কামাসক্ত স্ত্রী-পরায়ণতা হইতে দুর্ব্বল সন্দিগ্ধ জাতির উৎপত্তি—জাতিগঠনে বিবাহ ও সুপ্রজনন—জাতির উন্নয়নে অসবর্ণ বিবাহ ও বহু-বিবাহ—নূতন জাতি-গঠনে শিক্ষার অভিনব প্রোগ্রাম—জাতীয় স্বাস্থ্য ও আয়ুবৃদ্ধির উপায়—জাতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নে ভগবৎবোধের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা, অনুভূতি রাজ্যের সহিত শিক্ষা, শিল্প, সমাজ প্রভৃতির সম্বন্ধ ইত্যাদি। নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থ হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে একস্থানে বলিতেছেন—

"প্রাণ মানে হ'চ্ছে যা'-দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বাঁচা যায়, অর্থাৎ the vital energy by which the physique is enlivened with moving growth. আর 'আয়াম' বল্‌তে বুঝি যাহা দ্বারা এই জীবনী-শক্তি সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত হয়। তা'হ'লে 'প্রাণায়াম' মানে হ'ল—জীবনীশক্তির সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ।

"আবার এই জীবনীশক্তির প্রধান একটা functional symptom-ই হ'চ্ছে libido বা সুরত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হওয়ার ঝোঁক। তা'হ'লেই হ'ল tendency to unification that begets an active mood. তা'হ'লেই দেখা যা'চ্ছে এই libido বা সুরতই জীবের জীবত্ব। আর ইহা ঠিকই—মানুষের এই libido যখনই stunted, bruised, damaged or distorted হয় তখনই মানুষের vital flow ক্রমশঃ খিন্নের দিকে চলিতে থাকে।

"আবার এই libido যেখানে তৃপ্ত হইয়া অভিনিবেশ-সহকারে তোষণ, পোষণ ও প্রতিষ্ঠামুখর হইয়া চলিতে থাকে সেখানেই দেখা যায় life, love and vigour-এ মানুষ সমৃদ্ধ হয়। তা'হ'লেই প্রাণায়ামের প্রথম ও প্রধান উপকরণই হ'চ্ছে একটা higher or super কোন tangible কিছুতে সংবদ্ধ করা যাহাতে সে তৃপ্ত হইয়া higher becoming-এ চল্‌তে পারে। তবেই দেখুন, tangible superior কিছুতে libido-কে তৃপ্ত করাইতে হইলে চাই এমনতর একজন মানুষ যাঁ'র প্রতি অনুরক্তি, ভক্তি বা আসক্তি-বশতঃ তা'র প্রাণের টানে প্রিয়র wishesগুলি fulfil করতে গিয়ে আনন্দের সহিত spontaneously becoming-এর পথে চল্‌তেই হয়,—আর এই চলাই তা'র নিজেকে life, love and vigour-এ successfully সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌তে পারে।

"মানুষের বৃত্তিগুলি environment-এর impulse-এ excited হ'য়ে

কত রকমে কত ভাবে বিচ্ছিন্ন কত বিষয়ের সংঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে vitally stunted হ'তে থাকে তা'র কোন ইয়ত্তা নাই ; এমনি ক'রেই ideal না থাকার দরুণ fixity of purpose হারাইয়া মানুষ অজানিত ভাবে অবশ আতঙ্কে সর্ব্বনাশের কোলে গা-ঢালা দিয়া হতাশাপূর্ণ অবসন্নতায় নিঃশেষ হইয়া যায়।

"আর এই বৃত্তিগুলি মানুষের tendrils of libido-র উপর environment ও individual-এর প্রলুব্ধ ও বিকৃত রাগদ্বেষসম্ভূত বিভিন্ন impulse-এর সংঘাতেই মস্তিষ্ককোষের নানারকম সমাবেশ ও সমন্বয়ের সহিত সৃষ্ট হইয়া সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের উদ্বোধনে দুনিয়ায় থাকে ও চলিয়া বেড়ায়। এই রাগদ্বেষ, সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন বৃত্তিসহকারে নানা সংঘাতের সংস্পর্শে আসিয়া যখন যেমনতর বিষয়ে গমন করে, উপভোগ করে, আকৃষ্ট বা উৎক্ষিপ্ত হয়,—শারীরিক বিধানগুলিও সেই সংঘাতে নানারকমে আন্দোলিত হইয়া নানা রকম চঞ্চলতায় পরিবর্ত্তিত হয় আর তা'রই একটা প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে irregularity of breathing—শ্বাস-প্রশ্বাসের বৈষম্য।

"যখনই দেখা যায় মানুষ কোনও elevative প্রিয়েতে অনুরক্তির সহিত engaged and absorbed হইতেছে,—লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমে regulated হইয়া আস্তে আস্তে gravity of absorption অনুযায়ী ক্রমে স্থিরত্বের দিকে যাইতেছে।—আর এই absorption হইতেই ধীমান্‌রা মনকে স্থির করার একটা mechanical process আবিষ্কার করিয়াছেন—সতর্কতার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিয়া control করা।

"তাই আমি বলি যা'র Superior Beloved নাই অর্থাৎ Superior Beloved-এ আপ্রাণ অনুরক্তি নাই—যাঁ'কে ভাব্‌তে, যাঁ'র wishes-গুলি fulfil কর্‌তে প্রাণশক্তি উপ্‌চে' উঠে না, সে যদি mechanically শ্বাস-প্রশ্বাসকে control কর্‌তে যায় রেচক, পূরক, কুম্ভক দ্বারা,—তা'র তো এতে সমূহ বিপদেরই সম্ভাবনা। শারীরিক বিধান তা'র সহজেই বিধ্বস্ত ও রুগ্ন হ'তে পারে। আর যদি Superior Beloved-এ অমনতর আপ্রাণ অনুরক্তি থাকেই, তবে তো প্রাণায়াম—মানুষ তাঁ'তে যত absorbed হ'য়ে উঠ্‌চে—ততই তা'র অজানিত ভাবে আপনা-আপনিই হ'বে। মোটের উপর কথা হ'চ্ছে এই—কোন Superior Beloved-এ যদি কারু এমনতর অনুরক্তি থাকে যাঁ'র মননে তা'র তৃপ্ত ও সহজ উদ্দীপনা-সহকারে absorbed হওয়ার knack থাকে সে যদি একটু একটু প্রাণায়াম অভ্যাস করে—এই mechanical process তাহার পক্ষে অনেকটা

নির্ব্বিঘ্নে acceleration-এর দিকেই নিয়ে যে'তে পারে। নতুবা কিন্তু যা'-তা' ক'রে প্রাণায়াম করা সুবিধাজনক নয়। আর প্রাণায়াম অর্থাৎ চল্‌তি শ্বাস-প্রশ্বাসের কসরৎ কর্‌লে উল্লিখিত কারণপ্রযুক্তই শক্তির সমৃদ্ধি হ'য়ে থাকে।

"মানুষ কোন ideal-এ imbued হ'লেই তা'র libido তৃপ্ত হওয়ার দরুণ vital energy stunted বা distorted না হইয়া upheaval of energy ঘটিয়া থাকে। তা'-ছাড়া প্রাণায়াম as a breathing exercise সতর্কতার সহিত একটু attentive হইয়া করিতে পারিলে circulation বা রক্ত-চলাচলকে accelerate করিয়া tissue-তে more oxygenated blood যোগাইয়া metabolism-কে বাড়াইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে, আর lungs বা ফুস্‌ফুসকেও অনেক সবল করিয়া তোলে।

* * * * *

প্রশ্ন। হিন্দু কাহাকে বলে? আমরা যে বলি আমরা হিন্দু, তা'র মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সিন্ধুনদের ও-পারের মুসলমান ও গ্রীক রাজারা এ-পারের মানুষদিগকে সিন্ধুপারের মানুষ বলিয়া সংক্ষেপে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিত—যেমন রাজপুতনার মানুষগুলিকে রাজপুত বলিয়া ডাকি, বিহারের মানুষগুলিকে বিহারী বলিয়া ডাকি, আমার মনে হয় ঐ জাতীয়ই এই হিন্দু-আখ্যা।

বস্তুতঃ ইহাদের আর্য্য বরং সিন্ধুপারের আর্য্য বলা যাইতে পারে—আর এই আর্য্যাবর্ত্ত সিন্ধুপারেরই দেশ। তাই হিন্দুদের চালচলন, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে আর্য্যের সবকিছু যেমন ভাবেই হউক এখনও চলিতেছে, আমরা এমনতর বেকুব—influentials-রা আমাদের যাহা বলিয়া অভিহিত করিত, পেটের দায়ে কৃপা ভিক্ষা করিতে গিয়া আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছি কিন্তু influentials যা'রা এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহারা কেহই কিন্তু হিন্দু-আখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তাই হিন্দু-নামের সাথে আমাদের Aryan traditions-এর কোনই সাড়া নাই—তথাপি চিরকালই কি আমরা হিন্দু বলিতেই সাড়া দিব?

আর হিন্দুদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাপ, বড় বাপ সবাই আর্য্য ছিলেন অথচ আর্য্য বলিলে আর আমাদের ভিতর একটা সুখের উৎকর্ণ চম্‌কানি ভাসিয়া উঠে না—কিন্তু হিন্দু বলিলে বুকভাঙ্গা তাকানী এখনও তাকাই—অনুগ্রহ-লোলুপ হইয়া, না করিয়া পোঁদে গুতো দিয়ে বড় করিয়ে দেওয়ার লোভে লজ্জার মাথা খাইয়া আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের অমৃত-উদ্দীপনাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছি ও এখনও দিতেছি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে ব'ল্লেন হিন্দুরা আর্য্য, এই হিন্দু বা সিন্ধুপারের আর্য্য বল্‌তেই বা আমরা সত্যি সত্যি বুঝ্‌ব কি?—শুন্‌তে পাই হিন্দুসভা নাকি হিন্দু বল্‌তে বোঝেন ভারতবর্ষে উদ্ভূত যে-কোন ধর্ম্মমতাবলম্বী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্য বল্‌তে আমার মনে হয় উত্তর polar region-এর specific type of men—যাঁ'দের ভিতর atmosphere, climate ও environment-এর দরুণই হোক আর যেমন ক'রেই হোক innate hankering of culture for higher becoming আরম্ভ হ'য়েছিল। তাঁ'রা শুধু আত্মরক্ষা ক'রে শিশ্নোদরপরায়ণতায় তৃপ্ত হ'য়ে থাক্‌তেন না—চাইতেন দুনিয়াটাকে উপভোগ কর্‌তে আরো ও আরোতরভাবে with the unfoldment of every fold that floats with a music of enjoyment tuned with pain and pleasure around them with the objective impulses.

ঐ polar region যখন তাঁ'দের বাসের পক্ষে ক্রমেই অসুবিধাজনক হ'য়ে উঠ্‌ল, তাঁ'রা নেমে আস্‌তে সুরু কল্লেন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে বাসোপযোগী সুবিধাজনক জায়গা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে—ক্রমে এসে settle কর্‌লেন Cacasus range-এর ধারে—আবার সেখান থেকে ঐ stock-এর আর্য্যরা কতক ইউরোপের দিকে গেলেন আবার কতক ভারতবর্ষে এসে আর্য্যাবর্ত্ত তাঁ'দের বাসভূমি ব'লে আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত ক'রে সেখানে বসবাস কর্‌তে লাগ্‌লেন—আর তাঁ'দের সন্তান-সন্ততিই আমরা যা'দের ভিতর as an instinct aryan এখনও উঁকি মা'চ্ছে।

আবার দেখ্‌তে পাবেন ইউরোপের দিকে যা'রা গিয়েছেন তাঁ'দেরও সন্তান-সন্ততির ভিতর—যদিও তাঁ'রা সমৃদ্ধিকে বিশেষভাবে উপভোগ ক'চ্ছেন—এই Aryan culture-এর instinct কতই নূতন ছাঁচে নবীন আবেগে কেমন ক'রে কত রকমে হাতছানি দিয়ে হাস্যহুঙ্কারে গর্জ্জে উঠ্‌চে। দেখ্‌বেন তাঁ'দের সন্তান-সন্ততির ভিতর—ছোট-বড় যেখানে যে-ই থাকনা কেন সবার ভিতরই একই সুর, একই বোধ—আবার চালচলনের রকম-ফেরের খুব তফাৎ হ'লেও কায়দা-কস্‌রতের ভঙ্গী ঐ একই রকম—তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পারেন হিন্দু বল্‌তে আমাদের কি বোঝা উচিত।

আর হিন্দুমহাসভা যে হিন্দুত্ব বল্‌তে ভারতবর্ষে উদ্ভূত যে-কোন ধর্ম্মমত বোঝেন তা'র মানে আমি এই বুঝি আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যদের পূর্ব্বতন experience-কে basis করিয়া মানুষের being and becoming-এর নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই—কিন্তু যা'দের পূর্ব্বতন experience ব'লে কিছু ছিল না কিংবা অমনতর

instinct ব'লে কিছু ছিল না তাঁ'রাই আর্য্যাবর্ত্তে এসে বা এঁদের সংস্পর্শে রকম-ফের ক'রে যে সমস্ত ধর্ম্ম বা being and becoming-এর higher move-এর জন্য যে-সমস্ত বিধি declare ক'রেছেন সেগুলি নয়কো—কারণ এই experience বা knowledge from acquisition থেকে যে instinct সৃষ্টি হ'য়েছিল তা' আর্য্যদের ভিতরেই প্রকৃষ্টভাবে নিহিত ছিল। অন্যের ভিতর তা' থাকা সম্ভবপর নয় কারণ তাঁ'রা ত' এঁদের মতন ঐ Aryan culture-কে acquisition-এর ভিতর দিয়া generation after generation ধ'রে instinct-এ পরিণত করেন নি—তাই তা'দের জানাগুলিও এঁদের type-এর এমনতর perfect nature-এর হওয়া সম্ভবপর না—তা'হ'লেই অন্যগুলি এঁদের মত genuine হওয়া সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না—তাই এঁরা ও-বিষয়ে এত rigid আমার এই মনে হয়।

তা'হ'লেই সিন্ধুনদীর এপারে যাহারাই বাস করিত তাহারাই যে আর্য্য হইবে তাহার কোন মানে আছে ব'লে মনে হয় না—তবে তাহারা সিন্ধুর এপারের আর্য্যদের সহিত সিন্ধুপারের মানুষ বা হিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে।

প্রশ্ন। আর্য্যজাতির সঙ্গে তো বহু আর্য্যেতর জাতির সংমিশ্রণ হ'য়েছে—তবে আর্য্যজাতিও তো মিশ্রজাতি—ইহারও তো purity নাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যেরা নিজেদের origin-কে বা blood-কে more emphatic push দিবার উদ্দেশ্যে as a manure non-aryan female-কেও বিবাহ ক'রেছিলেন এবং তা' বিধিমত হইলে তা'দের সমাজে কোন আপত্তি না উঠিয়া বরং আদরই পাইত। তাই যেখানে paternal aspect পারম্পর্য্য হিসাবে ঠিকই আছে অথচ মেয়েদের দিক দিয়া আর্য্যেতরও ঘটিয়াছে তা'দের সন্তান-সন্ততি আর্য্য বলিয়াই গণ্য হইত এবং তাহাদিগকে আর্য্যরা নিয়মের ভিতর দিয়া অমনতর ভাবে আর্য্যে উন্নীত করিয়া লইতেন এবং তা'দের instinct এবং physiognomy-ও আর্য্যদের মতনই হইত—কিন্তু paternal aspect-এর যেখানে গোলমাল ঘটিয়াছে সেখানেই ঐ instinct ও physiognomy-র গোলমাল ঘটিয়াছে। তাই সাধারণতঃ আর্য্য পুরুষ এবং আর্য্যেতর স্ত্রী হইতে উদ্ভূত যাঁহারা তাঁহাদের আর্য্য instinct-এর কোনই গোল ঘটে নাই—কোথাও কোথাও হয়ত অনার্য্য পুরুষ ও আর্য্য স্ত্রীর মিশ্রণে সন্তান-সন্ততির উদ্ভব হইয়া এই আর্য্যের ভিতরেই স্থান পাইয়াছে—কিন্তু মোটের উপর আর্য্য পুরুষ এবং আর্য্যেতর স্ত্রীর মিশ্রণই বেশী হইয়াছে।

প্রশ্ন। ভারতীয় আর্য্য, পারস্যের আর্য্য ও ইউরোপীয় বা আমেরিকান আর্য্য—ইহাদের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি ?

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনাদেবীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

(পঞ্চ-চত্বারিংশৎ বর্ষে)

শ্রীশ্রীঠাকুর। Instinct-এর বিশেষ কোন তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না তবে atmosphere, climate and environment-এর ভিতর দিয়া ঐ original instincts যেমনতর pose নিয়া মাথাতোলা দিয়াছে শুধু সেটুকুরই তফাৎ হইতে পারে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা জাতি বা race-এর মধ্যে এমন কোন বাস্তব মিলনসূত্র নাই কি—যাহাতে তাহারা মিলিত হইতে পারে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে difference যেন মজ্জাগত!

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক-এক রকম atmosphere, climate ও environment-এর ভিতর যে যে রকম মানুষ evolve করিয়াছে তাহারা প্রত্যেকে মানুষ হইলেও মানুষেরই এক-এক প্রকার species. মানুষের যা' characteristic তা' সবার ভিতরেই আছে তাই প্রত্যেক species-এর এই রকম difference থাকিলেও প্রত্যেকের ভিতরেই প্রত্যেকের normal একটা accommodation আছেই—তাই যে species যে সমস্ত species-কে যত বেশী যত রকমে higher becoming-এ fulfil করিতে পারিবে ততই অন্যগুলি automatically সেই species-এর part and parcel হইয়া দাঁড়াইবে ইহাতে আব সন্দেহের কি আছে?

* * * * *

প্রশ্ন। সদ্‌গুরু কাহাকে বলে? তাঁ'কে চিনিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি ইষ্ট-পরিপূরণে আপ্রাণ হ'য়ে তৎপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে চরিত্রকে চারিয়ে তাঁ'রই স্বার্থ-অনুসন্ধিৎসায় বাস্তব জানায় জীবন ও বৃদ্ধির বিধিগুলিকে অনুভূতিতে কুড়িয়ে পে'যেছেন, তিনি যেমনই হউন প্রকৃত সদ্‌গুরু তিনিই। সৎ মানেই হ'চ্ছে—জীবন ও বৃদ্ধি যা'তে আছে, আর গুরু—বিশেষ ভাবে তা' যিনি জানেন।

তবে সদ্‌গুরু বল্‌তে আমরা এই বুঝে' থাকি—যিনি জীবন ও বৃদ্ধি যাহা-যাহা লইয়া বা যাহা-যাহা দিয়া হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে জানেন। তা'হ'লেই সদ্‌গুরু চেন্‌বার ঐ একটা জিনিষই প্রথম ও প্রধান ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে—যা'কে সদ্‌গুরু ব'লে মনে কচ্ছি, তিনি কতখানি তাঁ'র যা'-কিছু বৃত্তি দিয়ে বাস্তব ইষ্টস্বার্থপরায়ণ, আর এই ইষ্টস্বার্থপরায়ণতার অভিব্যক্তিতে তা' পরিপুষ্টির হেকমতি—অর্থাৎ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা-সমন্বিত কাযদা ও কৃতকার্য্যতা কেমনতর। আর এই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাকুশল ইষ্টস্বার্থপরায়ণ কৃতকার্য্য যিনি, তিনিই যদি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির বিধি বাৎলে দেন, আর তাঁ'র চলনার কায়দা ব'লে দেন,—তাঁ'তে আপ্রাণ অনুসরণে—ঐ চলনার বিধি অবলম্বন ক'রে

যদি আমরা চলি, কৃতকার্য্যতা যে আমাদের নতজানু অভিবাদনে নন্দিত ক'রে তুল্‌বে, সে সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেইকো। সদ্‌গুরুর যদি বাস্তব কোন পরিচয় থাকে, তবে তা' ঐ দিয়েই; নতুবা কারু জানা যদি তোমাকে কোন-ভাবে কোন দিক্ দিয়ে উন্নত চলনে চালু ক'রে দেয়, গুরুত্বের অভিবাদনে তো তুমি তাঁ'তেই কৃতকার্য্যতায় ধন্য হ'তে পার। কিন্তু তাই ব'লে সবাই তোমার সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয় নয় একথা ঠিক জেনো—ঐ সদ্‌গুরু ছাড়া।

প্রশ্ন। তা'হ'লে আমরা যাঁ'দের অবতার বলি, তাঁ'দের সঙ্গে আর সদ্‌গুরুর সঙ্গে প্রভেদ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই তো বল্লাম। সদ্‌গুরু যাঁ'রা, তাঁ'দিগকে তদ্‌যুগ-গুরুও বলা যে'তে পারে। কিন্তু অবতার গুরু যাঁ'রা, তাঁ'রা তদ্‌যুগের জানা ও চলনাকে একটা মহান্ পরিপূরণে প্রতি-ভান্বিত ক'রে তা'বই নূতন আরোর আলোকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনে বাস্তব নূতন ঊষার দিগ্‌বলয় গরিমাকে প্রত্যেক প্রাণে ঢেলে দিয়ে—উদগ্রীব আকর্ষণে তা'রই চলনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন; তাঁ'কে তাই গুরু-পুরুষোত্তম বলা যে'তে পারে।

ইংরাজী prophet কথাও বোধ হয় ঐ কথাকে ইঙ্গিত করে। তাঁ'রা তো সদ্‌গুরু বটেনই, তা' ছাড়াও অতখানি, তাঁ'রা মানুষের ভিতর সত্ত্বগুণ —অর্থাৎ যা'তে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি উচ্ছলতার দিকে উপ্‌চে ওঠে—তাই চারিয়ে দেন,—কিন্তু তাঁ'দের চলনা হয় রজোগুণের—সেই অনুরাগে রঞ্জিত ব'লে। আর তাঁ'দের কর্ম্ম বা ক্রিয়াভূমি হয় তমোগুণেতে বিশেষভাবে—অর্থাৎ মানুষের ভিতরকার অজ্ঞতার ভূমিতে। আর এই মানুষ, এই গুরু-পুরুষোত্তম মানুষ জগতে যখন আসেন তখন একজনই আসেন—আর এই আস্‌তে হ'লে তাঁ'রা আসার বিধিকে অবলম্বন ক'রেই এসে থাকেন।

যেখানে দেখা যায় মানুষের দুর্দ্দশা-দুর্নীতি তা'দের বেঁচে থাকাকে আপ্রাণ গলা চিপে ধ'রেছে—বাঁচার প্রয়াসে হয়ত তা' দিশেহারা আলুথালু হ'য়ে কত কি ভাব্‌ছে, কর্‌ছে থলকুল আর কিছুতেই পায় না —সেই স্থানই সাধারণতঃ তাঁ'র আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান, আর ঐ তেমনতর জায়গায় যে বংশে যা'দের ভিতর উন্নত সংস্কার ঐ দুর্দ্দশাক্লিষ্ট হ'য়ে অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে প্রাণের আবেগে রক্ষা পা'চ্ছে—সেই বংশের ঐ রকম পিতামাতাই তাঁ'র উপযুক্ত আবির্ভাবের ভূমি;—আর তাঁ'র স্মরত বা আদিম আসক্তি নিবদ্ধ সাধারণতঃ সেই জায়গায়ই হ'য়ে

থাকে, ঐ যুগের জানার দিগবলয়ে দাঁড়িয়েও যে বা যিনি অগণ্য বা নগণ্যভাবে দিন যাপন কর্‌ছেন।

অগণ্য বা নগণ্য এই জন্যে বল্লাম—পারিপার্শ্বিক তাঁ'র জীবন ও বৃদ্ধির সেবায় আত্মরক্ষা ক'রেও—কদর্থ ও কুভাবের কালিমার চক্ষে—দেখ্‌তে না পে'রে সাধারণতঃ তাঁ'কে একটা কৃপাপাত্র ক'রে রাখে ব'লে।

পায়, ভোগও করে, জানেও সে পারিপার্শ্বিক তাঁ'কে, তথাপি আহাম্মক অহমিকার দুর্ব্বল আত্মপ্রসাদে বিভ্রান্ত জ্ঞানী হ'য়ে মোড়লী প্রলোভনকে না ছাড়্‌তে পে'রে তাঁ'র আচারে আচারসম্পন্ন হওয়া ও তাঁহাকে অনুসরণ করা—এ পে'রেও ওঠে না, বিভ্রান্ত লোকচলনাকে উপেক্ষা ক'রে তা' হ'য়েও ওঠে না—বুঝ্‌লে ভাবে, সে যদি ঐ চলনে চলে, মানুষ তা'কে কি বল্‌বে?—এ হ'চ্ছে নেহাৎ মূঢ়-পণ্ডিত ভাল-লোকদের অবস্থা।

আরও মনে হয়, ঐ গুরু-পুরুষোত্তম সাধারণতঃ তাই মানুষ ইতর বা ছোটলোক যা'দিগকে বলে, তা'দিগকেই প্রথমে দলের মানুষ ক'রে, ঐ মূঢ়-মহান্ মোড়ল ও চল্‌তি-বিদ্যাবিশারদের ভেতর ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেন—আলিঙ্গনে জয়ে উদ্দাম ক'রে তোলেন। আবার আরও সেইজন্যেই ঐ ভদ্রসাধারণ নিন্দার গণ্ডি দিয়ে তাঁ'কে ঘিরে রাখ্‌তে আপ্রাণ-ই প্রয়াস পে'য়ে থাকেন। সেই জীবন-বৃদ্ধিদ করা ও বলা সত্ত্বেও সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্যের এস্তার মহোৎসব আচরণে চল্‌লেও যেখানে নিন্দাবাদ উল্লম্ফী ছিট্‌কানো জলের মত ছিট্‌ছে দেখা যায়, সেই জায়গায় সে-ই বিবেচনার যোগ্য বটে।

প্রশ্ন। গুরু-পুরুষোত্তম যদি এই হ'ন, তা'হ'লে সাধু মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরুগণের সকলেরই তো তাঁ'কে অনুসরণ করা এবং মানব সাধারণ যা'তে তাঁ'র দিকে আকৃষ্ট হ'ন তাই করাই তো উচিত! আমাদের দেশে তো এমন কিছু দেখা যায় না! প্রত্যেকেই যেন স্ব স্ব প্রধান;—এ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গত পুরুষোত্তমকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করাই তো সর্ব্ব সৎ-শাস্ত্রের নীতি! প্রথমে চলেও কিছুদিন তাই, তাবপর ক্রমেই তাঁ'র বা তাঁ'দের কথাগুলি মানুষের বৃত্তি-বাঁধে ফেলে তা'রই উপযোগী ক'বে নানাপ্রকার কায়দায় কায়দায় তাই কর্ত্তে চেষ্টা করে। এমনি ক'রেই পিতৃরাগী সদগুরুবনামী গুরুরা তা'দের কেরদানী ও আচার-চলনের ভিতর দিয়ে যত পারে পারিপার্শ্বিককে টান্‌তে থাকে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে থাকে; ভেতরকার উদ্দেশ্য—তা'দের বৃত্তি যেন তা'র ইন্ধন আহ্বানের পথে কোন প্রকারে বাধা না পে'য়ে বেশ একটা জবরদস্ত ভাবে জীবন যাপন কর্‌তে পারে—এমনি ক'রে ক'রেই এ' ওকে নিন্দা ক'রে দলসৃষ্টি কর্‌তে থাকে,

আর বেদের দোহাই দিয়ে তা'র অস্বাভাবিক কদর্থ ক'রে, তা'কে না-মানার আটঘাট বেশ ক'রে সায়েস্তা কর্‌তে থাকে। কারণ, বেদের স্বাভাবিক বোধে মানুষ অভ্যস্ত যদি থাকে, তা'হ'লে বৃত্তিবনাম সদ্‌গুরু যা'রা, তা'দের পারিপার্শ্বিক থেকে ওর ভোগ লোয়াজিমা নাও মিলতে পারে—পরন্তু হয়তো—মানুষের আক্রমণে ও নিগ্রহে হয়তো বেঁচে থাকাও বিপদাপন্ন হ'তে পারে—তাই ঐ সবের খাতিরেই ঐ রকম না কর্‌লে পথ কোথায়? কাজেই একজন আর একজনকে নিন্দা ক'রেই আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে হয়।

একজনকে বুঝতে হ'লে তা'র কাল, অবস্থা, করা ও বলার ভেতর দিয়ে ভাবকে জে'নে উদ্দেশ্যকে অবধারণ ক'রে, তবে তা'র হিসাব-নিকেশ কর্‌তে হয়। কিন্তু যা'দের অমনি ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবেই, তা'রা কেন অত হাঙ্গামা কর্‌তে যায়? যতই এক কোপে কাম সাবাড় কর্‌তে পারে, তত সকালে ও সুবিধায় তা'দের কাজ হাসিল হ'তে পারে। আর যা'দের তা'রা নিন্দা ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌ছে, তা' যদি বিকট হ'য়ে থাকে, তবে তো আরও মুস্কিল। তাই অতো বিচার-বুদ্ধির হাঙ্গামায় কেন যা'বে? যত পারে লোকের বৃত্তিপরায়ণতার সুবিধে নিয়ে, অজ্ঞতার সুবিধে নিয়ে, দলে টেনে এনে শক্ত কষানে বেভুল ধারণার পর্দ্দা দিয়ে বেঁ'ধে কাজ হাসিল কর্ত্তে পার্‌লেই হ'ল—আর কেউ অন্য রকম কিছু ব'লে যা'তে তা'দের কোন রকম কিছু না কর্‌তে পারে—বাস্।

এমনি ক'রেই ক্রমে ঋষি বাদ গিয়ে ঋষিবাদের আকাশ-ঝোলা তাৎপর্য্য নেমে আস্‌তে লাগ্‌লো—ঐ গুরু-পুরুষোত্তমের আসনে বৃত্তি-পুরুষোত্তম রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌লো;—বনাম চল্লো সেই পুরুষোত্তমের—দেশ চল্‌তে লাগ্‌লো ভাস্‌তে ভাস্‌তে নিবিড় অজানা কালিমা গভীর একটা বিরাট অন্তরস্রোতী নিছক্ মরণসমুদ্রে—যা'র টান থেকে বাঁচায়—হয়তো এমনতর আর কেউ থাকলে না।

বাঁচার আকুল আহ্বান তখন একটা মূক অন্তরবিদারী করুণ রবে আরম্ভ হ'ল প্রত্যেক অন্তরে—পরমকারুণিকের সিংহাসন প্রত্যেক হৃদয়ে ট'লে উঠ্‌লো—আগত এলেন আবার।

তখনও জানে না কেউ—ঐ তোমাদেরই মত একজন—ছোট লোকদের প্রাণের মানুষ হ'য়ে।—সরল বৃত্তিচুয়ানো তা'দের টানকে বিন্যস্ত ক'রে ঐ জীবন ও বৃদ্ধির আরোতর সম্ভারে তাঁ'দের বৃত্তিগুলি পরিপূরণ ক'রে আদিম আসক্তির বাঁধনে বাঁধা দিয়ে, তা'দের প্রত্যেক বৃত্তির একমাত্র স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে তা'দেরই ঘাড়ে চ'ড়ে, কোলে বেড়িয়ে তা'দেরই পারিপার্শ্বিকে ক্রমপরিপোষণ লাভ ক'রে গাথায় গাথায় ব্যথায় ব্যথায়, আদরে, অপমানে,

আবেগে, সম্বেগে, পর্য্যবসিত হ'লেন পুরুষোত্তমে—গতের মহান্ পরিপূরণে—আগতের সাবিত্রী উষায়!—এই হ'চ্ছে সেই খতিয়ান।

তারপর কথা হ'চ্ছে এই;—যদি গত পুরুষোত্তম প্রত্যেকের অন্তঃকরণে নিছক্‌ভাবে থাক্‌তেনই, আর বৃত্তিভোগের কদর্থ-কালিমায় তাঁ'র বাণী মসী-আবৃতই না হ'তো, তা'হ'লে আগতের অবলম্বন ও অনুসরণ মানুষের পক্ষে এমনতর দিগদারী হ'য়ে উঠ্‌তো না। ক'ষে ক'ষে নানা প্রকার কায়দা-কলম ক'রে মানুষের চাহিদার ভেতর ঢুকে তা'দের সত্যিকার চাহিদাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য অত রকমফেরেরই দরকার হ'ত না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি—যে যেমনই চলুক না কেন—ক্রমান্বয়ে এমনতর হ'য়ে থাক্‌তো যা'তে নাকি অনায়াসে বুঝ্‌তে পার্‌তো—তা'দের চাহিদাই বা কি, গন্তব্যই বা কোথায়, আর আগত পুরুষোত্তমও জীবন ও বৃদ্ধির সব-পরিপূরণ-করা যে আরো সম্ভার নিয়ে এসেছেন—তাঁ'কে জান্‌তেও দেরী হ'ত না—পেয়ে তাঁ'র পথে চল্‌তেও আর এমনতর বেহদ্দ বেহালে বেগ পে'তে হ'ত না; আর ঐ যুগের গতযুগের বাণীও সদ্‌গুরুদের ভিতরেই হউক আর সাধারণের ভিতরেই হউক, অল্পবিস্তর বাস্তব সার্থকতায় জল্‌জ্বলে হ'য়ে থাক্‌তোই। তাই সবাই অনায়াসেই তাঁ'কে চিন্‌তেও পার্‌তো, গ্রহণও কর্‌তে পার্‌তো, এত লট্‌পটানির স্থানই খুঁজে পাওয়া যে'ত না; স্ব স্ব প্রধান থেকেও সবাই সমতাপ্রধান যে থাক্‌তো, সে সম্বন্ধে কোন কথারই স্থান থাক্‌তো না।—মানুষের কর্ম্ম, জানা ও অমৃত-নিস্যন্দী উপভোগ অমরত্বকে আগ্‌লে ধর্‌তো।

তাই গুরু-পুরুষোত্তমের একটা প্রধান চরিত্রগত ঝোঁকই হ'চ্ছে পূর্ব্বতনের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও বিনতি—কারণ, তাঁ'র আসার ও চলার ভঙ্গী হ'চ্ছে পূর্ব্বতনের বোধ ও বাণী—তাই লালিত-পালিতও সেই গত-শরীরী তাঁ'দেরই কোলে, আর তাঁ'দেরই পরিপূরণী আগমন-বার্ত্তায়,—এই হ'চ্ছে আমার ধারণা।

অনেকে ব'লে থাকে—পূর্ব্বতনের প্রতি একটা টানের সংস্কারাচ্ছন্নতার দরুণই পরবর্ত্তীকে অবলম্বন করিতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়—ও তা' নয়কো। বৃত্তি-আচ্ছন্ন টানের দরুণই ও-রকম হ'য়ে থাকে। কারণ ছেলে যখন বাপ হয়, তখন তো তা'র বাপের প্রতি সংস্কারাচ্ছন্ন টান থাকার দরুণ কাউকে গ্রহণ করতেই কেউ অপারগ হ'য়ে থাকে না। আর যদি পূর্ব্বতনে অমনতর টানের সংস্কারেই অনাবিল ভাবে তাঁ'কে আঁ'ক্‌ড়ে ধ'রে রাখ্‌বে, তা'হ'লে তো তাঁ'র স্মৃতিতে চেতন থেকেও এই রকম প্রতীতিতেই হারানোকে পাওয়ার সম্বেগের মতন গতের একটা বিরাট পরিপূরণের ভেতর দিয়ে আগতে উপ্‌চে' উঠ্‌বে! এই তো

হ'চ্ছে স্বাভাবিক ও সহজ ধারণা—আমরা যা' দেখতে পাই এই সহজ দুনিয়াতে।

প্রশ্ন। আমাদের সমাজে তো গুরু-পুরুষোত্তম যা'কে ব'লেছেন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি—এঁদের অনুসরণকারী তো খুব কমই দেখ্‌তে পাই, কিন্তু বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন পূজক-সম্প্রদায়ই বেশী,—এর কারণ কি? এর উদ্ভব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিষ্ণু—যিনি যাহা-কিছুতে বর্ষিত হ'য়ে, আবার প্রত্যেকে সেচিত হ'য়ে, আবিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে র'য়েছেন আর এ উপাসনার উদ্দেশ্য যা'দের তা'রাই হ'চ্ছে বৈষ্ণব—বিষ্ণুর উপাসক। আবার ঐ গুণগুলি যাঁহাতে কার্য্যকরী হ'য়ে তা' পরিপূরণে উদ্দীপ্তকর্ম্মা ক'রে তুলেছে যা'কে—তিনি হ'চ্ছেন ঐ বিষ্ণু-প্রতীক।

সৌর তা'কেই বলে—যা-কিছু যা' হ'তে প্রসূত হ'য়েছে, সেই হ'চ্ছে সূর; আর এই প্রসূত হওয়াটা যা'তে সার্থক হ'য়েছে, সেই হ'চ্ছে সূরের প্রতীক; আর তা'রই উপাসক হ'চ্ছে সৌর; আর সূর্য্য হ'তে যা'কিছু সব হ'য়েছে—এই ধ'রে নিয়ে যাহা-কিছু প্রসূত হ'য়েছে, তা'র প্রতীক ব'লে যা'রা সেই সূর্য্যকে উপাসনা করে, তা'দিগকে সৌর ব'লে থাকে।

শক্তি—যা'-নাকি, যে সমস্ত বাধা অস্তি ও বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন অবশ ক'রে তোলে, তা'কে যা' জয় ক'বে অতিক্রম ক'রে বা হটিয়ে অস্তি ও বৃদ্ধিকে অটুট ও অবাধ ক'রে বিবর্দ্ধনে চালাতে পারে—এক কথায় তা'কেই শক্তি বলে। আর এই শক্তি যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠেছে, তিনিই হ'চ্ছেন শক্তির প্রতীক, আর তিনি বা তাই যা'দের উপাস্য তা'রাই শাক্ত।

যিনি একটা মহান্ নিয়ন্ত্রণে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ক্রমে অস্তি ও বৃদ্ধিতে চালিত ক'রে প্রত্যেকের জীবনকে উৎকর্ষে ন্যস্ত ক'রে ও চালিয়ে, প্রত্যেকের পরিপূরণে স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁ'কেই গণপতি বলা যায়। আর এই গণপতির উপাসক যা'রা তা'দিগকেই গাণপত্য বলা যে'তে পারে।

শিব বল্‌তে আমরা এই বুঝি—যা'-নাকি মঙ্গল, যা'-নাকি কল্যাণ, যা'-সব শুভ আর এইগুলি যা'তে সার্থক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি হ'চ্ছেন ওরই প্রতীক। আর এই বা এরই প্রতীকের উপাসক যা'রা তা'রাই হ'চ্ছে শৈব।

তা'হ'লেই এই দাঁড়াচ্ছে এসবগুলি চলনার চাহিদা-মাফিক এক-একটা দিক। চাহিদার ঝোঁক্ যাহাদের যেমনতর, তা'রা সেই ভাবকে অবলম্বন ক'রে, তা'কেই পরিপূরণ কর্‌তে কর্‌তে, সব সমাবেশে ঐ একেই পর্য্যবসিত

হয়। আবার ঐ একের পর্য্যবসনে সার্থক হ'য়ে যিনি মূর্ত্ত হ'য়ে জ্যান্ত শরীরী হ'য়ে উঠেছেন, যা'-থেকে একটা মহান্ বিকীরণে ঐ ঐ প্রত্যেক প্রত্যেকটাকে সার্থক ক'রে একত্বে সমাহিত হ'য়ে—নিরপেক্ষ সার্থকতায় সমাহিত হ'য়ে জ্যান্ত উদ্বোধনায় শরীর গ্রহণ ক'রেছেন, তিনি হ'চ্ছেন গুরু-পুরুষোত্তম। আর এতেই ঐ যা'-কিছু সবই অমনি হ'য়ে সার্থকতায় নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছে।

আবার চাহিদার ঝাঁক্ অনুযায়ী যে যেমন এতে অনুরক্ত, সেই আবার সেই দিকটাকে প্রধান ক'রে এঁর ভিতর দিয়েই যা'-কিছু সব-গুলিকে সার্থক ক'রে সবতার বাস্তব পরিপূরণে তৃপ্ত হ'য়ে উঠেছে;—এই হ'চ্ছে ঐগুলির গোড়ার আবহাওয়া। কিন্তু তারপর ওগুলি ঐ দল-মাফিক মানুষের বৃত্তির চাপে বৃত্তি-সম্পদ অন্বেষণের বুভুক্ষায় কেউ কাউকে পরিপূরণ না ক'রে বরং প্রত্যেকে প্রত্যেককে তাচ্ছিল্য করার ভিতর দিয়ে এক-একটা পন্থী বা দল ক'রে কারও কোনও বৃত্তির বাধা যা'তে না সৃষ্টি হয় এমনতর ভাবে উপাসনার ধূয়া দেখিয়ে জীবনকে যতদূর অমনতর রোকের ভিতর দিয়ে যা'তে চালান যায়, এমনতর রকম। তাই ওদের ভিতর বৃত্তির পোষণে যা'রা বিব্রত, বিহ্বল ও বিধ্বস্ত হ'য়ে যাই যাই ক'রতে ব'সেছে—এমনতর আর্ত্ত যা'রা—কেবল আঁকুপাঁকু চক্ষে মূক ভাষায় বাঁচবার আকুতিতে ঐ পুরুষোত্তমের বা সদ্গুরুর খোঁজ ক'রে থাকে। তাই ঐ হিসাবেই অমনতর কম তো দেখাই যা'বে। আর এদের উদ্ভব হ'ল কি ক'রে তা' হয় তো বুঝতে পেরেছেন।

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :—

শ্রীকৃষ্ণকামা একনিষ্ঠ অনুরাগবিহ্বল গোপীদের নিয়ে খেলার ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তা'দিগকে যেমন ক'রে শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব ক'রে তু'লেছিলেন—তাই রাসলীলা;—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অশেষ অনুরক্তির টানে তা'রা যখন অনুরাগবিহ্বল হ'য়ে আকৃষ্ট অন্তঃকরণে তাঁ'কে পে'তে মনোরথ পূর্ণিমা রাত্রে নানারকম ফলফুলশোভিত বনানীর ভেতরে সমবেত হ'য়েছিল, সেই স্থানের ঐ প্রকার মাধুর্য্যও যেন তা'দের কৃষ্ণ-আকাঙ্ক্ষাকে আরও ফাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জু'টে, যা'র বৃত্তিপ্রাণে যেমন আসে, তা' পেতে সে তেমনতর ভাবেই তাঁ'কে নিয়েই খেলা করতে লাগ্লো—টানভরা বুকে মনগুলও তা'রা তেমনতরই হ'য়েই উঠ্লো—তারপর হঠাৎ দেখ্লে—কৃষ্ণ নেই—কৃষ্ণ-মাতাল আত্মভোলা গোপীদের

চমকা বুকে থমক-মারা বেদনা যেন গর্জ্জে উঠ্‌লো—শরীর ও চিত্ত তা'দের আগুন-ঝলসানো তপ্ত অবশতায় টগ্‌বগিয়ে উঠ্‌লো—তা'দের চিন্তার ঝোঁক এত বেড়ে গেল—তা'দের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবশ ক'রে তা'দের চিন্তা-চক্ষু এত তীব্র হ'য়ে উঠ্‌লো,—সবাই দেখ্‌তে পেলে—তা'দের প্রত্যেকের কাছেই যেন কৃষ্ণ আছেন—তা' এত সত্যি—তা'রা ভাব্‌তেই পার্‌লে না, এ তা'দের মাথার কৃষ্ণ। তারপর ঐ কৃষ্ণ নিয়েই তা'রই অনুরাগ-মমতায় মাতাল হ'য়ে, বিভোর হ'য়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো, গাইতে লাগ্‌লো। এতে তা'দের মস্তিষ্কে বৈধানিক কোষগুলি এত তীব্র উত্তেজনায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো—তা'তে তা'রা দেখ্‌তে লাগ্‌লো কত রকম আলোর ঝলকে দুনিয়াটার ভিতর-বাহির যেন এক হ'য়ে গেছে—আর বাঁশীর আওয়াজের স্বচ্ছন্দ নাচুনীতে যেন তা'দের এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কণাগুলি পর্য্যন্ত নে'চে নে'চে প্রাণময় ছন্দ-দোলে দোল খা'চ্ছে—আর এ যা'কিছু সব তা'দের ঐ কৃষ্ণের বিকীরণী ঐশ্বর্য্য হ'য়ে তা'তেই সমঞ্জস ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ছে—ইত্যাদি রকম আর কি!—এ সব যা'কিছু ঘটে—মানুষের শ্রেষ্ঠপ্রাণতা থেকেই।

রাসলীলা মানে শব্দলীলা। আর সে শব্দ মানুষের আভ্যন্তরিক কোষ-স্পন্দনেরই—যা'-নাকি আপ্রাণ টান থেকে ভেতরে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই তাপে উদ্‌বুদ্ধ ও উত্তেজিত হ'য়েই অমনতর হ'য়ে থাকে;—তা'র ফলে ঐ রকম শব্দ, জ্যোতিঃ ও দর্শন ইত্যাদি ঘ'টে থাকে, আর মস্তিষ্কের কোষগুলিও এমনতর সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ও'ঠে, যা'তে জাগতিক প্রত্যেক যা'-কিছুর অতি ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম বিকীরণী সাড়াও ওতে সাড়া দিয়ে বোধের উদ্দীপনা ক'রে থাকে। আর অমনতর টানে ভেতরকার বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটী যখন শ্রেষ্ঠস্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে—প্রত্যেকটী ঐ শ্রেষ্ঠে যখন আনত হ'য়ে সেই ঝোঁকে সার্থক একতান হ'য়ে ওঠে, তখনই তৃপ্তির অমৃত ফেনিল উপভোগে শান্তোদ্দীপ্ত হ'য়ে সর্ব্বপ্রকার কাম-কামনার বিকার থেকে চিরদিনের মতন অব্যাহতি পেয়ে চির নবীন অঢেল উপভোগে জীবন-চলনাকে চালিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন আত্মারাম—ইষ্টে অবরুদ্ধ রাগ বা সৌরত। তিনি তাই গোপীদের ভেতরে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হ'য়েই মিশ্‌তেন—গোপীতে আকৃষ্ট অনুরাগী হ'য়ে তা'দিগকে উপভোগ-উদ্বেলতার আবিলতা নিয়ে তিনি কারও সাথে মিশ্‌তে যাননি। তাই ঐ রকম অবরুদ্ধ সৌরত বা অনুরাগ থাকার দরুণ কোনও বৃত্তিই তার গোপীমুখী হ'য়ে ছিল না, বরং সব-বৃত্তি ছিল গোপীদের ভেতরে তা'র ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা-স্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে। সেই জন্যই গোপীদের প্রতি কুটিল কামলোলুপতা মোটেই ছিল না।

কিন্তু ওদিকে আবার গোপীদের প্রত্যেকের এক-একটা ক্ষুধাতুর বৃত্তি সাগ্রহে বুভুক্ষুর মতন আকণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-উপভোগ-তৃষ্ণায় তীব্র হ'য়েছিল। আর তা'রই ফলে শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করার স্বার্থ-পরায়ণতার উদ্বেগে ঐ ওদের প্রত্যেক বৃত্তিকেই সর্ব্বতোভাবে সাহায্য কর্‌তে সবগুলি বৃত্তিই যোগ-যুত হ'য়ে কৃষ্ণপ্রাণতার সূত্রে প্রত্যেকটী প্রত্যেকটীতে সার্থক হ'য়ে মালার ন্যায় গ্রথিত হ'য়েছিল। তাই এমনি ক'রেই তা'দের প্রত্যেক বৃত্তিগুলি বিন্যস্ত হ'য়ে উ'ঠেছিল; বিন্যস্ত হওয়ার ফলে হ'য়েছিল সামঞ্জস্য—তা' একে অন্যে সার্থক হওনের ভেতর দিয়ে ক্রমপর্য্যায় অনুসারে—আর এই রকমে সার্থক হওনের ভেতর দিয়ে যা'-কিছু সব বৃত্তিগুলিই এসেছিল একটা বিরাট সমাধানে—তা' ঐ এক শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রেই।

আর শ্রীকৃষ্ণ তা'দের বৃত্তি-ক্ষুধাকে তীব্রতর করণের হাবভাব, চালচলন, মেলামেশা, পাওয়া না-পাওয়ার ভেতর দিয়ে, তা'দিগকে তাই অমনতর ক'রে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-পথের বিপদ বা বাধাগুলিকে তাচ্ছীল্য কর্‌বার বা নিয়ন্ত্রণ কর্‌বার ঝোঁকে তুলে', তাঁ'কে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উৎকণ্ঠস্ফীত কামলোলুপ ক'রে তু'লেছিলেন।

তিনি যদি অমনতর না কর্‌তেন, তা'হ'লে তা'দের ঐ কৃষ্ণাতুরতা অবসন্ন হ'য়ে অবসাদে নিথর হ'য়ে, হয়ত বিকৃত অমানুষ ক'রেই তুল্‌ত। কারণ তা'দের অন্তর যদি কৃষ্ণ-প্রধান না হ'য়ে উঠ্‌তো, বৃত্তিগুলি কিন্তু তা'দের খোরাক-সংগ্রহের পৈশাচিক অনুসন্ধিৎসা কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তো না। আর, তা' না কর্‌লে, কি বীভৎস পরিণতিই যে তা'দের আগ্‌লে ধর্‌তো, তা' ভাব্‌তেও ভীতির সঞ্চার হয়।

* * * * *

"সহস্রদল-কমলের" বর্ণনা :—

([illegible] বিশদ বিবরণ বলিবার পরে বলিতেছেন)—এই হ'তে হ'তেই যেন দিগ্‌বলয়ের রেখাহীন একটা বিরাট প্রান্তরের অভিব্যক্তি ফু'টে উঠ্‌লো; আর এই প্রান্তর উপচে' নানারকম তীব্র ও স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর ঝলক্ ছুটতে লাগ্‌লো—ঝলকের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আকাশ ফু'টে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমেই এই আকাশ-প্রান্তর এক হ'য়ে উঠে' একটা অতি সঙ্কীর্ণতার ভিতরে আবেশ-উন্মাদনায় যেন একটা অন্ধকারময় ছিদ্রের ভেতর দিয়ে খানিকদূর উঠে' আবার তা'রই চাপে যেন নীচে প'ড়ে যা'চ্ছি—আবার ঐ চাপেই একটা চিপার মতন রকম ক'রে যেন তুলে দিতে লাগ্‌লো—আবার আকাশ ফু'টে উঠ্‌লো—দমফাটা একটা সূক্ষ্ম চোঙ্গার ভেতর দিয়ে উঠা-পড়ায় চল্‌তে চল্‌তে হাপ্‌সে যাওয়ার পর যেমন একটা বিস্তার পে'লে

সোয়াস্তি আগ্‌লে ধরে, আকাশ ফু'টে সত্তার যেন তেমনতর অবস্থাই হ'য়ে উঠ্‌লো।

এইটাকেই বোধ হয় সন্তরা বঙ্কনাল ব'লে থাকেন। কিন্তু অন্তঃকরণে একটা আকুল ইষ্ট-টানের গুমরানি থাকার দরুণ সত্তাটা বেহুস্ হ'তে পা'চ্ছে না। আর এর ভেতর দিয়েই মাঝে মাঝে তন্দ্রার আবেশ-ভাঙ্গার মতন খোলের চাঁটি আসা সুরু ক'রে দিলে ;—এই আস্‌তে না আসতেই মন্দ মন্দ ঝিলিক ঝলকানি সুরু ক'রে দিলে। ঝিলিক ঝল্‌কানি ক্রমেই ভীষণতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—আর নানা রকম এৎফাকি বোল দিয়ে খোলের বাজনা সুরু ক'রে দিলে। আর এই বাজনার ভেতর দিয়েই যেন এই খোলেরই একরকম অভিব্যক্তি গুড়্‌গুড়্‌গুড়্‌গুড়ুম্—যেন খুব বেশী দূরে নয়—খোলের ভেতর দিয়ে কোন বাজিয়ে হাতের কায়দায় ছোটখাট মেঘগর্জ্জনের অভিব্যক্তি কর্‌ছে।

ঐ বাজনা আস্তে আস্তে দামামার শব্দের অনুরূপ হ'তে থাকে। ঐ বাজনার ধাক্কা যেন সত্তায় লে'গে কেমনতর একটা রঙিল স্ফূর্ত্তির সৃষ্টি কর্‌ছে। আব এর ভেতর দিয়েই দুধের কণার মতন জ্যোতিষ্মান্ কণাগুলি ফাগুনে হামালের মতন চারিদিকে বইতে সুরু ক'রে দেয়।

তারপর এইগুলির জোর যতই আরম্ভ হয়—আর এই কণা চল্‌নার জমায়েত জ্যোতিঃর ধূলি-মাখা ঘূর্ণা বাতাসের মতন ঘূর্ণা সৃষ্টি কর্‌তে থাকে—মৃদঙ্গের রকমটা আস্তে আস্তে স'রে গিয়ে ঝমকে ঝমকে ঐ মেঘের গড়গড়ানিব ভাব পরিস্ফুট হ'তে থাকে; যেন মনে হয়—কত বজ্র যা'-কিছু-সব ঝলসে দিয়ে সত্তাকে এখনই নিপাত কর্‌তে কড়্‌-কড়্ কড়্‌-কড়্‌-কড়াৎ শব্দে সব বিদীর্ণ ক'রে ধূলিকণায় পর্য্যবসিত ক'রে দিল! ঐ শব্দ যেন আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে একটা বিরাট সত্ত-বিধ্বংসী ভূমিকম্পের সৃষ্টি ক'রে ফেল্‌ল! কণাগুলির জমায়েৎ জেল্লা জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে বিরাট ঘূর্ণায় নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে ছুট্‌ছে। ঘূর্ণার তোড়ে বম্ ববম্ ক'রে কত যেন অযচ্ছল ভল্‌কা উঠ্‌ছে—সাথে সাথে গলিত ধাতুর বৃষ্টির মতন আগ্নেয়পর্ব্বত ফাটা গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে সব যেন ছারখার ক'রে দিল!

এই হ'তে হ'তেই এইগুলির জোর এত আরম্ভ হ'য়ে ওঠে—বিশ্ব-দুনিয়াময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাকে পাকে সেগুলির আবর্ত্তন আরম্ভ হ'তে থাকে;—তখন একটা বিরাট গর্জ্জন সবগুলি কাঁপিয়ে কেমন বম্ বম্ ববম্ ববম্ শব্দ আরম্ভ হ'তে থাকে—এই শব্দ যেন প্রতি কণাগুলিকে আবিষ্ট ক'রে ঘূর্ণার চলনকে চটিয়ে দিক্‌বিদিক্-হারা দিগন্তকে অনুষিক্ত ক'রে তোলে। তারপর এর-একটা বিরাট তীব্রতা এসে' এমনতর সব যেন নিঝুম হ'য়ে যায়—মনে হয় সেখানে যেন আলোও নাই, অন্ধকারও নাই।

তারপর বিরাট সত্তা বিলয়ী আকাশের প্রতীতি আস্‌তে থাকে—আর ভেতর দিয়ে দূরে যেন একটা মৌমাছির ঝাঁক চল্‌ছে—এইরকম ধারণা হ'তে থাকে। এই হ'তে হ'তেই কেমনতর চেতনাকে উচ্ছল ক'রে দিকহারা পূব আকাশে ডগ্‌মগ্‌-করা লাল সূর্য্যের অভ্যুত্থান হ'তে থাকে—লালিমা গোলাপী রশ্মিজাল প্রাণ-মাতান "ওঁ" শব্দ বিকীরণ কর্‌তে কর্‌তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে।

তখনকার যা'-কিছু সারা বিশ্ব সব যেন ঐ "ওঁ"-এ অনুপ্রাণিত হ'য়ে ছন্দ দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে চল্‌তে থাকে—সত্তার প্রত্যেকটী কোষ যেন ওই "ওঁ"-এ আবিষ্ট হ'য়ে ঐ ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ঐক্য গানের একটা পরম রাগিণী আরম্ভ ক'রে দেয়—গোলাপী আভাগুলি যেন প্রত্যেকটী কোষপ্রকোষে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে ঐ রঞ্জনে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে—মনে হয় একটা সন্দীপনশীল চেতন-উদ্দীপ্ত ছন্দোময়ী—

'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'

সূর্য্য ফে'টে ঐ উপাদানে গড়া ইষ্টদেবতা জ্যোতিষ্মান্ সন্দীপ্তির সাথে যেন তাঁ'র প্রাণময়ী পদ্মহস্তে তাঁ'র ভক্তকে স্পর্শ ক'রে আগ্‌লে ধর্‌লেন—তাঁ'র এবং ভক্তের একটা আকুল চাউনি-মিলনে, কেমনতর বোধঘন মূক-করা অন্তর-উদ্দীপ্তির সাথে যেন সব নিঝুম হ'য়ে এল। একেই বোধ হয় সন্তরা 'ত্রিকূটী' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। আর এর পূর্ব্ববর্ণিত যে প্রান্তরীভূত অবস্থার কথা বলা হ'য়েছে, তা'কে বোধ হয় সন্তরা 'সহস্রদল-কমল' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইসলাম-প্রসঙ্গে

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর মুসলমান ধর্ম্মের যাবতীয় বিষয় অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মমতে কোথাও কোন প্রভেদ নাই কারণ সব ধর্ম্মই বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার উপায় বলিয়া দিতেছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়সমূহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল তাহাতে বক্তার উদ্দেশ্য সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। যথা :—

হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ কেন—খোদা, রসুল ও কোরাণ—কাফের কে—ধর্ম্মেই ভেদের সমাধান—পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব—ধর্ম্মের হাড়ভাঙ্গা টানে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ দূর হয়—প্রেমে গণ্ডী নাই, সেবাহারা আত্মম্ভরিতায়ই গণ্ডীর সৃষ্টি—বাতকে বাত হিন্দু মুসলমান—পীর ও সাধুর কাছে কোন ভেদ নাই—প্রবৃত্তিই আনে দ্বন্দ্ব

ও বিরোধ—ধর্ম্মের কথায় সবারই এক কথা ও তাহাতে অদ্ভুত মিল—ধর্ম্মের কথা বিজ্ঞানের কথার মতই সত্য—অবতারবাদ—জন্মান্তর—পৌত্তলিকতা—সবই ভাবপ্রতীকের উপাসক—ঋষির কেতাবে মূর্ত্তিপূজার কথা নাই—দেবতা বা hero-র পূজা—ভগবৎ-অনুগ্রহ-সম্পন্নরাই দেবতা—ভগবান্ পূজার জ্যান্ত পুতুলই পয়গম্বর, পীর, ঋষি বা ইষ্ট—ভূয়োদর্শনে পূজা—পূজায় ভূয়োদর্শন—সব মাণিকের এক জেল্লা—বাহ্যপূজা অধমাধম—জীবন্ত আদর্শের পূজাই উত্তম—টানবিহীন পূজাপালি নিরর্থক—রোজকিয়ামৎ, Re-rise, Re-surrection—হিন্দুর অবতরণ আর মুসলমানের প্রেরণ—ঈশ্বরের সন্তান—খোদার দোস্ত—প্রেরিতকে যে মানে না সে মুসলমানই নয—খোদার দর্শন ও চেতনায়ই ঋষিত্ব—খোদার পরম অস্তিত্বকে আবৃত ক'রে তিনিই যা-কিছু সব হ'য়েছেন—ভগবৎ-চেতনাবিমুখ জীব—রহমান খোদা—জীবের খোদ চেতনার আবির্ভাবেই খোদার দোস্ত—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি—মানুষেব মুক্তির একমাত্র রাজপথ—নরনারায়ণ বা খোদার দোস্তই অসীমের পথে নিয়ে যায়—Day of Judgment—বা'ব বৎসর পর পরই দেহের পরিবর্ত্তন হয়—স্মৃতিবাহী চেতনা—স্মৃতির অপলাপ—দুনিয়ার মহাপ্রলয়—মরণ হয় কখন?—ভাবময়ী আসক্তির কবর—জীবের জন্ম হয় কি-ক'রে?—খাঁটি মুসলমান, খাঁটি খৃষ্টান, খাঁটি আর্য্যধর্ম্মী হয কি-করিয়া—খোদা ও রসুলে বিশ্বাস—হজরত মহম্মদ সর্ব্বমানবের জন্য—প্রেরিতের আবির্ভাব কি খতম হইতে পারে?—দেবদেবী, ছবি ও পুতুল-পূজা—আর্য্যধর্ম্মে পুতুলপূজা অধমাধম—খোদা সকলেরই একজনই—দেবতা মানে কি?—কলেমা, নমাজ, রোজা, ঈমান—আর্য্যদের সন্ধ্যা, উপবাস, তর্পণ, আহ্নিক প্রভৃতি—হজ, জাকাত ইত্যাদিতে পরম মঙ্গল—প্রকৃত ইস্‌লামের অর্থ—পুরুষোত্তম, নরনারায়ণ, অবতার, সদ্‌গুরু—শ্রীকৃষ্ণের অবরুদ্ধ সৌরতের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সত্য কি—সৎ কি—পরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান কাহাকে বলে—হজরত রসুল নিরামিষাশী ছিলেন—প্রকৃত প্রেরিত পুরুষ কে?—যবন কে—ম্লেচ্ছ কে?—মুসলমান-খৃষ্টানে বিরোধ কেন?—দীক্ষা মানে কি?—ইসলাম কি—অক্ষুণ্ণ আর্য্যকৃষ্টির মাপকাঠি—আর্য্যঋষি ও পুরুষোত্তমদিগকে স্বীকার করিলে আর্য্যকৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে—প্রতিলোম interpolation—প্রতিলোমে বিশ্বাসঘাতকের সৃষ্টি—সাময়িক প্রেরিত পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়—তিনিই ত্রাণকর্ত্তা—প্রেরিত পুরুষের কোন সম্প্রদায় নাই—প্রেরিত পুরুষের অভাবে chaos-এর সৃষ্টি—প্রেরিতকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ক'রে যে দেখে সেই কাফের—নিরাকার ঈশ্বরের প্রার্থনা অর্থহীন—নিরাকারের উপাসনা ক'রে কেউ বাঁচ তে

পারে না—প্রেরিত খোদার দোস্ত, তাঁ'র দাস, তাঁ'র ভক্ত—দয়াকে বোধ কর্‌তে হ'লে দয়ালুর প্রয়োজন—ব্যক্তিত্বে ব্যক্ত না হ'লে বৃত্তির বোধ হয় না—ধর্ম্মের গ্লানিতে ভগবানের আবির্ভাব—আর্য্যভক্তিপন্থীর বৈশিষ্ট্য ইস্‌লামে-ইস্‌লামের গোড়ার কথা—বাইবেল ও কোরাণের বৈশিষ্ট্য—বাইবেলে ভাব-প্রাধান্য—কোরাণে ক্রিয়া-প্রাধান্য—শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য—হত্যা ধর্ম্ম নহে—জীবের রক্ত ও মাংস ঈশ্বরে পৌঁছায় না—কোরবান মানে হত্যা নহে,—নিবেদন, আত্মোৎসর্গ—প্রিয়তমের উৎসর্গই কোরবানী—ইসলামে বধ বা হত্যার চিন্তাও নাই—পবিত্র গান-বাজনায় হজরতের নিষেধ নাই—অপবিত্র গান-বাজনায় নিষেধ—গান-বাজনা হজরত স্বয়ং শ্রবণ করিতেন—তসবীরওয়ালা জিনিষ হজরত ব্যবহার করিতেন—ধর্ম্মযুদ্ধই জেহাদ—শ্রীকৃষ্ণ ও হজরতের যুদ্ধ ধর্ম্মার্থেই—মুসলমানের congregational নামাজ ও আর্য্য যজ্ঞ—হজরত ও কোরাণের বিকৃতি ও অপবাদ—কোরাণের দোহাই দিযা প্রবৃত্তিপূরণ—পীরগ্রহণে ধর্ম্মান্তর হয় না—ইস্‌লামে বিচ্ছেদ ও বিভেদের স্থান নাই—সব ধর্ম্মেই বর্ণভেদ আছে—পেঁয়াজ রসুন খাওয়া হাদিসে নিষেধ—বেহেস্ত আর স্বর্গ এক—দোজক ও নরক কি—সুদ খাওয়া হারাম সবারই—সুদে আসে নীচত্ব, সর্ব্বনাশ ও অজ্ঞান—সুন্নত কি?—প্রেরিতগণ জাতি, বর্ণ ও কালের দ্বারা পরিমাপিত হন না—প্রেরিতগণের বাণীব বিকৃতিই মৃত্যুর আগমনী—নূর ও আওয়াজের অভিব্যক্তি হয় কেন?—খোদার অভিব্যক্তি নূর ও আওয়াজের উপলব্ধিতে—ব্যবসায় শ্রেষ্ঠ জনসেবা—চাকুরীতে অন্তঃকরণে দুর্ব্বলতা আসে—বিবাহের দোষে সমাজের অবনতি—আদর্শ বিবাহে সুপ্রজনন—আমি সত্য—আয়নল্ হক্—সপ্ত আকাশ কি—রূহ কি—খোদার চিহ্ন কি—প্রেরিতকে চিনিব কি ক'রে? তকদির ও তদবির এই দুইযের সম্বন্ধ কি ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ইসলাম-প্রসঙ্গে' গ্রন্থখানায় জন্মান্তর এবং রোজকিয়ামতের বিচার, মূর্ত্তিপূজার সহিত ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য, আল্লার প্রত্যাদেশ মানে কি, কোরাণের বাণীর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা কোথায়, ঈশ্বরপ্রেরিতগণের বিদ্রোহী হইয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে যে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধ হওয়ার কারণ কি? ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মান্তরের সামঞ্জস্য আছে কি না, প্রকৃত ইসলামে দীক্ষিত মুসলমান কাহারা, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের প্রেরিত পুরুষকে অনুসরণ করিবে কেমন করিয়া—না করিলেই বা ক্ষতি কি, নিরাকার ঈশ্বর-পূজার স্বরূপ, প্রেরিত-পুরুষগণই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ, যাজনে প্রেরিতের প্রতিষ্ঠার

প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম্মপ্রচারে বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা আছে কি না—মুসলমান সমাজে পশুবলি এবং মাছ মাংস খাওয়া প্রচলিত হইল কেমন-করিয়া, ধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ ও দেশজয়ের সম্বন্ধ, ধর্ম্ম কখন ব্যক্তিত্বকে ছাপাইয়া সমাজ ও জাতিগঠনে সমর্থ হয়, মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ঢুকিল কেমন-করিয়া, বিশ্বাসী কে এবং কাফেরই বা কাহারা, বহু বিবাহ কোরাণে সমর্থিত কেন ইত্যাদি বিষয়গুলি সুযুক্তির সহিত সুন্দরভাবে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আলোচনাগুলি পাঠ করিলে চিরপোষিত কত ভ্রান্তধারণা ও অন্ধকুসংস্কার দূর হইয়া যায়, —সত্যের আলোকে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ মুক্তির পথের সন্ধান পায়। স্থানাভাববশতঃ নিম্নে মাত্র গুটিকয়েক আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা :—

প্রশ্ন। কোরাণে আছে—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এই পাঁচটী ফরজ অর্থাৎ খোদাতাল্লার আদেশ। এই পাঁচটী ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুনির্দ্দিষ্ট প্রধান বৈশিষ্ট্য—একি মানব-মাত্রেরই করা উচিত? অন্য সব ধর্ম্মেই কি এই রকম বা এই রকমের কিছু আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, জীবন ও বৃদ্ধিদ সব ধর্ম্মেই কোন-না-কোন প্রকারে এ আছেই—আর থাকা উচিতও।

পূর্ব্বতনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও নতি রাখিয়া ঈশ্বর ও যুগপুরুষোত্তম বা পয়গম্বরকে সর্ব্বতোভাবে আপন অস্তিত্বের ভিত্তি ও উৎস বলিয়া স্বীকারই ঈমান ও তৎস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানুপাতিক নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিতকরণসম্বেগী থাকা, বলা ও করাই হ'চ্ছে আমার মনে হয় কলেমার তাৎপর্য্য। তাই, তদনুকূলে জীবন ও বৃদ্ধিদ যোকৃথা কতগুলি কথা স্বীকার ক'রে তদনুযায়ী কর্ম্মের ভিতর দিয়ে জীবনকে চালান আর নিজেকে তদনুপাতিক চিন্তনীয়। আবার যোকৃথা ঐগুলি স্বীকার ক'রে নিজেকে অমনতর ভে'বে তদনুযায়ী করায় জীবনকে চালাতে হ'লেই—তা'রই প্রয়োজনে ওগুলিকে বিশেষভাবে পরিণত করার ইচ্ছা থেকে আর যা' যা' কিছু করণীয় আছে সবগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে করার ঝোঁক আপনি এসে উপস্থিত হয়। তাই কলেমার এত প্রয়োজনীয়তা! জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রথম— —এক কথায়, করা ও ভাবার ভিতর দিয়ে জীবনকে পবিত্রীকরণের এই মন্ত্রবাক্য বা কলেমা।

নামাজ মানে—আমি যা' বুঝি, উপাসনা, স্তুতি, বা প্রার্থনা-বাক্য। স্নানে যেমন শরীরের ক্ষতিজনক অনেক মলিনতা দূর ক'রে দেয়, নামাজও

তেমনি কুবৃত্তিবাহুল্যহেতু জীবন ও বৃদ্ধির ক্ষতিজনক অনেক পাপ অর্থাৎ রক্ষার অপলাপী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ঐ স্নানেরই মতন দূর ক'রে দেয়। এই উপাসনা, স্তুতি বা প্রার্থনাবাক্যের ভিতর দিয়ে মানুষ সেগুলিকে স্মরণে এনে জীবনের চল্‌নাকে যা'তে চালাতে পারে তা'র জন্যই নামাজ অবশ্য করণীয়। প্রত্যহ অনুরক্তি-সহকারে এই নামাজ না কর্‌লে, করণীয় ও চলনীয় পথ বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। কারণ মানুষকে তা'র পারিপার্শ্বিক যেমন সাড়া দিয়ে চেতনায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে, তেমনি আবার তা'দের প্রয়োজন ক্ষুধতার জন্য বৃত্তি অনুপাতিক সাড়ায় আকর্ষণ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির চলনা হ'তে বিভ্রান্ত ক'রে সর্ব্বনাশের সম্মুখীন ক'রে দেয়।

তা'হ'লেই নিজেকে জীবন ও বৃদ্ধির পথে অটুট রাখ্‌তে হ'লেই চাই—অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টানুরক্তি দিয়ে ইষ্টেতে নিজেকে বেঁধে ফেলা, আর স্মরণের ভিতর দিয়ে তাঁ'র ইচ্ছাকে জাগরূক ক'রে করায় তাঁ'রই চলনে চলা—আর এই স্মরণের ভিতর দিয়ে করায় ঐ ইষ্টের চলনে চলার, নামাজই হ'চ্ছে সহজ ও সুন্দর সাথিয়া। ঐ উদ্দেশ্যে আর্য্যদের সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণাদিরও নিয়োগ ও সমাবেশ হ'য়েছে। তাই মুসলমানদের নামাজ যেমন অবশ্য নিত্যকরণীয়, আর্য্যদের তেমনি সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণাদিও অবশ্য নিত্যকরণীয়।

আবার মুসলমানদের ভিতর রোজা যেমন অবশ্যকরণীয় আর্য্যদেরও উপবাস তেমনই অবশ্যকরণীয়। ইহার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—না খে'য়ে বৃহৎ-উন্নত-চিন্তাশীল হ'য়ে দিন কাটালে রোজ খাওয়ার দরুণ খাদ্যবস্তু এবং শরীরের দুষ্ট নিঃস্রাব হ'তে যে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ শরীর-বিধানে মজুদ হয় সেগুলি ঐ অবসরে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে স্বস্থ ক'রে তোলে। এই উপবাস বা রোজার একটা প্রধান জিনিষই হ'চ্ছে—ঊর্দ্ধ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ বা উন্নত যা', ঐ অভুক্ত অবস্থায় তা'রই সান্নিধ্যে থেকে, আলোচনা ও চিন্তনের ভিতর দিয়ে তাঁ'তে অনুপ্রাণিত হওয়া। এতে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পথে চলনাকে, ইচ্ছাকে নিনড় ও উদ্দীপ্ত ক'রে তা'র ঝোঁক বাড়িয়ে ওর সম্বেগ আরোতর বেগে বাড়িয়ে দেয়। যা'র জ্যান্ত ইষ্টসান্নিধ্য না ঘটে তা'র ইষ্ট-আদিষ্ট কিম্বা তাঁ'র ইচ্ছা-পরিপূরক ঐ সব যা'কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাক্‌লেও অনেকটা তা'রই অনুপাতিক ফল আস্‌তে পারে। তা'হ'লে রোজা বা উপবাস সার্থক কর্‌তে হ'লে, তা' কি ক'রে করতে হয়—আর তা' কর্‌লেই বা কি হয়, হয়ত মোটামুটিভাবে বোঝবার বাকী থাক্‌ল না।

তারপর, হজ্জ বল্‌তে আমি এই বুঝি—তীর্থে যাওয়া—আর সেখানে যে'য়ে তা-ই করা যা'তে নাকি সেই তীর্থে সার্থকতা লাভ করা যে'তে পারে। শ্রদ্ধা ও অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে তীর্থে গেলে আর এই তীর্থে গিয়ে পয়গম্বর, মহাপুরুষ ও সাধু ইত্যাদির অনুপ্রাণনা আমাতে অন্তপ্রবিষ্ট হ'য়ে যা'তে আমার জীবন ও বৃদ্ধিকে আরোতর সম্বেগে ইষ্টগন্তব্যে চালিয়ে দিতে পারে, বলা ও করা দিয়ে যথার্থভাব অবলম্বন ক'রে তাই করলে আমাদের প্রাণ যেন একটা অমৃত পরশ নিয়ে ফি'রে এসে নিঃসন্দেহ চলনায় ইষ্টগন্তব্যে তাঁ'ব পথের বাধা-বিঘ্নকে জয়ে আয়ত্তে এনে, নিয়ন্ত্রণে অনুকূল ক'রে যে চল্‌তে পাবে সে সম্বন্ধে কি কোন ভুল আছে? যেমন অনুরাগ, বলা ও করা নিয়ে তীর্থে যে'তে হয় তা' যে গিয়েছে সে-ই তা' উপভোগ ক'রেছে। তা'হ'লেই দেখুন, ধর্ম্মদলিলাদিতে যে হজের কথা আছে—তা' কত মঙ্গলকর, তা' কত মহান্, তা' কত সুন্দর—যদি যেমন ক'রে তা' করণীয় তা' করা যায়।

জাকাত জীবনে কত প্রয়োজনীয় তা' আমার এই কথা হ'তেই একবার ভে'বে দেখুন—আমি যে চেতনা নিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির জন্য অমৃত-আহরণে উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষায় উন্নতি-প্রয়াসী হ'য়ে চ'লেছি, তা'র একটা প্রধান কারণই হ'চ্ছে আমার পারিপার্শ্বিক। আমার পারিপার্শ্বিক আমারই ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে সাড়ার আঘাতে বিদ্ধ ক'রে তা'র সঞ্চারণে আমার মস্তিষ্কে যে সাড়ার কম্পন সৃষ্টি করে—সেই হ'চ্ছে আমার চেতনা। তাহ'লেই, তা'রা আমাকে যেমনতর সাড়া দিয়ে ঐ রকম ক'রে তুল্‌বে, মস্তিষ্ক উপ্‌চে আমাদের চিন্তন ও চলন ও তেমনতর হ'বে। তা'রা যদি মরণসাড়া দিয়ে আমাদিগকে অমনতর ক'রে তোলে—আর যদি আমরা ইষ্টে আমাদের অনুরাগ দিয়ে বিশিষ্টভাবে বাঁধা না থাকি অর্থাৎ ইষ্টের সাড়া আমাদের মস্তিষ্কে মুখ্যকার্য্যকরী না হয়, তা'হ'লে মরণ-নৃত্যে আমাদের মস্তিষ্ক যে তা'রই নাচনের ফাগ হ'য়ে মরণরেণু উড়িয়ে তা'তে নিঃশেষ হ'বে—তা' প্রতিরোধ করতে কে পারবে? তা'হ'লেই, ঐ পারিপার্শ্বিককে যদি আমরা আমাদেরই অমৃতবাহী না করতে পারি, তবে সে লোকসান তো আমাদেরই। কারণ, তা'রা যেমন অবস্থায় থাক্‌বে, তেমনতর সাড়াই বিকীরণ কর্‌বে।

তা'হ'লে, যদি আমরা জীবন ও বৃদ্ধিকে অমরণেই ন্যস্ত করতে চাই, তা'দিগকেও তা' হ'লে আমাদের তেমনি করতে হ'বে—যা'তে আমরা ঐ অমরণ সাড়া তা'দের থেকেই অনায়াসে পে'তে পারি। তা'হ'লেই দেখুন তা'রা যদি দুঃস্থ, দুর্ব্বল, বিপথগামী, ক্ষতিপরায়ণ, রুগ্ন, অসহায় হ'য়ে

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুরাতন ভদ্রাসন বাটীর একাংশ

সর্ব্বনাশে গা ঢে'লে দেয়—তবে তা' থেকে আমরা বাঁচ্‌ব কি? তবেই তা'দের ভিতরেও আমার ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে হ'বে, তা'দের সুস্থ কর্‌তে হ'বে, সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে তা'দিগকেও সর্ব্বতোভাবে বিবর্দ্ধনশীল ক'রে তুল্‌তে হ'বে নতুবা রক্ষা কোথায়? কারু কি রক্ষা আছে? আর এই উদ্দেশ্যেই দয়ালু রসুল মানুষের প্রতি আদেশ ক'রেছেন—জাকাত দিতে তোমরা কখনই পশ্চাৎপদ হ'য়ো না। আর্য্যদেরও ঐ রকমেই কঠোরভাবে দানের অনুজ্ঞা আর্য্যদলিলে সন্নিবিষ্ট করা আছে। তা'হ'লেই দেখুন, জাকাত জীবন ও বৃদ্ধির কি রকম মূল্যবান নির্দ্দেশ!

* * * * *

প্রশ্ন। খোদার নূর-এর কথা, আওয়াজের কথা কোরাণে আছে—আবার বাইবেলে আছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দ, ঐ শব্দই ঈশ্বর—এই নূর আর শব্দ কি, আর ফেরেস্তা বা দেবদূতই বা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখন তা'র প্রিয়পরমে আকুল মুগ্ধ উদগ্রীবতায় তাঁ'কে পে'য়ে, তাঁ'র সঙ্গ লাভ ক'রে, তাঁ'কে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে, সেই উপভোগে নিজেকে সন্দীপ্ত ক'রে তুল্‌তে, তৃপ্ত ক'রে তুল্‌তে বুভুক্ষুবেদনে বিপুল আগ্রহে নিরন্তরতার সহিত চকিত উদ্ব্যস্ততায়—যেন অহরহঃ সবের ভিতর তাঁ'কেই মনে পড়ে এমনতরভাবে তা'র সুরত অর্থাৎ libido-কে আকুল সম্বেগশালী টানে উচ্ছল ক'রে চল্‌তে থাকে—তখন তা'র স্নায়ু-কোষের ভিতর এমনধারা একটা টানের সৃষ্টি হয়, যা'র ফলে তা'র স্নায়ুকোষগুলি যেমনতরভাবে স্বস্থ হ'য়েছিল, তা'কে তা'র সেই স্বস্থ অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে পর্য্যবসিত কর্‌তে সুরু ক'রে দেয়। আর সেই জন্যই হয় ঐ কোষগুলির ভিতর একটা দহন-তাপের সৃষ্টি বা একটা combustion. এই দহনতাপ বা combustion সমস্ত কোষগুলিকে এমনতরভাবে উত্তেজিত করে—যা'র ফলে ঐ রকম শব্দ ও আলোর অভিব্যক্তি হয়। এই আলো হ'চ্ছে তা'রই একটা indication যা' দিয়ে বোঝা যায় ঐগুলি কেমনতরভাবে কি পরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ elasticity লাভ ক'রেছে। টান যতই যেমনতর হয় ঐ কোষগুলিও তেমনতরভাবে সংবদ্ধ থেকে একরকম স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে। আমার মনে হয় এই combustion-এর effect থেকেই জ্যোতিঃ বা আলোর উপলব্ধি হয়, আর এই combustion-এর উত্তেজনা চারিয়ে গিয়ে কাণের স্নায়ু ও অন্যান্য স্নায়ুর কোষগুলিকে যেমনতর ভাবে উত্তেজনা দেয় সেই মাফিকই শব্দের উপলব্ধি হ'য়ে থাকে। ঐ কোষগুলির

স্থিতিস্থাপকতা অনুপাতিক সাড়া বা impulse-গ্রহণক্ষমতা অর্থাৎ receptivityও হ'য়ে থাকে। আর এই receptivity যা'র যত তীক্ষ্ণ সে বস্তুকেও তত finely, তত তীক্ষ্ণতার সহিত বোধ ক'র্তে পারে। এই বোধই হ'চ্ছে জানার কারণ। এই জানাগুলি স্তরে স্তরে যত generalised হ'য়ে, একত্রীকরণে—নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর দিয়ে পরম্পরা ও পর্য্যায়ক্রমে এসে উপস্থিত হয়, ততই সে হয় ঋষি, প্রজ্ঞাবান্—man of wisdom.

এই প্রিয়পরমে নিষ্ঠা, ভালবাসা বা টান—যা' তাঁ'র সেবায় আত্মপ্রসাদী সন্দীপনাময়ী তৃপ্তিকে এনে দেয়—যা'র যত যেমনতর, বোধও তা'র তেমনতর, চিন্তা, বিচার, ভাবনা ইত্যাদিও তা'র সেই মাফিক, নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধানও তা'র তত সম্যক্।

তাহ'লেই এই টান থেকেই স্নায়ুপথে combustion সৃষ্টি হ'য়ে, তা'কে তীক্ষ্ণ, সাড়াগ্রহণক্ষম ও স্থিতিস্থাপক ক'রে তোলে, বোধ ভাবনা বিচারে নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধান-সমন্বিত বিবেকের সৃষ্টি করে—যা'র অভিব্যক্তি শব্দ ও আলো। মানুষ যা' তা'র ভিতরে অনুভব করে তা-ই হ'চ্ছে সে যতখানিতে elated বা সংবর্দ্ধিত হ'য়েছে তারই ক্রমনির্দ্দেশক অভিব্যক্তি —আর তিনিই হ'চ্ছেন মানুষের কাছে সেই পথ, যাঁ'র অনুসরণ ও অনুগমনে আমরা তাঁ'কে ও তাঁ'র সেই অবস্থাকে both physically and psychically approach ক'রে পে'তে পারি—আমাদের অনুপাতিক রকমের ভিতর দিয়ে।

তা'হ'লেই দেখুন, নিরাকার খোদা ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে এই মানুষের ভিতর দিয়ে বিশিষ্ট রকমের নূর ও আওয়াজের উপলব্ধিতে, কোষগুলির elasticity ও receptivity-র ভিতর দিয়ে—যা' হওয়ার ফলে মানুষ অমনতর দর্শন, প্রজ্ঞা ও কর্ম্মে অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে। তাই অনেকে বলেন, খোদাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তাঁ'র নূর ও আওয়াজকে উপলব্ধি করা যে'তে পারে তাঁ'র কৃপা হ'লে!

আর ফেরেস্তার ভিতর দিয়ে তাঁ'র সাথে কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান হয়। এই ফেরেস্তাই হ'চ্ছে অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতায়-গাঁথা ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ঝোঁকের সম্বেগোদ্দীপ্ত চলায়মান বৃত্তিনিচয়—যা' নাকি মস্তিষ্কে বিশেষভাবে বিন্যস্ত হ'য়ে, elasticity ও receptivity-তে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মসাড়াগ্রাহী বোধ ও চিন্তায় নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে ত্রস্ত, দক্ষ, ক্ষিপ্র, বিবেক ও বিচার-উদ্দীপ্ত প্রকৃতি হ'য়ে সংন্যস্ত থাকে—সেই বৃত্তি-উদ্ভাবনী প্রজ্ঞাসমন্বিত দর্শন। ফেরেস্তা ও Angel একই কথা বোধ হয়।

Angel কথার মানে হ'চ্ছে messenger—অর্থাৎ impulse-কে carry ক'রে উদ্দীপ্ত হ'য়ে অন্তঃকরণে যা' ভাব, বাক্ ও কর্ম্মের সৃষ্টি করে। অনেকে দৈববাণী, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি শুন্তে পান—তা'ও অনেকটা ঐ রকমের ঐ বৃত্তিগুলির ভিতর যেমনতর দর্শন, ভাব ইত্যাদি—আবহাওয়া ও environment-এর impulse-এর ভিতর দিয়ে conceived হ'য়ে আছে—সেই দর্শন, ভাব, বাক্ ও কর্ম্মের রকমের ভিতর দিয়ে খোদার সাথে বা কোন শ্রেষ্ঠের সাথে communicated হ'য়ে থাকে ; আর ঐ impulse-এর প্রেরণা বৃত্তিতে যা'র যেমনতর conceived সেই মাফিক রূপ, atmosphere ও environment সৃষ্টি ক'রে, ঐ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর দিয়ে তা'র অন্তরে বিশিষ্ট প্রজ্ঞায় তেমনতরই communicating agent-এর সৃজন ক'রে থাকে। দেবদূত, জেব্রাইল, ফেরেস্তা, angel, dove, হংস ইত্যাদি যা'কিছু সবই হ'চ্ছে ঐ বৃত্তি-উদ্ভাবিত, দেশকালপাত্রভেদে সংস্কার-রঞ্জিত communicator—এই হ'চ্ছে মরকোচ্—যা' আমি বুঝ্তে পে'রেছি।

*　　*　　*　　*　　*

প্রশ্ন। হাদিসে আছে হজরত রসুল একদিন ব'লেছিলেন, "অনতিবিলম্বে মানবগণের উপর এক সময় আসিবে যখন ইসলামের শুধু নাম ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না। কোরাণের শুধু একটা চিহ্ন ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না, মসজেদসমূহ দালানে পর্য্যবসিত হইবে, উহার সুপথ-প্রদর্শন বিনষ্ট হইবে—উহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সৃষ্ট জগতের নিকৃষ্ট জীব হইবে—তাহাদের মধ্য হইতে ধর্ম্মদ্রোহিতা নির্গত হইবে আর তাহাদের উপর উহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" হজরত ত' মুসলমানের মতে শেষ নবী—তবে তিনি আবার এমনতর অবনতির কথা ব'লে যান কেমন্ ক'রে? ঐ যেমন দুরবস্থার কথা তিনি ব'লে গেছেন তাঁ'রই মত প্রেরিত ছাড়া তো ঐ অবস্থা হ'তে মানুষকে কেউ উদ্ধার কর্তে পারে না—এর সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হজরত মহম্মদই প্রেরিত পুরুষগণের শেষ নবী, ইহা কি হজরত মহম্মদের কথা, না আর কারও? কোরাণে কি তিনি এমন ক'রেই এইটুকুই ব'লেছেন? একথা আমার মনে ধরে না। তিনি এসেছিলেন মানবের জন্য—কোন একটা বিশিষ্ট মানবদলের জন্য নয়কো। মানুষ তাঁ'র কথা শুন্লো, কেউ কেউ অনুসরণ কর্তে চেষ্টা কর্ল, আলোকও কেউ কেউ পে'ল, কিন্তু মানুষের জন্মগ্রহণ করা সেই থেকে থেমে যায়নি! এর ভিতরই ধর্ম্মপথে পঙ্কিলতা এসে বিজ্ঞ স্বার্থলোলুপদের ছিটান ময়লামাটী মলমূত্রে কত যে কদর্থে কত বেচাল নিয়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই!

খোদা এমনি ক'রেই, চিরদিনই কত বিপ্লবের ভিতরে তাঁ'র প্রেরিতকে পাঠিয়েছেন! দুনিয়া রইলই, জগত চল্লই—মানুষের উপর শয়তানও তা'র প্রভাব বিস্তার করুতে থেমে গেল না, খোদা কিন্তু থেমে গেলেন, তাঁ'র প্রেরিতকে আর পাঠালেন না, চলনের মুক্তি প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বে'লে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আর দেখ্লেন্ না, মানুষের প্রতি তাঁ'র যা' করার তা' তিনি শেষ ক'রে ফেল্লেন, তিনি তাঁ'র বাণী পাঠালেন—এই দুনিয়ায় আমার আর কোন প্রেরিতের আবির্ভাব হ'বে না কিম্বা শেষ হজরত রসুলের আলো ওখানেই শেষ হ'য়ে গেছে, মানুষের বেদনায় তিনি আর কখনই তাঁ'র চেতনাসিক্ত স্থলশারীর কর্ণপাতও করুবেন না, এই স্থূল মায়ামুগ্ধ বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে যা' অত্যন্ত আশাপ্রদ ও প্রয়োজনীয়—তাঁ'র যা' করার তা' একদম সব সাবাড়—এও কি হ'তে পারে ?

হজরত রসুল অমন ক'রে অমনতর কথা ব'লেছেন আমার তো ইয়াদে তা' কিছুতেই আস্তে চায় না। খোদচেতনামজ্জিত রসুলের মুখনিঃসৃত খোদার বাণী পাঁতি পাতি ক'রে খুঁজে দেখ দেখি, আমার খুব বিশ্বাস তোমাদের সব ধাঁধা কে'টে যা'বে তা'তে। এই বাণীগুলি আর ময়লা হয়নি—শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে দেখ্লেই বুঝ্তে পারবে, ঐ আলোকবাণীই তোমাদের ঢের আঁধারের ধাঁধা ঘুচিয়ে দে'বে! ব্যাখ্যাতা বা অর্থকারীদের লেখায় মন না দিয়ে, আসলে কি আছে তা'রই পর্য্যালোচনা করুতে থাক।

আমি যা' বুঝি তা'তে তিনি শেষ সমন্বয়কর্ত্তা, অনুবৃত্তিকর্ত্তা। খোদার সৃষ্টিপ্রবাহ সেই থেকে এখনও চল্‌চেই, চল্‌বার আশাও আছে। আর হজরত রসুলের ওখানেই খতম হ'য়ে যা'বে—এ ভাবনাও আমার কাছে একটা ঘোর বেকুবী বেসম্মানী ব্যাপার—তা' খোদাতায়াল্লার নিকটও, প্রেরিত পয়গম্বর হজরত রসুলের কাছেও! খোদার সৃষ্টিপ্রবাহ চল্‌বেই, কিন্তু তাঁ'রই প্রেরিত হজরত রসুলের পরিবেশনী ভাণ্ড ওখান থেকেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে—এ যেন ভাব্‌তেও ইচ্ছা করে না! এ চিন্তা হজরত রসুলকেও যেমন খতম করে, খোদাকেও যেন সঙ্গে সঙ্গে তেমনি খতম ক'রে তোলে! যে চিন্তা খোদা ও রসুলকে কোথাও কোন রকমে খতমে নিরুদ্ধ ও নিঃশেষ করিতে চায় সেটা নিতান্তই বে-ইস্‌লামিক ব'লে মনে হয়। দুনিয়ায় এপর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি—কেউ তা'র প্রিয়তমকে কোথায়ও সীমাবদ্ধ ক'রে সে খতম হ'বে, নিঃশেষ হ'বে এমনতর চিন্তারও স্থান দিতে ভালবাসে—আর এতে এমনতর একটা দোষ এসে উপস্থিত হয় মুসলমান জগৎ further elating elevation থেকে যেন হজরত রসুল

হ'তেই খতম হ'য়ে গেছে—আর হজরত রসুলও যতটুকু পরিবেশন ক'রেছেন ততটুকুই—এ চিন্তাও যেন আমার কাছে হারাম ব'লে মনে হয়।

আর ওর পাঠ যদি খাতেম না হ'য়ে খতমই হয় তা'হ'লেও আমার সহজ জ্ঞানে এই বুঝি—রসুল আর হজরত মহম্মদ প্রতীকে আবির্ভূত হ'বেন না। যেমন খোদার প্রাকৃতিক বিধিই দেখতে পাই, যে বা যিনি গত হন ঠিক সে বা তিনি আর ফিরে' ঠিক তেমনতর হ'য়ে দুনিয়ার বুকে গজিয়ে উঠেন্ না। তাই ব'লে খোদার প্রেরণাপ্রতীকতা নিস্তব্ধ হ'য়ে থেমে যেয়ে থাকে না। আর তাই-ই আমরা হজরত রসুলের শ্রীমুখনিঃসৃত কোরাণবাণীতেও দেখ্‌তে পাই—তিনি পরবর্ত্তীদের বিষয় যা' যা' ব'লেছেন তা'র চেয়ে প্রাঞ্জল সাক্ষ্য আর কি হতে পারে?

তাই যদি না হ'বে হজরত রসুল কেন তবে "আমি তোমাদিগকে আল্লাকে ভয় করার জন্য আর আমার পরবর্ত্তীকে শ্রবণ করা ও মানার জন্য উপদেশ দিচ্ছি—এমন-কি যদিও সে হাবসী ক্রীতদাসও হয়।"—এই বাণীর ঘোষণা করলেন? তিনি তো আর আমাদের মত বেকুব পণ্ডিত ছিলেন না? আর কি বল্লে কি বোঝা যায় তা'ও তিনি বুঝ্‌তে পার্‌তেন না এমনতরও নয়কো! আর শব্দগুলিকে উদ্দেশ্য-মাফিক অর্থ করার উদ্‌গ্রীব পাকে পাকান দড়ি নাকে বেঁধে টেনে কোথায় নিয়ে পৌছান যায়—কি রকমে—তা'ও যে বুঝ্‌তে পারতেন না তা'ও ভাবা যায় না। তবে কেন তিনি আর এক বাণীতে মুসলমানেরা একদিন কি অবস্থায় পরিণত হ'বে তা'র একটা বিবৃতি দিয়ে—যা' এখানে প্রশ্নের ভিতর উল্লেখ করা হ'য়েছে—তা' প্রকাশ ক'রে ব'লেছেন?

তা'হ'লে তিনি কি মুসলমান-জগৎকে ঐ পরিণতিতেই খতম ক'রে দিয়েছেন? এ ভাবটা কি পাগ্‌লামী নয়কো? আর মুসলমানদের যদি শেষ পরিণতি ঐ হ'বে—হজরত আর প্রেরিত হ'যে ব্যক্ত জীবনে তেমনি আরো আলিঙ্গনে মানুষ ও মুসলমানদিগকে তুলে' নেবেন না—বাঁচা-বাড়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে আর অমৃত-নিয়ন্ত্রণে অভিষিক্ত ক'রে দেবেন না? যতটুকু যা' দিয়ে গেছেন খোদার তহবিল থেকে তিনি এনে—সেই শেষ! খোদার তহবিল থেকে প্রেরিতের মারফত জীবনবৃদ্ধি জাহান্নামশায়ী হ'লেও আর সে অমৃতমন্ত্র কাউকে অমরণে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌বে না—এও কি একটা কথা? এ কথা তো মানুষের জীবনবৃদ্ধির অমৃতচলনার অনন্তপথের খতম-করা কথা—কেমন তা' নয় কি?

তিনি জানতেন, মানুষ আজ যা' তাঁ'র কাছে পেল—তাঁ'র প্রতি তা'র নিয়ন্ত্রণে জীবন ও বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হ'য়ে বা হওয়ার আশায় মানুষ যেমনতর

উন্নত চলনায় চল্‌তে সুরু ক'রে দিলে—মানুষের মস্তিষ্ক তখন যা' ধরতে পারে তা'র মাফিক ক'রে তিনি যা' ব'লেছেন, তিনি যা' দিয়েছেন—যা'র ফলে তাঁ'তে সবাই অটুট ও আপ্রাণ হ'য়ে আবেগোন্মুখ উদ্‌গ্রীব আসক্তিতে আসক্ত ও নিয়োজিত হ'য়েছিল—অনেকেরই বৃত্তিগুলি তাঁ'হ'তে পূরণ ও পোষণ পে'তে পে'তে উন্নত উপভোগের উল্লম্ফনে তৎস্বার্থ ও তৎপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হ'য়ে ইস্‌লামের জয়গানে ভরদুনিয়াটা মুখরিত ক'রে তু'লেছিল, তাঁ'ব তিরোধানে কিছুদিন আরো হ'য়ে উন্নত চলনে চল্‌বে মানুষ। তারপবই মানুষের বৃত্তিগুলি পাবে না উন্নত পূরণ ও উন্নত পোষণের ভিতর দিয়ে উন্নত উপভোগ ও তা'র উন্মাদনা! তখন বৃত্তিগুলি তা'দের শ্রেষ্ঠহারা হ'য়ে আপন আপন উপভোগী খোরাক আহরণের জন্য ব্যক্তিকে আবিষ্ট ক'রে তা'র চাহিদার মতনই তা'কে ক'রে তুল্‌বে। তখন তাঁ'র বাণীগুলি হ'বে বৃত্তি-প্রাধান্যের অন্তরায়—তখন ঐ বৃত্তিসঙ্গেগী আবিষ্ট মানুষ তাঁ'র বাণীগুলিকে বিকৃত ক'রে, বৃত্তি-উপভোগের সহায়ক ও সমর্থক ক'রে নিয়ে বৃত্তিরই সামর্থ্যবৃদ্ধি কর্‌তে থাক্‌বে! ফলে আস্‌বে ইষ্টপ্রাণতার জায়গায় বৃত্তিপ্রাণতা—আর তা' থেকেই, তিনি মুসলমানদের যে পরিণতির কথা ঐ বাণীতে প্রকাশ ক'রেছেন, তা'র বাস্তবতা উপস্থিত হ'বে!

সেইজন্যই মানুষকে আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে, সংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে, বৃত্তিপরায়ণতার খোরাক-সরববাহীরূপে বিকৃত-করা হজরত-বাণীকে হজরতই রসুলেরই দোহাই দিয়ে অনুসরণ না ক'রে পরবর্ত্তী প্রেরিতের অনুসরণ কবার মানসে তিনি ঘোষণা ক'রলেন—"আমি আমার পরবর্ত্তীকে শ্রবণ করার ও মানিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছি—এমন-কি যদিও সে হাবসী ক্রীতদাসও হয়!" দেখুন, কেমন পরিষ্কার, কেমন উদার, কত সুন্দর আশার বাণী! মুসলমানদের দুর্দ্দশা অমনতর হ'বে তা জে'নেও তিনি তা'দিগকে ঐ দুর্দ্দশায়ই কায়েম ক'রে রে'খে গেলেন—এও কি হয়?

মানুষ যখন অমনতর দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় এসে জীবন ও বৃদ্ধির পথে নাজেহাল হ'তে থাকে,—তা'র আকুল-উৎক্ষিপ্ত মরণান্ধকারমথিত বাঁচাবাড়ার আকুতি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ বেদনার্ বিরাট ঝঙ্কারে দিগ্‌বলয় ঝাঁঝিয়ে প্রকৃতিকে নাড়া দিতে দিতে খোদার সিংহাসন আত্মনিবেদনে কাঁপিয়ে তোলে,—তা'রই প্রেরণায় প্রকৃতিই তখন আপন চাহিদার আকুল আকর্ষণোন্মত্ততার ভিতর দিয়ে পরিমিত ক'রে দেয় মহান্‌ প্রেরিত পুরুষোত্তমের ব্যক্ততাকে—আর তিনিই হন সেই দুরপনেয় দুর্দ্দশার উদ্ধাতা আর আরোতরের পরম উদ্গাতা। এ তিনি ভালভাবেই জান্‌তেন, আর জান্‌তেন ব'লেই তাঁ'র প্রেরণা থেকে ঐ জাতীয় সমস্ত আশার বাণী কত

রকমের ঝোঁক ধ'রে যে নিঃসৃত হ'য়েছে, তা' একটু চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই সবাই সহজেই বুঝ্‌তে পারবে।

* * * * *

প্রশ্ন। হাদিসে আছে—হজরত রসুল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ভালবাসে না তা'র কল্যাণ নাই।" কিন্তু হিন্দুরা ত' বলেন, "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং"—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? আবার কৃপণতাই বা দোষের কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার উদ্দীপনায় তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ করার অভ্যস্ত চল্‌না যেখানে সেই প্রয়োজনকে পূরণ করার অনুসন্ধিৎসা ও আকুলতায় ধনসম্পদের আহরণমুখতাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, সেই ধনসম্পদের চাহিদা ও চল্‌না মানুষকে জীবনে, যশে ও সংবৃদ্ধিতে সার্থক ক'রে তোলে। তা'ছাড়াও নিজের জীবন ও বৃদ্ধির পূরণীয় পোষণীয় যাহা-কিছু আহরণ তা' অন্যের মুখাপেক্ষিতায় নির্ভর না ক'রে, অন্যকে তদ্দরুণ ভারাক্রান্ত না ক'রে জীবন-বৃদ্ধির লওয়াজিমা যিনি সংগ্রহ ক'রে থাকেন তাঁ'র ধর্ম্ম অবনতি ও অবসাদের পথে অবসন্ন হ'য়ে ওঠে না।

ঐ পরমুখাপেক্ষিতা—যা'নাকি অন্যকে পোষণ ও পূরণে বর্দ্ধন না ক'রে নিজের জীবন ও বৃদ্ধির লওয়াজিমা সংগ্রহ করবার দুরাগ্রহ অভিসন্ধি লইয়া অন্যকে অযথা ভারাক্রান্ত, দুর্ব্বল ও অবসন্ন করিতে প্রচেষ্টাপরায়ণ, তা' নিজের সর্ব্বনাশ তো করেই,—আরো, সে তা'র যা'রা পারিপার্শ্বিক —ঐ অযথা অপূরণীয় ও অপোষণীয় আহরণ দ্বারা, এৎফাকের ফাঁকিবাজী চলনায়, না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধির সংস্কারের সৃষ্টি ক'রে,—প্রতি-প্রত্যেকেরই সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে। আর এই সর্ব্বনাশা, না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধির সংস্কার সহজেই বংশানুক্রমিকতা লাভ ক'রে বংশ ও জাতিকে ক্রমসর্ব্বনাশে নিশ্চিত ক'রে তোলে। হাদিসের ঐ বাণীর সার্থকতাই হ'চ্ছে—ঐ দুরপনেয় সর্ব্বনাশা, না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি যা'তে বংশ ও সমাজকে আক্রমণ না কর্‌তে পারে।

আর "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" একথা সেখানেই প্রযোজ্য, বৃত্তি যেখানে তা'র ভোগ-ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিকে অন্ধস্বার্থ অর্থাৎ বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ ক'রে তু'লে ইষ্টপ্রাণতাকে অবশ ও হতচ্ছাড়া ক'রে, সর্ব্বনাশের সাবাড়-ইঙ্গিতের প্রলুব্ধ চল্‌নায় চল্‌তে থাকে। সেই অন্ধ-বৃত্তি-স্বার্থ-পরায়ণতার ধন ও ঐশ্বর্য্যের আহরণ থেকে নিবৃত্ত করার মানসেই পণ্ডিতদের ঐ

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" সাবধান-বাণী—এই যা' ওসব কথার তাৎপর্য্য আমার মনে হয়।

আবার কৃপণতা এত নিন্দনীয় কেন? কারণ কৃপণস্বভাব ছলে, বলে, কৌশলে শুধু আহরণবুদ্ধিসম্পন্নই হ'য়ে থাকে। তা'তে সেবাবুদ্ধি ক্রম-অবশতায় একদম সুপ্ত হ'য়ে যায়—আর যে অমনতরভাবে আহরণ করে, এই আহরণে তা'র অন্তঃকরণের টান এত প্রবল হ'য়ে ওঠে, যা'র দরুণ সে আহরণ-করা অর্থদ্বারা নিজেও পূরণ ও পোষণে জীবনকে পুষ্ট ও বর্দ্ধনপর ক'রে তুল্‌তে পারে না—অথচ ঐ সেবা না ক'রে বা না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি তা'র পুত্র-পরিজনে চারিয়ে যায়। তা'দের ভিতর আহরণীয় টান অমনতর তরতরে না থাকার দরুণ বৃত্তিগুলি অন্ধস্বার্থপর হ'য়ে বংশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি-ব্যক্তিকে তা'র ইন্ধনসংবাহী ক'রে তোলে।

তা'র ফলে ঐ জমান ধনৈশ্বর্য্য ক্রমে নিঃশেষ হ'য়ে ওঠে। সেবা না ক'রে অর্থাৎ অন্যকে উদ্বুদ্ধ, পূরণ ও পোষণ না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি এমনতরভাবে মস্তিষ্ককে অবলেপিত ক'রে তোলে, তা'র ফলে তাহারা আহরণবিমুখ হ'য়ে ওঠে, বৃত্তিপরায়ণতা ব্যক্তিকে তা'র চাহিদার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়ে খরচে নিঃশেষ করতে থাকে—আর সেবা না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি ধন ও ঐশ্বর্য্য-আহরণে দুর্ব্বল ও বিমুখ ক'রে এক কিংবা দুই পুরুষের ভিতরেই বংশকে রাস্তার ফকির ক'রে ছে'ড়ে দেয়। আমি অনেক দেখেছি, আপনারাও দেখ্‌বেন—কৃপণের পরিণতি অমনতরই হ'য়ে থাকে।

* * * * *

প্রশ্ন। হাদিসে আছে—হজরত ব'লেছেন, "পরলোকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ পয়গম্বর, সত্যপরায়ণ সিদ্দিক ও ধর্ম্মার্থে নিহত শহীদ-দিগের সহচর হইবেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হালাল সেই উপজীবিকা যা' মানুষ নিজে কামাই করে,—আর সততার সহিত ব্যবসায়। তোমাদের অবশ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা চাই-ই—যেহেতু দশভাগের নয়ভাগ উপজীবিকা ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত আছে। হজরত ব্যবসায়কে জীবিকার্জ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সত্যবাদিতা অর্থাৎ যা'তে মানুষ অন্য কাহারও অপলাপ না ঘটিয়ে নিজের থাকা বা বাঁচাবাড়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে পূরণ ও পোষণে বর্দ্ধিত হ'তে পারে এমনতর বলা—যে বলায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়, যা' শুনতে আগ্রহান্বিত হ'য়ে আদরে অভিষিক্ত ক'রে দেবার প্রয়াস অন্তঃ-করণে স্বতঃই উপ্‌চে ওঠে' এমনতর তৃপ্তিময়ী, সন্দীপ্তিমাখান, উন্নতি-উদ্বোধনী

জীবনবৃদ্ধিকে পূরণ-পোষণে সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌তে পারে এমনতর পথনির্দ্দেশক ভরসাব্যঞ্জক বাস্তব কথার অনুসরণে বাস্তবভাবেই ঐগুলিকে অনুভব কর্‌তে পারা যায়।

তাই, সত্য কথা বল্‌তে গেলেই,—শুশ্রূষার ভিতর দিয়ে মানুষকে নন্দিত ক'রে পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বের কর্‌তে হয়, তা'র যা-কিছু দুর্ব্বলতা যেখানে যেখানে অন্তঃকরণ ও চলনে লুক্কায়িত আছে। তারপর তা'কে আশায় ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে জীবনীয় হস্তে সেই দুর্ব্বলতা-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উদ্বুদ্ধতায় তা'কে এমনতর প্রেরণাপূরিত কর্‌তে হয় যা'তে তা'র বাস্তবপ্রচেষ্টা স্নায়ু ও মাংসপেশীকে আলোড়িত ক'রে কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে তোলে।

তা'হ'লেই দেখুন, সত্যবাদী হওয়া কত বড় সেবা! আর এতে এ যে করে সেও অজ্ঞাতসারে এত উন্নত হ'য়ে ওঠে যা'তে সে নিজেই অবাক হ'য়ে যায়—এত অনুগ্রহ কোন্ কৃপা উপ্‌চে' আমাকে প্লাবন-পরিচর্য্যায় পুষ্ট ক'রে তুল্‌ছে! এই অবাক দয়ায় খোদাতে সে আপনিই সহজপ্রাণে আত্মনিবেদন ও আলিঙ্গন ক'রে থাকে।

আর ব্যবসায়েতে যে মানুষকে তা'র প্রয়োজন পূরণ ক'রে, উদ্বৃত্ত ক'রে তা'হ'তে লাভ সংগ্রহ কর্‌তে পারে—তা'কেও ঐ রকমেই দেখ্‌তে হয় কি ক'রে, কি পন্থায় তা'র প্রয়োজনকে পূরণে অভিনন্দিত ক'রে তু'লে উদ্বৃত্ততায় তা'কে আরো পুষ্ট করা যায়। আর এই থেকেই—সেই ব্যবসায়েই অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োজন পূরণ ক'রে, ক্রেতাকে উদ্বৃত্ত ক'রে আরোতরে বর্দ্ধিত করার ক্ষুধিত প্রচেষ্টায় এবং তা' থেকে লাভের আশায় অন্তরের সম্পদ পূর্ব্বোক্তরকমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে, কর্ম্ম-প্রাণতাও উপ্‌চে ও'ঠে এত তোখরভাবে চল্‌তে থাকে—যা'তে নাকি সে সহজেই সকল বিষয়ে অযচ্ছল হ'য়ে, নিরন্তর উন্নতিতে, পূরণে ও পোষণে প্রত্যেককে পুষ্ট ক'রে নিজেকে পুষ্ট ও পূরিত ক'রে তোলে। আর এর থেকে সেও দেখ্‌তে থাকে খোদা কি করুণাময়—আমার যা' হ'বার নয় তা'ও কি ক'রে উন্নতিতে উপ্‌চে' উঠ্‌ছে।

এমনি ক'রে সে তাঁ'র চরণে আনত হয়, আত্মনিবেদন করে। এটা বলাই বাহুল্য—এগুলি যদি আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে, সেখানেই পূর্ব্বোক্ত রকমের সম্ভবতা অজ্ঞাতসারে আত্মবিস্তার ক'রে থাকে—নতুবা বৃত্তিপরায়ণতার পোষণীয় ইন্ধন-অনুসন্ধিৎসা ও-হ'তে অনেক দূরে অবস্থিতি করে। তা'হ'লেই ঐ রকম যাঁ'দের প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার, তাঁ'দিগকে যে ইহকালেই ওদের সহচর

ক'রে তোলে, তা'তো নিয়তই দেখা যা'চ্ছে—পরকাল তো দূরের কথা! তা'ছাড়া, আরো কথা হ'চ্ছে—মানুষ যদি সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে, ইষ্ট-প্রাণতাকে আঁ'কড়ে ধ'রে, তাঁ'রই স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের আহরণ-আকাঙ্ক্ষী হ'য়ে ব্যবসায় কর্‌তে থাকে—তা'তে মানুষ ইষ্টানুরক্ত, আত্মবিশ্বাসী, সেবাপটু, বহুদর্শী, বিবেকী, নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানপটু, কর্ম্মপ্রবণই হ'তে থাকে। আর তা'ছাড়া সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন হ'চ্ছে চাকুরী। এই চাকুরীতে মানুষের প্রারম্ভ যেমনতরই হোক না কেন, মনিবের তুষ্টির জন্য তা'র বৃত্তিস্বার্থপরায়ণতার অভিসন্ধি-নিবদ্ধ ইচ্ছাকে পরিপূরণ-প্রয়াসে, নিজের বোধ, বিবেক, কর্ম্ম ও চলনকে তদনুপাতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ কর্‌তে কর্‌তে অন্তর্নিহিত উন্নত যা'কিছু অন্তঃকরণে জ্বলন্ত হ'য়েছিল—হয়ত কর্ম্মে উপ্‌চে' ও'ঠে বাস্তবতায় পরিণত হ'যে যা' পারিপার্শ্বিক ও নিজের জীবন ও বৃদ্ধিকে উপ্‌চে' তুল্‌তো—তা'র ক্রমশঃই খতম হ'তে থাকে! ঐ রকম নিরোধে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল, সম্বেগহীন হ'য়ে থাকে—আর এ থেকে স্নায়ুর বিবশতার উদ্ভব হ'য়ে বংশকে আক্রমণ ক'রে দুর্ব্বল, সেবাবিমুখ ক'রে ও যা'তে বাঁধাবাঁধিভাবে পাওয়া যে'তে পারে এমনতর ফক্কিকারী ফন্দীবাজি অন্ধবৃত্তিস্বার্থপরায়ণতা ইত্যাদির অভিব্যক্তিস্বরূপ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ক'রে, অনবরত চ'লে, সমাজ জাতি ও দেশকে চেষ্টাবিমুখ—পূর্ব্বোক্তগুণসম্পন্ন ক'রে জাহান্নামের দিকে ঠেল্‌তে থাকে। তাই হজরত রসুল ব্যবসায় সম্বন্ধে অমনতরভাবে ব'লেছেন।

তাই, আমার মনে হয়, কোথাও যদি কাহারও উন্নতিকল্পে তাহার সাহায্যের দরুণ চাকুরীই নিতে হয়, তা'হ'লে বেতন না নিয়ে, শুধুমাত্র নিজের বা নিজের পরিবারের পোষণ চল্‌তে পারে এমনতর সম্মানজনক বৃত্তি লওয়া যে'তে পারে। তা'তে মানুষের মানুষকে সাহায্য ও সেবায় উন্নত করার উন্মাদনাই প্রধান হ'য়ে থাকে—আর তা'তে নিজের অন্তঃকরণের উন্নত চিন্তাগুলিকে নিরোধ ক'রে, নিরেট ক'রে ফেলার বাধ্য-করা প্রবৃত্তিও কমই মাথাতোলা দেয়। শুভেচ্ছাকে কর্ম্মে বাস্তবতায় পরিণত ক'রে, ব্যক্ত ক'রে, মানুষের জীবন-বৃদ্ধির পোষণ ও পূরণে উন্নত হ'বার যা'কিছু চিন্তা ও চলন কমই ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকে। এক কথায়, পারিপার্শ্বিককে সেবায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করাই যা'র জীবনে স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'র জীবন ও বৃদ্ধির স্বার্থ যে পারিপার্শ্বিক হ'তে নিঃস্বার্থভাবে পরিপুষ্ট হ'তে থাকে সে বিষয়ে আর কইবার কিছু নেই কো!

তাই, এই বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিরোধ কর্‌তে জানে না, নিয়ন্ত্রণ ক'রে

উন্নতি-চল্‌নায় চল্‌তে জানে—তাঁ'দের পক্ষে ন্যায্য, অন্যায্য কি, তা' তা'দেরই সাধ ও স্বভাব নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারে। ব্যবসায় যাই হোক আর যেমনতরই হোক—জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে মানুষের প্রয়োজন পূরণ ক'রে, তা'কে উদ্বৃত্ত ক'রে যে অর্থ আহরণ করা যায়—সবদিক দিয়ে হিসাব কর্‌লে তা' যে অন্যান্য অনেক থেকেই শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? হজরত রসুলের বাণী যে মানুষকে ব্যবসায়ের দিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তু'লেছে, তা'র সার্থকতা যে ঐখানেই তা' স্পষ্টই বোঝা যায়।

* * * * *

প্রশ্ন। সুন্নত করার প্রথা যে মুসলমানদের ভিতর চ'লে আস্‌ছে তা'র তাৎপর্য্য কি? কৈ হিন্দুদের ভিতর তো ও-রকম কোন সংস্কার নাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। সুন্নত মানে যদি হজরত রসুল অথবা প্রেরিত পুরুষ বা পুরুষোত্তম যাঁ'রা তাঁ'রা যেমন অবস্থায় যা'র জন্য যা' যা' করতেন, তাঁ'দের চল্‌না, বল্‌না, ভঙ্গী, অভিব্যক্তি ইত্যাদির ধাঁজের অনুসরণ ক'রে ও অনুকরণ ক'রে, নিজের চলন-চরিত্রে আচার-ব্যবহারে সেইগুলিকে অভিব্যক্ত করা হয়, তা'হ'লে হজরত রসুলকে অমনতর অনুসরণ করাকেই Islamic মুসলমানগণ সুন্নত ব'লে থাকেন।

এই সুন্নতের action and attitude-ই হ'চ্ছে অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে চলার প্রথা থেকে physical manipulation ক'রে, psychical রকমটাকে তদনুরূপ রকমে বিবর্ত্তিত করার প্রচেষ্টা। Physical manipulation দ্বারা psychical uplift ঘটান psychically অমনতর করার চাইতে সহজ ও সুবিধা। যা' করতে হ'বে তা'র কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চল্‌না ও কর্ম্মকে তদনুরূপ অভিনয়ের মতন ক'রে চিন্তন বা thinking-কে তদনুরূপে চালিত কর্‌লেই অতি সহজেই আয়ত্ত হ'য়ে নিজের প্রকৃতিতে প্রকৃতিগত হ'তে থাকে। আমার মনে হয়, এই সুন্নত-প্রথার ভিতর দিয়ে তেমনতর রকমে শরীর ও মনকে উন্নত নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উন্নতিকে আলিঙ্গন করাই আসল উদ্দেশ্য।

মনে করুন, মহামনীষী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যেমনতরভাবে মানুষ অনুকরণ ক'রে থাকে, অনুসরণ ও চিন্তনও যদি তা'দের তদনুপাতিক হ'ত তা'হ'লে ঐ মহামনীষী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পথে অনেকেই কিছু-না-কিছু উন্নত হ'তে পার্‌তই পার্‌ত। এটাও আবার নির্ভর করে—যাঁ'কে এমনতরভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ কচ্ছি তাঁ'র প্রতি অটুট ও উদ্দাম আসক্তি বা টানের উপর। এই টান যদি না থাকে, ঐ অনুসরণ বা অনুকরণও তেমনতর হ'য়ে উঠে না—আবার টানের চরিত্রই হ'চ্ছে—তা'র Beloved-এর পছন্দসই সাজসজ্জা,

কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম্ম, চলন-চরিত্র ইত্যাদি কর্‌তে ভাল-লাগা ও তা'র প্রতি একটা তৃপ্তিপ্রদ ঝোঁক। আমার মনে হয় সুন্নতও তাহাই। হজরত রসুল যেমন জন্মেছিলেন, যেমন ছিলেন, যেমন সাজসজ্জা কর্‌তেন, যেমন বল্‌তেন, যেমন করতেন, যেমন চল্‌তেন সেই সবগুলিকে নিজে চল্‌না ও করার ভিতরে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে তদনুরূপ ক'রে প্রতিফলিত ক'রে শ্রদ্ধাভিষিক্ত তৃপ্তিপ্রদ প্রাণে তা'দেরই অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে চলা।

তা'হ'লে দেখুন সুন্নত যদি এই হয়—যেখানেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তা'র প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ সম্বেগশালী সেখানেই অমনতর হ'য়ে থাকে কি না? ভালবাসার একটা characteristic-ই হ'চ্ছে ঐ রকম অনুসরণ ও অনুকরণ করা—আর যেখানে অটুট ও আপ্রাণভাবে প্রিয়তমে ভালবাসা, সুন্নতও সেখানে আছেই। যেখানে টান নাই অথচ inferiority complex-এর দরুণ বড়ত্বের আকাঙ্ক্ষা অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে, সেখানে শ্রদ্ধাভিষিক্ত প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ সম্বেগশালী টানও নেই—আর টান নেই ব'লে অনুসরণও থাকে না—থাকে inferiority-র হামবড়াই-ভাবাপন্ন অপ্রীতিকর repulsive অনুকরণ—আর এই অনুকরণ চিরদিনই inferiority ও উপহাসকেই আমন্ত্রণ করে! সুন্নত তাই শুধু অনুকরণেই হয় না—সে বাস করে প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ সম্বেগশালী শ্রদ্ধাবনত মুগ্ধ আসক্তি বা টানের জেল্লায়, বাস্তব অনুসরণের সত্তায়। তাই আর্য্য হিন্দুই বলেন, বৌদ্ধই বলেন, খৃষ্টানই বলেন, আর মুসলমানই বলেন—যেখানে অমনতর প্রিয়তমে সম্বেগশালী অটুট ও আপ্রাণ টান, সেইখানেই বাস্তব অনুসরণমুখর আত্মপ্রসাদী অনুকরণশীল সুন্নত সজাগ!

বাংলার প্রাণের যত-কিছু দুঃখ-ব্যথা-সমস্যার সরল সহজ সমাধানে ভরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন-সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এইখানে সমাপ্ত করিলাম। যুগে যুগে ভাবসিদ্ধ মহামানবের অনুভূত নানাবিধ সূক্ষ্ম বিচিত্র বোধ হইতেই কথোপকথন-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনুভব পারিপার্শ্বিকের প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাঁহাদের কণ্ঠে অমৃতময়ী বাণীরূপে। মহাপুরুষগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই প্রজ্ঞাধারা পার্ব্বত্য প্রস্রবণের মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় মানবের সকল দ্বন্দ্ব, মনের সকল অন্ধকার দূর করে—তাহা যেমনই দীপ্ত ও মুক্ত তেমনি মহান্। সাহিত্য-জগতের বাস্তবসৃষ্টি যাহা-কিছু তাহা কথোপকথন-সাহিত্যেই থাকে—কারণ তাহা অকৃত্রিম, জীবন্ত ও প্রাণবান্। তাই এই কথোপকথন-সাহিত্য সর্ব্বদেশে, সকল যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মূল উপাদান। উপনিষদ, গীতা,

যোগবাশিষ্ঠ, কোরাণ, বাইবেল, সক্রেটিস্ ও প্লেটোর ডায়লগ্, কবীরের দোঁহা, শ্রীবুদ্ধের আলোচনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নিবিড় অভিজ্ঞতারাশিকে যে মূর্ত্তি দান করিয়াছেন জাতীয়-সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় সুধী পাঠকবর্গ তাহা বিবেচনা করিবেন।

নারীর নীতি

এই পুস্তকখানায় শ্রীশ্রীঠাকুর অতি সহজ সরল ভাষায় নারী-জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশবাণী দান করিয়াছেন। নারী যে সমাজে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে, নারীই যে জন্ম ও জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নারীর শুদ্ধতার উপরেই যে জাতির শুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, স্খলিত নারী-চরিত্র হইতেই যে ব্যর্থ জাতি জন্ম লাভ করে, তাহা এদেশের পুরুষ ও নারী উভয়েই ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের সমাজে 'নারী' কথাটীর প্রচলিত প্রতিশব্দ এখন হইয়াছে 'অবলা',—কারণ তাহারা পরমুখাপেক্ষী, দুর্ব্বল; কিন্তু ঋষি বলিতেছেন,—নারী তাই যাহা বৃদ্ধি পাওয়ায়—মানুষকে উন্নয়নে সার্থক করিয়া তোলে। আবার শিশুর জন্ম ও বর্দ্ধনেও নারীরই যত-কিছু দায়িত্ব, কারণ সন্তানের জন্ম সর্ব্বতোভাবে জায়াধীন। নারী তা'র সাহচর্য্যে পুরুষকে যেমনতরভাবে উদ্বর্দ্ধন করে পুরুষের সেই মনই স্ত্রীতে গমন করে এবং সন্তানরূপে মূর্ত্ত হয়—তাই স্ত্রীকে জায়া বলে। শিশুর ভবিষ্যতও নির্ভর করে, মাতা বাল্যে তাহাকে যে শিক্ষা দেয় তাহার উপর। একটী শিশু জীবনের প্রথম পাঁচবৎসরে জননীর ঐকান্তিক সাহচর্য্যে উদ্দীপ্ত গ্রহণমুখরতায় চারিধার হইতে যাহা, যতটুকু, যেমন-করিয়া আহরণ করে—পরবর্ত্তী জীবন তাহার তাহাই আরো আরো করিয়া ফুটাইয়া দেয় মাত্র;—বাল্যের ব্যগ্র আকুলতায় জননী যে ভাব শিশুতে উপ্ত করে, তাহাই সারা-জীবন তাহার চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে রঞ্জিত করে এবং তাহাই চারিত্র্যে পরিণত হয়। শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া পুরুষ যখন যৌবনে সংসারে প্রবেশ করে তখন হইতে সারাজীবন নারীই হয় তাহার সকল কাজের "সহধর্ম্মিণী" স্ত্রী—যে তা'কে বেষ্টন করিয়া তৃপ্তি পায়। নারী যদি মানুষের জীবনের এতখানি, তবে যেখানে সেই নারী দুর্ব্বলা, অশিক্ষিতা, আদর্শহীনা—সে দেশ যে অপোগণ্ড, মূর্খ, স্বাস্থ্যহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক সন্তানের জননী হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হইলে তাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, আদর্শ নারী তৈয়ার করা। নারীত্বের মহিমা উপলব্ধি না করিলে নবজাতির গঠন সুদূর-পরাহত। নারী কেমন করিয়া, কোন্ ছন্দে

চলিলে বাংলার এই অধঃপতিত মরণোন্মুখ জাতির জীবনে নব প্রাণ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারে, কোন্ পথে চলিলে নারী মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধি আনিয়া দিতে পারে, সেই মহামন্ত্র এই অতুলনীয় গ্রন্থে ঘোষিত হইয়াছে। বাণীগুলি নারীচরিত্রের এক-একটী বিশেষ বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে এবং তাহা এমন প্রাঞ্জল ভাষায় মন্ত্রের মত সূত্রাকারে উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে—পাঠ করিবামাত্র তাহা প্রত্যেকের মর্ম্মে গিয়া পৌঁছে—খুঁটিনাটি সকল প্রশ্নের সহজ সরল সমাধান পাইয়া মুক্তির পুলক-শিহরণে প্রাণ নাচিয়া উঠে। "নারীর নীতির" প্রতিটী বাণী চলার কত সহজ সঙ্কেত, কত আশা, উদ্দীপনা এবং উপদেশে পূর্ণ রহিয়াছে তাহা বলিবার নয়! গুটীকয়েক বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা :—

মেয়ে আমার—

তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা, পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন-একটা ভাবের সৃষ্টি করে—যা'তে তা'রা অবনতমস্তকে, নতজানু হ'য়ে, সসম্ভ্রমে, ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে—'মা আমার,—জননী আমার!' ব'লে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়,—তবেই তুমি মেয়ে,—তবেই তুমি সতী।

নারীর বৈশিষ্ট্য—

মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে—নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন; তুমি তোমাদের ঐ বৈশিষ্ট্যের কোন-কিছুকেই ত্যাগ করিও না; ইহা হারাইলে তোমাদের আর কি রহিল?

কুমারীত্বে—

কুমারী মেয়েদের—

পিতায় অনুরক্তি থাকা, তাঁহার সেবা ও সাহচর্য্য করা,—তাঁহার সহিত আলাপ ও আলোচনা কবা—উন্নতির প্রথম ও পুষ্ট সোপান।

একানুরক্তি—

একানুরক্তি—বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিয়া, ভাঙ্গিয়া—জ্ঞানে বিন্যস্ত করিয়া দেয়,—আর বহু-অনুরক্তি—বৃত্তিগুলিকে আরো

সৎসঙ্গ মাতৃবিদ্যালয়

হইতে আরোতর করিয়া,—বিবেক ও বিবেচনাশূন্য করিয়া ফেলে ;—তাই, বহুতে আসক্তি মূঢ়ত্ব ও মরণের পথ পরিষ্কার করে—আর একানুরক্তি অমৃতকে নিমন্ত্রণ করে !

বিবাহ-পরিহারে—

আদর্শানুপ্রাণতা যদি তোমাকে উদ্দাম করিয়া তুলিয়া থাকে,—যদি তুমি তোমার হৃদয়ে তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও স্থান দিতে না পাব,—আর, তাঁহাকে যদি তোমার পারিপার্শ্বিক ও জগতে প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদনা অটুটভাবে ধরিয়া থাকে,—মনে হয়—বিবাহ না করিয়াও জীবন পুণ্য ও পবিত্রতায় অতিবাহিত করিয়া, সবাইকে উজ্জ্বল করিয়া—উজ্জ্বলতর হইতে পারিবে ;—নিজেকে বুঝিয়া দেখিও ;—যদি আবিলতা দেখিতে পাও, তোমার বিবাহে ব্রতী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

লজ্জা ও সঙ্কোচ—

লজ্জা যেখানে পুরুষের মোহকে ডাকিয়া আনে—তা' লজ্জা নয়কো—দুর্ব্বলতা বা ন্যাকামী।

নারীর লজ্জা যদি পুরুষকে সশ্রদ্ধ, অবনত ও সেবা-উন্মুখ করিয়া তোলে, সেই লজ্জাই নারীর অলঙ্কার ;—লজ্জাকে ভুল করিয়া তাহার নামে দুর্ব্বলতাকে ডাকিয়া আনিও না।

গুপ্ত পুরুষাকাঙ্ক্ষা—

যখনই দেখিবে পুরুষ-সংস্রব তোমার ভাল লাগিতেছে—অজ্ঞাতসারে, কেমন করিয়া, পুরুষের ভিতর যাইয়া আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছ—বুঝিও, পুরুষাকাঙ্ক্ষা—জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক্—তোমার ভিতর মাথাতোলা দিতেছে ;—যদিও স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রকৃতিগত একটা ঝোঁক উভয়ের সংস্রবে আসা—তথাপি দূরে থাকিও, নিজেকে সামলাইও নতুবা অমর্য্যাদার তোমাকে কলঙ্কিত করিতে কিছুই লাগিবে না।

প্রতিষ্ঠায় প্রেম—

প্রেম বা ভালবাসা—তা'র প্রেমাস্পদকে পারিপার্শ্বিকে, জগতে শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না,—সে আরও চায়—তাহার

জগৎকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে তাহার প্রেমাস্পদকে উপঢৌকন দিয়া কৃতার্থ হইতে;—তাঁহাকে বহন করিয়া, বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করিয়া—অধীনতায় তৃপ্তি ও মুক্তিকে আলিঙ্গন করিতে;—আর এমনই করিয়া প্রেম তাহার প্রিয়কে বোধে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, জীবনে ও ঐশ্বর্য্যে প্রতুল করিয়া তোলে—তাই, প্রেম এত নিষ্পাপ—এত বরণীয়!

কামে কাম্য—

কাম চায় তাহার কাম্যকে নিজের মত করিয়া লইতে—সে সুখী হয় কাম্য যদি তাহার জগৎখানি লইয়া তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া দেয়; কাম কাহারও পানে ছুটিতে জানে না—তাহার শিকারকে আত্মসাৎ করিয়াই তাহার তৃপ্তি;—সেই জন্য তাহার বৃদ্ধি নাই—জীবন ও যশ সঙ্কোচশীল—মরণ-প্রাসাদে তাহার স্থিতি—তাই, সে পাপ, দুর্ব্বলতা, চঞ্চল, অস্থায়ী ও মরণ-প্রহেলিকাময়! —বুঝিয়া দেখ কি চাও?

প্রেরণায় স্ত্রী—

নজর রাখিও তোমার স্বামী যেন তোমাতে সুস্থ, স্বস্থ ও প্রেরণাপুষ্ট থাকিতে পারেন কিন্তু তোমাতে মূঢ় ও সমাহিত না হন,—তোমার তুষ্টি, পুষ্টি যেন তাঁহার লক্ষণীয় না হয়, বরং তোমার প্রেরণায় তিনি যেন আদর্শে উদ্দাম হইয়া বিশ্বসেবায় নিরত থাকিতে পারেন; আর এইটী যেন তোমার তৃপ্তির, তুষ্টির, সুখ ও গর্ব্বের আরাধনা বলিয়া হৃদয়ে স্থান পায়—মহিমময়ী ও সুখী হইবে—সন্দেহ নাই।

শিল্প-ব্রত—

আমার মনে হয়, ব্রতের ভিতর এই ব্রতটীর অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক মেয়েরই অবশ্য কর্ত্তব্য,—সেটী হ'চ্ছে শিল্পব্রত। এমন-কিছু শিল্প অভ্যাস করাই চাই—যাহা খাটাইয়া অন্ততঃ পক্ষে তুমি নিজে—অশক্ত হইলে তোমার স্বামী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির পেটের ভাত, পরণের কাপড়, আর অবশ্য-প্রয়োজনীয় যাহা-কিছুর সংস্থান করিতে পার;—তোমার অবস্থায় যদি অনটন না-ও থাকে, তথাপি তোমার কিছু উপার্জ্জন সংসারকে উপঢৌকন-স্বরূপ দেওয়াই উচিত;—

ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, অন্যের গলগ্রহ হইবার ভয় থাকিবে না, তাচ্ছীল্যের পাত্রী হইবে না,—আদর ও সম্মান অটুট থাকিবে ;—'শিল্প' বলিতে কিন্তু শ্রমশিল্পও—আর এইটী বাদ দিয়া লক্ষ্মীর ব্রত সম্ভব কি না জানি না।

শুচি ও পরিচ্ছন্নতায়—

সব সময়ে শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকিও,—তোমার শরীর ও চারিদিক যেন ছিম্‌ছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে,—ময়লা, দুর্গন্ধ বা আলুথালু না থাকে,—সজ্জিত করিয়া রাখিও—দেখিলেই যেন সুন্দর ও স্বস্তিকে অনুভব করা যায় ;—তাই বলিয়া, শুচিবাইগ্রস্ত হইও না,—দেখিও স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি তোমাকে অভিনন্দিত করিবে।—অশুচি ও অপরিচ্ছন্নতা—পাতিত্যের মধ্যে এগুলিও কম নয়।

ছদ্মবেশী মাতৃভাবে—

অনেক দুর্ব্বলচেতা, নীচচিন্তাপরায়ণ পুরুষ—বিশেষতঃ তাদৃশ যুবকেরা—তাহাদের কামলোলুপতাকে ভ্রাতৃত্ব বা সন্তানত্বের মুখোস্ পরাইয়া—মা, মাসী, ভাই, বোন ইত্যাদি সম্বোধনের সাহায্যে মেয়েদের নিকট গমন করিয়া হাবভাব আদর আব্‌দারে তাহাদের বশে আনিয়া,—মাই খাওয়া, চুম্বন, জড়াইয়া ধরা ইত্যাদির ভিতর দিয়া—তাহাদেব নীচ কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া লয়—যা' নাকি তাদের মাসী, বোন্ বা গর্ভধারিণীর সহিত মোটেই করে না। সাবধান হইও এমনতর মা, মাসী, ছেলে, ভাই ইত্যাদি সম্বন্ধ হইতে,—ইহাতে মেয়েরা কামভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া এমনতর পুরুষে ঢলিয়া পড়ে—ফলে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হয় ;—গোপনতাই ইহাদের উত্তম ক্ষেত্র ;—তাই, তাহারা প্রায়ই লোকজন হইতে সরিয়া থাকিতে চায় ;—লোকের কাছে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে তাহারা খুব সাধু এবং আদর্শচরিত্র ;—উভয়কে উভয় পারিপার্শ্বিকের চক্ষু এড়াইবার জন্য প্রচার করিয়া থাকে,—কিন্তু বাস্তবতায় তাহাদের চরিত্রে ভাল'র তেমন-কিছুই দেখা যায় না। যে-ই কেন না হোক্ পূর্ব্বেই সাবধান হইও,—আর যদি ভুল করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাক—এই সব লক্ষণ দেখিবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইও ; মনকে সংযত করিও—পদদলিত করিয়া, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় করিও ; বুঝিও—নেকড়ে বাঘও এদের চাইতে চরিত্রবান্!

বরণে বিচার—

বরণ করিতে হইলেই দেখিও—স্বামীর আদর্শ কি বা কেমন,—তাঁহার আরাধনায় চেষ্টা ও কর্ম্মের আগুনে তোমাকে আহুতি দিয়া সার্থক হওয়ার প্রলোভন তোমাকে প্রলুব্ধ করে কি না। আর তুমি যাহাকে বরণ করিতে চাও সে তাঁহাতে কেমনতর ও কতখানি,—কারণ তুমি তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে যাইতেছ; ইহাতে যদি তুমি উদ্বুদ্ধ হও—আর জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যায় যদি—তোমার বরণীয় যিনি—তিনি সর্ব্বতোভাবে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ হ'ন,—এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষের অর্ঘণীয় বলিয়া বিবেচনা কর—তবে—তাহাকে বরণ করিলে বিপত্তির হাত হইতে এড়াইতে পারিবে—এটা ঠিক জানিও।

ধর্ম্মাচরণে—

'ধর্ম্ম' মানেই হ'চ্ছে তাই—যা' নাকি ধরিয়া রাখে—অর্থাৎ যাহা করিলে বা যে আচরণে বা যে ভাব-পোষণে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি অক্ষত ও অবাধ হয়;—তুমি যদি ধর্ম্মশীলা হও, দেখিবে তোমার পুরুষ (স্বামী) ও পরিবারে আপনা-আপনি তাহা চারাইয়া যাইতেছে, কারণ স্ত্রী যাহা চায় পুরুষের ইচ্ছা তাহাই করিতে চেষ্টা করে—আর পুরুষের বেলায়ও স্ত্রী তদ্রূপ তাহার বৈশিষ্ট্যে; তাই, দেখিতে পাইবে—তাহাদের অজ্ঞাতসারে, তাহাদের চরিত্রেও তোমার ঐ ধর্ম্মপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—আর ইহার ফলে তোমার সংসার শ্রী ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া—রোগ শোক দুর্দ্দশা দরিদ্রতা হইতে—ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে।

জীবন-ধর্ম্মে ইষ্ট—

ইষ্ট বা আদর্শ বা গুরু তা-ই বা তিনি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, অনুসরণ করিয়া—মানুষ জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে,—আর—আসক্তি বা ভক্তি তাঁহাতে নিবদ্ধ থাকায় —পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোন বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে না পারিয়া—জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে;—তাই—আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিকতা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়! অতএব ধর্ম্মসাধনার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনই হ'চ্ছে ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু—আর ধর্ম্মশীলা হইতে হইলেই—চাই তাঁ'তে ভক্তি ও তাঁহার অনুসরণ ও আচরণ

তা' এমনতর চরিত্র লইয়া যা'তে এই ভক্তি বা আসক্তি—স্বামী ও পারিবারিক সবার ভিতর যেন এমনতর প্রেরণার সৃষ্টি করে—যা'তে তা'রা ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠেন;—আর এমনতর হইলেই—তোমার সহধর্ম্মিণীত্ব সার্থক হইবে,—দেখিবে উজ্জ্বল হইবে ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে!

সুপ্রজননে নিষ্ঠা—

ক্ষীণমতির (the feeble-minded) কোনো কিছুতে লাগোয়া-থাকা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া মনে হয়,—আর এই লেগে-থাকা অভ্যাসকে যতই তাচ্ছীল্য করা যায় মন ততই দুর্ব্বল, চঞ্চল, ক্ষীণতর-চিন্তাসম্পন্ন হয়—তাই—তা'র মানসিক অস্থিরতা জীবনকে প্রায় অবহনীয় করিয়া তোলে; আবার এইরূপ অস্থির ও ক্ষীণমনা স্ত্রী তা'র স্বামীকে তাঁহার ভাবধারায় এমনতর ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না—যাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক ভাবের আবেগে স্ফীত ও উৎফুল্ল হইয়া নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে; এবং তারই ফলে—সে এমনতর সন্তানের গর্ভধারিণী হয়—যাহাব ক্ষীণ ও চঞ্চল মন ধাতুগত হইয়া থাকে—পরে তা' সংশোধন অতি দুষ্কর হইয়াই থাকে—আর অল্পায়ু, বেকুব ও রোগসঙ্কুল সন্ততির এ-ও একটা প্রধান কারণ! তুমি যদি অমনতর হইয়া থাক লেগে-থাকা বা নিষ্ঠাকে যত্নে চরিত্রগত করিতে চেষ্টা কর; যদি পার,—এ দুর্দ্দৈবের হাত হইতে এড়াইবে,—ভাবিও না।

স্বামীর বিপথ-গমনে—

তোমার স্বামী যদি বিপথগামীই হইয়া থাকেন—তাঁহাকে তাচ্ছীল্য করিও না—বা রূঢ় ভাষা বা ব্যবহারে কিংবা অযত্নে তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিও না, বরং অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর—বাস্তবিকভাবে তিনি কি চান আর কিসের অভাবে বা আসক্তিতে তিনি এমনতর পথ অবলম্বন করিলেন; আবিষ্কার কর, সম্ভব হইলে প্রাণপণ করিয়া তাহার নিরাকরণে যত্নবতী হও,—আর এমনতর আদর, যত্ন, সেবা, যুক্তি ও আলোচনা কর যাহা তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া এমনতরভাবে উদ্বুদ্ধ করে যাহাতে তিনি একরকম অজ্ঞাতসারে—তোমাতে মুগ্ধ হইয়া বিপথের প্রয়োজন হইতে অপসারিত হ'ন!

স্বামী-প্রতিষ্ঠায় গুরুজন-সেবা—

স্বামীর যদি উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা চাও—তবে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা হইতে কখনই বিমুখ হইও না; কারণ তাঁহারা তা'-ই যাঁহাদের হইতে তোমার স্বামী উদ্ভূত হইয়াছেন—আর তাঁহারাই তাহার আদিম মঙ্গলকামী, যদিও এ কামনার ভিতরও ভ্রান্তি থাকিতে পারে! স্বামী যদি ভ্রান্ত হইয়া ইহাতে অনিচ্ছুক হ'ন—তা' উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের সেবা করিলে মঙ্গলই হইবে;—শ্বশুর যদি ভ্রষ্টাচার-সম্পন্নও হ'ন তথাপি তাঁহার সেবাবিমুখ হইও না, বরং সহচর্য্যায় বিরত থাকিও—দেখিবে—মঙ্গলকেই উপঢৌকন পাইবে।

গর্ভিণীর গর্ভচর্য্যায়—

যাহাকে গর্ভে স্থান দিয়াছ—মানুষে মূর্ত্ত করিবে যাহাকে—গর্ভারম্ভ হইতেই তাহার পরিচর্য্যা করিতে ভুলিও না—এ পরিচর্য্যা প্রথমতঃ মানসিক, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক; তোমার মনকে যতই নির্ভীক ও সৎ-এ প্রফুল্ল রাখিতে পারিবে, তোমার গর্ভস্থ সন্তানও তাহাই উপভোগ করিবে—শরীরকে স্বাস্থ্যে, কর্ম্মপটুতায় ও পরিচ্ছন্নতায় যতই সুন্দর রাখিতে পারিবে, তোমার গর্ভস্থ সন্তান তাহাই উপভোগ করিবে—বুঝিয়া চলিও।

বিধবার আদর্শ—

বিধবার আদর্শ—ইষ্ট বা গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্তরে স্বামীকে অটুট রাখিয়া, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা হইয়া, উপযুক্ত সেবায়—পারিপার্শ্বিক ও জগতে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করিয়া নন্দিত হইয়া গত স্বামীর আত্মাকে নন্দিত করা।

বালবৈধব্যে—

তুমি যদি বিধবা হইয়া থাক—তোমার মস্তিষ্কে, গত স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া যদি কোন প্রকার টান, উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা না-ই থাকিয়া থাকে,—আর সে স্বামীকে যদি তুমি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া না থাক, এবং তাহার স্মারক সন্তানসন্ততি যদি না-ই থাকিয়া থাকে,—এবং তোমার যদি মনে পুরুষাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া তোমাকে চঞ্চল ও উদ্বেল করিয়া তোলে, সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আদর্শবান্ কোন

পুরুষকে তুমি অনায়াসে বরণ করিয়া তোমার স্থিতি ও উৎকর্ষকে তাঁহার সহিত নিবদ্ধ করিয়া—তাঁহার সহিত আদর্শে সার্থক হইতে পার ;—ইহাতে তুমি পাতিত্যকে এড়াইয়া পবিত্রতাকে লইয়া অস্খলিত জীবন যাপন করিতে পারিবে।

রোগচর্য্যায় গাছ-গাছড়া—

সাধারণতঃ তোমার পারিপার্শ্বিক গাছ-গাছড়া বা অন্য-কিছু—তাহা মানুষের কি প্রয়োজনে লাগিতে পারে, কি কি গুণ তার, কি প্রয়োজনে কেমন-করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, ইত্যাদি নখদর্পণে রাখিয়া দিও—বিপদে সাহায্য পাইবে—হয়ত অল্পে—বৈদ্য বা ডাক্তার খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হইবে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ইষ্টকে স্মরণ করিয়া তাঁহার কথা, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার চলন ও চাওয়া ইত্যাদি চিন্তা করিয়া—শয্যাত্যাগ করিও, পরে প্রাতঃকালীন সাংসারিক কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া প্রাতঃকালীন প্রয়োজনের উপকরণ যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বদিকে আনন্দ-আরক্তিম সূর্য্যকে অবলোকনের সহিত—গুরুজনকে অভিবাদন করিও, সন্তান-সন্ততিদিগকে যথাযথ উৎফুল্লতার সহিত স্নেহসম্ভাষণ দ্বারা প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের খবর লইতে ভুলিও না, ইহা অভ্যাসে এমনতর করিয়া লইতে চেষ্টা কর—যেন প্রত্যেকের মুখ দেখিয়াই যথাসম্ভব অল্প কথার ভিতর দিয়া স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের খবর অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পার ;—আর ইহাই যেন তোমার রন্ধন-ব্যাপারকে পরিচালিত করে ;—অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বাস্থ্যানুপাতিক আহার্য্য যেন প্রত্যেকেই পায়—দেখিও এমন করিলে তোমার পরিবার রোগসঙ্কুল হইয়া—তোমাকে দুর্দ্দশা ও দুরবস্থায় বিধ্বস্ত করিবে না।

'নারীর নীতিতে' নারীর জ্ঞাতব্য এবং প্রতিপালনীয় উক্ত প্রকার অসংখ্য বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অমৃতময়ী উপদেশবাণী দান করিয়াছেন। পতিতা রমণীর উদ্ধারের কথা, আদর্শ নারীর কর্ত্তব্য, প্রকৃত সতী, আদর্শ মাতা, নারীর শিক্ষা, নারীর বৈশিষ্ট্য, জাতিগঠনে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ, বিবাহের আদর্শ, সুপ্রজননের অব্যর্থ উপায়, পতিত ও বিপথগামী স্বামীকে কি করিয়া জীবনে বর্দ্ধনে উন্নত করিয়া সোণার সংসার গড়িয়া তুলিতে হয়, নারীর দক্ষতা, নারীর সেবা, নারীর মাতৃত্ব প্রভৃতি নারী-জীবনের সকল তথ্যের সুন্দর মীমাংসা অতি সহজ কথায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। 'বর্ত্তমান যুগের নারীর এই

মহা উপনিষদ্ গ্রন্থখানা বঙ্গের গৃহে গৃহে নারীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত,'—একথা আজ অনেকেই বলিতেছেন।

চলার সাথী

প্রাত্যহিক জীবনে কেমন করিয়া চলিলে মানুষ ব্যাপনে বর্দ্ধনে নিজেকে উচ্ছল করিয়া তুলিতে পারে এই গ্রন্থখানায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাহারই উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি পরিবার, কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কি ধর্ম্ম, কি শিক্ষা, কি রাজনীতি সর্ব্বত্র আজ ঘোর বিপ্লব উপস্থিত। পুঞ্জীভূত বিরাট অন্ধকার গাঢ় যবনিকার মত দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, দুর্গম-কুয়াসাচ্ছন্ন পথে চলিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। পারিবারিক দুর্দ্দশার কথা বলিবার নয়। পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঐক্য নাই, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর প্রীতি নাই, স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয় নাই, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধ, এক দেশ অপর দেশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে নিয়ত চেষ্টিত। জাতির এই মহা সঙ্কট সময়ে যাহাতে প্রতিটী পরিবার আদর্শ সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, দেশবাসী সকলে পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয় "চলার সাথীর" বাণীগুলিতে তাহারই সু-সঙ্কেত রহিয়াছে।

প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান কেমন করিয়া করিতে হয়, সাধনা ও সিদ্ধির পথ কি, শিক্ষার উদ্দেশ্য, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, জীবনে আদর্শের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-বিধানে চাতুর্ব্বর্ণ্য, বিবাহে স্ত্রীর দায়িত্ব, ব্রত, আচার, নিয়ম, সন্ধ্যা, পূজা, জপ, প্রার্থনা প্রভৃতির তাৎপর্য্য, অবস্থাভেদে চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান কেমন করিয়া করিতে হয়; নেতা, উকিল, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব, বেকার-সমস্যার সমাধান, স্বাধীনতার বিকৃতি ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা, সেবামাহাত্ম্য, সুখদুঃখ, সত্যমিথ্যা, শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, দৈব ও পুরুষকার, অমৃত ও মরণ, প্রাত্যহিক জীবনে যাজনের প্রয়োজনীয়তা, ভালবাসার শক্তি, কাম ও প্রেমের চাহিদা, ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিক, কৃতকার্য্যতার ধারা ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের মীমাংসা-বাণী ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এক কথায়, নরনারী কোন্ পথে কি-নিয়মে চলিলে সমাজ ও পরিবার মধুময় হইয়া উঠিতে পারে তাহারই ব্যবহারিক কৌশল জানিতে পারা যায় "চলার সাথীর" বাণী হইতে।

বিরাট অহং-এর ঘনীভূত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যাহাদের অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে, বাসনার মোহে জর্জ্জরিত, বিক্ষিপ্ত ও অবশ হইয়া যাহারা

অবসাদের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সেই অবাধ্য প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া বাসনা-রাশিকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে "চলার সাথীর" বাণীগুলি সবিশেষ সাহায্য করিবে। নিম্নে গ্রন্থের স্থান বিশেষের কয়েকটী বাণী উদ্ধৃত করিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সর্ব্বপ্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। জগতের সেই আদিম অবস্থার সহিত যোগযুক্ত মনের কি বিরাট অনুভূতি! বর্ণনার গাম্ভীর্য্য এবং বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য প্রারম্ভের মাত্র গুটীকয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

> "ক্ষুব্ধ-সম্বেগে অব্যক্তের বুকে দ্রুত ব্যঞ্জনায় বিঘূর্ণিত সত্তাব উচ্ছৃষ্ট-বিচ্ছুরণ-সংবিদ্ধ সংঘাতকম্পিত ছন্দে ভাসমান শক্তি-শরীরী প্রতিধ্বনিই আদিবাক্—সৃষ্টির প্রথম প্রগতি!
>
> "কম্পিত-কল, সৃজন-উৎস সেই স্ফুটবাক্ বিজৃম্ভিত-সম্বেগে, আত্ম-বিচ্ছুরণে, সহসম্পদে, ভাসবিস্ফোরণে, বহুধা-প্রকটে পর্য্যবসিত হইয়াও তাহাই থাকিলেন—অব্যক্তেরই বুকে!—কিন্তু সে স্পন্দনে ব্যক্ত-বিমুখ সাড়া দিল না!
>
> "স্পন্দনপ্লুত, বিপ্লব-বহ্নি, শক্তি-সমুদ্র, ঘোষ-কল, জাতবাক্ প্রকট-প্রাচুর্য্য হইয়াও তদবস্থ!—তিনিই ঈশ্বর, আদিবাক্—পরম দৈবত।"..... ইত্যাদি!

গ্রন্থের সূচনাযই পুরুষের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর তেজোদৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে, পুরুষ ছুটিবে তাহার আদর্শের পানে আর নারী চলিবে তাহার পুরুষকে অনুসরণ করিয়া আদর্শের প্রতিষ্ঠার ইন্ধন যোগাইয়া নিজেকে সার্থক করিতে। পুরুষ আদর্শমুখী না হইয়া নারীমুখী হইলেই সর্ব্বনাশ। পুরুষ যে নারীকে চাইতে পারে না—ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাই যে তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—ইষ্টপ্রতিষ্ঠাযই যে তাহার সর্ব্বসার্থকতা—ব্যক্তি ও জাতির উন্নতির এই মূল মন্ত্রটী শ্রীশ্রীঠাকুর নানা ভাষায় বারংবার সকলকে জানাইয়াছেন। এস্থানেও তাই বলিলেন—

> "তুমি জগতে প্লাবনের মত ঢলিয়া পড়—সেবা, উদ্যম, জীবন ও বৃদ্ধিকে লইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়া—জয়, যশ ও গৌরবের সহিত ;—আর নারী যদি চায়-ই তোমাকে তবে ছুটুক সে তার মঙ্গলশঙ্খনিনাদে সব-প্রাণ মুখরিত করিয়া তোমার দিকে,—কিন্তু সাবধান!—চেওনা তুমি তা'!"

তারপর গ্রন্থ-অধ্যয়নে যতই অগ্রসর হওয়া যায় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার

ভিতর পথ চলিবার সুন্দর সুন্দর সহজ সঙ্কেতগুলির সহিত পরিচয় ঘটে। যথা :—

কৃতকার্য্যতা-লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন—

"তুমি জান বা না জান, পার বা না পার—তোমার চেষ্টার ক্রমাগতি অটুট, অব্যাহত থাক ;—সিদ্ধির পথ খুঁজিয়া লও, কৃতার্থ হইবে, কৃতকার্য্যতা আসিবে ; আর তোমার প্রতিষ্ঠা তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবেই—নিশ্চয় জানিও।"

আবার বলিতেছেন—

"যদি করিতেই চাও, যে কাজ করিতে হইবে তাহা কেমন করিয়া, কি কি দিয়া—পারম্পর্য্য-হিসাবে, যতদূর সম্ভব চিন্তা করিয়া লও,—তারপর সেগুলি তোমার অবস্থা ও সামর্থ্যের আনুপাতিক করিয়া মিলাইয়া লইও,—আর ইহার সাথে বেশ করিয়া দেখিয়া লও তাহা কত সহজে, কত কম সময়ে, কত কম শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সংঘটন সম্ভব হইতে পারে ;—আর ইহার অন্তরায়গুলিকে যেমন করিয়া সম্ভব বশে আনিয়া—অনুকূল করিয়া কিংবা অবহেলা করিয়া, করার উপায়গুলি তোমার ফন্দীর ভিতর আনিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত ভীমবেগে লাগিয়া যাও,—কৃতকার্য্যতা যে তোমাকে দাসীর মত সেবা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?"

যশস্বী হইতে সবাই আমরা চাই, কিন্তু কি করিলে প্রত্যেকের অন্তরের অধীশ্বর হওয়া যায় যাহাতে সকলে স্বতঃই আমার স্তুতি-গানে তৃপ্তি পায়—তাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলিয়া দিতেছেন :—

"তুমি মানুষের এমনতর নিত্য-প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াও—যাহাতে তোমার সেবায় তোমার পারিপার্শ্বিক যথাসাধ্য প্রয়োজনকে পূরণ করিয়া জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে আলিঙ্গন করিতে পারে ;—আর এমনি-করিয়াই তুমি প্রত্যেকের অন্তরে ব্যাপ্ত হও ও এগুলি তোমার চরিত্র হইয়া দাঁড়াক্,—দেখিবে যশ তোমাকে ক্রমাগত জয়-গানে যশস্বী করিয়া তুলিবে।"

দুঃখকে চিরতরে বিদায় দিয়া কি-ভাবে নিজে সুখী হওয়া যায় এবং অন্যকে সুখী করা যায় তাহাই শুনিতেছি, নিম্নের উদ্ধৃত বাণীটীতে—

"দুঃখের চিন্তায় বিব্রত থাকিও না—দুঃখের ভাব কাহাকেও আনন্দিত করিতে পারে নাই!—বরং কিসে মানুষকে সুখী

করিতে পারিবে, মানুষ কেমনতর ব্যবহার পাইলে সুখী হয়—তা' কেমন করিয়া করিতে পারা যায় ইত্যাদি চিন্তা কর, আর কাজে লেগে যাও ;—নিজেও সুখী হইবে আর অন্যকেও করিতে পারিবে।"

আপদবিপদ, ভালমন্দ, অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যদিয়া সবাইকেই চলিতে হয়, কিন্তু অবস্থা-বিশেষকে যিনি যেমন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হন ফল-ভাগীও তিনি তেমনই হন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলিতেছেন—

"শুভদর্শীই দেখ্‌তে পায় আপদ, বিপদ, ব্যাঘাত ও দুঃখের ভিতর একটা উন্নতি ও আনন্দের স্বর্ণ সুযোগ!—কিন্তু মন্দদর্শী সব ভালোর ভিতরই অবাধে দেখে নেবে অপারকতা, অসম্ভবতা—একটা দুরদৃষ্টের দুরপনেয় দুর্ভোগ!"

সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্রটা গুটি-কয়েক কথায় কেমন স্পষ্ট অথচ সহজভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"করা, লেগে-থাকা, দেখা ও অনুধাবন করা—এই কয়টাই বোধ, বিজ্ঞান, দক্ষতা ও সিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করে।

"পারি-না ভাবা বা পারায় সন্দেহ কার্য্যতঃ 'না-পারা'কেই সৃষ্টি করে ;—পারায় 'না' বা সন্দেহকে তাড়িয়ে দাও—লেগে থাক ; চেষ্টা কর, সিদ্ধি সম্মুখেই তোমার।"

তেমনি কৃতার্থতার রাজলক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা ও কর্ম্মপটুতার সহিত যাহার বিপদের ভিতর শুভ ও সুযোগ-দর্শন ফুটিয়া ওঠে—তুমি অতি নিশ্চয়তার সহিত বলিয়া দিতে পারে—সে যেমনই হউক না কেন—কৃতার্থতার মুকুটে তাহার মস্তক সুশোভিত হইবেই হইবে।"

দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা—অর্থসমস্যা—দারিদ্র্য। দরিদ্র আমরা কেমন করিয়া হইলাম সে কথার কারণ নির্ণয় না করিয়া বেকারের সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছি ; তাই দারিদ্র্যও আমাদের কিছুতেই ঘুচিতেছে না। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শুনিতেছি—

"আলস্য, পারি-না, হয়-না বা পারা-যায়-না—এসব চিন্তা ও চলন হইতে সাবধান ও সতর্ক থাকিও ; কারণ ইহারা সহজেই বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক ইহাদের দ্বারা দুষ্ট হইয়া উঠে ;—ফলে বংশ, সমাজ ও দেশ মূঢ়, মুহ্যমান্‌ ও অবসন্ন হইয়া বিশাল দরিদ্রতায় নিঃশেষ হইয়া যায়।"

"আলস্য, অবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা ও অকৃতজ্ঞতার মতন বন্ধু বা মিত্র থাকিলে দরিদ্রতাকে আর খুঁজিতে হইবে না;—এমন কি ইহাদের যে কোন একটীও দরিদ্রতার এমন বন্ধু ইহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া যেন সে থাকিতেই পারে না, এমন ধন যদি তোমার অন্তরে বসবাস করে, দুঃখের অভাবের বালাইকে আর সহ্য করিতে হইবে না।"

"দীর্ঘসূত্রতা কাজ পণ্ড করার গুরুঠাকুর; ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া মানুষ দুর্দ্দশার কবলে পতিত হয়; লোভ মানুষকে অবসন্নতায় চালাইয়া মৃত্যুতে নিঃশেষ করিতে পারে; পাওয়ার উৎসকে পূরণ না করিয়া গ্রহণ যেখানে মুখর হইয়াছে স্বার্থ সেখানে ম্লান ও মুহ্যমান্; প্রেমকে অবলম্বন না করিয়া কামকে যে দমন করিতে চায় কামই তাকে বিধ্বস্ত করে; শোক যদি অনুশোচনাকে ডাকিয়া অপলাপের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে তবে তাহাই সমীচীন্; মানুষের যাহা কিছু আছে সবই যখন দাঁড়াইবে তাহার আদর্শের উপরে, শান্তি তখনই নিনড় হইয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিবে; সন্দেহ যেখানে সহাস্য, সঙ্কোচ সেখানে স্বাভাবিক; যে লোককে খারাপ দেখিতে জানে দোষদৃষ্টির চশমাচোরের সহিত তা'র কমই সাক্ষাৎ হয়; মান যা'র ক্ষণভঙ্গুর যশ তা'র চিররুগ্ন; বীরত্ব ও পারকতা যা'র মেয়েদের কাছে মুখর হইয়া ফুটিয়া ওঠে, বহির্জগতে বাস্তবে আসিলেই সূর্য্যতাপে সে যে মলিন হইয়া এলাইয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়; কৃপা পাওয়া তা'কেই বলে, করা বা সেবার ফুরসুৎ যেখানে মুক্ত; শুধু কামপ্রবৃত্তি কখনও কাহাকেও প্রকৃত স্বামী বা স্ত্রী করিতে পারে না; শুধু কসরৎ-সাপেক্ষ সংযম অনেক সময়ে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আনিয়া দেয়; প্রেমের গন্তব্যই যেখানে কামোদ্দীপ্তা কামিনী, লাঞ্ছনা-মাল্য তা'র কণ্ঠকে শোভিত করিয়াই থাকে; সমাজের যদি আদর্শ না থাকে তাহা প্রাণহীন, অতএব চলনহীন—তাই ক্ষয়ে নিঃশেষ হইয়া যায়; অর্পিত ক্ষমতা যা' নাকি মানুষকে ত্রাণ, তৃপ্ত ও বর্দ্ধন করে না, তা' শয়তানের তমসাচ্ছন্ন পিচ্ছিল বর্ত্ম; দোষদৃষ্টির অব্যর্থতা ব্যর্থ প্রহেলিকায় জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে; অধিগম্য যদি কিছু থাকে তা' হ'চ্ছে স্মৃতিবাহী চেতনা—যা' জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া পরবর্ত্তীতে পৌঁছাইয়া দেয়; তা' করাই গোলামী যা' করিতে গিয়া প্রাপ্যের

খাতিরে আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে হয়; কর্ম্ম যাঁ'র প্রিয়, ফলপ্রাপ্তি তাঁ'র মোসাহেব; অন্যের নিন্দা ক'রে বড় হ'তে চাওয়া, আর বড় নিন্দক হওয়া একই কথা; কুৎসা-কুয়াসায় জ্ঞানের প্রদীপ কি করিবে? চাই তাচ্ছীল্যের ফট্‌কা আওয়াজ; একটা জিনিসই যথেষ্ট মানুষের দুরদৃষ্ট ও জাহান্নমের পক্ষে—তা' আদর্শে অকৃতজ্ঞতা; আদর্শ যা'র খেয়ালের ইন্ধন, বৃত্তি যা'র চালক, স্বাধীনতা তা'র বিকৃত অহং-এর অসংবদ্ধ কল্পনামাত্র; আদর্শ যা'র নাই, আদেশ যা'কে অপমানিত করে, দেশ তা'র জাহান্নমে।"—

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত এই সকল অমূল্য অসংখ্য উপদেশের প্রত্যেকটীই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলার অপূর্ব্ব সঙ্কেত।

আবার সঞ্চয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—

"সঞ্চয় করিও কিন্তু সেবার জন্যে। তোমার সঞ্চয় যদি সেবাকেই পূজা না করিল, নিশ্চয় জানিও—উহা যাহা বর্দ্ধনকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহারই জন্য।"

কিন্তু কি দেখিতে পাই? সেবা-বিমুখ হইয়াই সকলে সঞ্চয় করিতে চাহে—সেবার জন্য সঞ্চয় কয়জনে করেন? ফলে আমাদের বৃদ্ধিও নাই।

আবার বলিতেছেন, "সেবা মানে তাই—যাহা মানুষকে সুস্থ, স্বস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে; আর তাহা হয় না অথচ শুশ্রূষা আছে, সে সেবা অপলাপকেই আবাহন করে!"

আদর্শ কে, জীবনে আদর্শানুরক্তির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, আদর্শচ্যুতিতে মানুষের কতখানি সর্ব্বনাশ আনয়ন করে তাহারই আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"যাঁহার সেবা, সাহচর্য্য ও অনুরক্তির সহিত অনুসরণ মানুষকে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নত করিয়া তোলে—যাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি বা ভক্তি অটুটভাবে নিবদ্ধ থাকায়, পারি-পার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোন প্রকার বিক্ষেপ সৃষ্টি না করিতে পারায়, ঐ বিক্ষিপ্ত সংঘাতগুলি সম্বদ্ধ ও বিন্যস্ত হইয়া, সার্থকতা লাভ করিয়া, ভাবে, জ্ঞানে ও বোধে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া অমৃতকে আলিঙ্গন করে তিনিই আদর্শ, ইষ্ট বা গুরু;—তাই ইষ্ট, আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিক অনুরক্তি মানুষের জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়; ধর্ম্মকে অটুট করিয়া জীবনকে বহন করিতে হইলেই এই আদর্শ, ইষ্ট বা গুরুই হ'চ্ছে প্রধান প্রয়োজনীয়! তুমি

তাঁহাতে তোমার অনুরক্তি, ভক্তি, ভালবাসাকে ন্যস্ত করিয়া—তাঁহাকেই পরম স্বার্থ বিবেচনায় তাঁহারই অনুসরণ কর—কৃতার্থ হইবে!"

তাই আবার বলিতেছেন—

"আদর্শ তোমার পিতা, আদর্শ তোমার পালক, আদর্শ তোমার স্রষ্টা, আদর্শ তোমার চালক, আদর্শ তোমার প্রিয়তম! ধীমান্! সর্ব্বপ্রকারেই তুমি আদর্শের হইয়া থাক,—আর তোমার একমাত্র প্রচেষ্টাই যেন থাকে তোমার জগতে যেন তাঁ'কে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া সার্থকতায় উদ্দীপ্ত হইয়া অমৃতকে আলিঙ্গন করিতে পার;—তোমার ভালমন্দ যতবৃত্তিই থাকুক না কেন সকল বৃত্তিতেই যেন তোমার আদর্শ সম্যক্‌রকমে অনুপ্রবিষ্ট হন; তুমি কখনই তাঁহা হইতে নিজেকে ফিরাইয়া কামকাঞ্চনে উন্মত্ত হইয়া, আত্মদান করিয়া অমৃত, উন্নতি ও জীবনকে অপঘাতে অবমাননা করিও না—জাগ্রত থাক।

"তুমি যদি থাক তোমার পতিব্রতা স্ত্রী যেমন কিছুতেই নষ্ট হইতে পারে না,—তেমনই তোমার আদর্শ, ইষ্ট বা গুরু যদি থাকেন, আর তাঁ'তে তোমার ভক্তি যদি অটুট হইয়া তোমাতে তাঁহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারে,—নষ্ট তোমা হইতে দূর কতদূর পলাইয়া যাইবে খুঁজিয়াও খোঁজ মিলিবে না!—আর তোমার ইহা হইতে পতন হইলেই দুরদৃষ্ট লোলজিহ্বায় তোমাকে তো আক্রমণ করিবেই, সঙ্গে সঙ্গে তোমার পতিত্বকেও উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে!"

আর—

"তুমি যতই আদর্শে স্বার্থপ্রাণ হইবে—সেবায় দক্ষতা, কার্য্যে নিপুণতা, কথায় ও ব্যবহারে মিষ্টতা, সহানুভূতি ও সংবর্দ্ধনা—এগুলি তোমার চরিত্রকে অনুলিপ্ত করিয়া তোমার পারিপার্শ্বিকে প্রতিফলিত হইবেই—তুমি আদর্শে যে স্বার্থপ্রাণ হইয়াছ, তাঁহার প্রতিষ্ঠাই যে তোমার পরমস্বার্থ—এই আকুতিই তোমাকে বাধ্য করাইয়া, অথচ অজ্ঞাতসারে এমনতর করিয়া তুলিবে!—আর ইহাই তোমার আদর্শপ্রাণতার সাক্ষ্য।"

দুইটী কথায় 'পাওয়ার' কি অব্যর্থ সঙ্কেত বলিয়া দিতেছেন—

"পাইতে—করাকেই অনুসরণ করিও,—শুধু বিবেচনা পাওয়াকে অনেক সময় অবশ করিয়া তোলে।"

প্রচলিত নানাতথ্যের মর্ম্মার্থ অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নিম্নে উদাহবণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

সত্য ও মিথ্যা—

যাহার অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে, আর যাহা, থাকাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উন্নয়নে পরিচালিত করে,—এমন-কি আর কোন থাকার বিচ্ছেদ বা বিরতি আনে না তাহাই সত্য;—আবাব যাহাতে ঐ থাকাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়া অন্যের থাকার বিক্ষেপ বা অপলাপ ঘটায় তাহাই মিথ্যা।

সাধনা ও সিদ্ধি—

কোন কিছুকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার কৌশল অবগতিব পুনঃ পুনঃ একতান চেষ্টা করাকেই সাধনা বলে;—আর যখন ইহা জানা ও করার ফলে চরিত্রে অর্শিয়া ওঠে তখনই সিদ্ধি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে।

কর্ম্মফল ও অদৃষ্ট—

তোমার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সংক্ষুধিত পারিপার্শ্বিকে তোমার কর্ম্মফল নিঃসৃত হইয়া সংক্রমণে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া তোমার জানার পাল্লার বাহিরে তোমার জন্য যাহা অপেক্ষা করিতেছে তাহাই তোমার অদৃষ্ট।

দৈব ও পুরুষকাব—

সহজ বৈশিষ্ট্যসম্ভূত সংস্কার—যাহা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, আর যাহার ফলে পারিপার্শ্বিক তাহাকে যেমন করিয়া গ্রহণ করে—তাহাই দৈব;—আর পুরুষকার ঐ বৈশিষ্ট্যনিহিত ক্ষমতা—যাহা মানুষকে প্রকৃত করিয়া প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকে চালনা করে।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—

ধর্ম্ম মানে তাই যাহা নাকি থাকা, বৃদ্ধি পাওযাকে জীবন, যশ ও উন্নতি-প্রবণতার সহিত একতানে বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিয়া অমৃতকে আলিঙ্গন করায়;—আর যাহা এইগুলির অপলাপ ঘটাইয়া

সঙ্কোচ, অবসন্নতা ও অধঃপতনের পথে লইয়া মরণকে স্পর্শ করাইয়া দেয়—তাহাকেই অধর্ম্ম বলা যায়।

ধ্যান—

ধ্যান করা আর কিছুই নয়—মানুষ যেমন করিয়া তাহার প্রিয়কে চিন্তা করিয়া উদ্বুদ্ধ ও উল্লসিত হয়, অর্থাৎ, যাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে তাঁহাকে যেমন দেখা যায়, তাহাতে যাহা যাহা আছে, যাহা যাহা লইয়া তিনি,—তাঁর চলা, বলা, ভাব-ভঙ্গী সহকারে ভাবা, চিন্তা ও মানসিক আলোচনা করিয়া বোধ, অর্থ ও উপায়ে উপনীত হইয়া, তাঁহাতে উদ্বুদ্ধ, উচ্ছল ও আপ্রাণ হইয়া তাঁহাকে সার্থক করিতে উন্মুখ ও উদ্দাম হওয়া ;—

আবার কাহারও প্রতি এরূপ ভাবা, চিন্তা ও করার ক্রমাগতি তাঁহাকে, যে চিন্তা করে, তাহার প্রিয় করিয়া তোলে ;—আর এমন করিয়াই ধ্যেয় বা প্রিয় যখন তোমাতে কেবল হইয়া উঠিবেন, তখন তুমিও তাঁহাতে কেবল হইয়া সমাহিত হইবে, আর এই সমাহিত ভাবই সমাধিকে আমন্ত্রণ করিবে ;—আর ইহাতেই মস্তিষ্কে সহজ বোধ ও মনে সহজ ভাবের অভ্যুত্থান হইবে।

দ্রষ্টা পুরুষের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রতি অহংসেবী স্বার্থান্ধ মানবের অশ্রদ্ধা ও অকৃতজ্ঞতায় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইয়া জাতিকে অধঃপাতে লইয়া যায়, তাহারই কথা বলিতেছেন—

"যিনি পূর্ব্বতন দ্রষ্টা, প্রেরিত বা ইষ্টদিগকে অস্বীকার বা তাচ্ছীল্য করিয়া নিজের মত বা দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চান, কিন্তু অবনতমস্তকে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া—অজ্ঞানতা, সময়ের ভিতর দিয়া, তাঁহাদের উক্তিগুলির যে বিকৃতি ঘটাইয়াছে, তাহা সশ্রদ্ধায় সংশোধন করতঃ—অধিকন্তু সেই সংশোধনের উপর তাহার সময়োচিত পরিপূরণ ও পরিপুষ্টি আনিয়া, সহজ উন্নত ও প্রাঞ্জল করিতে প্রয়াসী না হইয়া, অস্তুতি ও অপলাপ করিয়া তাহা আদবেই ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর তাঁহাকে সন্দেহ করিও ;—কারণ ইহা ঠিকই পূর্ব্বতনের নিশ্চয়োক্তিকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী যাহা বলিতেছেন বা করিতেছেন তাহার অভ্যুদয় ;—তাই যিনি বা যাঁরা পূর্ব্বতনে অশ্রদ্ধা ও অকৃতজ্ঞতাহেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্, তাঁরা পরবর্ত্তী অনুসরণকারীদের ভিতর সেই অকৃতজ্ঞতা ও

বিচ্ছিন্ন ভাবকে চারাইয়া জাতি ও কৃষ্টিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই ;—তাই বলিতেছি—সাবধান হইতে দ্বিধ করিও না।"

ধর্ম্মানুসরণ করিলে মানুষের জয়, যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ, কাম, মোক্ষ—লাভ হইবেই কিন্তু ধর্ম্মাচরণে মানুষ যদি খিন্নই হয় তবে নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে আচরণেই তাহার গলদ রহিয়াছে, তাই বলিতেছেন—

"তুমি ধার্ম্মিক! নিয়ত ভগবানের আরাধনা করিতেছ,—পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক লইয়া বিব্রত ,—অথচ সেবা, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, জীবন, যশ, বৃদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি ইত্যাদি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছে না, আর তোমার পারিপার্শ্বিক তোমাতে উপযুক্তরূপে এগুলি পাইয়া সমৃদ্ধ হইতেছে না,—বুঝিও—তোমার ধর্ম্ম-আড়ম্বরে বেঁচে-থাকা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে আমন্ত্রণ কর নাই ;—তাই, তুমি ও তোমার পারিপার্শ্বিক উভয়েই ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছ!"

আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান এতদিন মানুষ অন্যকে পীড়ন করিয়া—অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া—অন্যকে বিপন্ন করিয়াই পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। অন্যের প্রতিষ্ঠায়ই যে প্রকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠা তাই আজ দেশবাসীকে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিতেছেন—

"স্মরণ রাখিও—অন্যের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করাই তোমার জীবন, যশ, বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র পথ ;—কিন্তু তাহা করিয়া,—শুধু ভাবিয়া, বলিয়া, বা চাহিয়াই নয়কো। ইহার ভুল হইলে তোমার সব চেষ্টা, সব ইচ্ছা, সব কর্ম্ম ভুলেই অবসান হইয়া যাইবে।"

মানুষের জীবনের সম্রাট হইবার কি উদার প্রশস্ত বর্ত্মই না দেখাইযাছেন নিম্নোদ্ধৃত বাণীটিতে! যথা :—

"ছোট বা নীচু তোমার কাছে আসিয়া যেন কিছুতেই বুঝিতে না পারে সে বা তাহারা ছোট ও নীচু ;—বরং তোমার সাহচর্য্যে ও সাহায্যে তাহারা যেন দেখিতে পায় সম্মুখেই বিস্তৃত রাজপথ—যাহা ধরিয়া চলিলে মানুষ হেলায় বড় ও প্রবীণ হইতে পারে ;—আর এটা তোমার স্বভাব-সিদ্ধ হোক্!—দেখিবে মানুষের জীবনে তুমি সম্রাট হইয়া থাকিবে।"

পুরুষ বড়, কি নারী বড়—ইহা লইয়া আজ দেশময় তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন—"নর নরই, নারী নারীই—স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উন্নতি লাভ করাই প্রত্যেকের প্রকৃতিগত সহজ ধর্ম্ম। পুরুষ নারী হইতে চাহিলে আর নারী পুরুষ হইতে চাহিলে—দুর্দ্দশা ও দুর্গতি-ভোগ অবশ্যম্ভাবী। নর ও নারীর মধ্যে ছোট বড় প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। নর যেন গাছ, আর নারী যেন মাটী। মাটী গাছের refuse লইয়াই পুষ্ট ও তুষ্ট, এবং বিবর্ত্তনে সে গাছকে দেয় nourishment যা'র ফলে গাছ বেড়ে ওঠে। একজনের দিয়েই তৃপ্তি—আর একজনের পেয়েই তৃপ্তি। মাটী গাছের বীজকে বুকে ধ'রে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গাছকে খাদ্য দিয়ে পুষ্ট ও বর্দ্ধনশীল রাখে, এটা মাটীরই ধর্ম্ম। গাছ মাটীর কোলে বদ্ধিত, লালিত এবং মাটীর দ্বারা পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উর্দ্ধে এগিয়ে যা'চ্ছে কিন্তু শিকড় তা'র মাটীর কোলে, মাটীর দ্বারা পুষ্ট হ'য়েই সে বেড়ে চল্‌ছে—এখানে ছোট বড়'র প্রশ্ন হ'তে পারে না।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাই নারী ও পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

> "পুরুষের বৈশিষ্ট্য লইয়া পুরুষ আর নারীর বৈশিষ্ট্য লইয়া নারী; পুরুষ যখন নারীতে মুগ্ধ হইয়া নারী-সর্ব্বস্ব হইয়া, নারীর যাহা-কিছু লইয়া নিজেকে সাজাইতে চায়, তখন হইতেই পুরুষে পুরুষত্বের মরণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে,—পুরুষ অবশ ও উচ্ছৃঙ্খল আশা ভরসা লইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিবিড় মূঢ়ত্ব ও তমসার ভিতরে নিজেকে মুছিতে মুছিতে পিচ্ছিল গতিতে বিলীন হইতে থাকে,—আবার নারী যখন পুরুষকে সংবৃদ্ধ না করিয়া, নিজের বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছীল্য করিয়া, পুরুষের হাবভাবগুলি কুড়াইয়া লইয়া নিজেকে পুরুষ করিয়া তুলিতে চায়,—নারীত্ব তখন প্রেতিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অবসন্ন ও অসংযম্য বাহু বিস্তার করিয়া, ব্যর্থতায় বিকট হইয়া, তাচ্ছীল্য ও ঘৃণায় খিল্ খিল্ করিয়া অবাধ্যভাবে হাসিতে হাসিতে অনন্ত দুর্গতিতে অবসান হইতে পারে।"

ব্যবসায় করিয়া বাঙ্গালী লাভবান্ হইতে পারে না প্রায়শঃই দেখা যায়, ইহার কারণ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ঠকাইবার বুদ্ধিই থাকে বেশী। ব্যবসায় একমাত্র সেবার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই তথায় লক্ষ্মীর আসন অচল হইতে পারে—নতুবা নয়। তাই ব্যবসায়ীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন—

সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণ গৃহনির্ম্মাণ করিতেছেন

"প্রয়োজন-ক্লিষ্টকে যতদূর সম্ভব তা'র ও তোমার সামর্থ্যমত সুবিধা করিয়া দিও,—দেখিও তুষ্ট হয়, সংবর্দ্ধিত হয়,—ঠকা ভাবিয়া যেন কিছুতেই অনুতপ্ত না হইতে পারে, বিফলতার সাক্ষাৎকার তোমার কমই ঘটিবে।

"ব্যবহারে, যত্নে, সহানুভূতিতে প্রয়োজন-ক্লিষ্টকে তা'র উপযুক্ত সামর্থ্যের ভিতরে যদি তোমার সেবা তাহার প্রয়োজন-পূরণের সহিত তোমার লাভকে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ করিয়া দিতে পারে, তবেই ব্যবসায়কে অবলম্বন করিও—নতুবা তা' ধৃষ্টতামাত্র!

"যদি ব্যবসায় করিতে চাও আগে ব্যবহার শিক্ষা কর,—তা' এমনতর যাতে সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় মানুষ স্বস্তি ও তৃপ্তি পায়;—আর এইটা চরিত্রগত করাই হইল কৃতকার্য্যতার মূলভিত্তি।"

চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন :—

"যদি সার্থকই হইতে চাও আত্মাভিমানকে একদম বিদায় দিয়া চাক্ষুষ ও সহজ বিবেচনায় কঠোর হইয়া স্নেহশীল থাকিতে যত্নবান্ হইও,—বিরক্তি, নিন্দাবাদ, স্থৈর্য্যহানি, অসহানুভূতিশীলতা যেন তোমার উপর কিছুতেই আধিপত্য করিতে না পারে, আশা, ভরসা, সুখশ্রমশীলতা ও সদ্ব্যবহার যেন তোমার চরিত্রে ওতপ্রোত-ভাবে সমবেদনায় ঝঙ্কারিত হয়, রোগ-নিরাকরণই তোমার পরম স্বার্থ হউক যতক্ষণ তোমার রোগীর সুস্থতায় তুমি পরিতৃপ্ত না হও—স্বপর্য্যালোচনায় নজর রাখিয়া মনন করিও, পরিচর্য্যায় পশ্চাৎপদ হইতে, উৎকণ্ঠাকে বিরক্তি ও বেদনার সহিত তাচ্ছীল্য করিতে, তোমার মনকে একটুও অবসর দিও না; চিকিৎসার সময় অর্থ যেন তোমাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে খুব নজর রাখিও—আরো নজর রাখিও রোগীর মেরু ও মস্তিষ্কে, শ্বাস ও হৃৎযন্ত্রে আর পরিপাক ও নিঃস্রাব-বিধানে,—কোন ভরসাই যেন বা কোন নিরাশাই যেন তোমাকে ইহা হইতে বিচ্যুত না করে, —নজর রাখিও জীবনের আধার তোমার ইষ্ট বা ভগবানে,—মননে, কর্ম্মে ও আচরণে তাঁহাকে কুড়াইয়া আনিয়া—তোমার দুঃস্থ ও অবসন্নের ভিতর ঔষধ, নিয়ম ও পরিচর্য্যার সহিত উপ্ত করিতে জাগ্রত থাকিও,—তৃপ্তি, যশ ও অর্থ তোমাকে পূজা না করিয়া জলগ্রহণই করিবে না।"

বেকারসমস্যা-সমাধানের কি সুন্দর ব্যবহার-কৌশল বলিয়া দিতেছেন—

"দুটো খেয়ে যদি বাঁচ্‌তেই চাও তবে আহরণ কর—আর আহরণ করিতে হ'লেই দেখ্‌তে হ'বে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন; তোমার করা যদি এই প্রয়োজন-পূরণের সেবা করিতে পারে তবেই তা'র বিবর্ত্তনে তোমার আহরণ বাস্তবে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে,—এই ক'রতে গিয়ে আগেই যদি পয়সা পাওয়ার কাল্পনিক পর্দ্দায় তোমার দৃষ্টিকে রুদ্ধ ক'রে তুলতে থাক—আহরণ তো হবেই না, চল্‌তে হোঁচোট্ খেয়ে প'ড়বেই নিশ্চয়;—আর পয়সার আবরণ ফেলে দিয়ে যদি চল,—এই প্রয়োজনের সেবার সম্বেগে —ঠিক জেনো, পয়সা তোমাকে পূজো ক'র্‌বেই—তাই অমানী হ'য়ে অভিনিবেশের সহিত পারিপার্শ্বিকের সেবায় নিত্যই তোমার করাকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখ—বেকারের উৎকটতা তোমার কি করিবে?"

জীবন-যাত্রার পাথেয় এইরূপ অসংখ্য উপদেশবাণীতে গ্রন্থখানা পূর্ণ রহিয়াছে। বেসুরে চলার সকল ভুলভ্রান্তি দূর করিয়া মানুষকে জয়, যশ ও গৌরবের অধিকারী করিয়া তুলিতে "চলার সাথী"র মত সত্যিকারের পথপ্রদর্শক বাস্তবিকই বিরল।

The Message

কতকাল পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর 'সত্যানুসরণের' বাণীগুলি রচনা করিযাছিলেন! তৎপর সুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কথিত বা রচিত কোন বাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ১৩৪১ সনে 'নারীর পথে', 'নানা প্রসঙ্গে', 'নারীর নীতি', 'চলার সাথী' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাহিত্য-জগতে দেশব্যাপী এক-অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর আনয়ন করে। বঙ্গবাসীর নিকট এই বৎসর এককালে এক বিশেষ স্মরণীয় বৎসর বলিয়া গণ্য হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল গ্রন্থাদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসংখ্য অমূল্য উপদেশাবলী এবং অপূর্ব্ব সমাধান-বাণী প্রকাশিত হইলে পর ইং ১৯৩৫ সনে তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থ 'The Message' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-রচনার উপলক্ষ্য বিষয়ে সঙ্কলয়িতা পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ মহোদয় যে কৌতূহলপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। যথা:—

"শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ মাতৃভাষা বাংলা-ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলিতে পারেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে গত ১৩৪০ সনের শীতকালে আমি ইংরাজী-জানা লোকদের জন্য তাঁহার নিকট কতকগুলি ইংরাজী বাণী চাহিয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার কথিত নানা সমস্যার সমাধান-বাণীনিচয় বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মনে করিলাম যদি এই সকল বাণী ইংরাজীতে লিখিত হইত তাহা হইলে তাহা দেশবিদেশের বহুলোকের বিশেষ প্রয়োজনে আসিত। আমি এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাঁহাকে ইংরাজীতে বাণী প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম কেমন করিয়া—যদিও আজ একযুগ ধরিয়া জানি যে, তিনি ইংরাজী মোটেই জানেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'অসম্ভব!' কয়েক দিন চলিযা গেল। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে ডাকিয়া বাণী লিপিবদ্ধ করিতে বলিলেন। আমি শুনিয়া অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম তিনি সহসা ইংরাজীতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিতে গিয়া আমার লেখনী কাঁপিতে লাগিল। এইভাবে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া তিনি সময়ে অসময়ে আমাকে ডাকিয়া বাণী লিপিবদ্ধ করাইতে লাগিলেন। বাণী-প্রদানকালে আশ্রমবাসী অনেকেই উপস্থিত থাকিতেন,—পরিদর্শনকারী অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং মাঝে মাঝে সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণ নানা প্রয়োজনে উপদেশ ও পরামর্শ লইবার জন্য উপস্থিত হইতেন—ইহাতে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হইত। সময় সময় স্রোতের মত অবিরল ধারায় বাণীগুলি এমন হুড়্‌হুড়্ করিয়া বাহির হইত, বিশেষ ত্রস্ততার সহিত লিখিয়াও লেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও বলেন যে বাণীগুলি মাছের ঝাঁকের মত বা আকাশে সঞ্চরমান মেঘ-খণ্ডের মত হঠাৎ তাঁহার মানসপটে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে উদিত হয়, আবাব তেমনি অতি সত্বর সেগুলি কোথায় বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইযা পড়ে। আমি তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম। সারা দিন-রাত্র, যতক্ষণ তিনি সজাগ থাকিতেন, আমিও তাঁহার কাছে কাছে থাকিতাম —কারণ কখন যে বাণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ডাকিবেন তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। কথিত বাণীগুলি আমার নিকট এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তুই ছিল, কারণ দীর্ঘ বার বৎসরের অধিক কাল তাঁহার সঙ্গ করিতেছি কোন দিন তাঁহাকে পূরাপুরি একছত্র ইংরাজী বলিতে শুনি নাই। জাগ্রতাবস্থার "মহাভাববাণী" ছাড়া এগুলিকে আর কি বলিব? শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃ

বিছানার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া, উপস্থিত সকলের সমক্ষে বাণী বলিয়া যাইতেন আর তাহাই লিপিবদ্ধ হইত। সমগ্র পুস্তকখানায় লিপিবদ্ধ যাবতীয় বাণী—যাহা ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে কথিত হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটীই তাঁহার স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হইতে উক্ত হইয়াছে আর তাহাই তিনি তদীয় সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে বীজাকারে মূর্ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কথিত বাণীগুলিতে বর্ত্তমান জগতের নানা সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত বহু প্রশ্নের অপূর্ব্ব সমাধান রহিয়াছে—অন্ততঃ আমার কাছে।

"মনে মনে প্রশ্ন করিলাম—এগুলি অন্যেরও প্রয়োজন লাগিতে পারে কি না। কতিপয় বন্ধুকে দেখাইলাম। কথাগুলি তাঁহাদের কাছে খুবই ভাল লাগিল। আমি এগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চেন্সেলার মাননীয় রেভাবেণ্ড ডাঃ আরকুহার্টকেও দেখাইলাম। তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মন্তব্য কবিলেন—'বাণীগুলির অধিকাংশই কেমন হৃদয়গ্রাহী, কি সুন্দর, কত মনোজ্ঞ, আর কি অপূর্ব্ব তাহার ভাবসম্পদ!' আর আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—'সূত্রাকারে নিবদ্ধ এই ছন্দোময়ী বাণী-গুলি আমি বিশেষ আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি এবং ইহার উচ্চ ভাবরাজির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।......আমি আশা করি, পুস্তক-খানি মুদ্রিত হইলে যে উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা সাধিত হইবে।"

তৎপর "The Message" নাম দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত এই সকল ইংরাজী বাণী মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'চলার সাথী' 'নারীর নীতি' প্রভৃতি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে এ গ্রন্থখানার উদ্দেশ্যও তাহাই—অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবমনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা—জীবনযাত্রার পথে বিধ্বস্ত মানবকে চলার সঙ্কেত বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বল, ভরসা, আশা, উদ্দীপনায় সন্দীপ্ত করিয়া তোলা। সমগ্র গ্রন্থে অন্যূন তিনশত বাণী সংগৃহীত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতিপয় বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা :—

The Message—

Roll on—like a flood over the sorrows, sufferings and calamities of the World,—with love, sympathy and service and with the message of Beloved the Lord,—with a knowledge and activity that illuminates the way of the dull, and deteriorating depressed ;—flow on—extremely unresting and un-

disturbed: if female wants let her run after you, proclaiming admiration and worship, establishing the kingdom of peace and happiness with a wistful soothing gaze after her beloved ;—but wish not for that at all!

Remember and Go—

Think not weak, think not depressed,- ye be not hopelessly immobile; remember the best creation of His stock which you live in! Shout, cheer up, be sure and brave;—hold His banner of love, behold Him in His creation; go—and this *go* is only to serve, to kneel and to pray!

Love *vs.* Force—

Love acquires Life with all its riches,—and Force conquers rights without life!

Rights—

Only then the right is right and is a boon of nature, when it is dumb of self and active in nursing the environment--to fulfil the requisition of existence with a welling up of service!

The Way to Success—

Surrender to thy Ideal, continue to move on—smashing and managing the sufferings that come forth as obstacles,—and be crowned with success!

Perfections—

When Ideal, individual and environment fulfil one another in a concord,—with an uplift of exuberance that moves the life onward with an easy, intelligent flow—*Perfection* resides there indeed!

Real Education—

Education in its real form is to unfold the characteristic faculties that are latent within by attachment to an Ideal embodied, and through the glimpses of expressions—those which come forth as impulses from his experiences during periods of exposition,—to follow with services, to learn with attention, to do in accordance therewith,—in a word to take those impulses in, with sense,—to unfold and adjust!

University—

When varieties arrive with a meaning at unity—it is university!

Acquisition and Learning—

Acquisition through love and admiration makes the being elevated,—whereas enormous learning from inferiority-complex keeps the being untouched!

The Mother of Success—

Verily, I say, *doing* is the *mother* of *success*!

The Garland of Wealth and Worship—

If you possess normal aptitude for service with your unshaken love for principle that exalts your environment with a profitable nourishment which makes them interested with a loving earnestness to cherish you, verily, I say, with a stony assurance destiny with the garland of wealth and worship will follow you with a wistful gaze!

Boon of Satan—

Really unlucky he is who adorns himself at the cost of others' interest, instead of healing sore and

sorrow of deficiency of pauper environment ;—so despair and despondency is the boon of Satan to him!

Heredity—

Heredity bears the being of forefathers alive in the offspring: So when a woman of higher heredity succumbs to an inferior, it rouses a drowning-down panic in the soul of her ignorance, because the inferior breeds at the cost of the deteriorating superior!

Predestination and Free Will—

The inherited instincts imbibed from the acquisitions of forefathers determine the faculties that make one move—that is *Predestination* ;—and the faculties that dwell in those instincts accentuate the innate nature of a being, and make it move accordingly—this is *Free will!*

Beauty—

Have you a craving for beauty? Try to see beauty even in ugliness!

Man and Woman—

Man should expand himself blazing up his ideal in his environment, exalting it in life, wealth and ability, bestowing his self on every individual, making them unified in interest in him: In such a way he runs after glory with glory, and this is the characteristic of a man ; and where the female follows man with a darling dish of nourishment, voice of vitality, influence of love, push for the ideal, tears of affection and sympathy, proclaiming with the blow of conch, 'Run forward—in exhaustion I am the

shelter, I the rest and life, the arbour of love and refreshment,'—that is the characteristic of a woman!

Chastity dwells there—

When in a female all the passions converge in welling up the life and lift of her beloved, ceases all her hankering for self-enjoyment but for Love: hope relieves despair, labour relieves rest, joy relieves suffering, and life relieves death in the innermost recesses,—peeping wistfully towards the lover, making him unconsciously exuberant in life, love and service, with a beautiful serviceable move—chastity dwells there!

My Religion—

The act of binding oneself with the Ideal, in love, worship and admiration and to live on accordingly in an acceleration of one's being and becoming is *Religion* to me.

War Inevitable—

Without nourishing the environment through compassion, love and service soothing with resonant sympathy sorrows and disappointments, when individuals of same interest live on slaughtering others—those that environ them—to protect their existence,—they quiver, outbreak with roaring rolls,– hunger shouts with cramps of cruelty,—tilt in every heart pangs of existence, screams with thrill—War is inevitable!

Art and Literature—

What makes one luminous with an enthusiastic unfoldment of ideas that elate the mind with a

pleasure-push to service and success in the way of becoming by means and skill that operates with an uphill sensation, is Art and Literature.

Labour and Capitalism—

Where capitalists are not laborious to serve the labourers—to make them efficient, Mammon with a sighful glimpse converts money into mud ; and where labourers deceive the capitalists without being profitable to them and negligently usurp the maintenance which makes them fit in life, Satan with embezzling laughter presents them a black necklace with a steel rope that pulls them towards vanity !

The Backbone of Commerce—

Service with invention is the backbone of commerce : When commercialism serves not the Ideal and culture with money and means, it lacks with a yawning depression and dwindles to a depradation of invention that stabs—with a cruel blood-shed.

Money—the Symbol of Thanks—

Money is the symbol of thanks that come out of the hearts of the needy and sufferers in exchange of service that redeems : So if there be any wealth that enriches men, it is Service—that brings in prosperity to both—the servant and the served !

Ascend the Throne of Bliss—

If thou wishest to be pure in soul, love thy Ideal or Prophet,—do everything to fulfil the wishes that thou knowest and see good in everything thou seest—

allying evil with an uplift of being and becoming : Do so to thyself and others and thus ascend the throne of purity and bliss!

Where the Latter is denied the Former is spitted on—

Phenomena roll on, experience goes evolving—thus the first invites the second, and the former makes way for the latter : So the prior is the resting ground of what comes after ;—therefore, he who denies the former insults invariably the latter,—and where the latter is denied, the former is spitted on!

The Way to know the Grace and God—

He the Supreme Father is ever unknown and unknowable—but there—only when the Beloved, the attached Son is solely attached to His Grace, and does and goes accordingly, can only be known—He in him : So he is the father Embodied—though he knows him as His child, and thereby he is The Way to know the Grace and God and God Himself in him—the source of heaven, peace and happiness.

My Father—

My Father! The Supreme, the omnipotent, all-pervading! My heavenly heart! The Beginning! The Being that hath manifested! My God, Oh Thou, revealed in flesh and blood! A Child of Thyself to wash off the sorrows and sufferings with begotten blood!—Let Thy blessing flush the dirts that are onerous and make me pure and able with a tilt of blissful joy!

Peace, Peace, Peace—Be Ye Peaceful!

Be ye whatever—regret not what has happened by the impulse of your blind misfortune, let not be afeared by the taunting insult of your actions that have occurred by the enticement of the ignorant, dull, depressing environment; Shout, cheer up—be unquivered and attached by your tendrils of passion to the Ideal, the Beloved—whose love enters unquestionably top to bottom whatever ye may be—saint, rogue, sufferer, criminal or sinner—pervading all! Instal Him with all your purpose, with all your service, with all your love and emotion, with all the resources you have; neglect to fulfil the narrow sordid interests from the universe in which you dwell; only think of Him, think how to fulfil His interests,—move on doing and dealing accordingly—elating everyone with the message of love, hope, charity and service that exalts! Put thine ear to the throbbing impulse of environment and hear attentively the lingering music of the inner micro-cosm with a rolling peaceful concert, a singing thrill—

Peace Peace Peace—be ye Peaceful!

চলার রীতি

এই পুস্তকখানি আকারে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয়-সম্পদে ইহা অদ্বিতীয় ও অমূল্য রত্নবিশেষ,—মানব-সাধারণের জীবন-চলনার একমাত্র বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্ম্ম চিরকালই সকলের কাছে অজ্ঞেয় এবং দুর্জ্ঞেয় হইয়াই রহিয়াছে, কিন্তু "চলার রীতি" মানুষের চিরপোষিত এই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিয়াছে। প্রকৃত-খাঁটি কোন্ পথ এবং মিথ্যাই বা কি তাহা এই পুস্তকের বাণীগুলির কষ্টিপাথরে অতি সহজ ও সুন্দরভাবে জানিবার সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেকটী বাণী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে মানব-মনের কত-দিনের কত ভ্রান্ত ধারণা

যে তিরোহিত হয়, তাহা বলিবার নয়! সত্যকে কুসংস্কারের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এমন স্পষ্ট ও জলন্তভাবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার ফলে যদি আজ এই বিভ্রান্ত মরণোন্মুখ জাতির যথার্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয়—নির্জ্জীব দেহে প্রাণের স্পন্দন আসে! বাণীগুলি যেন এক-একটী অমোঘ মন্ত্রস্বরূপ। যে-কেহ বাণীগুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে তাহা প্রতিপালনপূর্ব্বক জীবন-পথে অগ্রসর হইবেন, তিনিই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গফল অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন। বাণীগুলির প্রতিটী অক্ষর যেন ওজন-করা, অতীব সূক্ষ্মভাবে বিচার-করা,—স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও অভ্রান্ত এমন বাণী বাস্তবিকই নিতান্তই বিরল।

গ্রন্থের আরম্ভে মানবমাত্রেরই সহজ-চলার তিনটী রীতির কথা বলিতেছেন। যথা :—

১। পৃথিবীর পূর্ব্বতন অবতার, প্রেরিত ও মহাপুরুষদিগকে আপ্ত বলিয়া স্বীকার করা এবং সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকা উচিত।

২। যিনি পূর্ব্বতনে সশ্রদ্ধ হইয়া,—তাহাদের বাণী ও কর্ম্মের তাৎপর্য্যনিরূপণে এবং তাহারই আরোতর প্রগতিতে সম্বেগোদ্দীপ্ত সার্থকতায় বাস্তব পরিণতিতে চলিয়াছেন—তাঁহাকে সেই যুগ বা সময়োপযোগী প্রেরিত বা গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া, তৎস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া, পূর্ব্বতনদিগকে তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়া নিবিষ্ট চলনে চলিতে চেষ্টা করা উচিত।

৩। যে-কোন সম্প্রদায়, যে-কোন মত বা গুরু ও কুল-গুরু-উপদিষ্ট সাধনা ইত্যাদিতে কেহ নিবিষ্ট থাকুক্ বা না থাকুক্, তাহা ত্যাগ করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, সৎমন্ত্রে প্রত্যেকেরই দীক্ষিত হইয়া তচ্চলনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

চির-পোষিত ভ্রান্ত এবং বিকৃত ধারণা দূর করিয়া সত্যজ্ঞান লাভের জন্য নিম্নলিখিত বাণীগুলি প্রত্যেকেরই সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। যথা :—

সাধনায় চরিত্র—

সাধন-প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত চেষ্টা ও অভিনিবেশে শব্দ, জ্যোতিঃ দৈববাণী ইত্যাদি যোগ-বিভূতি যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, সেগুলি শুধু তোমার মস্তিষ্কের বৈধানিক পরিবর্ত্তনই নির্দ্দেশ

করে। ইহা তোমার প্রকৃত সত্তা ও চরিত্রকে স্পর্শ না-ও করিতে পারে; কিন্তু আদর্শে ভক্তি বা ভালবাসার অকাট্য টানে বা তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়ায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহা সত্তা ও চরিত্রকেই আকর্ষণ করিয়া উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত করে—ইহা স্থির নিশ্চয়।

সাধু—

যিনি সিদ্ধির কৌশলকে চরিত্রগত করিয়া তদ্ভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহাকেই প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধু বলা যায়।

প্রকৃত ধ্যান—

আড়ষ্টভাবে শুধু ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তার চেষ্টা করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হইতে যাইও না,—তাহাতে তোমার মস্তিষ্কের সাড়াসম্বাহী কোষগুলিকে সঙ্কাপ-মুহ্য করিয়া একটা নিরেট পরিণতিতে পরিণত করিয়া তুলিবে। তোমার ইষ্টপ্রাণতায় অনুরক্ত আকুল ইষ্টবুভুক্ষা যখনই তাঁহার চাহিদাকে প্রাঞ্জল ও অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়া তঁৎস্বার্থ ও তঁৎপ্রতিষ্ঠামুখর যাজন-অভিব্যক্তিতে সন্ধিৎসা-উদ্দীপ্ত কর্ম্মপ্রয়াসী করিয়া তুলিবে,—সেই আপ্রাণ ইষ্টানুরাগী বুভুক্ষা যে ইষ্টমনন তোমার অন্তরে উপস্থিত করিয়া থাকে—তাহাই হ'চ্ছে তোমার স্বাভাবিক ইষ্টধ্যান,—ইহাই হ'চ্ছে প্রকৃত জীবনীয়, তোমার পক্ষে প্রকৃত বর্দ্ধনীয়।

ধ্যানের পদ্ধতি—

শুধু মাত্র ইষ্টের প্রতিমূর্ত্তিকে চিন্তা করিলেই যে ধ্যান হইবে তাহার কোনও অর্থ নাইকো,—ইষ্টবিষয়ক স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হইয়া মস্তিষ্কে যত চিন্তাই আসুক না কেন, সহজভাবে সবগুলিকেই ঐ ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানুকূলে মনন করাকেই ধ্যান বা মনন বলিয়া থাকে।

সমাধি—

আর ভাব ও ভাবানুপাতিক কাজের ভিতর দিয়া মানুষের এই রকম চিন্তাই বাস্তব পরিণতিতে আরোতর সম্বেগশালী হ'তে

হ'তেই আপ্রাণ কেবলতায় সমাধিগত হ'য়ে থাকে। সমাধি মানেই হ'চ্ছে সর্ব্বতোভাবে সম্যক প্রকারে ইষ্টকে ধারণ করা।

ধ্যানে Realisation—

যখনই দেখিবে তোমার ইষ্টানুগ বোধোদ্দীপ্ত ভাবগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত করিয়া কর্ম্মে আগ্রহ আকুতির সহিত সম্বেগ ও বুভুক্ষাকুলতায় নিযোজিত হইয়া সে গুলিকে বাস্তব পবিণতিতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে, আর এমন-তর না করিয়াই থাকিতে পারিতেছে না, তোমার অনুভূতি বাস্তবভাবে যে তোমাকে উৎসাহাভিনন্দিত করিয়া ইষ্টপ্রাণ জ্ঞানাধীশ করিয়া তুলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নেই! আর এই হ'চ্ছে Realisation যাকে বলে তাই।

প্রকৃত ধ্যানে মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা—

তোমার ধ্যানের সময় ইষ্টবিষয়ক ও সেই চিন্তার পারি-পার্শ্বিক যত চিন্তাই আসুক না কেন, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য ও সমাধানে আনিয়া, তোমার ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় ও তাঁহার যাজন মননে একান্ত করিয়া আনিতে চেষ্টা করিও; আর তোমাব কর্ম্মশক্তিকে তদনুপাতিক বাস্তবতায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া চালাইতে থাক—দেখিবে অতি সত্বরেই তোমার মস্তিষ্ক কতখানি উর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে! আর ইহার বিপরীত করিলে অর্থাৎ সমস্ত চিন্তাগুলিকে নিগ্রহ করিয়া শুধু ইষ্টমূর্ত্তি-চিন্তাপ্রয়াসী হইতে থাকিলে ঐ নিগৃহীত চিন্তা ও বৃত্তিগুলি এমনতর কর্ম্মপ্রেরণাশূন্য বিকৃত-ভাবাপন্ন হইযা উঠিবে—যাহার ফলে তোমার জীবন একটা নিরর্থক অর্থশূন্য আড়ম্বরতাপূর্ণ অথবা নিরেট হইয়া উঠিতে পারে।

প্রকৃত জপ—

তোমার জপ যাঁহা-হইতে প্রয়োজিত হইয়াছে তিনিই তোমার জপের প্রয়োজন; আর এই প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া যে মানসিক আবৃত্তি তোমাতে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে—অথচ তাহা কোন প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া সংবদ্ধ হয় না, তাহা বিকৃতিকেই ডাকিয়া আনে; কিন্তু ঐ মানসিক আবৃত্তি বা আন্দোলন—যদি যিনি

তোমার প্রয়োজন—তাঁহাতেই সংবদ্ধ ও বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া সহজ বোধ, ভাব বা জ্ঞানে চরিত্রকে উচ্ছল করিয়া সংবৃদ্ধ করিয়া তোলে; তাই জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।

জপের তাৎপর্য্য—

জপের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—যাহা জপ করিতে হইবে তাহাকে ও তাহার বিষয়ক যাহা-কিছু—মনে মনে আলোড়ন করিয়া চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত বোধকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উপলব্ধিকে উচ্ছল করিয়া তোলা।

অনুভূতি মানে কি?—

কোন বোধ বা ভাব যখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে অভিদীপ্ত ক'রে উপ্‌চিয়ে বাস্তবতায় পর্য্যবসিত ক'রে সেইগুলি যখন আবার বাস্তবীকরণের রকমগুলিসহ বা বাস্তব চরিত্রগতকরণের ভাবগুলিসহ সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে—মস্তিষ্কে দর্শন-উৎসাহী হ'য়ে উপনীত হয় ও মজুত থাকে—তাহাই হ'চ্ছে প্রকৃত অনুভূতি। ভাব বা বোধ কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে বাস্তব পরিণতির ফলে পশ্চাতে যাহা হইয়া থাকে তাহারই ভাবকেই অনুভূতি বলে—অনু মানেই হ'চ্ছে পশ্চাৎ, ভূতি মানে হওয়ার ভাব। তা' ছাড়া যে-সমস্ত অনুভূতি সে সব অসংবদ্ধ, স্নায়ু-উত্তেজনার বৈকারিক স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয় বলিয়াই মনে হয়।

যাজন—

যাজন মানেই হ'চ্ছে মানুষের সংসর্গে গিয়ে বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, সাহচর্য্য ও সাহায্যে বাস্তব করণের ভিতর দিয়ে নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে সেবাপটু দক্ষতার অনুপ্রাণনে এমনতরভাবে তাদের ভিতর চারিয়ে দেওয়া—যা'তে তারা তোমার ইষ্টপ্রাণতায় আকৃষ্ট, উদ্বুদ্ধ ও অনুরঞ্জিত হ'য়ে তোমার ইষ্টে এমনতর অটুট ও আপ্রাণ-ভাবে যুক্ত ও অনুরক্ত হ'য়ে উঠে—যার ফলে স্বতঃশ্রদ্ধা ও ভক্তির উৎসারণে তারা পূজায়, যজ্ঞে, দানে, তৎসঙ্গমে অস্তিবৃদ্ধির অমৃত-কৃষ্টিতে সহজ আপ্রাণ আলিঙ্গনে নিরন্তর হ'য়ে ওঠে।

জীবন ও বৃদ্ধির ষট্‌স্তম্ভ—

১। তুমি ইষ্টপ্রাণ সেবাসন্ধিৎসু, ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপর হইয়া তোমার পরিবার ও পারিপার্শ্বিককে ইষ্টানুগ যাজনে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে নিয়ত প্রয়াসশীল থাকিও।

২। অন্ততঃ একবার আহ্বানের সহিত সমবেত প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ—যেমন শারীরিক অপটুতা বা শ্রেষ্ঠনির্দেশী ও অবস্থায় অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম-ছাড়া সমবেত প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য না-করিয়া, তাহাতে যোগ দিতে শ্রদ্ধাবনত যত্নশীল থাকিও-ই।

৩। অন্ততঃ দুইবার ব্যক্তিগত জীবন ও বৃদ্ধিদ সাধনাকে যাজন ও স্মরণ মনন এবং শ্রেষ্ঠকর্ম্মাভিব্যক্তির ভিতর দিয়া অবশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক করিয়া তুলিও-ই।

৪। কল্যাণকর যাহা-কিছু যখনই মনে কর, তাহাকে কখনই নিরুদ্ধ না করিয়া তোমার কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বেই তাহার বাস্তব পরিণতি দিতে তৎপর হইও-ই হইও।

৫। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার, কোন পবিত্র দিনে—তোমাতে নির্ভরশীল প্রত্যেকটী সমর্থ পরিজনসহ—পূর্ব্বাহ্নে স্বল্প-পরিমিত হবিষ্যাশী হইয়া বাকী দিনরাত্রি উপবাসী থাকিয়া এক বেলার আহার্য্যানুপাতিক মূল্য—প্রত্যেকের অন্ততঃ সোয়া এক আনা—তোমার ঈপ্সিত প্রিয়পরমেব উৎফুল্ল সম্বর্দ্ধনার সহিত তৎকর্ম্ম-উদ্দীপ্ত হইয়া যাজনমুখরতায সানন্দে তাঁহাতে উৎসর্গ করিও-ই। উপবাসের সময় ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইলে জল, কচি ডাবের জল ও আমলকীর রস ছাড়া আর কিছুই আহার না করাই বিধেয়।

৬। প্রতিবৎসর ন্যায্য সামর্থ্য-সঙ্কুলান থাকিলে অন্ততঃপক্ষে একবার তোমার আদর্শ, ঈপ্সিত, প্রিয়পরমের জন্মস্থানে সশরীরী নতজানু উৎফুল্ল অভিবাদন দিতে কিছুতেই তাচ্ছীল্য করিও না। ঐ বাস্তব নতি ও স্মরণ-মননোৎফুল্ল উপাসনোদ্দীপ্ত কর্ম্মপ্রেরণায় তোমার অবসাদগ্রস্ত সঞ্জীবনী ধারা উন্নত স্ফুরণে উৎফুল্ল হইয়া দীপ্ত ও সম্বেগশালী পটুত্বে যতদূর সম্ভব বর্দ্ধিত হইবেই হইবে।

সাংসারিক জীবনে নিষ্ঠার সহিত উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ভক্তি-অবনত হইয়া এগুলি প্রতিপালন করিলে তুমি পরিবার পরিজনের

সৎসঙ্গ প্রেস ও পাব্লিশিং বিভাগের কর্ম্মি-সম্মিলন
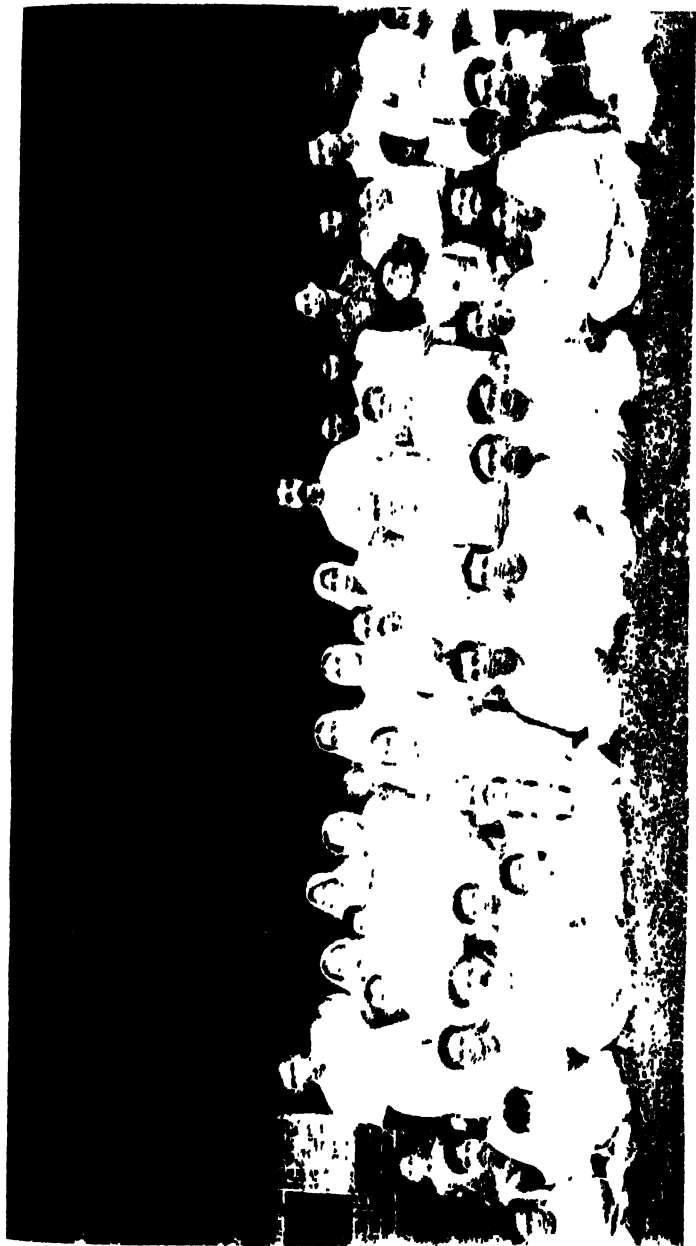
(১৩৪০ সন)

সহিত নিয়তই ক্রমশঃ জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত ভাবে সমুন্নত হইতে থাকিবে—ইহা অতি নিশ্চিত।

যাজক—

চাই তাই করা, তা-ই হওয়া—যা'তে মানুষ আবেগভরে নতজানু হ'য়ে, আকুল আগ্রহে, সশ্রদ্ধ স্ফুটবাকে, ব'লে সার্থক হয়, দিয়ে সার্থক হয়—আমার পুরোহিত—আমার দেবতা—আমার পরম পথের হাত ধ'রে তোলা পরম-সাথিয়া।

সম্বর্দ্ধনের চারিটী বিধি—

১। জীবনের সব চাহিদাগুলিকে ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানুকূলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে আপন স্বার্থীভূত করতঃ uncompromising তৎপ্রাণতায় প্রতি-প্রত্যেকের প্রতি মৈত্রী-সম্বর্দ্ধনায় চলিতে থাকিও।

২। তোমার বাক্ বা কথাকে যথাযোগ্য প্রকাশে নিন্দাশূন্য করিয়া বিনীত, সম্বর্দ্ধনাপ্রবণ, তেজাল ও পুষ্টিপ্রদ করিয়া ব্যবহার করিও।

৩। উচিত অথচ সমীচীন বলিয়া যাহা বিবেচনা কর তাহা তৎক্ষণাৎই করিতে প্রয়াসশীল থাকিও।

৪। ন্যায্যপ্রয়োজন-পীড়িত কেহ তোমার নিকট উপস্থিত হইলে, স্বতঃপ্রবৃত্তিসহকারে যথাসম্ভব তাহার দায়িত্ব লইয়া, ভরসাপ্রদ তৃপ্তিজনক বাক্যে তাহাকে নন্দিত করিয়া অবিলম্বে তাহার প্রয়োজন পূরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইও না, আর যতদূর সম্ভব অন্যকে উত্যক্ত না করিয়া, বরং নন্দিত করিয়া—তোমার নিজের প্রয়োজনকে সমাধান করিয়া লইতে চেষ্টা করিও।

যে-কেহই হোক না, এই চারিটী বিধির অনুশাসনকে নিজের প্রকৃতিতে প্রকৃত করিয়া জীবনকে চালাইতে থাকিলে অন্ততঃ আধিভৌতিক সম্বর্দ্ধনা যে তাহার পক্ষে হস্তামলকবৎ হইবে—সে সম্বন্ধে সন্দেহই নাই।

Independent living মানেই auto-initiative responsible service-এর ভিতর দিয়ে মানুষকে fulfil ক'রে যথোপযুক্ত সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। উক্ত নিয়মগুলি মানিলে প্রকৃত স্বাধীন জীবন প্রত্যেক ব্যক্তিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

স্বস্ত্যয়নী

আজ জাতির ভীষণ দুর্দ্দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃস্থ নরনারীর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার যে অমোঘ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই 'স্বস্ত্যয়নী'। এই ব্রত প্রতিপালনের যে সমুদয় বিধান তিনি দান করিয়াছেন এবং লোককল্যাণ-কামনায় ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যে সকল প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"আচার ছিল আর্য্যসমাজে পরম ধর্ম্ম। আচারহীন, আচারভ্রষ্ট যা'রা তা'রাই ছিল ম্লেচ্ছ। প্রতি পরিবারে, প্রতিগৃহে প্রত্যহই ইষ্ট বা শ্রীবিগ্রহের পূজা ও সেবানুষ্ঠান আর্য্যগণের চিরন্তনী রীতি ছিল, নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই ছিল পরিগণিত। আমাদেরই আর্য্যপিতৃগণ ছিলেন নিত্য ইষ্ট-ব্রতাচারী তাই তাঁ'রা ভারতকে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ক'রে তু'লেছিলেন। ব্রতগ্রহণ মানেই জীবন-বৃদ্ধিদ মাঙ্গল্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিগ্রহণ।

ইষ্ট বা জীবন্ত শ্রীবিগ্রহের পূজা মানে, প্রথমেই আমার দেহ ও মনকে তাঁ'রই সেবার প্রধানতম যন্ত্রবোধে সুস্থ ও সহনপটু রাখিবার কয়েকটী স্থূল নিয়ম মানিয়া চলা, যেমন—

১। অসুস্থ হইলে আমার ইষ্টের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—তাই যে আচার ও নিয়মে আমার শরীর সুস্থ ও সবল থাকে তেমনতর চলিবই চলিব।

২। উপযুক্ত সময়ে রুচি ও ক্ষুধা অনুসারে পরিমিত আহার্য্য গ্রহণ করিব এবং স্বাস্থ্যের সমতার জন্য যথাপরিমিত নানাবিধ রস প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিব।

৩। মাঝে মাঝে শরীরটা হাল্কা ও কর্ম্মঠ রাখিবার জন্য উপবাস দিব আর স্বাস্থ্যের হানি ঘটে এমনতরভাবে বাহ্য, প্রস্রাব ও ঘাম ইত্যাদি সাধারণতঃ কিছুতেই নিরোধ করিব না।

৪। কাম বা যে-কোন প্রবৃত্তিবেগকে সতত উন্নতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিব—তাহা না করিয়া চিন্তায় মস্তিষ্কে একটা আক্ষেপ ঘটাইয়া বাহ্যতঃ চাপা দিব না।

৫। স্বামী অথবা স্ত্রীর সহিত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া যাহাতে কিছুতেই বসবাস করিতে না হয়, নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্যের সহিত ইষ্টপ্রাণ হইয়া নিয়ত তদনুরূপ ব্যবস্থা করিব।

৬। শরীরে অপরিশুদ্ধ সূচী, ছুরিকা বা যে কোন অস্ত্র কখনই প্রয়োগ করিব না—আর যে রকমেরই অস্ত্রশস্ত্র হউক না কেন, প্রয়োগ করিলে বা হঠাৎ শরীরে লাগাইলে তৎক্ষণাৎই সমুচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব। শরীর ও মনকে নিয়ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুস্থ ও সহনপটু করিতে করিতে—

(১) ইষ্টের স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা ও প্রীতির জন্য আমার প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলিকে নিয়তই নিয়ন্ত্রিত করিব। আমার প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলি আমার বাঁচা-বাড়ার, আমার ভালর দিকে তো এতকাল লাগাইনি, তাই তা'রা মঙ্গলের জন্মদান করেনি। ঐগুলি আমার ইষ্টের, মঙ্গলময়ের প্রীতিসাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করলে ওদের ভাল কাজেও লাগাতে শিখি, ওরা মঙ্গলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে—আর তখন থেকেই তা'রা ওঠে সার্থক হ'য়ে। একেই বলে বাস্তবপূজা—ইহাই ইষ্টপূজার প্রথম অঙ্গ।

(২) সৎ অর্থাৎ ইষ্টানুকূল জীবনবৃদ্ধিদ যে কোন চিন্তা মনে উদিত হইলেই অবিলম্বে তাহা বাস্তবকর্ম্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবই। ইহাই ইষ্টপূজার দ্বিতীয় অঙ্গ। কারণ শুধু চিন্তা যদি কাজে পরিণত না করি, আমাদের বোধ-স্নায়ুগুলি (sensory nerves) হয় উত্তেজিত, মনে নিরর্থক চিন্তার একটা নরক সৃষ্টি হয়, না করিয়া শুধু ভাবার ফলে কর্ম্ম-প্রবোধী স্নায়ুগুলিতে (motor nerves) যায় ঘুণ ধরিয়া—আর ইহাই হয় আমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, দারিদ্র্যের অগ্রদূত। মনোবিজ্ঞানের এই গূঢ় সত্যকে আশ্রয় করিয়া এই দ্বিতীয় পূজাপদ্ধতিকে জীবনের অঙ্গ করিয়া তুলিব।

(৩) পারিপার্শ্বিকের প্রতি-প্রত্যেকের সর্ব্ববিধ সেবা ও অভাব-মোচনের জন্য সদাসর্ব্বদা সজাগ অনুসন্ধিৎসু থাকিব—আর সেবায় পারিপার্শ্বিককে আকৃষ্ট করিয়া ইষ্টানুকূল যাজনে সবাইকে তাঁ'তে অনুরক্ত করিয়া তুলিব। ইহাই ইষ্টপূজার তৃতীয় অঙ্গ। কারণ আমাদের বাঁচা-বাড়ার উপকরণ যা' তা' মুখ্যতঃই পারিপার্শ্বিক ও পারিপার্শ্বিকের কোন-না-কোন, কিছু-না-কিছু প্রতি-প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই আহরণ ক'রে থাকি—আর আমিও যা'দের পারিপার্শ্বিক অমনি ক'রে তা'দেরও দিয়ে থাকি। আমার সেবা ও যাজন পারিপার্শ্বিকের প্রতি-প্রত্যেককে জীবনবৃদ্ধিদ ক'রে বাঁচা-বাড়ায় প্রবর্দ্ধনশীল ক'রে যদি না তুলতে পারে, তা'হ'লে আমার এই থাকা, এই বাঁচা, এই বাড়া পরিজনসমেত সবই যে মুখ্যভাবে ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন ও সংঘাতনিপাতী হ'য়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

আর পরমমঙ্গলময় ব্যক্তিত্বের সন্ধান প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরের গভীরতম চাহিদা, পরম-মঙ্গলের প্রয়োজন নাই এমনতর ঐশ্বর্য্যবান্ কেহই নাই—সেই পথের সন্ধান যদি আমি পেয়েই থাকি, আর প্রতি-প্রত্যেককে সেবার মধ্য দিয়ে আকৃষ্ট উন্মুখ ক'রে আমার ইষ্টেই যদি অনুরক্ত ক'রে না তুল্‌লাম তবে তা' পারিপার্শ্বিকের সেবা হ'বে, না হ'বে জনহিতের মুখোস-পরা শুধু বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ আত্মপূজা?

ইষ্টপূজার এই তিনটী অঙ্গই হ'ল বোধ-প্রধান কর্ম্মানুষ্ঠান (sensory prominent motor action), তাই এদের বলে ব্রতপ্রাণ। প্রত্যহই ঐ তিনটী অঙ্গ পরমশ্রদ্ধায় যথাযথ পালন করব।

তা'র সঙ্গে সঙ্গেই করতে হ'বে সেবানুষ্ঠান। ইষ্টকে ভরণীয়গণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম ব'লে গ্রহণ ক'রে নিজের বাস্তব-জীবনে তাঁ'র প্রতিষ্ঠা না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত সেবার আরম্ভই হয় না। তাঁ'র সেবা মানে—

১। আমার অস্তিত্বের যা'কিছু সবই তাঁ'র পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠার—সহজ-প্রীতিতে এই ভাবে সম্যক্ অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাস্তব-দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-বোধের উদ্দীপনায় ইষ্টের পোষণ ও সেবার জন্য ৶৷৹ পয়সা করিয়া প্রতিদিনই তাঁহাকে উৎসর্গ না করিয়া কিছুতেই অন্নগ্রহণ করিব না। ইহাই ইষ্টসেবার প্রথম অঙ্গ। এমন না করলে তাঁহার সহিত বাস্তব যোগসূত্র রচিত হয় না। আর সেবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যোগসূত্র রচিত হ'লে গ্রহাদির এবং পারিপার্শ্বিকের কূট-প্রভাব—যা' আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ক'রে মৃত্যুর পথিক ক'রে তোলে—আমাদের উপর অনেক কমই আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

২। প্রিয় বা গুরুজনকে না খাইয়ে কিছুতেই যেমন খাওয়া আসে না, ইষ্টের সেবা, পোষণ ও পুষ্ট্যর্থে সার্থক বুদ্ধিতে আমারই স্বোপার্জ্জিত প্রতিদিনের অর্ঘ্য একত্র ক'রে এক মাসের সর্ব্বসমেত ৩৲ টাকা পরের মাসের প্রথম দিনেই তাঁ'কে অর্ঘ্যস্বরূপ না দিয়ে বা না পাঠিয়ে অন্য কোনও ব্যয়ে কিছুতেই যেন আমার প্রবৃত্তি বা রুচি না আসে। যত-দিন আমি অন্নগ্রহণ করব ততদিনই তাঁ'কেও খাওয়াব আর এই সেবানুষ্ঠান হ'তে কোনক্রমেই স্খলিত বা চ্যুত হইব না। ইহাই এই সেবানুষ্ঠানের দ্বিতীয় অঙ্গ।

এমনি ক'রে ইষ্টের সঙ্গে বাস্তব একাত্মবোধ দৃঢ় হ'বে আর গ্রহাদি সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের হাত হ'তে বহুধা নিষ্কৃতি লাভ করব। মাথায় গেরোর মত কোন ভাব ভূতের মত চেপে বসে' যে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও ভ্রান্তি ঘটায় তা'রই নাম গ্রহদোষ—শনি, রাহু, রবি, মঙ্গল প্রভৃতি কু-গ্রহগুলি ঐ রকমের বিশিষ্ট গেরো বা ভ্রান্তবুদ্ধিরই সৃষ্টি করে। ইষ্টান্বিত মাঙ্গল্য কর্ম্মোদ্দীপ্ত সজাগ মস্তিষ্কে ঐ ভ্রান্তিগুলি কমই ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকে।

৩। নিজের বাস্তব অর্জ্জনকে প্রতিদিনের নূতন নূতন গৃহশিল্প প্রচেষ্টাদি দ্বারা বাড়িয়েই হোক আর যেমন ক'রেই হোক প্রত্যহই ইষ্টার্ঘ্য রেখে তদতিরিক্তও কিছু কিছু প্রত্যেক দিন ইষ্টোদ্দেশে সঞ্চয়

কর্‌তেই হ'বে, এই সঞ্চয় আবার প্রত্যহই কিছু না কিছু বাড়াতেই হ'বে—আর যা' সঞ্চিত হ'তে থাক্‌বে তা'র থেকে ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের নিতান্ত জীবনবৃদ্ধিদভাবে-ছাড়া কখনও কিছুতেই খরচ কর্‌ব না। ইহাই এই সেবানুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান তৃতীয় অঙ্গ। আর্য্যগণ প্রতি পরিবারে পরিবারে লক্ষ্মীর কৌটা রাখিত—এ-টাকা তা'রা প্রাণান্তেও খরচ করিত না—লক্ষ্মীর জন্য ছাড়া। লক্ষ্মীরই আর এক নাম শ্রী আব শ্রী মানেই সেবা।

ইষ্টপ্রীতি-উদ্দেশ্যে ঠিক ঠিক করলে অযথা অপব্যয়ের দিকে পড়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, স্বাধীন অর্জ্জনদক্ষতা ও সেবাসঞ্চয়বুদ্ধি যায় বেড়ে। আমরা অর্থ, শ্রী ও বাস্তব সমৃদ্ধিমণ্ডিত হ'য়ে পড়ি। সাধারণতঃ জীবন-বীমায় টাকা রেখে শুধু সঞ্চয়ের দ্বারা মানুষ কতটুকু অর্থবান্ হ'তে পারে? ইহাতে প্রতিদিনেরই ইষ্টপ্রী[illegible] স্বাধীন শ্রমলব্ধ অর্জ্জন ও সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি-হারে বাড়তে বাড়তে তা'র চেয়ে বহুগুণ অর্থ প্রতি পরিবারে পরিবারে মজুত থেকে জাতির অক্ষয় ভাণ্ডার রচনা করবে।

এই তিনটী অঙ্গই হ'ল কর্ম্ম-প্রবোধী, তাই এদের সেবানুষ্ঠান বলে। এই তিনটী অঙ্গই আমাদের প্রত্যহ পরম শ্রদ্ধায় যথাযথ পালনীয়!

ইষ্টপূজা ও সেবার এই নিয়মগুলি নিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন ক'রে প্রত্যহ স্নানান্তে কিংবা বাসি বা অশুচি বসন ছেড়ে হাত পা ধুয়ে অথবা শুধু ইষ্টস্মরণপূর্ব্বক "আমি পবিত্র" এই মাত্র স্মরণ ক'রে শ্রীবিগ্রহের সামনে অথবা তাঁ'র উদ্দেশ্যে মানসোপচারে বা চন্দন তুলসী ফুল নিয়ে নিম্নলিখিত স্তোত্রমন্ত্র পাঠ ক'রে অঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ঐ প্রতিদিনের ইষ্টার্ঘ্য ৬৷৷০ পয়সা ও তদূর্দ্ধ সঞ্চয়ার্থ যা'-কিছু নিজ কর্ম্মনিঃসৃত চয়নকে উৎসর্গ করাই বিধি।

অর্ঘ্যাঞ্জলি স্তোত্রমন্ত্র—

> "শ্রীবিগ্রহস্ত্বং পুরুষোত্তমো মে বন্দে ত্বাং সদন্বকুলচন্দ্রম্।
> ত্বং হীষ্টস্ত্বমেব পূজ্যঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ তে নিযুনক্তু বৃত্তীঃ॥
> তবানুকূলং যদি সত্যকামং মুহুঃকৃপয়া কুরুকর্ম্মনিষ্ঠম্।
> সন্ধিৎসয়া সেবয়া যাজনেন সর্ব্বাংস্ত এবানুরঞ্জয়ানি॥
> রোগশোক-গ্রহদোষ বুদ্ধি-বিপর্য্যয়াচ্ছমে।
> দারিদ্র্যাদি সর্ব্বদৈন্যাৎ মুঞ্চ মে ত্বয়ি নিষ্ঠয়া॥
> শান্তিং স্বস্তিং শুভং দেহি দেহি কর্ম্ম সুকৌশলম্।
> দেহি মে জীবনবৃদ্ধী নিয়তং স্মৃতি-চিদ্‌যুতে॥"

অর্থাৎ—শ্রীবিগ্রহ তুমি, তুমিই পুরুষোত্তম, আমার অস্তিবৃদ্ধির অনুকূলদীপ্তি তোমাকে বন্দনা করি। তুমিই ইষ্ট, তুমিই পূজ্য, আমার সকল বৃত্তি তোমারই প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হউক, তবানুকূল যে কোন সত্যকামনা আমার, তোমার কৃপায়, অবিলম্বে যেন কর্ম্মে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারি। সন্ধিৎসায়, সেবায় ও যাজনে যেন সকলকে তোমাতে অনুরঞ্জিত করি ও করিতে পারি। তোমার প্রতি অটুট নিষ্ঠা রোগ, শোক, গ্রহদোষ, বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও দারিদ্র্যাদি সর্ব্বদৈন্য হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তুলুক। আমাকে শান্তি দাও, স্বস্তি দাও, শুভ ও সুকর্ম্ম-কৌশল দাও—আর দাও আমাকে নিরন্তর চেতনাবাহী স্মৃতিযুক্ত জীবন ও বৃদ্ধি।

আলস্য, আত্ম-অবিশ্বাস, দম্ভ ও ঠুন্‌কো মান হ'তেই আসে আমাদের দারিদ্র্যাদি যত কিছু অমঙ্গল। এই ইষ্টপূজা ও সেবানুষ্ঠানে ঐ দোষগুলি সমূলে দূরীভূত হ'যে যায়—তাই আমরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুকর্ম্ম-কুশল হ'য়ে উঠি, সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠি।

আবার প্রতি-প্রবৃত্তির প্রত্যেক রকম টানের সংঘর্ষ যা প্রতিমুহূর্ত্তে মানুষকে কত রকমেই না অনুরঞ্জিত ক'রে কত চাহিদায় বিভ্রান্ত ক'রে বেহিসাবী বোধের মৃত্যুপন্থী অহমিকার সৃষ্টি ক'রে রোগ, শোক, দুঃখ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে মরণের দিকে টেনে নিয়ে যা'চ্ছে—ঐ প্রবৃত্তিগুলি ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'যে, তদনুরূপ প্রচেষ্টা ও কর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে উঠে'—মানুষকে অমৃতসম্বেগী ক'রে তদাত্মবোধ-উদ্দীপনায় অমরণযাত্রী ক'রে তোলে। ইষ্টের একান্ত টানে আমার আর যত কিছু টান, যত কিছু চাওয়া নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, সার্থক হ'য়ে ওঠে—তাই জীবনে আসে চিরতৃপ্তি আর অফুরন্ত স্বস্তি। চিরজীবনের দুঃখ, দুর্দ্দশা, অভাব অমঙ্গল, দৈন্য, দারিদ্র্যের হাহাকার মন্থন ক'রে ইষ্টৈকপ্রীতির নিত্য খুঁটি ধ'রে পাই নূতন জীবনের স্বাদ;—এমনি ক'রে অমোঘ নিয়মের অব্যর্থ সন্ধানে শান্তি, তৃপ্তি ও স্বস্তি হয় চিরপ্রতিষ্ঠিত;—তাই এই শুভব্রতের নাম স্বস্ত্যয়নী-ব্রত।

ভক্তি-অবনত সার্থকবুদ্ধিতে কৃতার্থ অন্তঃকরণে প্রাত্যহিক জীবনে এই স্বস্ত্যয়নীব্রত প্রত্যেকেরই গ্রহণীয়, সম্ভব হ'লে বংশানুক্রমিকতায় চিরাচরণীয় ক'রে চালাতে পারাই শ্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ—আর ইষ্টপূজা ও সেবাসঙ্কল্পে অর্ঘ্যলিপিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথারীতি নর-নারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়।

ব্রতারম্ভে গুরুজনের সম্মুখে বা ঋত্বিকের সম্মুখে ইষ্টোদ্দেশে অর্ঘ্যপুষ্পাদি নিয়ে স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি-পত্রে অঞ্জলি ক্ষেপণ করাই বিধি। এইজন্য নিজ ঋত্বিকের উদ্দেশে বা সম্মুখে যথাসাধ্য দক্ষিণাও প্রযোজ্য। কারণ এতে

মানুষের অন্তর্নিহিত দক্ষতার উদ্বোধনে পারকতা উপচে উঠে' তা'কে শ্রেয়ে চলৎশীল ক'রে তোলে।

পূর্ব্বসঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য কাহারও এই স্বস্ত্যয়নী ব্রতের আরম্ভের মুখেই শুভফল দেখা দেয়, আবার কাহারও কাহারও সাময়িক এক-আধটুকু আপাতঃ অশুভ ফলও দেখা দিতে পারে—যদিও শেষোক্ত অশুভ যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হ'লে উহা ভবিষ্য শুভেরই সূচনাকারী লক্ষণ—কিন্তু অটুটভাবে যথাযথ এই ব্রতানুষ্ঠানে অন্তর্নিহিত সহজসংস্কারানুযায়ী পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফল—যা' নিরাকরণযোগ্য—তা' নিরাকৃত হ'য়ে চিরচলন্ত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আসবেই আসবে।

এই স্বস্ত্যয়নী ব্রতবিধান যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ইহার মূল বিষয়টা একটা সহজ কবিতায় লিপিবদ্ধ করাইয়া দিয়াছেন। যথা :—

"ইষ্টসেবার যন্ত্ররূপে শরীরটীকে সদাই দে'খো।
স্বাস্থ্য-নিয়ম পালন করি' সহন-পটু সুস্থ রে'খো॥
মনের কোণে যখন তোমার যে প্রবৃত্তি মার্‌বে উঁকি।
ঘুরিয়ে তা'রে নিয়ন্ত্রিয়া কো'রোই ইষ্ট-স্বার্থমুখী॥
ভাল যাহা যখনই তা' উদয় হ'বে মনের মাঝে।
তখনই তা' সাহস ভরে সত্যি সত্যি কর্‌বে কাজে॥
পাড়া-পড়শীর বাঁচা-বাড়া আপনারই স্বার্থ জেনে।
যাজন সেবায় তাদের সদাই ইষ্টপানে ধর্‌বে টেনে॥
নিজের সেবার আগে রোজই ইষ্ট সেবার জোগাড় কর।
নিত্যশ্রমের ফল বাড়িয়ে ইষ্টলাগি মজুত কর॥
মাসের শেষে অর্ঘ্য দিও পা'বে বুকে শক্তি অযুত।
দারিদ্র্যে আর গ্রহের ফেরে ভাল'র পথে থাক্‌বে অটুট্॥"

মানবমাত্রেরই বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই স্বস্ত্যয়নীব্রত প্রতিপালন করা যে নিত্যকরণীয় অবশ্য কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ সকলের নিকট দিবারাত্র বিশদভাবে কত আলোচনা করিয়া থাকেন! জীবন-চলনার এই একমাত্র অমূল্য পন্থা যথাযথ অনুসরণ করিয়া প্রত্যেকটা মানুষ যাহাতে উন্নতিতে অধিরূঢ় হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কি আকুলি বিকুলি—কি প্রাণপাত চেষ্টা! এবিষয়ে তাঁহার একদিনের (১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সন) উক্তি সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইষ্টভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ হালদার বি,এ মহাশয় লিখিতেছেন—

"গতরাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী সাধনার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সবাই যা'র যা'র কাজে ব্যস্ত। আমি বাঁধের উপর তাঁ'র ঘরে আছি। জননীদেবীর স্বর্গারোহণের পর হইতে সর্ব্বদাই তাঁ'র মুখখানা বড়ই বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে 'দয়াল, দয়াল,' 'মা, মা' করেন। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন— 'Life-টা যেন জোর ক'রে একটা tragedy হ'য়ে গেল! এখনও যদি আপনারা সবাইকে স্বস্ত্যয়নী ব্রত গ্রহণ করাতে পারেন তবে tragedy-টা একটা trago-comedy-তে পরিণত হ'তে পাবে। দেখুন, pauperism দূর করতে, মানুষকে active করতে, তা'র শরীর ও মনের উন্নতি বিধান ক'রে সমগ্র ও পূর্ণ ইষ্টপ্রাণতার সহিত তা'কে ever progressing উন্নতিতে সমাসীন করতে স্বস্ত্যয়নীব মত এমন আর কিছু নেইকো। এ Life Insurance এর চাইতেও ঢের বড। বড় বড় অর্থনীতিবিদ্‌ও একথা স্বীকার ক'বেছেন। তোমাব যিনি প্রিয়পরম, তোমাব যিনি বাপের বাপ, আরও কত-কি, তাঁ'কে ভালবে'সে তাঁ'রই দু'টো খাওযার জন্য দু'মুঠো চাল তুমি রে'খে দিবে রোজ রোজ। এই চালের পরিবর্ত্তে রোজ শযন থেকে উঠেই তোমার যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সংগ্রহ ক'রে তাঁ'র জন্য কোথাও বে'খে দেও—আব তা' কখনও যেন কোনক্রমে ৬॥০ পয়সার কম না হয়। এটা সংগ্রহ ক'বে মাসের শেষে তোমার প্রিয়পরম যিনি তাঁ'কে পাঠিয়ে না দেওযা পর্য্যন্ত তোমার যেন কিছুতেই চেষ্টার বিরাম না হয়, প্রাণে শান্তি না আসে। আর এটা চলবে ততদিন যতদিন তোমার দেহে প্রাণ আছে। যেদিন তুমি তাঁ'কে না খাওয়াতে পারবে সেদিন তোমারও মুখে খাদ্য রুচবে না, তুমিও উপবাসী থাকবে। সে-তোমার না খে'য়ে উপবাসী থাকবে তা'র চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? এই ক'টী পয়সা জোগাড় করার জন্য তোমাকে সমস্ত কাজের ভিতর পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজতে হ'বে কেমন ক'রে এই পয়সাটা তোমার হাতের মধ্যে আসে; তোমার brain-এর মধ্যে সমস্ত activity-র মধ্যে এই চিন্তাটা সব সময়ের জন্য লেগে থাকবে। এই অভ্যাস তোমাকে হাজার গুণে ইষ্টপ্রাণ, active ও tremendous ক'রে তুলবে। তোমার becoming এন্তারভাবে চলতে থাকবে, তোমার ভাবা ও করার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ফু'টে উঠবে। এমনি ক'রে ক'রে সব রকমের pauperism দেশ থেকে দূরে অতিদূরে অনতিবিলম্বে পা'লাবে। এই হ'চ্ছে সহজ সাধন,—becoming-এর পথে যাওয়ার সোজা রাস্তা! আর এই ৬॥০ পয়সা হ'বে তুমি যা' রাখতে পার তা'র minimum. ক্রমে তোমার activity যত বাড়বে আয়-ক্ষমতাও আরও অনেক বে'ড়ে

যা'বে, তুমি আরও অধিক ক'রে রোজ রোজ তোমার স্বস্ত্যয়নী-ভাণ্ডারে রাখ্‌তে পার্‌বে। কিন্তু ৬।৵৹ পয়সা হিসাবে তিন টাকার অধিক তোমার প্রিয়পরমকে পাঠাতে হ'বে না। অবশ্য তাঁ'র নিতান্ত আবশ্যক বিনা, তাঁ'র direct আদেশ না পে'লে। এম্‌নি ক'রে স্বাস্থ্যে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে, ধন-সম্পদে ও আনন্দ-সম্পদে তুমি রোজ রোজ একটু একটু ক'রে বে'ড়ে বে'ড়ে অনন্ত চলায় অনন্তের দিকে বে'ড়েই চল্‌বে। আর এ বাড়ার কোন দিন কিন্তু শেষ নেইকো।'

"একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন—'আর ৩৲ টাকার অধিক যা'-কিছু যত-কিছু আপনার স্বস্ত্যয়নী-ভাণ্ডারে রাখ্‌তে পার্‌বেন সেখানে জমাই হ'তে থাক্‌বে। এই টাকা বে'ড়ে গিয়ে যখন একটা মোটা capital-এ দাঁড়াবে তখন তা' একটা Savings Bank account open ক'রে রে'খে দিতে পারেন। এই স্বস্ত্যয়নী-ভাণ্ডার আপনি কিছুতেই touch ক'রতে পার্‌বেন না, এর থেকে ধার করা বা কর্জ্জ দেওয়া আপনার কিছুতেই চল্‌বে না। তাঁ'র আদেশক্রমে আপনি শুধু এ-টাকা কোনি ইষ্টস্বার্থকারী কাজে নিয়োজিত কর্‌তে পার্‌বেন। আবার আপনার interest-ই হ'বে ৩৲ টাকার আরও অধিক অর্থ আপনার স্বস্ত্যয়নী-ভাণ্ডারে রাখা। আর এটা আপনি যত বেশী বাড়াতে পার্‌বেন ততই আপনার লাভ অনেক বেশী হ'বে। আপনারই সামান্য অর্থ রোজ রোজ বে'ড়ে গিয়ে একটা স্থায়ী ধন-সম্পদে পরিণত হ'বে, যা' আপনাকে বিপদে-আপদে রক্ষা ক'রে ক্রমাগত উন্নতিতে নিয়েই চল্‌বে। এই স্বস্ত্যয়নী যে কত বড় জিনিস তা' আর বলা যায় না। এক সংসারের সবাই মিলে—পুরুষ ও নারী যদি এই স্বস্ত্যয়নী-ব্রত যথাযথভাবে পালন করে তবে দারিদ্র্য-দোষ, গ্রহ-দোষ চিরদিনের জন্য সেখান থেকে পা'লাবে; শান্তি, স্বস্তি, সম্পদ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তা'দের দাস হ'য়ে সেবা কর্‌বেই কর্‌বে। আপনারা এ জিনিসটাকে এখনই চারিদিকে চারিয়ে দিন। লাখ লাখ দাদারা ও মায়েরা এ জিনিসটাকে গ্রহণ ক'রে যথাবিহিত চল্‌তে থাকুক্‌, দেখ্‌বেন এখনই দেশের চেহারা একদম বদ্‌লে যা'বে। কিন্তু আপনারা মাহিনা থেকে কিংবা অন্য কোন সাংসারিক টাকা থেকে স্বস্ত্যয়নী বাবদ যদি মাস মাস তিনটি ক'রে টাকা পাঠান বা দেন তা'তে কিন্তু আপনাদের pauperism তেমনতরভাবে ঘুচ্‌বে না। আপনারা না বে'ড়ে যদি তাঁ'কে বাড়াতে চান, তাঁ'রও বাড় কিছুতেই বাড়্‌বে না, আপনাদের বাড়াও ব্যাহত হ'বে—ক্ষুণ্ণ হ'বে। রোজ রোজ এই মহান্‌ ব্রত পালন কর্‌তে থাকুন, সব দিক দিয়ে রোজ রোজ বাড়্‌তে থাকুন, দেখ্‌তে পা'বেন এ-বাড়া কেমন বিরাট, কেমন মহান্‌ হ'য়ে দাঁড়ায়।

'আবার এই ব্রতপালনে সেই প্রিয়পরমকে basis ক'রে তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি নিয়ে সব-কিছু scheming ও doing সম্পাদিত হয় ব'লে সব-কিছুর ভিতর একটা সামঞ্জস্য, সব বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটা একমুখী ভাব, একটা সুস্থ পূর্ণ পরিণতি আস্তে আস্তে ফু'টে উঠে সূত্রে 'মণিগণাইব'। আব একেই বলে আপনার সমস্ত বৃত্তির একে সার্থক হওয়া, শাস্ত্রে যা'কে ব'লেছে পরম মুক্তি—চরম প্রাপ্তি। আর এমনটা হ'লেই তা'র ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার জন্য tremendous না হ'য়ে পারার জো থাকৃবে না। কারণ তখন সে দেখ্‌বে ইষ্টই তা'র জীবন, ইষ্টস্বার্থই তা'র স্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকে বাদ দিয়া তা'র নিজের প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি-টুদ্ধি মোটেই থাকে না। এই উজাড় ক'রে দেওয়ার ভিতর দিয়েই তা'র অনন্ত পাওয়া আপ্‌সে আপ্‌ ঘ'টেই থাকে!

'আমি ভাব্‌ছি—উন্নতি চায় না, স্বাস্থ্য চায় না, শান্তি চায না এমন মানুষ দুনিয়ায় নেই। এই পরম মঙ্গলকর ব্রতের উদ্‌যাপনে তা'দের সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি সম্ভবপর হ'বে, তা'দের চলা অবাধ হ'বে, তা'রা মূর্ত্ত পরম মঙ্গলের কোলে আশ্রয় পে'য়ে আরও বে'ড়ে উঠ্‌বে—এইটুকু যদি আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারি, তবেই এই পরম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'তে চায় এমন আত্মঘাতী মানুষ কি দুনিয়ায় কেউ থাকৃতে পারে? আবার এ-জিনিসটাও তা'দের ভাল ক'রে বোঝাতে হ'বে যে মূর্ত্ত পরম ইষ্টকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোন প্রকারের উন্নতিই সম্ভবপর নয়। আমরা একটু ভে'বে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বো আমাদের সমস্ত করার মূলে থাকে কোন মূর্ত্ত প্রেমাস্পদ—কোন জ্যান্ত ভালবাসার মানুষ। তা'রই তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানের জন্য আমাদের যা'-কিছু ভাবা, যা'-কিছু বলা, যা'-কিছু করা। তা'কে বাদ দিয়ে কিন্তু আমাদের কোন চলা, কোন উন্নতি সম্ভবপর নয়। আমরা মা, বাপ, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, কোন নিকট আত্মীয বা বন্ধুর মুখে সামান্য হাসি ফু'টাবার জন্য কতই-কিছু-না ক'রে থাকি! সহজ টান আছে ব'লেই এদের জন্য কোন পরিশ্রমই পরিশ্রম ব'লে বোধ হয় না, কোন ত্যাগই—তা' যতই কেন বড় হোক না—ত্যাগ ব'লে মনে হয় না, শত খে'টেও ক্লান্তি আসে না। ছেলের অসুখের সময় ক্রমাগত প্রায় চল্লিশ রাত্রি জে'গেছি, কিন্তু তা' নিয়ে তো কখনও কারুর কাছে বাহাদুরী নেওয়ার জন্য বল্‌তে ইচ্ছা হয় নি। ভালবাসার টান এমনি যে, ক'রেই সেখানে তৃপ্তি, পাওয়ার জাবেদা খাতা সেখানে নেই, অথচ পাওয়া সেখানে অফুরন্ত!

'আমার এই জীবনের লক্ষ্য যদি এমন একজন হ'ন, যাঁ'র সমস্ত পাওয়ার প্রশ্ন মিটে গে'ছে, সমস্ত জানা যাঁ'র জানার মধ্যে এসে গে'ছে, যিনি পরম

সুন্দর—পরম প্রেমিক, মানুষের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবন, যশ ও বৃদ্ধির দ্যোতক, তবেই না আমাদের জীবন তাঁ'কে লক্ষ্য ক'রে—অনুসরণ ক'রে, নবীন বিশ্বাসে, দক্ষতায়, কর্ম্মশক্তিতে, জ্ঞানে ও প্রেমে, ষোলকলায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্তে পারে! এ-পাওয়া কি-যে পাওয়া, যে পে'য়েছে সেই জে'নেছে, এ-চলা কি-যে আনন্দের ও গর্ব্বের চলা, যে চ'লেছে একমাত্র সেই জানে। এঁকেই লক্ষ্য ক'রে আমার স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের উদ্‌যাপন কর্‌তে হ'বে এবং এঁকেই অনুকরণ ক'রে ক'রে দিনের পর দিন আমার এই মহান্ ব্রত পালনের দক্ষতা ও পটুতা অর্জ্জন ক'র্‌তে হ'বে। এঁর উপর আমার টান হ'বে যত সহজ ও স্বাভাবিক, আমার চলাও হ'বে তত সহজ ও স্বাভাবিক। তাই স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের গোড়ার কথাই হ'চ্ছে এই ইষ্টপ্রাণতা।

'এই স্বস্ত্যয়নী-ব্রত কর্‌তে গেলেই পারিপার্শ্বিকের সেবা ক'রে তা'কে ইষ্টস্বার্থপরায়ণ করা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাক্‌বে না! আগে যা এত কষ্টেও করা সম্ভবপর হয় নি বা যা' কোথাও হয়ত ভুল ক'রে করা হ'য়েছে, তা' ঠিক ঠিক মত করা সহজ ও স্বাভাবিক হ'যে উঠ্‌বে।

'আবার ইষ্টপ্রাণতা যতই বাড়্‌বে আমার সমস্ত বৃত্তি ততই তাঁ'রই কাজে তাঁ'রই সেবায় নিয়োজিত হ'বে। তখন আমার কোন বৃত্তি আমাকে আগেকার মত কাণ-মলা দিয়ে চা'লাতে পার্‌বে না। আমি বরং তা'দের প্রত্যেককে আমার ইষ্টের প্রীতি-সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত কর্‌বো। তা'রা আগে আমার কতই না কাঁদাতো, কতই না জ্বালাতন্ কর্‌ত, এখন ওরাই হ'বে আমার ইষ্ট-পূজার বাহন। এমনি কর্‌তে কর্‌তে আমার সমস্ত রিপুগুলি—যা'রা আগে আমায় কতই না জ্বালিয়েছে তা'রাই হ'য়ে উঠ্‌বে আমার মস্ত বড় বন্ধু, আমার জীবন্ত প্রিয়পরমের—আমার ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার পরম সহায়ক।

'এই ইষ্টপ্রতিষ্ঠার পথে চল্‌তে গেলেই মনটাকে রাখ্‌তে হ'বে সতেজ, তীক্ষ্ণ ও কর্ম্মক্ষম এবং এ-সব ক'র্‌তে গেলেই যখন যা'-কিছু সৎচিন্তা মনে উঠ্‌বে তখনই তা'কে কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে হ'বে। আমাদের জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রধান কারণ কোন সৎচিন্তার অভাব নয় বরং তা'কে কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য চেষ্টার অভাব। আমাদের মাথাটা এই কত না-করা সুচিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে আছে, তা'র কি আর অবধি আছে? Motor nerves and sensory nerves-এর co-ordination না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এতটুকু মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হ'তে পার্‌ব না এবং এই স্বস্ত্যয়নী-ব্রত গ্রহণ ক'রে এখনই আমাদের এই nerves-এর co-ordination ক'র্‌তে লেগে যে'তে হ'বে। নতুবা ব্রতপালনই ব্যাহত হ'যে উঠ্‌বে—আমার প্রিয়পরমের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হ'বে।

'আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌তে পারি মানুষের সর্ব্বদৈন্য, সর্ব্বশোক, সর্ব্বব্যাধি দূর ক'রে তা'কে শান্তিতে ও স্বস্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে এই স্বস্ত্যয়নীই হ'চ্ছে একমাত্র অমোঘ পন্থা! এই স্বস্ত্যয়নী-ব্রতই হ'চ্ছে আমার একান্ত প্রিয়পরম যিনি তাঁ'রই অযাচিত আশীর্ব্বাদ, তাঁ'রই জীবন-যশ-বৃদ্ধিদাযিনী প্রেরণা।' "

জীবন-বৃদ্ধির পথে কৃতকার্য্যতালাভের একমাত্র অব্যর্থ উপায় এই স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের বিধানগুলি সর্ব্বদা নখদর্পণে রাখিয়া যাহাতে তাহা পূর্ণাঙ্গভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করতঃ প্রত্যেকে পরম মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ইদানীং যে সংক্ষিপ্তসার বাণীটী দান করিয়াছেন, ব্রতপালনের সুবিধার্থ নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা:—

"তুমি তোমার নিজের জন্যই হউক, আর তোমার জীবিকার্জ্জনী যে-কোনও ব্যাপারের জন্যই হউক, যদি স্বস্ত্যয়নী-ব্রতই গ্রহণ কর—

১। তবে তা'কে ইষ্ট-সেবার যন্ত্র বিবেচনা ক'রে অনুধাবনার সহিত সেই নিয়মগুলিই বেশ ক'রে পালন ক'রে চল্‌তে হ'বে—যা'তে তোমার বা তোমার ওই জীবিকার্জ্জনী-ব্যাপারের স্বাস্থ্য বা স্থায়িত্ব বজায় থাকে, আর তা' নানা ঝঞ্ঝাটেও অটুট ও সহনপটু হয়ে' উন্নতির দিকে চল্‌তে পারে;—

২। আবার তোমার নিজেরও সেই ব্যাপার-বিষয়ক চাহিদা এবং প্রয়োজনগুলিকেও ইষ্টানুকূল ক'রে নিয়ন্ত্রণ কর্‌তে হ'বে,

৩। আর এর সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি-যুক্ত প্রেরণার সহিত ভাল ব'লে যা' মনে হয় তা' তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত ক'রে তুল্‌তে সব সময়েই যথোপযুক্তভাবে যত্ন করতে হ'বে;

৪। পাড়া-পড়শির বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ বুঝে সেবা ও ইষ্ট-যাজনার সহিত তা'দিগকে সর্ব্বরকমে উন্নত কর্‌তে প্রযত্নপর থাকা চাই-ই;—

৫। এইগুলি আচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা ও শ্রমশীলতাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রত্যহ **আহার্য্য গ্রহণের পূর্ব্বে** তোমার ইষ্টকে যথাসাধ্য সুন্দরভাবে দু'-বেলায় আহার্য্যোপযোগী ভোজ্য বা তদনুকল্পে দু, চার, আট আনা, এক টাকাই হোক্, আর পাঁচ, সাত, দশ টাকা বা তদূর্দ্ধই হোক্,—বা বিনিময়ে—অমনতর অর্থ

পাওয়া যেতে পারে—এমনতর দ্রব্য দিয়েই হোক্, নিবেদন ক'রে, প্রতি একমাস পূর্ণ হ'লেই তা'-থেকে ইষ্টসেবার জন্য তিনটী টাকা পাঠিয়ে—তবে জলগ্রহণ কর্‌বে ; আর বাকী যা' রইল তা' তোমার নিকট গচ্ছিত রে'খে এমনভাবে মজুত করতে থাক তা' যা'তে কিছুতেই নষ্ট না হয়।* **না-ছোড়্-বান্দা হ'য়ে** এই নিয়মে যদি চল্‌তে থাক—দেখ্‌বে রোগ, দুর্ব্বিপাক, দারিদ্র্যাদি গ্রহের ফেরে আর দুঃস্থ হ'য়ে তোমাকে থাক্‌তে হবে না।"

ইষ্টভৃতি

মানুষের নিয়ত বৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ "স্বস্ত্যয়নীব্রতের" বিধান দিযাছেন, মানুষের স্থিতিকে অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিবার জন্য তেমনি প্রতি-প্রত্যেকের অবশ্যকরণীয "ইষ্টভৃতি"র বিধানও দান করিযাছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তৎপ্রদত্ত এই মহান্ ব্রতের উদ্দেশ্য ও বিধি-নিয়মাদি উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—

"যিনি আমাদের পরমকল্যাণ-নিধান অথচ পরম-বাঞ্ছিত তিনিই ইষ্ট। আর্য্যগণ চিরদিন ইষ্টের পূজারী। ইষ্টপূজা তাঁহাদের নিত্য করণীয়। আবহমান কাল হইতে তাঁহারা ইষ্টের যজন, যাজন ও পোষণে ব্যক্তিগত জীবনকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। এই দৈনন্দিন ইষ্টসেবাই তাঁহাদের অস্তিত্বকে অটুট ইষ্টানুরাগসম্বেগী করিয়া রাখিত। এই সেবারই নামান্তর যজ্ঞ। আর্য্যজীবন যজ্ঞময। একান্ত ইষ্টনিষ্ঠা ও সদাচার তাঁহাদের জীবনকে কৃতকার্য্য, সমর্থ, সার্থক ও সফল করিয়া তুলিত—জীবনের মূল রস ছিল এই একনিষ্ঠতা, জীবনের মূল উৎসই ছিল ঐ ইষ্টের দরদ। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি না হাপয়েৎ ॥

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ শক্তি অনুসারে নিয়ত অনুষ্ঠান করিবে, কখনই ত্যাগ করিবে না।

আর্য্যদ্বিজগণ আচার্য্য-সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রতিশ্রুতি করিত "ভৈক্ষং চর"—ভিক্ষা করিয়া দ্বাদশবর্ষ নিত্য আচার্য্যকে ভরণ করিয়া আমি তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিব। আর্য্যদীক্ষার সহিত যজন, যাজন ও ইষ্টপোষণ বা

---

* প্রতি বৎসরের গচ্ছিত মজুত ইষ্টার্ঘ্য হইতে অনিবার্য্য কারণে এক-দশমাংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে—কিন্তু সাবধান, তোমার ইষ্টের দানের অবৈধ ব্যবহার না হয়।

ইষ্টভৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা জপ-ধ্যান করিব, আর্য্যকৃষ্টির কথা সকলকে বলিয়া প্রতি ব্যক্তিকে যাজনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিব আর সর্ব্বদা ইষ্টের পোষণ করিব। ইষ্টের জন্য নিত্য ভাবা, বলা ও করার মধ্য দিয়া আর্য্যগণেব দীক্ষা পূর্ণতা লাভ করিত।

এ শুধু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নয়। গৃহস্থ-জীবনেও পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা ইষ্টের ও মানবের পোষণার্থ নিত্য সেবাযজ্ঞ-বিধান প্রত্যেক আর্য্য-দ্বিজেরই অবশ্য-করণীয় ছিল।

শুধু ভারতীয় আর্য্যগণ নহে, গ্রীকগণ, রোমানগণ, এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতি সমূহও দেবতার্থে নিত্য দান করিতেন। এই দান ও সেবা ইসলাম-ধর্ম্মীগণেরও ছিল নিত্যব্রত। জাকাত ও church-rate ইসলাম ও খৃষ্টান-জগতে চিরপ্রসিদ্ধ।

পীর, ঋষি, পয়গম্বরগণকে নিত্য সেবা করা, তাঁহাদের পোষণ ও ভরণার্থ নিত্য নিবেদন মানবের অবশ্য-করণীয় মহাযজ্ঞ। আমরা যখন হইতে ইষ্ট-পোষণ ও সেবাবিমুখ হইয়াছি তখন হইতেই আমাদের জাতি, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। যদি আমরা আবার ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে উন্নতি লাভ করিতে চাই তবে এই ইষ্টভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই ইষ্টভৃতি গ্রহণ না করিলে আমাদের দীক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। রোজ ইষ্টের জন্য বাস্তবভাবে তাঁহার আহার্য্য বা তদনুকল্পে যাহা-কিছু—ডাল, তিল, তিসি, গম, যব, তরকারী, কাঠ অথবা তাহার বিনিময়ে প্রতি বেলা অন্ততঃ দেড় পয়সা ইষ্টার্থ নিবেদন না করিয়া আমি অন্নজল গ্রহণ করিব না। তাঁহাকে ভোজন-প্রারম্ভে শুধু মনে মনে নিবেদন করিয়া নিজেই সে অন্ন গলাধঃকরণ না কবিযা, তাঁহার জন্য বাস্তবভাবে দুই বেলার অন্ন বা তদনুকল্পে অন্ততঃ তিনটী পযসা নিবেদন করিয়া রাখিয়া, নিম্নলিখিত ইষ্টভৃতি মন্ত্রপাঠে ইষ্টভৃতি সমাধা করিয়া অন্নজলাদি গ্রহণ করিব। ইহাই হইবে আমার নিত্যব্রত। যজন, যাজন ও এই ইষ্টভৃতি আজীবন আমি নিত্যব্রত-রূপে পালন করিব।

যদি দীক্ষাগ্রহণের সময়েই অমি যথাবিধি দক্ষিণাবাক্য পড়িয়া এই ইষ্টভৃতি গ্রহণ না করিয়া থাকি তবে ঋত্বিক, প্রতিঋত্বিক বা কোন গুরুজনকে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ইষ্টের প্রীত্যর্থে একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া ইষ্টভৃতি-পত্র স্বাক্ষরান্তে আমার দীক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত ঐ দিবস হইতেই যথাবিধি এই ইষ্টভৃতি আরম্ভ করিব।

এই ইষ্টভৃতি রক্ষা করিতে আহার্য্য-গ্রহণের পূর্ব্বেই নিজের আহার্য্যানু-পাতিক প্রত্যহ দুই বেলা ভোজ্য রাখাই সমীচীন। তদনুকল্পে অন্ততঃ

৩টী পয়সা, না-হয় তৎমূল্যের যে-কোন প্রকার তিল, ডাল, গোধূম, সরিষা, তিসি, ধান, জ্বালানী কাষ্ঠ, তরকারী ইত্যাদি যাহার যেমন সুবিধা প্রত্যহ রাখিতে পারিবে।

ইষ্টভৃতি মন্ত্র :—

"ইষ্টভৃতি র্ময়াদেব কৃতা প্রীত্যৈ তব প্রভো।
ইষ্টভ্রাতৃ-ভূতযজ্ঞৈস্তৃপ্যন্তু পারিপার্শ্বিকাঃ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যহ ইষ্টভৃতি রাখিবে আর মাসের শেষে অর্থাৎ ৩০ দিন পূর্ণ হইলে তৎপর দিবস তদ্বিনিময়ে অন্ততঃ একটা পূর্ণ রজত মুদ্রা, দুইজন ইষ্টভ্রাতার আহার্য্যানুপাতিক ভোজ্য এবং লোকহিতৈষণায় খরচ করিতে পারা যায় এমন কিছু সংগ্রহ করিবে। আর ঐ পূর্ণ রজত মুদ্রা তোমার প্রিয়পরমকে ৩০ দিন পূর্ণ হইলে তৎপর দিবস স্বহস্তে বা মনিঅর্ডার যোগে প্রতিমাসে পাঠাইবে এবং ঐ দিনই দুইজন ইষ্টভ্রাতাকে ভোজ্য দিতে হইবে ও বাকী পয়সা লোকহিতৈষণার্থ জমা রাখিতে হইবে। গুরু-ভাই অভাবে দুইজন গুরুজনকে ঐ ভোজ্য দান করিতে হইবে।

শাস্ত্রে আছে—

"দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"

দেওয়া, নেওয়া, গোপন কথা বলা ও জিজ্ঞাসা করা এবং খাওয়া ও খাওয়ান এই ছয়টী হ'চ্ছে প্রীতি-লক্ষণ, ইহাতে পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। করা ও চলা নাই—আচরণ নাই, অনুষ্ঠান নাই, শুধু ভাবা আছে এমনতর অনুরাগ কিছুতেই বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে না। তাই সংহিতার বিধান "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ।" ইষ্টানুরাগকে জীবনে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইলে শুধু যজন অর্থাৎ নাম ধ্যানে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইবে না—তাহার সহিত যাজন ও ইষ্টভৃতি নিত্যকরণীয় হিসাবে পালন করিতে হইবে। তবেই ইষ্টানুরাগ জীবনে জীবন্ত হইয়া আমাদিগকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, ধন্য করিবে, সার্থক করিবে।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—আমার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেমন নিত্য-করণীয়, তেমনই স্বস্ত্যয়নী-ব্রত স্বতঃ-স্বেচ্ছায় আমার দ্রুত বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অবশ্য-গ্রহণীয়। স্বস্ত্যয়নী-ব্রত আমাদের বৃদ্ধির দিকে—becoming-এর দিকে লইয়া যায়, আর ইষ্টভৃতি আমার অস্তিত্বকে—being-কে অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখে।

এই 'ইষ্টভৃতি' ও 'স্বস্ত্যয়নী'-ব্রতের স্ব-স্ব বিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে যে সরল ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রশ্ন। প্রত্যেকেই যে নিত্যকরণীয় বলিয়া 'ইষ্টভৃতি' গ্রহণ করিতেছেন ও নিত্যপালন করিতেছেন এই 'ইষ্টভৃতি' কাহাকে বলে? এই ইষ্টভৃতি আর স্বস্ত্যয়নীব্রত এই দুইয়ের পার্থক্য কোন্‌খানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরু বা আচার্য্য-সকাশে উপনীত হইয়া সাবিত্রী-দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এই গুরু বা ইষ্টভৃতি অর্থাৎ গুরুকে পরিপালন করিবার বিধান ঐ দীক্ষার অঙ্গীভূত করিয়াই আর্য্যঋষিরা দ্বিজমাত্রেরই জন্য প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তব কর্ম্মের ভিতর দিয়া বাস্তবভাবে আচার্য্য বা গুরুর সহিত সম্বন্ধ অকাট্য হইয়া ওঠে। প্রত্যেকেরই প্রবৃত্তি-উৎসৃজী যে সকল কর্ম্ম উদরান্ন-সংস্থানে বা আহরণে নিজের সংসারকে লাভবাহী করিয়া তুলিতে প্রয়াসশীল থাকে, গুরু বা আচার্য্যের প্রতি ঐ বাস্তবকরণের ভিতর দিয়া পরিপোষণ-অবদানে সংবদ্ধ হওয়ায় ঐ প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিকতার সহিত যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় দুষ্টি বা এমনতর দুরপনেয় কিছু করিতে সহজে সমর্থ হয় না যাহার ফলে মানুষ বিশ্বরন্তির মরণ-ইঙ্গিতের লোলুপ-প্ররোচনায় অকাট্য-ভাবে সর্ব্বনাশে গা ঢালা দেয়। কারণ লাভবাহী প্রতি আহরণই প্রত্যক্ষ-ভাবে আচার্য্যকে স্মরণ করাইয়া সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তিগুলির মঙ্গল-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিতচলনায় চলিতে থাকে অর্থাৎ ইষ্টস্বার্থ-প্রবণ হইয়া সহজভাবে প্রবৃত্তিগুলির ব্যক্তব্যষ্টিকে চালাইয়া থাকে। তাই তা'রা এমন অবস্থা বা ভাবদ্ধারা গ্রস্ত বা আবিষ্ট হয় না যা'র ফলে সর্ব্বনাশ তা'দের উপর নির্ব্বিরোধে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে।

তাই 'ইষ্টভৃতি' মানুষের স্থিতিকে অনেক পরিমাণেই অটুট করিয়া তোলে—আর তাই আর্য্য যাঁ'রা দীক্ষাগ্রহণে দ্বিজত্বে উপনীত হইয়াছেন, ইষ্টভৃতি তাঁ'দের ঐ দীক্ষারই অঙ্গীভূত চল্‌না। যেমন জন্মদাতা পিতামাতাকে পালন ও পোষণ প্রতি-প্রত্যেকেরই অতি কর্ত্তব্য তেমনই আচার্য্যকেও পালন ও পোষণ করা নিত্যকর্ত্তব্য। যাঁহারা দীক্ষাপ্রাপ্তির সহিত এই নিত্যকরণীয় ইষ্টভৃতি পালন করেন নাই, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইষ্টের প্রীত্যর্থে ঋত্বিক, প্রতিঋত্বিক বা গুরুজনের নিকট অথবা তদুদ্দেশ্যে একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া দীক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত এই ইষ্টভৃতি আরম্ভ করিতে হয়। এই ইষ্টভৃতি রক্ষা করিতে হইলে প্রাত্যহিক জীবনে আহার্য্য গ্রহণের পূর্ব্বেই নিজের আহার্য্যানুপাতিক প্রত্যহ দুই-

শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

(১৩৩৩ সন)

বেলা ভোজ্য ইষ্টার্থে রাখাই সমীচীন। তদনুকল্পে অন্ততঃ তিনটী পয়সার কম না হয় তন্মূল্যের যে কোন প্রকার ডাল তিল, গোধূম, সরিষা, তিসি, ধান, জ্বালানী-কাষ্ঠ, তরকারী ইত্যাদি যাহার যেমন সুবিধা প্রত্যহ রাখিতে হইবে। আর মাসের শেষে অর্থাৎ ইষ্টভৃতির আরম্ভ দিবস হইতে ৩০ দিন পূর্ণ হইলে তৎপর দিবস তদ্বিনিময়ে অন্ততঃ একটী পূর্ণ রজতমুদ্রা, দুইজন ইষ্টভ্রাতার আহার্য্যানুপাতিক ভোজ্য ও লোকহিতৈষণায় খরচ করিতে পারা যায় এমন কিছু সংগ্রহ করিয়া ঐ পূর্ণ রজত মুদ্রা ইষ্টের সকাশে প্রেরণ করতঃ দুইজন ইষ্টভ্রাতাকে ভোজ্য প্রদান করিয়া বাকী পয়সা লোকহিতৈষণার্থ জমা রাখিতে হয়। 'ইষ্টভৃতি' যেমন বিপ্রবস্তিকে প্রতিরোধ করিয়া মানুষের স্থিতিকে সংরক্ষিত করিয়া চালাইতে থাকে, 'স্বস্ত্যয়নী' তেমনই আবার মানুষের সংবর্দ্ধনের পথের অমঙ্গলগুলিকে নিরোধ করিয়া শত বিপর্য্যয়কে যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতঃ, জয় করতঃ, লাভবাহী করতঃ সম্বর্দ্ধনাকে উন্নত পরিক্রমণে চলৎশীল করিয়া চালায়। প্রত্যেক আর্য্যসন্তানেরই দ্বিজ হইতে হইলেই সাবিত্রী-দীক্ষা, ইষ্টভৃতি যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, মানুষকে লাখ আবর্ত্তনের, অযুত ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে নৈমিত্তিক জীবনে উন্নতচলৎশীল হ'তে হ'লেই তেমনিই যথাবিধি 'স্বস্ত্যয়নী' অবশ্য করণীয়। দুনিয়ায় উন্নতচলৎশীল এমনতর কোন জীবনই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যে-জীবনে কোন-না-কোন রকমে অকাট্যভাবে যথাবিধি 'স্বস্ত্যয়নী' প্রতিপালিত হয় না। যে-জীবনে 'স্বস্ত্যয়নী' নাই, উন্নতি সেখানে কোথাও মূকের মত, কোথাও পঙ্গুর আর্ত্তনাদী ভীতত্রস্ত কোলাহলমুখর, কোথাও বা অন্ধের বোধদৃপ্ত তমসাচ্ছন্ন আবেগময়ী ইতস্ততঃ গৌরবমুখর হাতরানী—। নাম, ধ্যান, যাজন ও ইষ্টভৃতি—এই হ'চ্ছে দীক্ষার পূর্ণাঙ্গ, তেমনই নৈমিত্তিক জীবনকে উন্নত চল্‌নায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সবিধি স্বস্ত্যয়নী অতি অবশ্যকরণীয়।"

ইষ্টভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য

তোমার ইষ্ট-ভ্রাতা—সে যেমনই হোক না কেন, তাহার আপদ-বিপদ-অনটনে তোমার সামর্থ্য অনুপাতিক যদি তাহাকে সমীচীনরূপে বাক্য, ব্যবহার, অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য না করিয়া নিশ্চেষ্ট, উদাসীন বা অনুকম্পাহারা হও—তাহা হইলে বিকৃত দুর্দ্দশার কবল হইতে তোমাকে আলিঙ্গনাবদানে রক্ষা করিবার আর কাহাকে পাইবে? মনে রাখিও, সে যদি অপরাধীই হইয়া থাকে, তাহার প্রথম ও প্রধান শাস্তা ও শোধ্‌রাবার মালিক তুমি ও তোম্‌রাই; দেখিও—ঐ ইষ্টীপূত তনু—ঐ ধমনীতে যে রক্ত

বহন করিতেছে—তোমার সামর্থ্য যেন পারতপক্ষে আর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতে না দেয়! আশীর্ব্বাদের শুভ-নিয়ন্ত্রণে স্বস্তির সিংহাসন অটুট থাকিবে সন্দেহ নাই।

দীক্ষা

শ্রদ্ধাভক্তির চাষের ভিতর দিয়ে, বাধাবিঘ্নের আবর্জ্জনা ঘুচিয়ে—ঐ যিনি জানেন, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয়। আর এই পাওয়ার প্রকরণকেই দীক্ষাগ্রহণ ব'লে থাকে।

তাই, যাদের এই দীক্ষাগ্রহণ করা হয়নি, তাহাদের সাধারণতঃ শাস্ত্রে পশুর সমান ব'লে থাকে। কারণ, এই দীক্ষাগ্রহণ ক'রে মানুষ যদি তার চলনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, করার ভিতর দিয়ে জানা তাকে কিছুতেই উন্নত প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না। আর যাদের চলা বিধিমাফিক ঐ করার ভিতর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তারা জীবন ও বৃদ্ধিতেও উন্নত হ'তে পারে না। এমন কি—যে অমনতর করে না, তার পরিবার পারিপার্শ্বিকও ঐ উন্নত চলনা হারিয়ে ফেলে।

তাই, দীক্ষা মানুষের পাপ—অর্থাৎ যা' জীবন ও বৃদ্ধি থেকে পাতিত করে—তাকে ক্ষয় ক'রে করার জ্ঞান দান ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিতে সমুন্নত ক'রে তোলে।

সদ্‌গুরু পেলেই কাল ও অবস্থা বিবেচনা না ক'রে তৎক্ষণাৎ যে দীক্ষাগ্রহণ না করে, কাল তার পাতকী অঙ্কুশে দিগ্‌দারী সর্ব্বনাশে তা'কে টান্‌তে কিছুতেই ছাড়্‌বে না। আর এই সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি জীবনবৃদ্ধির চলনাগুলিকে হাতে-কলমে এস্তামাল ক'রে জানায় শ্রেষ্ঠ বা গুরু হ'য়েছেন। তাই শাস্ত্র অমনতর মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লেছে—এখনই যদি সদ্‌গুরু পাও, তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তুমি যেমনই হও না কেন, এক্ষুণই দীক্ষা গ্রহণ ক'রে, শ্রদ্ধাবনত প্রাণে তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌তে সুরু ক'রে দাও—আর এই চল্‌তে গিয়ে তুমি প'ড়েই যাও আর অনভ্যাসের দরুণ ছড়ে' গিয়ে তোমার শরীর রক্তাক্তই হ'য়ে উঠুক, বা ভেঙ্গে-চুরেই যাক্—তুমি চল, চলাকে ছেড়োনা, তাঁর নির্দ্দেশমত চলা একদিন—একদিন কি, এখন থেকেই ক্রমনিরাময়ে উদ্দীপ্ত ক'রে, জীবন ও বৃদ্ধির অমৃতপ্রগতির পথে অমৃতভোগী ক'রে তোমায় চালিয়ে নেবেই!

দক্ষিণায় দক্ষতার সঞ্চারণ

সিদ্ধিলাভে প্রথম সোপানই হচ্ছে—যার কাছ থেকে ঐ করার মতলব নিচ্ছি তাঁকে নিজের করায় অর্জ্জিত—বিশেষতঃ সৎ বা জীবনবৃদ্ধিদ করায় অর্জ্জিত—তাঁর প্রীতিপ্রদ এমনতর কিছু শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত দেওয়া, যাতে আবার তাঁ-থেকে এমনতর সাড়া পাওয়া যায় যে পাওয়ায় মস্তিষ্কে এমনতর একটা অভিব্যক্তি হয় যাতে স্নায়ুপথে পেশীগুলিকে উত্তেজিত ক'রে করার অভিব্যক্তি দক্ষতায় নেবে এসে এমনতর একটা ইচ্ছুক ঝোঁক এনে দেয়—যার ফলে পথে যা-ই বাধা আসুক না কেন, অতিক্রম ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে অবহেলায় আনন্দের সহিত সিদ্ধিলাভ করতে পারি। এই দেওয়ারই নাম দক্ষিণা। ঐ অমনতর ক'রে ঐ প্রথার ভিতর দিয়ে মানুষকে দক্ষ ক'রে তোলে ব'লেই ওর নাম দক্ষিণা হ'য়েছে। তাই কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লেই, যাঁর কাছ থেকে ঐ কাজের মতলব নিচ্ছি তাঁকে ঐ দক্ষিণার ভিতর দিয়ে দক্ষতার সঞ্চারণ করতেই হয়।

এইবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত বাংলাভাষায় রচিত প্রার্থনা ও সন্ধ্যামন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করিব। এতদিন বাংলা-ভাষায় আমাদের সমবেতভাবে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রার্থনার কোন ভাল মন্ত্র ছিল না, কিছুদিন হইল শ্রীশ্রীঠাকুর চিরন্তন আর্য্যসন্ধ্যার ছায়াবলম্বনে প্রায় সমুদয় মন্ত্রগুলিই রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার ছন্দোবিন্যাস এমনই অপূর্ব্ব হইয়াছে যে সংস্কৃতের যত-কিছু গাম্ভীর্য্য এবং মন্ত্রের যাহা-কিছু প্রাণশক্তি তাহা যেন তাঁহার ভাষায় সংহত হইয়া আছে। মন্ত্রগুলি পাঠ করিবামাত্র মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের শিহরণ আনিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটু ক্ষুদ্র অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা:—

> হে পরমকারুণিক! হে সব্ব, হে সর্ব্বানুস্যূত! ব্যাপ্ত, প্রাক্, প্রথমবাক্! সর্ব্বস্বর্গ, সর্ব্বহৃদয়প্রাণনপরিমল! অদ্বিতীয়, ঈশ্বর! জীবজগৎরূপে প্রতিভাত! রক্তমাংসসঙ্কুল—উদ্ভাসিত তুমিই তোমার ত্বজ্জাত সন্তান! এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ,—এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা'-কিছু মলিনতা উৎসাবিত অমৃতআশীষে, জরামরণদুঃখদুরিতবিপত্তি যা'কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোল! এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত-আচমনে পবিত্র হইলাম! আমি পবিত্র! আমি পবিত্র! আমি পবিত্র!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চরিত্রাখ্যান

এই অধ্যায়ে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরেব দৈনন্দিন জীবন-চলনার সংক্ষিপ্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্রের সহজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত কবিব।

প্রতিদিন এক সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আব এক সকাল পর্য্যন্ত কি-পরিমাণ ঝামেলা তাঁহার অবসরহীন জীবনে চাপিযা আছে তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারিবেন না। ভোর হইতেই আত্মীয়স্বজন আসিযা তাঁহাদের স্ব-স্ব রোগীদিগের পূর্ব্বরাত্রের অবস্থাব সংবাদ দিতেছেন; যাহাদের অর্থাভাব তাহারা কাঁদিযা পড়িল, 'কি খা'ব বাবা?' প্রতিষ্ঠানেব বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মীরা কার্য্যপরিচালনায নিজ নিজ অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিয়া পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কেহ উপস্থিত হইল নিজের পারিবারিক নানা অশান্তির কথা লইয়া;—দূরদেশ হইতে আগন্তুক কেহ বা আসিলেন নানা তথ্যের মীমাংসা জানিতে। এইরূপে আসিতে লাগিল দলে দলে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর দল—একের পর এক, একের পর এক করিয়া। কেহ বা সভাস্থে কেহ বা নিরালায়—তাহারা নিবেদন করিতে লাগিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সকাশে যাহার যাহা প্রয়োজন, যাহার যাহা অসুবিধা, যাহার যেখানে ব্যথা। শ্রীশ্রীঠাকুর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অকাতরে সমস্ত ঝক্কি হজম করিয়া স্মিতমুখে প্রয়োজনানুরূপ সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া সবাইকে আশায উৎসাহে ভরপুর করিয়া রাখিতেছেন। যেরূপ অক্লান্তচিত্তে সেবা করিয়া মানুষের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান-দানে তিনি সকলকে সতত জীবন ও বৃদ্ধির পথে চালিত করিতেছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সহস্র সহস্র দিনের লক্ষ লক্ষ ঘটনার সেই সকল বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্বচক্ষে না দেখিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মীমাংসা-প্রদানের এই অপূর্ব্ব মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। নিম্নে কয়েক দিনের দুই চারিটী ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ-সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি।

একদিন প্রাতে তপোবন বিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক আসিয়া শিক্ষা-প্রসঙ্গে কথা তুলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে কথায় কথায় বলিলেন,

—"দেখুন, শিক্ষক হ'বেন ছাত্রের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র। এই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে হ'লে দরকার, ছাত্রদের আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসা,—নিজহস্তে তা'দের সেবা-যত্ন করা। শিক্ষক ছাত্রের সেবা ক'চ্ছেন দেখ্‌লে ছাত্রও স্বতঃই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ও সেবাপরায়ণ হ'বে। ছাত্রের নিকট কখনও সেবা দাবী করা উচিত নয়, তা'রা স্বেচ্ছায় আগ্রহের সহিত যেন সেবা করতে আসে—শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এমনই মধুর প্রীতির বন্ধন থাক্‌বে। শিক্ষক যখন ক্লাসে প'ড়াবেন, ছাত্রেরা যেন আনন্দে মস্‌গুল হ'যে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁ'র কথা শুনে, এমনিভাবে কথকের ন্যায ভাবভঙ্গী-সহকারে বেশ রসাল ক'রে পাঠ্য বিষয়গুলি তা'দের মধ্যে পরিবেশন করা উচিত। প'ড়াবার সময় শিক্ষক যদি তাঁ'র নিজের ছাত্র-জীবনের কথা মনে করেন, তা'হ'লেই তিনি ছাত্রের অসুবিধা গুলি ঠিক ঠিক বু'ঝে দরদ-প্রাণে তা'দের প্রযোজন ও চাহিদা-মাফিক পাঠ দিতে পার্‌বেন, আর সে-ক্ষেত্রেই ছাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে সহজে তা' গ্রহণ ক'রে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হ'তে পারে।

"আর একটা কথা। যিনি প্রকৃত শিক্ষিত, তিনি কিন্তু জানেন না তাঁ'র কত বিদ্যা আছে। যেমন পাতঞ্জলে আছে,—'সর্ব্ববীজজ্ঞ'—সেই-রূপ। অশ্বত্থের বীজ অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তা'র মধ্যে বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে আছে, উপযুক্ত environment পে'লে বীজ বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। শিক্ষক তাদৃশ জ্ঞানভাণ্ডার-সদৃশ হ'বেন, অথচ তিনি conscious থাক্‌বেন না যে তিনি জানেন; কিন্তু কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে তাঁ'র মুখে যেন খই ফুট্‌তে থাক্‌বে। শিক্ষাও দিতে হ'বে এরূপভাবে যেন ছাত্রেরা বুঝ্‌তে না পারে যে, তা'রা শিখ্‌ছে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও গল্পচ্ছলে শিখাতে হ'বে। আর, শিক্ষকগণের সকলে মিলে একটি compact body হওয়া দরকার, যেন দশজন শিক্ষকে একজন শিক্ষক হ'য়েছেন; এজন্য জ্যেষ্ঠের প্রতি থাকা চাই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আর বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি দোষসহনশীল হওয়া চাই—তাঁ'দের চলন-চরিত্র সব দিকে হ'বে আদর্শস্থানীয়। ছাত্রদের চরিত্র-গঠনের জন্য এরূপ আবহাওয়া নিতান্তই দরকার।"

একটু বেলা হইয়াছে, একটী বর্ষীয়সী বিধবা ব্রাহ্মণ-মহিলা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তপোবন বিদ্যালয়ের বিদেশাগত ছোট ছোট ছেলেদের সেবা-যত্নের ত্রুটী না হয় এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এই মা-টীর উপর তথাকার গৃহস্থালীর সমুদয় দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। মা-টীর সঙ্গে তথাকার ভৃত্যের ঝগড়া হয়। তিনি মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে

শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেছেন,—"বাবা, সওদাগর আজ আমাকে অপমান-জনক কত কথা ব'লে গালি দিয়েছে, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছে আমি আর ওখানে যা'ব না।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"সওদাগর তোকে বক্‌ল, তুই কি কল্লি?" মা-টী উত্তর করিলেন,—"কেন, আমাকে মারতে এসেছিল আমি তা'কে এক ধাক্কা মে'রে ফে'লে দিয়েছি।" শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, বলিস্ কি? তোর গায় এত জোর হ'য়েছে যে তুই সওদাগরকেও ঠে'লে ফে'লে দিয়েছিস্!" শ্রীশ্রীঠাকুর কেবলই হাসিতে লাগিলেন—হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণখোলা উচ্চহাসি দেখিয়া মা-টীও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার মনের দুঃখ কোথায় দূর হইয়া গেল! অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"যা, আমি ব'লে দিচ্ছি, ও' আর এমন করবে না, তা'র দোষ ভু'লে যা'। তোকে যে কাজ দিয়েছি, তা' দিয়ে তুই ধন্য হ'য়ে যাবি। যা লক্ষ্মী! দুঃখ করিস্‌নে, তুই এতগুলি ছেলের মা, তুই না গেলে ওরা খা'বে কি?" মা-টী খুসী হইয়া হাসিমুখে আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

উক্ত ঘটনার একটু পরেই প্রেসের ম্যানেজার এক অশীতিপর বৃদ্ধ আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তথাকার কর্ম্মিগণের নানা প্রকার অবহেলা ও ত্রুটীর কথা উপস্থিত করিলেন। এই জরাজীর্ণ দেহ নিয়া তিনি এমন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সেখানে আর কাজ করিতে পারিবেন না বলিয়া ভদ্রলোকটী মনের বিরক্তি, অনিচ্ছা এবং দুঃখ জানাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া বলিলেন,—"দাদা, ও কিছু নয়, দু'দিনেই সব ঠিক হ'য়ে যা'বে, আর আমি ইচ্ছা ক'রেই আপনাকে এই সব ঝামেলার মধ্যে রে'খেছি, কারণ জানি অসুবিধার মধ্যে রাখ্‌লেই আপনার কর্ম্মশক্তি ঠিক্ থাক্‌বে, আপনি সুস্থ থাক্‌বেন,—আপনার life prolonged হ'বে।" এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিমর্ষবদনে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমিও আমার বাবার সম্বন্ধে এই ভুল ক'রেছিলাম। সবাই বল্‌ত যে, বাবা বৃদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁ'কে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আমিও তা'দের কথা শু'নে সমস্ত কাজ থেকে বাবাকে রেহাই দিয়ে রে'খেছিলাম, কিন্তু ফল হ'ল তা'র বিষময়—আমি তাঁ'কে অকালে হা'রালাম।" নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ কর্ম্মী মনোযোগের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনিলেন এবং আর কোনদিন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে অমত প্রকাশ করিবেন না, মনে মনে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

সেদিন একটু বেলা হইয়াছে। জনৈক আগন্তুক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা বলিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, সহসা ঐ ব্যক্তির কোন কথার উত্তরস্বরূপ তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আপনি কি আগুন, জল, আকাশ, electron হ'তে চান, না উহাদের master হ'তে চান? যিনি সমুদয়কে জানেন তিনিই সর্ব্বজ্ঞ,—যিনি সকলের অন্তরকে বা ভিতরকে control কর্‌তে পারেন তিনিই অন্তর্যামী। সকল কার্য্যেরই কারণ থাক্‌বেই। যিনি সকল কার্য্যের কারণ জানেন, তাঁ'র নিকট কোন miracle নাই।·····গুরু ও ভগবান্‌ ভিন্ন নহেন। অজ্ঞান অর্থাৎ না-জানারূপ অন্ধকার থেকে যিনি জানার দ্বারা চক্ষু খু'লে দেন, তিনিই গুরু। গুরুই সব, গুরু ব্রহ্ম, গুরু বিষ্ণু······ইত্যাদি; তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন,—'মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী····ইত্যাদি।" নানা আলোচনা চলিতে লাগিল, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"মনের মানুষ তাঁ'কেই বলে যাঁ'র নিকট গেলে আমি আমাকে চিন্‌তে পারি,—যেমন একটী সরলরেখার নিকট একটী বক্ররেখা রাখ্‌লে সে বুঝ্‌তে পাবে যে সে বক্র। যে মানুষের নিকট প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনোভাবের বা চরিত্রের দুর্ব্বলতার support পায়, তাঁ'কে সকলেই ভালবাসে এবং তাঁ'র সহিত মি'শে আনন্দ পায়; এই ভাবে নিয়ত তাঁ'র সঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে, তা'র নিজের complexগুলি তা'র নিকট ধরা পড়ে ও তাঁ'তে যুক্ত থাক্‌বার দরুণ ঐ complexগুলির আস্তে আস্তে মীমাংসা হ'য়ে সে normal man-এ পরিণত হয়,—যাঁ'র সঙ্গ কর্‌লে এইভাবে মানুষের বৃত্তিভেদ হয় তাঁ'কেই ideal man বলা যে'তে পারে।"

আর একদিনের কথা বলিতেছি। Prophet সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে Prophet শব্দের অর্থ অভিধানে দেখা হইল—One who speaks before or on behalf of God. শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"God is Law." ইহা শুনিয়া জনৈক আগন্তুক বলিয়া উঠিলেন,—"God যদি Law হন, তা'হ'লে তাঁ'তে ক্ষমা বা all-merciful ভাব কিরূপে সম্ভব, কেননা Law must have its own course." শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"ব্রহ্মের আশ্রয় নিলে বল্মীকাবৃত ব্যক্তির ন্যায় আঘাত পে'তে হয় না, বল্মীকের উপর দিয়েই চোট্‌ চ'লে যায়। আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় যেমন approver হ'য়ে। দেখুন, Prophet-রা হ'চ্ছেন ধর্ম্মসংস্থাপন-কর্ত্তা; ইহার অর্থ এই যে, যেখানে অধর্ম্ম প্রবল হয়, অর্থাৎ breaking of law হয়,—তা'র ফলে লোকে

কষ্ট পায়, সেখানে Prophet এসে কি কি laws কি ভাবে পালন কর্‌লে লোকে সুখ-শান্তির অধিকারী হ'বে তা' দেখিয়ে দেন—ইহারই নাম ধর্ম্মসংস্থাপন। যা' রক্ষা করে তা'ই ত' ধর্ম্ম।"

তৎপর অন্য কথা উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলিতে লাগিলেন,—"এদেশের উচ্চশিক্ষিত বি-এ, এম্‌-এ, অনেকেই non-cooperation-এ যোগ দিয়ে failure আনয়ন ক'রেছিল। ইহার কারণ, দেশের জনসাধারণের সহিত উহাদের আন্দোলনের কোন যোগ ছিল না—দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ কি, তা'রা জান্‌ত না। শিবাজীর success-এর একমাত্র কারণই তিনি দেশের অবস্থা সম্যক্‌রূপে সমুদয় জান্‌তেন। প্রতাপ যদিও রাজবংশজ—শিবাজীর ন্যায় তিনি জনসাধারণের অভাব-অসুবিধার বড়-একটা খবর রাখতেন না, নিজের অহঙ্কারের পরিপুষ্টিই মাত্র চাইতেন;—তা' না-হ'লে ভাই শক্তসিংহ শত্রুদলভুক্ত হ'লেন কেন? মানসিংহের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার তাঁ'র অহঙ্কার ও আভিজাত্যগর্ব্বের পরিচায়ক নয় কি? তিনি যদি দেশের যথার্থ মঙ্গলকামীই হ'তেন তা'হ'লে অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহায়তায় দেশকে ছলে, বলে, কৌশলে যে-ভাবেই হউক স্বাধীন কর্‌তে পার্‌তেনই। আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে গিয়েই সব নষ্ট কর্‌লেন। শিবাজী দেশের দুঃখ প্রাণ দিয়ে বু'ঝেছিলেন, আর তাই তা' দূর কর্‌তে কত কৌশলই না অবলম্বন ক'রেছিলেন! একটা বিপুল মঙ্গলের জন্য যদি সামান্য foul means-ও adopt কর্‌তে হয়, তা'ও ভাল। একটা পেঁয়াজ খে'লে যদি কখনও বিশেষ মঙ্গল হয়—কোন কঠিন রোগ সেরে যায়, তা' করা ভাল নয় কি? না হয় তা'র জন্য দশ দিন কষ্ট পে'তে হ'বে।"

একদিন অপরাহ্নে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন, তখন বিদেশাগত জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা, কুলকুণ্ডলিনী কি এবং তাহার স্থানই বা কোথায়? এ সম্বন্ধে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন।" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিতে লাগিলেন—"Spinal cord একটা নলের মতন,—fluid দিয়ে ভরা, তা'র lower end শেষ হ'য়েছে মূলাধারে, সেটাও fluid দিয়ে ভর্ত্তি; এর upper end cerebellum-এ গিয়ে শেষ হ'য়েছে, এর ঘাটে ঘাটে nerves-এর গুচ্ছ জ'ড়িয়ে আছে, এ'কে ইংরেজীতে ganglion বলে। এইরকম অনেক ঘাট আছে। Penal gland-এ নামের কম্পন তুল্‌লে কিংবা cerebellum-এর centre-এ নামের কম্পন তুল্‌লে ঐ মূলাধারে যে fluid আছে তা'র ভিতর একটা vibration-এর সৃষ্টি হয়। এই কম্পন আস্তে আস্তে fluid-কে এবং তা'র ভিতর

দিয়ে different centres বা ganglian-কে আন্দোলিত করতে থাকে এবং এরই অনুপাতে cerebellum-এর কোষগুলি যা' spinal cord-এর কাছাকাছি অবস্থিত তা' elastic ও sensitive হ'তে থাকে। তারপর দূরের কোষগুলি by induction sensitive হ'য়ে পড়ে। এর ফলে brain cells finer and finer হ'তে থাকে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাড়া গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। জগৎটাও ঐ brain cells-এর adjustment ও co-ordination অনুযায়ী বোধ হ'তে থাকে। একটা সামঞ্জস্য, সমাধান ও প্রতীতির ভিতর দিয়ে জীবন চলতে থাকে—infinite becoming-এর পথে। যে layer-এর কোষগুলি developed হ'তে থাকে spinal cord-এর ভিতর ganglian-গুলি তদনুযায়ী ফু'টে উঠতে থাকে আর তেমন তেমন দর্শন, জ্ঞান ও আনন্দ বোধ হয়। নাম করলে যে তাপের সৃষ্টি হয় তা'ই জ্যোতিঃরূপে প্রতিভাত হয়। আর inner combustion বা adjustment-এর দরুণ যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তা'কেই শব্দ বা নাদ বলে, আর spinal cord-এর ভিতর যে সুড়্-সুড়ে আনন্দ অনুভূত হয় vibration যাতায়াতের দরুণ, তা'কেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে। Whole nerve-system-কে control করা যায়, যদি cerebellum-এর cellsগুলি properly adjusted ও co-ordinated হয়, এমন কি এতে মৃত্যুকেও জয় কবা যায়।"

আর একদিন গোপীদিগের ও রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন,—"রুক্মিণী নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া, রুক্মিণী আদর্শ বধূ—শ্রীকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী, কাজেই সহকর্ম্মিণীও। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সময়োচিত সাহায্য ক'চ্ছেন, তাঁ'কে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত ক'চ্ছেন, নিজে রথ চালাচ্ছেন, যুদ্ধ-পরিচালনার plan ক'চ্ছেন ;—আবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের আহত সৈন্যদের জন্য ambulance পাঠাচ্ছেন,—কারণ সেখানে তিনি সবারই মা। রুক্মিণী যেন সব দিক দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের brain ছিলেন। দুর্ব্বাসার মত কোপনস্বভাব মুনির কত বড় দুরভিসন্ধি রুক্মিণীদেবীর কাছে ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল! রুক্মিণী বাস্তবিকই সতী-শিরোমণি, তাঁ'র সব বৃত্তিগুলিই ছিল শ্রীকৃষ্ণের যা-কিছুকে পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনপর হ'য়েই।

"গোপীদিগের ভাবও কিন্তু বেশ! তা'রা রুক্মিণীর মত শ্রীকৃষ্ণকে fulfil করার ধার বড়-একটা ধারত না বটে—enjoyment-ই তা'দের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। চাতক চেয়ে থাকে দিনরাত মেঘের পানে আকুলনেত্রে—fulfil করার বুদ্ধি-টুদ্ধি তা'র নেইকো, আবার মেঘের জল

ছাড়া অন্য জলে তা'র তৃষ্ণা-নিবারণেরও আকাঙ্ক্ষা নেই। অন্য পাখীরা খাল-বিলের জলও পান করে, তা'দের চেয়ে চাতক ত' অনেক ভাল। enjoyment-এর বুদ্ধি prominent থাক্‌লেও গোপীরা ত' শ্রীকৃষ্ণকেই enjoy কর্‌তে চাইত! এই enjoyment-এর বুদ্ধি নিয়ে এসেও তা'রা কালে শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়েছিল। গোপীরা ছিল শ্রীকৃষ্ণের সহানুচারিণী। প্রত্যেকেই কোন বৃত্তি-বিশেষের ভিতর দিয়া তা'রা শ্রীকৃষ্ণে আপ্রাণ অনুরক্ত হ'য়েছিল—শ্রীকৃষ্ণ-উপভোগ ছিল তা'দের জীবনের একটা অদম্য তৃষ্ণা। তাই তা'রা ত'াদের বৃত্তিমাফিক বাদে শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণতঃ উপভোগ কর্‌তে পার্‌ত না—উপভোগেরও খাকৃতি হ'ত। তা'দের-শ্রীকৃষ্ণের মতন ক'রেই তা'রা শ্রীকৃষ্ণকে চাইত—বৃত্তি-নিঃস্রাবী আসক্তির অশেষ ও আপ্রাণ টানে তা'রা তেমনি ক'রেই শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে ফে'লেছিল আর সেইজন্যই তা'দের বর্দ্ধনও তেমনতরই হ'য়েছিল।"

সেদিন বিকাল বেলা শ্রীশ্রীঠাকুর বিনতি-পাঠের পর একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেকেই আছেন। "Instincts" বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—"Instincts দুই রকমের—Unconditioned ও acquired. Unconditioned instinct—যা' আমরা পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে heredity হিসাবে পে'য়েছি। এ কিন্তু বদ্‌লাবার নয়। যদি environment অনুকূল না হয় তবে এরকম instinctগুলি dormant অবস্থায় ভিতরে ধিকিধিকি জ্বল্‌তে থাকে। অনুকূল আবহাওয়া পে'লেই আবার জীবন পে'য়ে লাফিয়ে ওঠে। আর acquired instincts যা', তা' এই জীবনেই পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে acquire করা যা'চ্ছে, তা'র উপর পারিপার্শ্বিকের ছাপ খুব বেশী। যদি Superior Beloved-এর প্রতি একান্ত টান থাকে এবং এই একান্ত টানের দরুণ acquisition হয়, তবে তা' libido-কে স্পর্শ কর্‌বেই এবং instinct হ'য়ে জীবনে গ্রথিত থাক্‌বেই। এই রকমের acquisitionগুলি future generation-এ transmitted হ'য়ে বংশকে wholesale elevate কর্‌বেই। কিন্তু ইষ্টপ্রাণতা বাদ দিয়ে যদি জীবনে কিছু অর্জ্জন করা যায় তবে তা' heredityতে পর্য্যবসিত হ'বে না। কতকগুলি অজ্ঞানের বোঝা হ'য়ে জীবনকে কর্‌বে দুর্ব্বিসহ! এরকম শেখাকে learning বলাই ভাল! এই hereditary instinct-কে ignore ক'রে কোন প্রকার growth বা education হ'তে পাবে না। এমন-কি মানুষের development হয় এই hereditary instinct-মাফিক। এর বাইরে সাধারণতঃ কারও যাওয়ার

উপায় নাই! এই হিসাবে আমাদের growth predetermined হ'য়ে আছে। আর যা'-কিছু এই life-এ acquire করা যায়, তা' এই hereditary instinct-এর উপর দাঁড়িয়েই ওরই রকমে। তবে যদি Ideal-এ attached হওয়া যায় এবং এই attachment-এর ভিতর দিয়া right conduct and behaviour formed হয়, তবে নূতন নূতন instinct grow করানো যায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

"সমাজে যা'দের genius বলে, তা'দের কিন্তু growth ঠিকভাবে মোটেই হয় না। genius দেখায় inferiority complex-এর খেলা নিজেদের জীবনে! হয়ত কারো'পর ভয়ানক আক্রোশ আছে কিম্বা কোথায়ও কারো কাছ থেকে অনাদর, অবমাননা বা ঘৃণা পে'য়েছে,—এই আক্রোশে সে হ'যে উঠ্‌ল অদ্ভুত কর্ম্মী, দিনরাত গবেষণারত বৈজ্ঞানিক বা কঠোর দেশপ্রেমিক বা সমাজ-সংস্কারক। Tremendous activity-র দরুণ অনেক কিছু ক'রে গেল, অনেক কিছু শি'খে গেল, কিন্তু ঐ inferiority complex যখনই satisfied হ'য়ে যা'বে, তখনই activity ক'মে যা'বে—জীবনটা হ'য়ে যা'বে একটা শূন্য।

"Genius-রা যা' জীবনে পে'য়েছে বা জে'নেছে তা' next generation-এ কখনও transmitted হ'বে না। Body-র মধ্যে একটা tumour হ'লে যেমন হয়, genius-এর growth-ও তেমনি unhealthy. সাধারণতঃ মানুষ পারিপার্শ্বিকের ছাপ পড়ার দরুণ তা'র যে কি instinct তা' সে জান্‌তে পারে না। তা'কে বিভিন্ন complex-এর ভিতর দিয়ে অনেকটা তা'রই বুদ্ধি-মাফিক চল্‌তে হয়। এই রকম কর্‌তে কর্‌তে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়—কিছুতেই যেন মনে তৃপ্তি আসে না। শেষটায় গিযে instinct-এর গায়ে হাত পড়ে, আর অমনি সে tremendously active হ'য়ে ওঠে। যদি কাউকে কিছু দিতে হয় এই unconditioned instinct-এর সঙ্গে মিশ্‌ খাইয়ে। তবেই সে তা' গ্রহণ করে। নতুবা imposition-এর ঠেলায় বিদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্ব-ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রে'খে যদি কিছু দেওয়া যায়, তবে তা' অনায়াসে গ্রহণ কর্‌তে পারে। যাজনের সময় এদিকে আমাদের তীব্র দৃষ্টি রাখার দরকার। আর্য্যদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই instinct-এর উপর গ'ড়ে উঠেছে! এর ভিতর বিন্দুমাত্র hatred নাই, আছে elevation-এর law-কে একটা practical সামাজিক shape দেওয়া!"

আর এক দিনের কথা। সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে অনেকে উপবিষ্ট। একজন প্রশ্ন করিলেন—"আমরা জন্মাই বা কি ক'রে, আবার মরিই বা কি ক'রে?"

তিনি বলিতেছেন—"আমরা যখন মরি, একটা complex-এর water-tight compartment-এর ভিতর off হই, তখন আমরা অন্যান্য complex-এর হাত থেকে রক্ষা পাই। এই জন্য মরণের সময় আমরা ছোট-খাটো complex-এর হাত থেকে রেহাই পে'য়ে একটা বিশেষ কোন complex-এর বাক্স-বন্দী হ'য়ে off হই!" প্রশ্ন করা হইল, এ complex কেমন? তিনি বলিলেন—"ধরুন কাঁঠালের মতন! ভিতরের ভূষ্‌ড়ো হ'ল complex-এর মধ্যে instinct, আর কোষগুলি হ'ল ছোট-খাটো similar complexes যা'-নাকি main complex-এর মধ্যে instinct-কে আশ্রয় ক'রে বা support ক'রে আছে। Complex-এর মধ্যে যে instinct আছে তা'র আছে একটা tension যা'র জন্য সে ভালতে বা মন্দতে আসক্ত হ'চ্ছে। প্রত্যেকের instinct-এর গায় যখন হাত পড়ে, তখন সে হ'য়ে ওঠে tremendous. Libido যখন তাঁ'তে ligared হয় তখন এই instinct-ই একটা superior-instinct-এ পরিণত হয়। এই complex-মাফিক আমাদের শরীর ও মন হয়, tendency-ও তেমন তেমন grow করে। এইজন্যই প্রত্যেকের চেহারা তা'র কাছে সব চেয়ে সুন্দর। আর চেহারা দেখ্‌লেই ব'লে দেওয়া যায় কা'র কি complex বা instinct. যে-complex নিয়ে মানুষ জন্মে, তা' solved হ'য়ে গেলে সে ম'রে যায়। মরে যাওয়ার সময় যদি সে ইষ্টপ্রাণ ভাবের মধ্যে off হয়, তবে সে ইষ্টের একটা powerful viceroy হ'য়ে জন্মায়। সে জন্মে শুধু ইষ্টকে fulfil করার জন্য, নিজের কাজ তা'র কিছুই থাকে না।"

একজন কহিলেন—"ইষ্টকে আশ্রয় ক'রে আমাদের life-span বে'ড়ে যায় কি?" তিনি বলিলেন—"যদি libido ligared হয়, তবে life-span বে'ড়ে যায়। তবে সমস্ত শেষ ক'রে যদি কেউ আসে, তখন correct libido থাকা সত্ত্বেও death prevent করা প্রায়ই পারা যায় না! এ অবস্থায় with strong body and nerves নিয়ে ফিরে আসাই সাধকের পক্ষে উপকারী। নতুবা যা'দের strong body আছে তা'রা যদি ঠিক ঠিক মত এখানকার will-মাফিক কাজ করে তবে span of life prolonged হয় ব'লেই আমার ধারণা। সবাই তো তা'দের complex অনুযায়ীই চলে। সত্যি কথা যে আমি আপনাদের কাউকে বল্‌তে ভরসা

পাই না। তা'হ'লে সাম্‌লানো দায় হ'য়ে ওঠে! আগেকার দিনে সবাই যেমন নাম, ধ্যান ও কর্ম্ম কর্‌তো, আপনারা যদি তেমন মন নিয়ে লেগে যান, তবে এ মৃত্যু-স্রোতকে অনায়াসে রোধ কর্‌তে পারেন! এখন আপনারা যেমন চ'লেছেন আর একটু vigorously চল্‌লেই success অনিবার্য্য হ'য়ে পড়্‌বে। তবে আমি success-failure বুঝি না। আমি আজীবন struggle ক'রে আস্‌ছি death-এর হাত থেকে বাঁচ্‌বার ও বাঁচাবার জন্য, তা' ফল যা' হয় হোক, আপনারা আমার সহায় হ'ন।" * * * আবার বলিতেছেন—"নিতান্ত দুষ্কৃতকারীও—হোক্ না কেন সে দস্যু, প্রতারক, মাতাল—correct libido যদি তা'র থাকে আর মাল-মশলা মজুত থাকে, তবে সে একদিন দস্যু রত্নাকরের মতন মহর্ষি বাল্মিকীতে পরিবর্ত্তিত হ'বে।"

একদিন (১০ই এপ্রিল ১৯৩৬ সন) বিনতি-পাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের উত্তর ধারেব বারান্দায় অর্দ্ধশায়িত। তাঁহার কাছে অনেকে বসিয়া আছেন। বাহিরে বৃষ্টিপাত হইতেছে। সঙ্ঘভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র হালদার মহাশয় বাগেরহাট হইতে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন। প্রশ্নগুলি :—Theory of Evolution কি? মানুষের উৎপত্তি কি ভাবে হইল? তাহার পিতামাতার স্বরূপই বা কি? অমরত্ব ও স্মৃতিবাহী চেতনা কাহাকে বলে?

প্রশ্নগুলির উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন—"From the fine to the gross and from the gross to the fine—এই যে being-এর ক্রম-বিবর্ত্তন একেই evolution বলে! অর্থাৎ being-এর eternal becoming-কে evolution বলে! বৈষ্ণব-শাস্ত্রে একেই ব'লেছে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যলীলা! এই evolution চ'লেছে beyond বা environment যে stimulus দিচ্ছে being-এর উপর তা'র দরুণ! জীব তা'র environment-কে control, manipulate ও profitably manage কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে সৃষ্টির আদি থেকে, কারণ এই environment-ই দিচ্ছে তা'কে পদে পদে আঘাত এবং এর ফলেই হ'চ্ছে জীবের further progress towards superior becoming. সমস্ত জীবই অনবরত এই struggle কর্‌ছে environment-কে বশে আনার জন্য। এই struggle করার জন্য তা'দের শরীর ও মনের একটা পরিবর্ত্তন আস্‌ছে যা'র ফলে বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই তা'দের appearance-এর একটা palpable পরিবর্ত্তন দেখা যা'চ্ছে। এই পরিবর্ত্তন পরিষ্কার হ'য়ে ফু'টে উঠেছে তা'দের

descendants-দের ভিতর দিয়ে। কোন particular environment-কে manage করতে হ'লে শারীরিক বিধানের ভিতর যে যে পরিবর্ত্তন দরকার সেখানে তেমন পরিবর্ত্তন সবটাই দেখা দিয়েছে এবং মনেরও পরিবর্ত্তন এসেছে ঐ অনুপাতে। পূর্ব্বতন যা'রা struggle ক'রে ক'রে ম'রে গেল—হয়ত তা'দের জীবন environment-কে control করতে তেমনভাবে সক্ষম হ'ল না—তা'রা তা'দের ঐ মনের অবস্থা নিয়ে জন্মাল descendants হ'যে। Science ঐ আগের-টুকু স্বীকার করে। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মী আর্য্যেরা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার ক'রে ঐ জিনিসটাকে আরও ফুটিয়ে তুলতে চে'য়েছেন! এই ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা চলতে চলতে এক stage-এ ape-man-এ পৌছেছে। এর পরের থাকেই মানুষের সৃষ্টি। এমন-কি এখনও অনেক মানুষের ape-এর মত মুখ দেখা যায়, গায়ে লোমও ঠিক পশুর মতন! সৃষ্টি একই সময়ে হয়নি ব'লে এবং এখনও সমানভাবে চলছে ব'লে জীবের মধ্যে কতকগুলি মানুষ-অবস্থায় এসে পৌছে গেছে, কতক মানুষ-অবস্থার দিকে চলছে, কতক embryonic stage-এ এখনও আছে। মানুষ আমরা আস্তে আস্তে এই evolution-এর ফলে super-man-এ পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছি!"

অমরত্ব সম্বন্ধে বলিলেন,—"আমি চাই আমি কেন, বোধ হয় সবাই চায় স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে becoming-এর দিকে এস্তারভাবে progress করতে। তা' এই জীবনকে eternally prolong ক'রে যদি হয় তা' হোক বা একেরই বিভিন্ন শরীরের ভিতর দিয়ে হয় হোক্। এই শরীরটাকে বা আপনার এই বর্ত্তমান self-টাকে infinitely prolong ক'রে যদি এই স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে থাকতে পারেন ভাল, অথবা বার বার ক'রে যদি আসতে হয়, তাতেও আপত্তি নাই যদি এই স্মৃতিবাহী চেতনা আপনার মধ্যে as a continuous experience লেগে থাকে।"

একজন প্রশ্ন করিলেন—"এই স্মৃতিবাহী চেতনা থাকা মানেই তো এই সুখ-দুঃখের অনুভূতির রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি ক'রে সমস্ত দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার প্রতি-প্রত্যেককে জানা এবং তা'দের সঙ্গে relationship establish করা। তা'তে সুখও যেমন বে'ড়ে যা'বে, দুঃখও তেমনিভাবে বে'ড়ে যা'বে। তা'তে আর লাভ কি হল ?"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, সুখও যেমন বে'ড়ে যা'বে, দুঃখও ঐ proportion-এ বে'ড়ে যা'বে সত্য, কিন্তু দুঃখ ত' আমায় কষ্ট দিতে পারবে না। এই সমস্ত দুঃখের স্মৃতি experience হ'য়ে আমাকে becoming-এর পথে সাহায্য করবে। কারণ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান বাদ দিয়ে ত' চলাই নেই। আমার যত-কিছু চলনা—যা' জীবনের পর জীবন বেয়ে বর্ত্তমান

অবস্থায় এসে পৌঁছেছে—তা'তো ঘটনা-পরম্পরাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে, সমাধান ক'রে কতকগুলি pleasant experiences হ'য়ে আমার বর্ত্তমান আমিকে বা জীবনকে সব দিক দিয়ে enrich ক'রে তুল্‌ছে! সুতরাং দুঃখের স্মৃতিও আমার কাছে দুঃখের নয়কো, বরং আনন্দের খনি। এই দেহ নিয়েই যদি জীবের অমরত্ব-লাভ সম্ভব হয়, তবে অমরত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে infinite possibilities তা'র চোখের সাম্‌নে ভে'সে উঠ্‌বে এবং নূতন নূতন জগৎও তা'র experience-এ ধরা পড়্‌বে যাকে *ad-infinitum* অর্থাৎ চিরকাল ধ'রে explore ক'রে ক'রেও সে কখনও exhaust কর্‌তে পার্‌বে না।"

জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন বলিলেন—"ঠাকুর, সংসারে কত জনকে ত' কত রকম কর্‌তে দেখি, সবাই বলে কর্ত্তব্য কর্‌ছে, আমার যে কর্ত্তব্য কি তা' ত' ঠিক পাই না?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিলেন—"তোমার লক্ষ্য কি আগে বল। তবে ত' বলে দিতে পাবি তোমার কর্ত্তব্য কি। লক্ষ্য যদি তোমার চুরি করা হয়, তা'হ'লে চুরি কর্‌তে গেলে যা' করা দরকার তাই তোমার কর্ত্তব্য; তোমার লক্ষ্য যদি সংসার হয়, তবে ভালভাবে সংসার কর্‌তে গেলে যা' যা' করা প্রয়োজন তাই তখন তোমার কর্ত্তব্য; আবার তোমার লক্ষ্য যদি হয় ভগবান-লাভ, তা'হ'লে তাঁ'কে পে'তে হ'লে যা' করা উচিত তাই তোমার কর্ত্তব্য। বল লক্ষ্মী, তোমার লক্ষ্য কি? আগে লক্ষ্য স্থির কর, লক্ষ্য স্থির হ'লে সেই লক্ষ্যেতে পৌঁছাবার জন্য যা' করা আবশ্যক, জে'নো তাই সেই ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য।"

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ সৎসঙ্গের কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সর্ব্ব-বিভাগীয় কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সমুদয় ব্যাপারের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দিনের বেলায় আহারাদি করিতে কোন কোন দিন একটাও বাজিয়া যায়, রাত্রেও অনেক দিনই বারটার পূর্ব্বে নিদ্রা যাইতে পারেন না,—তারপর কাহারও কোন গোপনীয় কথা থাকিলে তাহা শুনিতে শুনিতে সে রাত্রে ঘুমাইবারই আর সময় পান না। এই বিশ্রামহীন কার্য্যক্রম যেমন সুস্থ শরীরে তেমনি অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহাকে নিয়ত চালাইতে হইতেছে। এজন্য কেহ কোন দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি তাঁহাতে লক্ষ্য করেন নাই। কতবার তাঁহার গুরুতর পীড়ার সময় দেখিয়াছি, চিকিৎসকের পরামর্শমত তাঁহাকে লোকসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ করা হইলে তিনি কত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া-

ছেন! রোগ-যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন এমন অবস্থায়ও পরের অভাব, অভিযোগ, ব্যথা দূর করিবার তাঁহার কি আকুলি বিকুলি তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

শিষ্য, আগন্তুক, অতিথি—যখনই যিনি আশ্রমে উপস্থিত হন—হাসি, উপদেশ, সান্ত্বনা কত-না-প্রকারে তিনি তাঁহাদিগকে আশা-উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন! তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের কাছে পরিচিত অপরিচিত বলিয়া কোন বিচার নাই। প্রত্যেকেই যেন তাঁহার কত আপন—কতদিনের পরমাত্মীয়! নবাগত কেহ আসিলে নিতান্ত প্রাণপ্রিয় সুহৃদের মত সস্নেহে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রথম-পরিচয়-মুহূর্ত্তের সেই অপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও সুমধুর "দাদা" সম্বোধনটী জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিবেন না। নানা পর্ব্বোপলক্ষে দেশবিদেশের সৎসঙ্গী ভ্রাতৃগণ, মাতৃবৃন্দ ও আগন্তুক-অভ্যাগতগণের কলকোলাহলে সারা আশ্রম মুখরিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কয়দিন একমুহূর্ত্তও অবসর থাকে না। সকলে তাঁহার চরণপ্রান্তে তাঁহাদের স্ব-স্ব ব্যথা, বেদনা, অবসাদ ও নৈরাশ্যের কথা নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া নিবেদন করেন; আর তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশ-বাণী লাভ করিয়া তৃপ্ত, আনন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া গৃহে গমন করেন। এইভাবে কতকাল ধরিয়া নিত্য তিনি সহস্র সহস্র নরনারীর সেবা করিয়া তাঁহাদের অন্তর-রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অপরের দুঃখ তিনি কতখানি সত্যিকারের হৃদয় দিয়া অনুভব করেন, তাহা কাহারও যে-কোন ব্যথা, দৈন্য ও অভাব-অভিযোগ লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। শুধু ফাঁকি কথা বলিয়া বা মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না। যাহাতে বিপন্ন ব্যক্তির ব্যথা-বেদনার আশু প্রতীকার করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় কাজে লাগিয়া যান। প্রত্যহ প্রকাশ্যে ও গোপনে কত জনকে যে তিনি অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, খাদ্য, ঔষধ, পথ্য ও নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করতঃ বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাহার অবধি নাই। কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়েন, সে সম্বন্ধে অনেক দিনের একটী ঘটনা বলিতেছি। ১৯৩০ সনের গ্রীষ্মাবকাশ, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বেলা প্রায় দশ ঘটিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর তৎকালীন লাইব্রেরী-ঘরের সম্মুখে বাবলা-তলায় আসিয়া
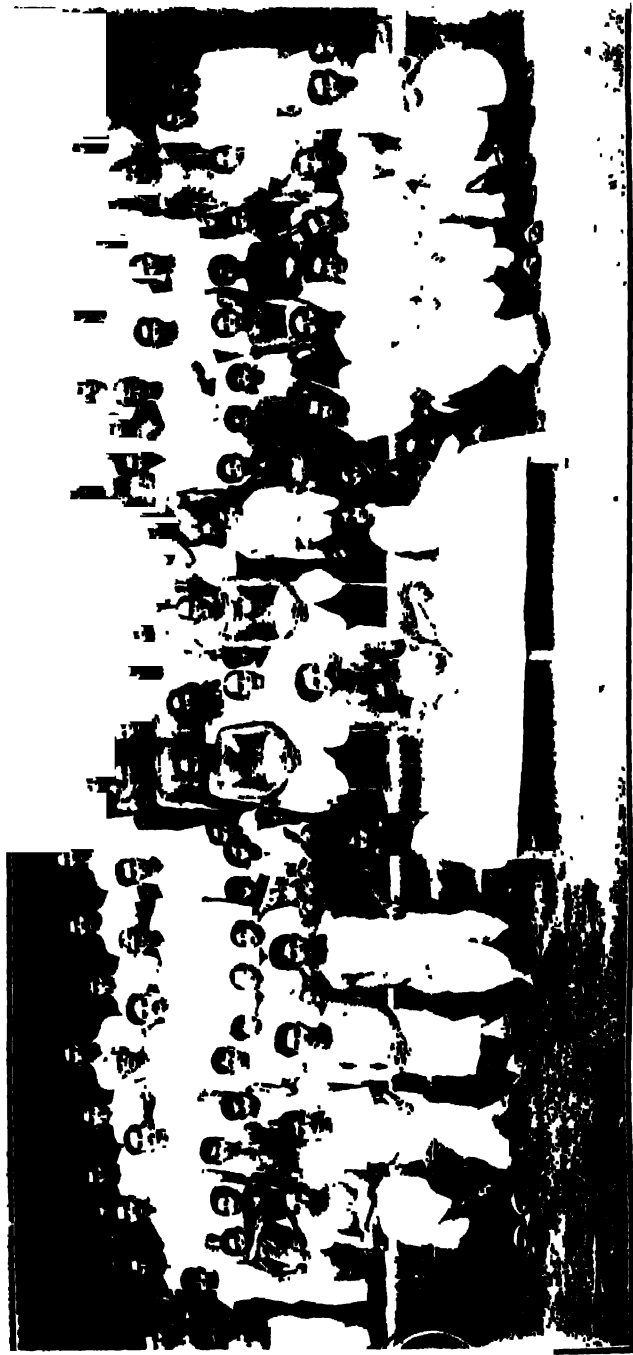
পরিবার ও শিষ্যবর্গ-পরিবৃত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রথম লাইনের বামদিক হইতে—মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিবেকরঞ্জন

মধ্যস্থলে—জননীদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁহার পার্শ্বে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও কনিষ্ঠা কন্যা. বামে ও পশ্চাতে শিষ্যগণ

দাঁড়াইয়াছেন, জীর্ণবেশধারী এক ভিক্ষুক নিতান্ত করুণকণ্ঠে তাঁহার নিকট একখানা কাপড় চাহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি ভিক্ষুকের গাত্রস্থ ছিন্ন মলিন দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্রখণ্ড লইয়া পরিধান করিলেন এবং নিজের পরিধেয় সুন্দর পরিচ্ছন্ন বস্ত্রখানি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। ভিক্ষুক শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, সে বলিল—"না, না,—এরকম ক'রে ন্যাঙটা হ'য়ে আপনাকে কাপড় দিতে বলি নাই।" বিস্ময়াবিষ্ট দরিদ্র ভিক্ষুক আর কিছু বলিতে পারিল না। নির্ব্বাক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল! দয়ার এরূপ বাস্তব কাহিনী তাঁহার জীবনে নিত্যই কত ঘটিতেছে!

কিছুদিন পূর্ব্বের ঘটনা। ৯ই এপ্রিল ১৯৩৭ সন। সকালবেলা বিনতি-পাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলান্থ্রপি কার্য্যালযের সম্মুখে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট, নিকটে একটী ভাই দণ্ডায়মান। অনেক দিনের শিষ্য তিনি। পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মালিক ছিলেন, বুদ্ধির দোষে সব হারাইযা, এখন ছেলেমেয়ে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইযাছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটী ভাইকে ডাকিযা বলিলেন,—"দেখুন দাদা, মানুষের যে কখন কি অবস্থা হয় বলা যায় না। এর এক সময় কত টাকা-কড়ি ছিল, সবই কপালের ফেরে হারিয়েছে, বউ মারা গিয়েছে কয়েক মাস হ'ল, ছেলেপুলে রোগে শয্যাগত। আপনারা কয় জনে মিলে এর জন্য একটা ফণ্ডের ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫৲ টাকা ক'রে নিন্। আপনি ব্রহ্মদেশে এবং অন্যেরা এদেশে চেষ্টা করুন। এই টাকা দ্বারা তা'কে একটা ব্যবসা জু'ড়ে দিতে পারলে খুবই ভাল হয়।" শ্রীশ্রীঠাকুর এই সকল কথা নিকটে উপবিষ্ট আর একটী ভাইকেও বুঝাইয়া বলিলেন। তাহাতে সেই ভাইটী বলিলেন,—"ব্যবসাটা আশ্রমেই আপনার direct supervision-এ ক'রে দিতে পারলে বোধ হয় এঁর বেশী সুবিধা হ'ত।" এই কথা শুনিবা মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"না, তা' ভাল না, এত টাকার মালিক একদিন ছিল এ, এখন হ'য়ে গিয়েছে একেবারে নিঃস্ব, একটা inferiority complex লেগেই আছে। এখানে এসে পদে পদে এত লোকের মধ্যে কাজ করতে গেলে এই complex-এ লাগ্‌বে আঘাত—আর পা'বে বেদনা। তা'র চাইতে দূরে গিয়ে আপাততঃ কাজ করা ভাল। তারপর সময় হ'লে বা সুবিধা পে'লে এখানে আসতে পার্‌বে।" মানুষের কতটুকু মন বুঝিয়াই না তিনি চলিয়া থাকেন!

পারিপার্শ্বিক, শিষ্য, পরিজন সবারই জন্য কতটুকু তিনি ভাবেন, একদিনের তাঁহার সামান্য দুইটী কথায় তাহার একটু আভাস দিতেছি। জননীদেবীর অসুখের সময় তাঁহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুণেন্ বাবু আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত একদিন বিকালে পদ্মার ধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনি প্রায়শঃ ফেরেঞ্জাইটিসে যেমন ভোগেন তা'তে আপনার পক্ষে "সৎসঙ্গ ভবনের" দ্বিতলে বাস করিলে ভাল হয়।" শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন,—"ডাক্তারবাবু, আমার পক্ষে উপর-তলায় ওখানে permanently থাকা একটু মুস্কিল। আমার মনে হয়, আমাকে যা'রা ঘিরে আছে তা'রা নিতান্ত শিশু, খুবই অসহায়। আমি সব সময় তা'দের মধ্যে না থাক্‌লে ঝড়ে, ভূমিকম্পে বা অন্য কোন আকস্মিক বিপদপাতে তা'রা না-জানি কত helpless হ'য়ে পড়্‌বে। কতগুলি বিষয়ে আমার যেন কেমন-একটা nervousness আছে। মাঝে মাঝে আমার মনে উঠে, যেন কত বন্দুকধারী শিকারী কতকগুলি নিরীহ প্রাণীকে বধ কর্‌তে ছু'টেছে, আর তা'দের পরিত্রাহি চীৎকার এসে আমার বুকে শেলের মত বিঁধ্‌ছে। এ এমনি সত্যি ব'লে বোধ হয় আমার কাছে যে, এতে আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়! যা'দের দিয়ে আমি, এবং যা'রা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, তা'দিগকে একটু অস্বস্তির ভিতব রে'খে যেন আমার কিছুতেই শান্তি আসে না। তা'দের কোন প্রকারে এতটুকু কষ্ট হ'লে যেন আমার বুকে সে কষ্ট ভীষণভাবে লাগে। কখন তা'দের কোন্ বিপদ ঘটে সর্ব্বদা এই আশঙ্কাই আমার প্রাণে জাগে। আমার নিজের কথা ভাব্‌ব কখন?"

শ্রীশ্রীঠাকুর কাহাকেও নিজের থেকে পৃথক ভাবিতে পারেন না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কষ্টকে তিনি নিজেরই কষ্ট বলিয়া অন্তরের সহিত বোধ করেন, এবং তাহা দূর করিতে অস্থির হইয়া পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে একদিন বলিতেছিলেন—"নিজের জন্য যেন কিছু কর্‌তে পারি না, নিজের জন্য কিছু ভাব্‌তে পারি না। আলাহিদা আমার একটা উন্নতি, সুখ-স্বচ্ছন্দতা—ইত্যাদি ধারণা মাথায় আসে না। কোন অবস্থায়ই দুনিয়া হইতে পৃথকভাবে আমার স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব-বোধ এবং তা'র জন্য কিছু করা এই বুদ্ধি আন্‌তে পারি না।" আর একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"আপনাদের আমার মনে হয়, আমারই মাংসের দলা। মাঝে মাঝে অভিমান হয় আপনাদের ভাব দে'খে কিন্তু তা'তে যেন আরও

বেশী যুক্ত হ'য়ে পড়ি, সহানুভূতি আসে ব'লে। আমার মন আমার হাত-পাকে যেমন ক'রে খাটায় আপনাদেরও তেমনি ভাবে খাটিয়ে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয়। আপনাদের আমি আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারি না, তাই ত' কেউ আমাকে না-চাইলেও তা'কে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

কাহারও শরীর অসুস্থ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ছট্‌ফটানি! প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ লইতে থাকেন, রোগী কেমন আছে। কাহারও পীড়ার সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ-নির্ব্বাচনে রাত্রিদিন কত ব্যস্ত থাকেন, ঔষধ ও পথ্যের জন্য কত অযচ্ছল অর্থব্যয় করেন। রোগী যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না উঠে তিনি কেমন পাগলের মত থাকেন—তাহা শত শত সহস্র সহস্র ঘটনায় সর্ব্বদা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। একবার জনৈক সঙ্ঘভ্রাতা অসুস্থ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জন্য কলিকাতা হইতে 'অক্সিজেন জেনারেটার' আনিতে বলেন। যে ব্যক্তির উপর অর্থাদি-ব্যয়ের ভার ছিল, তিনি তখন অর্থের অসচ্ছলতার দরুণ বলিয়াছিলেন,—'অক্সিজেন জেনারেটার' আনিতে ৮০।৯০্ টাকা লাগিবে, এত টাকা ব্যয় করিয়া ইহা আনিয়া কি দরকার? শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বিচলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি, পাঁচশত টাকা লাগিলেও যে তাহা আনিতেই হইবে,—প্রাণের কাছে অর্থ কোন্ ছার!"

আশ্রমবাসী একটী মহিলা সন্তান-প্রসবান্তে মরণাপন্ন অসুস্থ হইয়া পড়েন। শয্যাগত-অবস্থায় পাঁচ ছয়দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। এই কয়দিন পাবনা ও কুষ্টিয়ার বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার আনাইয়া, প্রত্যহ কলিকাতা হইতে ঔষধপত্র সরবরাহ করিয়া এবং নিজে সর্ব্বক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রম করতঃ চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তারগণকে উপদেশ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কি ভাবে তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। সৎসঙ্গ-কর্ম্মীদিগের তখনও দুইবেলা আহারের সংস্থান হয় নাই। এমতাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ চারি শতাধিক টাকা এই চিকিৎসা-ব্যাপারে ব্যয় করিয়াছিলেন। রোগীমাত্রকেই সত্বর সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য কত পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তাই যে তিনি করিয়া থাকেন, তাহা না দেখিলে ধারণা করা অসম্ভব।

দরদী-তিনি অতীন্দ্রিয় ভূমিতে বিচরণ করিয়াও সর্ব্বক্ষণ কত অসংখ্য লোকের কত রকমে সাহায্য করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুজনের

প্রত্যক্ষ-অনুভূত সে-সমুদয় অসংখ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠকসাধারণের নিকট অলৌকিক বলিয়া অনাদৃত হইতে পারে মনে করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বকই এ-গ্রন্থে এতাদৃশ আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত রহিয়াছি। বস্তুতঃ অলৌকিক বলিয়া কিন্তু জগতে কিছুই নাই। 'কোন বিষয়ের কারণ জানা না থাকিলেই তাহা লোকের নিকট অলৌকিক বলিয়া গণ্য হয়। যা'হোক, কথায় কথায় একদিনের একটী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দান করিতেছি, আশা করি পাঠকবর্গ তাহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিবেন। গভীর রাত্রি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার খড়ের বড় ঘরখানিতে তক্তপোষে উপবিষ্ট হইয়া একরূপ আবেশের সঙ্গেই সেদিন নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। কথাগুলির ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা এমনই জীবনীয় যে, উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শুনিয়া যাইতেছিলেন। সময় সময় অনুভূত বিষয়গুলি ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা যেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিতান্ত ব্যাকুলতার সহিত এবং বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক খুঁজিয়া লইয়া প্রকাশ করিতেছিলেন। তা'র একটী কথার ধরণ বিচ্ছিন্নভাবে এখনও একটু একটু মনে পড়ে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ যেন বলিয়া উঠিলেন—"কেমন হয় জানেন ? যেমন mento molecular arrangement of the brain-cells…" বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই বলিলেন,—"হাঁ, কি-না বল্‌ছিলাম কেষ্টদা ?" কৃষ্ণদা পূর্ব্বোক্ত কথার যোগসূত্র ধরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এমন তন্ময় হ'য়ে কথা ব'লে যা'চ্ছিলেন, হঠাৎ মাঝখানে এরূপ অন্যমনস্কতার কারণ কি ?" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্বমাধুর্য্য-মণ্ডিত প্রশান্তবদনে মৃদুহাস্যে বলিলেন—"আসন-টলার কথা শু'নেছেন ?" কৃষ্ণদা বলিলেন—"সে কেমন ?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"শুনেন নাই সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা ? সমস্ত দিনের কর্ম্মের অবসানে সবে তখন অপরাহ্ন সময়ে অন্নগ্রহণ কর্‌তে ব'সেছেন, রুক্মিণীদেবী পাখা লইয়া বাতাস ক'চ্ছেন, প্রথম গ্রাস অন্ন মুখে দিতে যা'বেন, এমন সময় ব'ল্লেন—'আর বুঝি আমার খাওয়া হ'ল না, আমার যে ডাক প'ড়েছে।' তাড়াতাড়ি অন্ন পরিত্যাগ ক'রে তিনি গৃহ হ'তে বহির্গত হ'লেন। সেদিন পঞ্চ-পাণ্ডবের মহা দুর্দ্দিন, দুর্ব্বাসার অভিশাপে কা'রও রক্ষা পা'বার উপায় নাই। বিপদ বু'ঝে দ্রৌপদী আর্ত্তকণ্ঠে বিপদ-বারণের নাম স্মরণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সে আকুল-আহ্বান তাঁ'কে চঞ্চল ক'রে তুল্‌ল। তিনি মুখের গ্রাস ফে'লে তখনই সে স্থানে এসে উপস্থিত হ'লেন।" কৃষ্ণদা প্রশ্ন করিলেন—"এখানে কিসে আপনাকে অন্যমনস্ক কর্‌ল।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"এক বিধবা মা বাড়ীতে একা থাকেন, এক দুর্ব্বৃত্ত তাঁ'রই অপেক্ষায়

সমস্ত রাত্রি সেই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে ছিল। মা-টী প্রস্রাব করতে উঠেছিলেন, এই ঘোর দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে লোকটা মা-টাকে টেনে নিয়ে যা'চ্ছিল। দেখলাম কি লোকটার French-cut কাঁচা-পাকা দাড়ি, চক্ষে সোণার চশমা, মা-টী ব্যাকুলকণ্ঠে সাহায্যের জন্য চীৎকার ক'চ্ছিল। যখন গেলাম তখনই মায়ের হাত ছে'ড়ে দিয়ে লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছু'টে পালিয়ে গেল। সোণার চশমা একটা কাণে ঝুলছে, একটা কোথায় প'ড়ে গেছে, silk-এর চাদরখানা একটা কাঁটা-গাছের গায় খানিকটা ছিঁড়ে রইল, আর পায়ের লপেটা জুতো একখানা কাদায় আটকে রইল,… ..পালিয়ে গেল কেষ্টদা।" কৃষ্ণদা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই world of events কি সব আপনার নজরে আছে? নজর থাকা কি সম্ভব? কারণ simultaneously-ই ত' বহু-সংখ্যক events ঘটিয়া যাইতেছে, তাহা আপনার দৃষ্টিগোচরে থাকা সম্ভব কি ভাবে?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"কোন event-ই simultaneously হ'চ্ছে না। একটা event-এর stagnant period-এ আর একটা event-এর expansion, তা'র stagnant period-এর মধ্যে আর একটার expansion, এইভাবে world of events চলছে। যাহা আপাতদৃষ্টিতে simultaneous বলিয়া বোধ হয় তা' কিন্তু মোটেই simultaneous নয়।" কৃষ্ণদা প্রশ্ন করিলেন—"তা' যদি হয় তা'হ'লে বিশ্বের সকল ঘটনাই ত' আপনার জানার মধ্যে র'য়েছে। তবে বিশেষ ক'রে আসন-টলার মানে কি?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলছি। ধরুন, আপনাতে আমাতে একটা ট্রেণের জানালার ধারে ব'সে গল্প করতে করতে যা'চ্ছি। আমাদের গল্পও চলছে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দৃশ্যাবলী—সেগুলিও যে নজরে নাই তা' নয়,—কিন্তু হঠাৎ রেলের লাইনের ধারেই একটা বাড়ীতে আগুন লে'গেছে দেখা গেল, তখন কিন্তু আমাদের সমস্ত attention-টা ঐ দিকেই গিয়ে প'ড়েছে, গল্পও থেমে গিয়েছে। এই world of events-এর এক-একটা event ঐ রকম বিশেষভাবে attention draw করে।"

এই পরদুঃখকাতরতা যেমনি মনুষ্যের প্রতি তেমনি ইতরপ্রাণী ও উদ্ভিদাদির প্রতিও সমভাবে তিনি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আশ্রমের কুকুর-বিড়ালগুলি পর্য্যন্ত অসুস্থ হইলে, রোগনির্ণয় করিয়া ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করত. যথাসম্ভব চিকিৎসাধীনে রাখিয়া, ইহাদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিতে কত চেষ্টা করেন! কীটপতঙ্গ, পিপীলিকাদি মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইহাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য কেমন অস্থির হইয়া পড়েন! তাঁহার সম্মুখে কেহ কোন

জীবের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইলে বা দেহে সামান্য আঘাত প্রদান করিলে তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করেন এবং তাহার দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হন। একদিনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ১৩২৬ সনের চৈত্র-সংক্রান্তি দিবসে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী শ্মশান-ভূমিতে এক তান্ত্রিক সাধক ছাগশিশু বলিদ্বারা পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ছাগ-শিশুটীর ক্রন্দন শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। অসহায় প্রাণীটীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া ছাগশিশুটীকে বলি না দিয়া অন্য উপচারে পূজা সম্পন্ন করিবার জন্য বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে কত প্রার্থনা জানাইলেন। সন্ন্যাসী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ক্কশ ভাষায় তাঁহার মিনতিপূর্ণ করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। এমন সময় জননীদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে হস্তধারণপূর্ব্বক বাড়ী লইয়া গেলেন। মায়ের কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তর-খানা নিদারুণ ব্যথায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইযা উন্মত্তের মত সেইদিন অন্ধকার রাত্রিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই তীব্র মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া নফরচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক সজ্ঘভ্রাতা ছাগশিশুটীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। এমন সময় গ্রামবাসী অনেকেই এই ঘটনা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তির জন্য এই পূজার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহাকে সমুদায় বিষয় বুঝাইযা বলিয়া সন্তুষ্ট করতঃ ছাগশিশুর মূল্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ দান করিয়া বিদায় করা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ছাগশিশুটীকে পাইয়া, ইহাকে কোলে লইয়া মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, মনে হইল সন্তান-হারা মা যেন কত দিনের পর তাহার অঞ্চলের হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

আর একটী ঘটনা বলিতেছি। ৮ই মার্চ্চ ১৯২৪ সন। শ্রীশ্রীঠাকুর জননীদেবীর গৃহের বারান্দায় একখানা তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন। অল্প অল্প রৌদ্র উঠিয়াছে, অল্প অল্প শীত আছে। অদূরে বিশাল পদ্মানদী এবং নিকটেই বিস্তৃত চর। নদীর জল কমিয়া গিয়াছে, মাঝে কতদূর প্রকাণ্ড খালের মত, তা'র পরেই নূতন চর পড়িয়াছে। দুইটী চকাচকি পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, একজন নিষ্ঠুর শিকারী পাখী দুইটীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিল। গুলি ডানায় লাগিলেও পাখী দুইটী উড়িয়া

গেল এবং অনতিদূরে চরে গিয়া বসিল। এই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং যাঁহারা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়! পাখী দু'টীকে মার্‌ছে বোধ হয়, আমি অসহায়, কি কর্‌তে পারি, আমার যে কোন ক্ষমতাই নাই,"—এইরূপ বলিতে বলিতে গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং কাতর-নয়নে চরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পাখী দুইটীর প্রতি নিষ্ঠুর শিকারী দ্বিতীয়বার গুলি করিল, এরূপ শব্দ শ্রুত হইল। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং "হায়, হায়, মর্‌ল রে উঃ উঃ—" বলিতে বলিতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারই নিজ বক্ষে যেন সেগুলি বিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ তীব্র যন্ত্রণাবোধে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিম আভা ধারণ করিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—আহতের ন্যায় মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন।

আর একদিনের একটী ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ বাড়ী হইতে কাশীপুর গ্রামের দিকে যাইতেছিলেন, সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। তখন বর্ষাকাল। যাইতে যাইতে দেখিলেন রাস্তায় জলস্রোতে বহুসংখ্যক কীট ভাসিয়া যাইতেছে। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া অতি যত্নে কীটগুলিকে একটী একটী করিয়া মাটীর উপর তুলিয়া দিতে লাগিলেন, আর সঙ্গীয় সবাইকে কাতরকণ্ঠে বারবার অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দাদা! পোকাগুলিকে বাঁচিয়ে দিন না?" সকলে মিলিয়া বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া পোকাগুলিকে উদ্ধার করিলে, তিনি শান্ত মনে পথ চলিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেরই অন্তরে এই দয়াবৃত্তির উদ্বোধন করিবার জন্য তিনি বলিয়া থাকেন,—"যতদিন তোমার শরীরে ও মনে ব্যথা লাগে ততদিন তুমি একটী পিপীলিকারও ব্যথা-নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রে'খো, আর তা' যদি না কর, তোমার চাইতে হীন আর কে?"

আর একটী ব্যাপারের কথা বলিতেছি। তখন বাঁশের মাচাং-এর পায়খানায় শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা করিতেন। সেখানে ময়লার গামলায় অনেক সময় গুব্‌রে পোকা পড়িয়া থাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় বসিয়াই সর্ব্বপ্রথম নীচের দিকে চাহিয়া দেখিতেন, কোন গুব্‌রে পোকা আছে কি না। যেদিন পোকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন, সেদিন আর

তাঁহার পায়খানা করা হইত না। অমনি নামিয়া আসিয়া পায়খানার পশ্চাৎ দিকে যাইয়া পোকাগুলিকে তুলিতে আরম্ভ করিতেন। সবগুলিকে উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত তাঁহার অস্বস্তির ভাব কিছুতেই দূর হইত না। একে একে পোকাগুলি সব গামলা হইতে তোলা হইলে পর তিনি তৈল মাখিয়া পদ্মায় স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিতেন। যেদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা হইতে আসিয়া তৈল চাহিতেন, বুঝা যাইত সেদিন তিনি গুব্‌রে পোকার উদ্ধার-সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। একদিন কি বিষয়ে গুব্‌রে পোকার কথা উঠিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই সুন্দর একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। কথায় কথায় তাহা না বলিয়া পারিলাম না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছিলেন—"দেখুন, ভগবান্ এই পোকাগুলোকে কত শক্তি দিয়েছেন, যখন উ'ড়ে আসে, মনে হয় যেন একখানা এরোপ্লেন আস্‌ছে, আবার গায়ে এমন তৈলাক্ত পদার্থ দিয়েছেন যাতে কোন রকম ময়লা-মাটী না লাগ্‌তে পারে। কিন্তু যখন এরা গুয়ের গামলায় পড়ে তখন ভু'লে যায় তা'দের গায়ের এত শক্তি, ভুলে যায় একটু ঝাড়া দিলেই ময়লাগুলো সব খ'সে যায়। সেই গাম্‌লায় প'ড়ে হাবুডুবু খে'য়ে মর্‌বে সে-ও স্বীকার, তবুও তা'র নিজের শক্তি ও সম্পদ সম্বন্ধে একটুও conscious হ'বে না। মানুষেরও কিন্তু সেই একই অবস্থা। সংসারে থেকে দুঃখ-দৈন্যে বিব্রত হ'য়ে মানুষ ভুলে যায় যে, সে পরমপিতার সন্তান, শক্তির তনয়—ইচ্ছা-কর্‌লেই দুর্দ্দশার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পে'তে পারে; কিন্তু মানুষ তা ভা'বে না, নিজেকে অক্ষম ও দুর্ব্বল ভে'বেই সাবাড় হয়।" যাক্, যাহা বলিতেছিলাম।

বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আশ্রমের অনেক ঘরবাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বদাই সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন, বৃক্ষাদি যতদূর সম্ভব না কাটিয়া গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর কত চেষ্টা করেন। ঘরের ফাঁকে ফাঁকে আনাচে-কানাচে বারান্দার ধারে যেখানে যে ভাবে যতদূর সম্ভব গাছ-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তিনি ঘরগুলি তুলিয়া থাকেন। কেহ তাঁহার অজ্ঞাতে কোন বৃক্ষাদি ছেদন করিলে তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঝড়ে কোন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া গেলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বৃক্ষের সেই ক্ষতস্থানে মাটী, গোময়, খড় প্রভৃতি দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া এবং তাহাতে নিয়মিত জলসেচ করিয়া ক্ষতস্থানটী নিরাময় করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়া থাকেন! বৃক্ষদেহস্থ ক্ষতটিকে যেন তিনি নিজ অঙ্গের ক্ষত বলিয়াই মনে করেন। একদিন কথায় কথায় বলিতেছিলেন—"এক সময় দাঁতনকাঠি ভাঙ্‌বার সময় আমার

মনে হ'ত যেন সত্যি সত্যি আমারই আঙ্গুলটাকে মট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্লাম, তখন থেকে মাটি দিয়ে দাঁতন কর্ত্তাম।" তাঁহার স্নায়ু এমনই সূক্ষ্ম ও সাড়া-প্রবণ যে তাঁহার সম্মুখে কেহ কোন বৃক্ষাদি ছেদন করিলে বা ইহার শাখা, পত্র, পুষ্পাদি ছিন্ন করিলে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণে ভীষণঃ ভাবে আঘাত করে।

শিশু, যুবক, স্ত্রী, পুরুষ সকলের প্রতি কেমন অগাধ আপ্রাণ তাঁহার ভালবাসা! পুত্র-কন্যা আপন পিতামাতার নিকট যে আদর না পায়, স্ত্রী আপন স্বামীর নিকট যে মমতা না পায়, স্বামী নিজের স্ত্রীর নিকট যে যত্ন না পায়, প্রত্যেকে তাঁহার নিকট তাহা শতগুণ অধিক লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেকের অন্তরের সঙ্গে তাঁহার এমনই নিবিড় প্রেমের অটুট বন্ধন যে, আশ্রমবাসী বালক-বালিকারা সত্যই মনে করে পিতামাতা কাছে না থাকিলেও বরং তাহাদের চলিবে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর-ছাড়া তাহাদের একদিনও চলিবে না; প্রত্যেকটী নারীর ধারণা, শ্রীশ্রীঠাকুর-ভিন্ন তাহাদের দুঃখ বুঝিবার তেমন দরদী আর কেউ নাই; তেমনি প্রত্যেক পুরুষই ভাবেন,—স্ত্রীপুত্র হইতে দূরে থাকা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর-ছাড়া এক নিমেষও চলা কল্পনারও অতীত!—তাঁহার মত আপনার জন যে এ দুনিয়ায় আর কেহই নাই।" প্রত্যেকেই যাহার যত গোপন-কথা, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, মান-অপমান, বিপদ-আপদ, সন্দেহ-সমস্যা—যত-কিছু তাঁহার কাছে মনের কপাট উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তিনিও তাঁহাদের স্ব-স্ব অভাব, চাহিদা ও অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যেককে তাঁহার সমস্যা-নিচয়ের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের উপায় বলিয়া দিতেছেন। তাঁহার সেবাযত্নে ব্যাধিগ্রস্ত নির্জীব দেহ ও মনে প্রাণের নব স্পন্দন অনুভব করিতেছে। পুত্র-শোকার্ত্ত তাঁহার সঙ্গ করিয়া পুত্রশোক ভুলিতেছে, স্বামীহীনা স্বামীর অভাব অম্লানবদনে সহ্য করিতেছে। প্রত্যেকের মর্ম্মন্তুদ ব্যথায় তিনি সমবেদনার স্নেহশীতল স্পর্শে শান্তির প্রলেপ দিতেছেন।

ব্যক্তি-বিশেষের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাঁহাদের গোপনীয় কত ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত অপূর্ব্ব সমাধান-বাণী বাস্তবিকই রসহ্য-পূর্ণ, অতীব বিচিত্র এবং তাহা জীবন-চলনার অপূর্ব্ব পাথেয়! সেই সমুদয় গুহ্য বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে অক্ষম। যা'হোক, দুইজন ইষ্টভ্রাতার নিকট

শ্রুত, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটী ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যথা :—

১৬ই মার্চ্চ ১৯২৮ সন। শ্রীশ্রীঠাকুর আহারাদি সারিয়া শয়ন করিতে গিয়াছেন। একটী ভাই বাড়ীতে স্ত্রীর ব্যবহারে নিতান্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া তাঁহাকে গিয়া বলিতেছেন—"ঠাকুর, আমার কথা কি বল্‌ব? তা'র দুর্ব্ব্যবহারে একেবারে জ্বালাতন হ'য়ে গেলাম। স্ত্রীটা কিরূপ অকৃতজ্ঞ, সে পরমানন্দে আহার নিদ্রা সম্পন্ন ক'চ্ছে, আমি কি খাচ্ছি, কোথায় আছি, একবার জিজ্ঞাসাও করে না। মনটা রোষে, ক্ষোভে বিষাক্ত হ'য়ে উঠে, মনে হয় উহাকে মার্‌তে মার্‌তে খুন করি বা নিজেই মরি।" শ্রীশ্রীঠাকুর নিবিষ্টচিত্তে সমুদয় শুনিয়া বলিলেন—"আপনার পা'বার আশা আছে ব'লে না-পাওয়াতে এই কষ্ট; অতএব পা'বার আশা ত্যাগ করুন। অন্য লোককে পা'বার আশা রহিত হ'য়ে যেমন অর্থ-সাহায্য করেন, সেইরূপ ভাবে উহাকেও প্রতিপালন করুন,—noble revenge লউন। সক্রেটিস্ স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহার যেমন অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তেন, সেইরূপ করুন।" তিনি বলিলেন—"আমি ত পা'চ্ছি না, আমি সক্রেটিস্ নই, উহার ব্যবহারে আমি দুইবার আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলাম, আপনার ডাক পড়ায় আমি চ'লে এসেছি, নতুবা কি কর্‌তাম জানি না।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"দ্বেষও একরূপ attachment. আপনি indifferent হ'য়ে থাকুন। Indifferent থাকাই ভাল। বাপান্ত কর্‌লে এমন-কি পরপুরুষ কর্‌তে দেখ্‌লেও অনেক সময় indifferent হ'য়ে থাকা ভাল; ইহাতে অনেক স্থলে ভাল ফল দেখা গিয়েছে।" ভাইটী জীবন-চলনার একটা নির্দ্দিষ্ট পথ পাইয়া তদবধি তদনুযায়ী চলিতে লাগিলেন।

আর এক জনের কথা। প্রথম জীবনে তাঁহার চরিত্রে নানা দোষ ছিল। যৌবনসুলভ অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া এখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আছেন। তাঁহার পরিবারেও নানা অশান্তি এবং কলহ-বিবাদ লাগিয়াই আছে। নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তিনি একদিন (৩১শে বৈশাখ ১৩৪৫ সন) শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। মনের দুঃখে শ্রীশ্রীঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর, আমি আর পারি না, আমার একটা ব্যবস্থা করুন। কতভাবে কত চেষ্টা ক'রেছি, বাড়ীতে আমার কথা কেউ শুনে না। দিবারাত্র এমন অগ্রাহ্যের ভাব, আর প্রতি বিষয়ে এমন ঝগড়া, বিবাদ ও অশান্তি আমি সহ্য কর্‌তে পারি না। সংসারের জ্বালায় সঙ্ঘের কাজকর্ম্মও মন দিয়ে কর্‌তে পারি না। আপনাকে আর কত বিরক্ত কর্‌ব? একবার

ভাবি, দুঃখের প্রলাপ গাইতে আর আপনার নিকট আস্‌ব না, কিন্তু না এসেও যে পারি না, এ ব্যর্থ দুর্ব্বহ জীবনের কথা আর কা'র কাছেই বা কইব?" শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোকে কত বারই ত' ব'লেছি, তুই কথা শুনিস্‌ না, তা'র কি কর্‌ব।" ভাইটী তখন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ঠাকুর, আর আমি অবাধ্য হ'ব না, যেমনটী বল্‌বেন পালন কর্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব।" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁহাকে একটী পেন্‌সিল ও এক টুক্‌রা কাগজ আনিতে বলিলেন। কাগজখানার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়া দিলেন,—"মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্ক্ষা-পূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা ঈপ্সিতে বেশী টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।" তদবধি ভাইটী শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া এই অমূল্য বাণীটী সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া,—যাহাতে তাহা নিয়ত চক্ষে পড়ে এমনভাবে তাহার গৃহে প্রাচীর-গাত্রে টানাইয়া রাখিয়াছেন, আর সর্ব্বক্ষণ বাণীটীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করিতে কত চেষ্টাই না করিতেছেন! বলিতে কি, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ টানের ফলে তিনি এখন উচ্চ চরিত্র-সম্পদের অধিকারী হইয়া সুখে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতেছেন।

সবারই কতখানি হৃদয় তিনি অধিকার করিয়া আছেন, তাহা সময় সময় কার্য্য-ব্যপদেশে তাঁহার আশ্রমত্যাগ-কালে বেশ উপলব্ধি করা যায়। সে বিদায়দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক, বড়ই করুণ! যাত্রার বহু পূর্ব্ব হইতে দলে দলে নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিয়া থাকে। তাহাদের প্রিয়তমের অল্পকয়েক দিনের বিরহ-ব্যথায় সকলে যেন পাগল-প্রায়। সবাই অশ্রুবিস্ফারিত ছলছল-নেত্রে প্রাণের দরদ-মাখান ব্যথার শিহরণে এক অভিনব আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়। তৎকালে আশ্রমবাসীগণের নতজানু অভিবাদনে শুধু এই ভাবই লক্ষ্য করিবার থাকে যে, আজ বাংলার এই নিভৃত পল্লীতে নানাদেশবাসী সহস্রাধিক অধিবাসীর মনের কোণ জুড়িয়া যে প্রেম, যে ইষ্টানুপ্রাণতা, যে শ্রদ্ধা, যে নতি সুস্পষ্ট প্রতিফলিত তাহা এ যুগে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার।

মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা গমন করিয়া থাকেন, তখনও ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার শুভপদার্পণ-কালে সেখানে কি বিপুল সমারোহই না হইয়া থাকে! ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সহর ও উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানসমূহের ভক্তমণ্ডলী দলে দলে প্ল্যাট্‌ফরমে উপস্থিত হইয়া থাকেন। দর্শনাকাঙ্ক্ষী হর্ষোৎফুল্ল জনতা অসীম উৎসাহের সহিত

তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হন। অজস্র পুষ্পবৃষ্টি এবং অগণিত শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে যখন সকলে এককালীন তাঁহার চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তখন বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়।

প্রতিটী মানুষের জন্য কি তাঁহার টান। কেহ আশ্রমে আসিলে অপরিসীম আনন্দে কেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠেন! আগন্তুকগণের আহারাদি এবং বাসস্থানের সুবন্দোবস্তের জন্য কত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন,—যথাযথ ব্যবস্থা না-হওয়া-পর্য্যন্ত তাঁহার ছট্‌ফটানি এবং অস্বস্তির ভাব কিছুতেই দূর হয় না। এ সম্বন্ধে একদিনের কথা বলিতেছি। ১৯২৩ সনের ২৬শে জুলাই, রাত্রি ১১ ঘটিকা। পদ্মার ধারে বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন, পার্শ্বে আশ্রমবাসী কেহ কেহ উপবিষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন—"সবাইকে ভালবাস্‌তে হ'বে, যা'রা আমার তা'দের সবাইকে ভালবাস্‌তে হ'বে। তা'দের ভাল না বে'সে, সেবাযত্ন না ক'রে, শুধু আমাকে ভালবাস্‌লে আমি সন্তুষ্ট নই। সকাল বেলা এখানে ব'সে থাকি, সম্মুখ দিয়ে ষ্টীমার চ'লে যায়। মনে মনে ভাবি এই বুঝি আমার প্রেমাস্পদ আস্‌ছে। আশাপথ পানে চেয়ে অপেক্ষায় বসে থাকি, যদি কেউ না আসে সেদিন প্রাণটা ছোট হ'য়ে যায়—সমস্ত দিন খাঁ খাঁ করে। যা'রা এখানে আসে তা'রা কত অশান্তি ল'য়ে, ক্লান্ত হ'য়ে আসে। আমার কর্ত্তব্য তা'দের সেবা করা, যত্ন করা, তা'দের সমস্ত গ্লানি দূর ক'রে দেওয়া। তোমরা আমাকে ঠাকুর বানিয়েছ, সে-সমস্ত কর্‌তে দেও না। কাজেই আমার কাজ তোমাদের কর্‌তে হয়। যা'রা এখানে আস্‌বে তা'দের যেন মনে হয় তা'রা বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছে, তা'দের এটা—আপন বাড়ী।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে সেবার কথা অনেকেই জানেন। বহুকাল পূর্ব্বের কথা। ভক্তেরা যখন আশ্রমে আসিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানকালে সকলের শরীরে তৈলমর্দ্দন করিয়া দিতেন, জলে নামিয়া গামছা দ্বারা তাঁহাদের গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেন, কখনও কখনও নিজহস্তে তামাক সাজিয়া তাঁহাদের ধূমপানের সাধ মিটাইয়াছেন, কখনও বা স্বহস্তে তাঁহাদের পা টিপিয়া পথভ্রমণজনিত ক্লান্তি দূর করিয়া দিয়াছেন। এইসকল কার্য্যে সকলে হাজার আপত্তি করিলেও তিনি কাহারও কথা শুনিতেন না। ভক্তেরা পূর্ব্বে প্রায়শঃ নৌকাযোগে আশ্রমে আসিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে রাস্তায় কোন অমঙ্গল ঘটে এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কি উৎকণ্ঠা! দুর্ভাবনায়

ইষ্টপূজা-নিরতা জননী মনোমোহিনী দেবী

অস্থির হইয়া সৎসঙ্গ-বাড়ীর ঘাটে বর্ষাকালে ঝড়বৃষ্টির দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত লণ্ঠন লইয়া অপেক্ষা করিতেন। যাত্রীদের নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র এক লম্ফে তাহাতে উঠিয়া প্রত্যেককে জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করতঃ কোলে উঠিয়া, পিঠে চড়িয়া আনন্দের আতিশয্যে তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেন।

বিদেশ হইতে কেহ তাঁহার কাছে আসিলে যেমনই তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন, তেমনি কেহ তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহিলে, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিতান্ত আপন-জনের মত কত ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন,—সহজে কিছুতেই কাহাকেও কাছ-ছাড়া করিতে চাহেন না। কাহারও যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে বলেন—"যতক্ষণ আপনারা আমার কাছে থাকেন, আমার দৃষ্টির ভিতরে থাকেন, আমি যেন নিশ্চিন্ত থাকি; কোন অমঙ্গল হ'লে তা'র প্রতিকার করতে পারি, কিন্তু দূরে গেলে আশঙ্কা হয় যদি কোন বিপদাপদ ঘটে সময়োচিত তাহার যথাযথ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারব না, তাই আপনাদের বিদায় দিতে এত দুশ্চিন্তা হয়।" কাহাকেও বিদায়ের অনুমতি দিতে হইলে তাঁহার কত ব্যথা লাগে। বিষাদমাখা বদনে ছলছল-নেত্রে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন, দেখিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারা যায় না। কাহারও প্রস্থান-সময়ে তাঁহার অন্তরে কিরূপ তীব্র যন্ত্রণা হয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নের উল্লিখিত প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ১৩২৯ সন, ১৯শে চৈত্র। সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়া আছেন। গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীর পর আজ অনেকেরই বিদায়ের পালা। যাঁহারা আজই যাইবেন, তাঁহারা আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন—"দ্যাখ্, আমি ত্রিকূটীর উপর উঠে' প্রলয়ের গর্জ্জন শু'নেছি, কি ভীষণ সে গর্জ্জন! যেন মহাপ্রলয় হ'য়ে যা'চ্ছে, কিন্তু তা'তে বুক কাঁপে নাই; কামের উল্লম্ফনে, ক্রোধের ভয়াল মূর্ত্তিতে বা লোভের তীব্র তাড়নায় কোনদিন এতটুকু টলি নাই, কিন্তু তোদের বিদায়ের কথা শুনলেই অবশ হ'য়ে পড়ি, সহ্য করতে পারি না, বুকটা যেন থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।" বলিতে বলিতে তাঁহার বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব আভায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল। সকলে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার প্রশস্ত ললাট দর্পণের মত চক্ চক্ করিতেছে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে ও তাহার মধ্যে উজ্জ্বল তরল আলোক-স্রোতের আবর্ত্তন খেলা করিতেছে।

তাঁহার এমনই কোমল প্রাণ, কাহারও দুঃখ-কষ্ট দেখিলে, তিনি নিজেও সমব্যথী হইয়া তাহার সে বেদনা গভীরভাবে অনুভব করেন। কাহারও মৃত্যু দেখিলে তাঁহারও জীবন্মৃত অবস্থা হয়। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে সুস্থ রাখা এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া মৃতব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত নিজেদের নিদারুণ শোক ভুলিয়া গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ করিতে অস্থির হইয়া পড়েন। একদিনের ঘটনা এখনও মনে পড়ে। ৪ঠা জুলাই ১৯৩৬ সন। তপোবন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ভূষণচন্দ্র নাথ মহাশয় দন্তরোগে অনেক দিন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মারা যান। সেদিনের শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থা অবর্ণনীয়। স্বামীর শোকে রোরুদ্যমানা বিধবা পত্নী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত। আশ্রমবাসী অন্যান্য সকলে অশ্রুমুখী হইয়া নীরবে অদূরে উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষাদমাখা মলিন মুখখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। মা-টীকে তিনি সান্ত্বনা দিতে যাইতেছেন কিন্তু কথা বলিবার সামর্থ্য নাই। চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্তভাবে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়াইযা গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতেছে,—আর হাউ হাউ করিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছেন। তাঁহার অশ্রু-আপ্লুত বিষণ্ণ বদনমণ্ডল-দর্শনে এবং মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া মা-টীও চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ও বাবা, তুমি এত কষ্ট সহ্য করবার জন্য কেন এলে? তোমার যে দুঃখের সীমা নাই। আমাদের পাপে যে তোমাকে পু'ড়ে মরতে হ'চ্ছে। তুমি আর কেঁদ না বাবা, তোমার চোখে জল দেখলে—তোমার এই বুক-ফাটা কান্না শুন্‌লে আমি যে স্থির থাকতে পারি না।"

মৃত্যু দেখিলে তিনি কেমন বিচলিত হন, নিম্নের উদ্ধৃত একখানা চিঠিতে তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। জনৈক সঙ্ঘভ্রাতাকে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিতেছেন—"তোর কয়খানা চিঠিই পে'য়েছি, কিন্তু নানা রকম বুকফাটা ব্যথার ভিতরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তাই কিছুই লিখ্‌তে পারি নাই। কানাই Blackwater fever-এ মারা গেল। কবিরাজদের বাড়ীর —র স্ত্রী ছেলে-হ'তে মারা গেল, আবার বালুরঘাট থেকে একজন তা'র ২৫।২৬ দিনের টাইফয়েডগ্রস্ত ৫।৬ বৎসরের একমাত্র সন্তান নিয়ে এল, একটু ভালও বোধ হ'ল—কিন্তু হঠাৎ মারা গেল, নানা রকম কষ্টে প্রাণটা যেন কেমন হ'যে গেছে। মানুষ যতদিন-না মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারছে ততদিন তা'র জন্মই বৃথা।"

আর একটী ভাইকে তাঁহার পুত্রবিয়োগে সান্ত্বনা দিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহাতে লিখিতেছেন—

"দাদা আমার! আমি মৃত্যুকে রোধ করতে পারি নাই,—তবে চেষ্টা করি,—নিস্তারের উপায় যা' পে'য়েছি বুঝেছি—যা' তিনি জানিয়েছেন—তা' প্রাণপণে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করি—তা' যতদূর সম্ভব সতর্কভাবেই।

"দাদা! আমি নিজেই জরামরণশীল,—এখনও কি ক'রে মরণকে শুদ্ধ করব, নিঃশেষ করব—তাঁ'র দয়ায় এ দান পাওয়ার উপযুক্ত হ'তে বোধ হয় পারিনি—তবে যতদিন থাকি, চেষ্টা করব, প্রার্থনা করব—পেতে।"

"মরণ" কথাটি তাঁহার মনে এমন অস্বচ্ছন্দ ভাবের সৃষ্টি করে যে, কেহ কাহাকেও "মর" বলিয়া গালি দিলে পর্য্যন্ত তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। মৃত্যুকে রোধ করিয়া সকলকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেওয়া যায় কি করিয়া, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কত কাল পূর্ব্বের কথা! সৎসঙ্গে তখনও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় নাই। 'অমিয়বাণীর' সঙ্কলয়িতা লিখিতেছেন—"আজ ১৩২৫ সন, ২৮শে পৌষ রবিবার। গতরাত্রে আশ্রমে এসেছি। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বল্‌ছেন—'দেখুন জগতে এই যে রোগযন্ত্রণা, এত অকালমৃত্যু, এ নিরাকরণের একটা উপায় করতে পারেন? এর জন্য আপনাদের প্রাণ কাঁদে না? এর জন্য আপনারা কেউ চেষ্টা করতে পারেন না? * * * * যদি অকাল মৃত্যু নিবারণ করা যায় তবে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই এতে উপকৃত হ'বে।' * * *।" এই দীর্ঘকাল যাবত কি আপ্রাণ চেষ্টাই না তিনি করিতেছেন, মানুষকে মরণের হাত হইতে বাঁচাইতে—আর এজন্য তাঁহার কতই-না আকুলি বিকুলি!

সকলের সঙ্গেই শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ গুরুতর অন্যায় করিলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। অন্যায়কারীকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার প্রাণান্ত চেষ্টার বিরাম নাই। তিনি কাহারও অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেন না, কিন্তু নিজে অম্লানবদনে সমস্ত দোষত্রুটী সহ্য করিয়া লইয়া তাহাদের আত্মশুদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, দুষ্কৃতকারীদিগকে নিয়াই তিনি সমধিক ব্যস্ত থাকেন। যে যত নীচ, জঘন্য এবং হীনই হউক্ না কেন, প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে তাহার চরিত্রের একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে কত পরিশ্রম করেন! জনৈক সঙ্ঘ-ভ্রাতা একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেছিলেন—"লোকের অপরাধ দেখ্‌লে আমাদের ত' ঘৃণা হয়, সহানুভূতি হারা'য়ে ফেলি, কিন্তু আপনাকে ত' কোনদিন

মোটেই বিরক্ত হ'তে দেখি না। মহা অন্যায় কার্য্য ক'রেও কেহ আপনার নিকট এসে দোষ স্বীকার কর্‌লে, আপনি তৎক্ষণাৎ তা'কে ক্ষমা করেন। অন্যায়কারীকে আপনি ত' কোন দিনই শাস্তি দেন না, বরং তা'দিগকে আরও অধিক যত্ন করেন, এ কি ক'রে সম্ভব হয়?" শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন—"আপনারা লোকের যতটুকু দোষ দেখেন আমি তা'র চেয়ে শতগুণ অধিক দোষ দেখি, তা'-ছাড়া তা'রা কেন এই অন্যায় ক'রেছে সঙ্গে সঙ্গে তা'ও দেখ্‌তে পাই—তাই তা'দের প্রতি বিরক্তি মোটেই আসে না বরং সংশোধনের বুদ্ধি আসে। যে-যে অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে প'ড়ে তা'রা সেই সকল দোষত্রুটী কর্‌তে বাধ্য হ'যেছে, তা' যথাযথ নিয়ন্ত্রিত ক'রে, যে-পর্য্যন্ত-না তা'দিগকে সুস্থ মানবে পরিণত কর্‌তে পারি, মনে কিছুতেই শান্তি পাই না।" তেমনি আর একদিন বলিতেছিলেন—"অন্যায়কারীদের যে আমি ছাড়্‌তে পারি না। যে আমাকে যে পথ দেয় সেই পথ দিয়েই আমাকে তা'র মধ্যে ঢুক্‌তে হ'বে, কাউকেই যে ছাড়ার উপায় নাই। অন্যায়-কারীদের ছে'ড়ে দিলে দুনিয়ার সবাইকেই যে ছাড়্‌তে হয়—তা'হ'লে আমি কা'কে নিয়ে থাক্‌ব, সবাই ত' সংসারে কমবেশী অপরাধী। আপনারা সবাই ত' দিন-রাত্তিরই ভুল করেন। আমি ত' তা' ব'লে কা'রও উপর বিরক্ত হ'তে পারি না—কা'কেও যে ত্যাগ কর্‌তে পারি না, সবাইকে নিয়েই যে চল্‌তে হ'বে।"

এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা। কলিকাতায় হরিতকী বাগান লেনের বাড়ীতে একদিন পূর্ণ মাতাল অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ কথক ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসিয়া নেশার ঝোঁকে তিনি অনর্গল কত অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিয়া যাইতেছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু হাস্য করিতেছেন এবং নিবিষ্ট মনে সমুদয় শুনিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কবি বলিলেন—"ঠাকুর, এইমাত্র আমি মদ খে'য়ে এলাম, এখনও পর্য্যন্ত আমার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বাহির হ'চ্ছে, কৈ আপনি ত' আমায় ঘৃণা ক'চ্ছেন না?" শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে মধুরকণ্ঠে বলিলেন,—"আমার একটা আঙ্গুলে যদি ব্যথা থাকে দাদা, তবে তা' সারাবার জন্যই চেষ্টা করি, সেটাকে কি আমরা বাদ দিয়ে থাকৃতে পারি?"

আর একদিন কবিবর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে বসিয়া বলিতেছেন,—"ঠাকুর, আমার বড় একটা বদ অভ্যাস—আমি মদ খাই।" শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন,—"যা'হোক, আপনার কথা শু'নে আজ আমি আশ্বস্ত হ'লাম! আপনি মদ খান ক্ষতি নাই, কিন্তু লক্ষ্য রাখ্‌বেন দাদা, মদে যেন আপনাকে না খায়।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে, কবিবর সৎসঙ্গে আসিয়া দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছিলেন। সৎসঙ্গে থাকিয়াও বহুদিন তিনি মদ্য পান করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি, আশ্রমের দারুণ অর্থাভাবের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জন্য পাবনা হইতে মদ খরিদ করাইয়া আনিতেন, কিন্তু তাঁহাকে মদ ছাড়িতে একদিনও জোর করেন নাই। কবিবর শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহমাখা সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে নিতান্তই অভিভূত হইতেন কিন্তু চিরাভ্যস্ত এই পাপপ্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া এক-এক দিন শত বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। কতদিন কত দৃঢ়সংকল্প করিতেন—প্রাণান্তেও আর মদ স্পর্শ করিবেন না, কিন্তু অধিক দিন সে প্রতিজ্ঞা স্থায়ী হইত না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবার মদ্যপান আরম্ভ করিতেন—আবার ছাড়িতেন—আবার ধরিতেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল অবিরাম তীব্র চেষ্টার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপেই মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ এবং কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কি প্রাণান্ত পরিশ্রম গিয়াছে এবং কতদিন কত ব্যাপারে তাঁহাকে কত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। সে সকল ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিলে, একটী দীর্ঘ আখ্যায়িকায় পরিণত হইবে, কাজেই সে আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

অন্যায়কারীকে সস্নেহে ক্ষমা করিয়া কি ভাবে তিনি চরিত্র সংশোধন করেন তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখানে দুইটি ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি :—

অনেক দিনের কথা। একবার আশ্রমে হঠাৎ অনেকের জিনিসপত্র চুরি যাইতে লাগিল। আজ একজনের ঘড়ি পাওয়া যায় না—কাল আর একজনের কাপড় হারাইয়া গিয়াছে—একদিন কোন ব্যক্তির পকেট হইতে পয়সার থলেটী নাই……ইত্যাদি। সকলেই উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই একদিন ভোরবেলায় দেখা গেল এক যুবক প্রকাণ্ড একটী পুঁটুলী লইয়া আশ্রম হইতে বাহিরে যাইতেছে। পথিমধ্যে জনৈক আশ্রমবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি যুবকের গতিবিধি সন্দেহ করিয়া তাহার বোঁচ্‌কাটী খুলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে এতদিনের অপহৃত সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আরও অনেকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল, কেহ কেহ যুবককে প্রহারও করিলেন। ঘটনাচক্রে এই সময় কোথা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরও

সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল বিষয় আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি সযত্নে নিজহস্তে লোকটীর গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন এবং তাহাকে আপন কক্ষে লইয়া গিয়া মিষ্ট কথায় কত আদর করিয়া চুরি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহানুভূতিপূর্ণ কোমল ব্যবহারে যুবকটীর অন্তঃকরণ আত্মকৃত অপরাধের তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল—"বাবা, আমার মা বড়ই দুঃখিনী। তাঁ'র দুর্দ্দশা দূর কর্‌ব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে বাড়ী থে'কে বা'র হ'য়েছিলাম। আমাদের জীর্ণ ঘরখানা মেরামতের প্রয়োজন। মাযেব কাপড় নাই, আমারও কাপড় নাই—অন্নেরও সংস্থান নাই—এই জন্যই এই কুকর্ম্ম ক'রেছি।" শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে তাহার গায় হাত বোলাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, তুমি আমায় আগে বল নাই কেন? তা'হ'লে এত লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হ'ত না, আর এমন নীচ বৃত্তিও অবলম্বন কর্‌তে হ'ত না।" এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া যাহার যাহা-কিছু ভাল জুতা, জামা, কাপড় ছিল তাঁহাদিগের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যুবকটীকে পরাইয়া দিলেন; তাহার মায়ের জন্য একজোড়া নূতন কাপড় খরিদ করিয়া আনিলেন এবং নিজেই ভিক্ষা করিয়া চল্লিশটী টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে দিলেন; অপহৃত দ্রব্যাদিও সমুদয়ই তাহাকে দান করিলেন। যুবক অবাক বিস্ময়ে শ্রীশ্রীঠাকুবেব দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, অবশেষে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইযা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—"বাবা, আমি এমন অপকর্ম্ম ক'রেছি আমার কি উপায় হ'বে? আমায় রক্ষা করুন।"

আর একটী ছেলের কথা। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় হরিতকী বাগান লেনের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে ৮০৲ মূল্যের একটী ঘড়ি উপহার দেন। দুই তিন দিন পরে একদিন দেখা গেল ঘড়িটী নাই। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে প্রাতঃকালে এক ভদ্রলোক তাঁহার চৌদ্দ পনর বৎসরের এক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ছেলেটী রোরুদ্যমান, হাতে সেই ঘড়িটী। বালক ঘড়িটী শ্রীশ্রীঠাকুরের পাযের কাছে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সস্নেহে তাহাকে কোলের কাছে বসাইয়া কত আদর করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"বাবা, ঘড়িটী তুমি নাও, ভাল ক'রে লেখাপড়া ক'রো, এই ঘড়িটী তোমায় আমি

দিলাম। আহা! তোমাব বাবা না-জানি তোমায় কত মে'রেছেন, কত তিরস্কার ক'রেছেন। বাছা, তুমি জীবনে এমন অন্যায় কাজ আর ক'রো না।" এই বলিয়া তিনি ঘড়িটী বালকের পকেটে রাখিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শাসনের পরিবর্ত্তে উপঢৌকন পাইয়া বালকটী হর্ষে ও বিষাদে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতেই সে তাহার বুকফাটা ক্রন্দন থামাইতে পারিতেছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মাথা রাখিয়া কেবলই সে রোদন করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু সে কিছুতেই ঘড়ি লইতে স্বীকৃত হয় না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার গায হাত বুলাইয়া এবং কাছে বসাইয়া আদর করিয়া মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া, কোন রকমে শান্ত করিলেন। তারপর ঘড়িটী তাহার নিকট রাখিয়া ইহার সদ্ব্যবহার করিতে বলিয়া দিলেন। জীবনে কোনদিন প্রাণান্তেও এরূপ অপকর্ম্ম না করে এবং পিতার মনে দুঃখ না দেয় ইত্যাদি নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে তিনি তাহাকে বাড়ী পাঠাইযা দিলেন। ছেলেটীর মুখে গ্লানির পরিবর্ত্তে পবিত্রতার উজ্জ্বল আভা ফটিয়া উঠিল।

অন্যের কু তিনি কখনও দেখিতে জানেন না। প্রত্যেকের ভালটুকুই তাহার সম্মুখে বিশেষ উজ্জ্বল কবিয়া ধবিয়া, ভালবাসা দেখাইয়া এবং প্রশংসা করিয়া তাহাকে আরও উন্নত করিবার চেষ্টা করেন। কেহ কাহারও দোষ দেখিলে তিনি যেমনি খুবই ব্যথিত এবং অসন্তুষ্ট হন, তেমনি একে অন্যের সংগুণের প্রশংসা করিলে তাঁহার বুকখানা দশ হাত ফুলিয়া উঠে। কোন কুলোকের সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কিছু বলিলে তিনি বলিয়া থাকেন—"আমাকে দিনের মধ্যে দশ বার ভক্তিভাবে প্রণাম করে, ভালবাসে—সেও আমার যা', আর যদি কেউ আমার নিন্দা করে, গালাগালি করে, এমন কি শত্রুতা করে,—সেও আমার তা'; ববং দুষ্টের প্রতি আমার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আরও বেশী। আপনারা কি এখানে সাধুর সঙ্গে ফূর্ত্তি কবৃতে এসেছেন, না পাপীর উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে এসেছেন, মহা মহা দুষ্কৃতকারীদের যদি প্রেমের সহিত বুকে টেনে নিয়ে সংশোধন কর্ত্তে না পারেন, তবে আব হ'লো কি? কত লোক কত জঘন্য কাজ ক'রে, কত নিকৃষ্ট জীবন নিয়ে এখানে আসে। সে সমস্ত জে'নেও আমি কি তা'দেব ঘৃণা কবৃতে পারি? তা'তে কি ওদের মঙ্গল করা যায়? পাপীকে ঘৃণা না ক'রে প্রেমের দ্বারা সংশোধন করাই যে ধর্ম্ম।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বিশেষ করিয়া সবাইকে এই সাবধান-বাণী জানাইতেছেন—"তুমি দোষ বা অন্যাযকে তাচ্ছীল্য করিও—কিন্তু দোষী বা অন্যায়কারীকে ঘৃণা কবিও না; তা' যদি

কর দেখিবে যেমন করিয়া ঘৃণা করিয়াছ, যেমন করিয়া অন্যায়কারীকে অপদস্থ করিয়াছ, সেইগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া, তোমাকে আগলাইয়া ধরিয়া সেই সেই রকমে অপদস্থ, হাস্যাস্পদ, নির্য্যাতিত ও ঘৃণিত করিয়া তুলিবে ;—ভাব ও ব্যবহারে সাবধান হও।"

আশ্রমের কর্ম্মীদিগের মধ্যে কখনও পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ ঘটিয়া মারামারি হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিদারুণ মনোব্যথায় কি ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন তাহা বলিবার নয়। কোন কারণে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার উপর হাত তুলিয়াছেন শুনিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়, সে তীব্র জ্বালা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুব নিজের উপরেই এমন কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন যে, তাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। কতদিন এইরূপ কত অসংখ্য ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে নিজেকে নিজে নির্ম্মম প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, সে সকল দৃষ্টান্তেব অভাব নাই। অন্যের অপরাধের জন্য তাঁহার নিজের এইরূপ শাস্তিগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"যখন কা'রও কথা ভাবি, তা'র মধ্যে এবং আমার মধ্যে কোনই তফাৎ দেখ্‌তে পাই না,—তা'কে 'আমি' ব'লেই বোধ করি, তা'র ক্রটী-বিচ্যুতিগুলিও আমারই আত্মকৃত অপরাধ ব'লে গণ্য হয়, কাজেই শাস্তিটাও তা'কে না দিয়ে নিজেরই নিতে ইচ্ছা হয়।"

প্রত্যেকের উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর দিবারাত্র কত চেষ্টাই না করিতেছেন! সকলেই যাহাতে জয়, যশ, ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইতে পারেন, নিয়ত ইহাই তাঁহার অন্তরের একমাত্র কামনা। প্রত্যেকের বিদ্যা, বুদ্ধি চিত্তবৃত্তি ও পারিবারিক অবস্থা অনুশীলন করতঃ তাঁহাকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুসারে তিনি পরিচালনা করিয়া থাকেন। পারিপার্শ্বিক সবাই এইভাবে নিত্য নূতনরূপে তাঁহার সঙ্গ ও সান্নিধ্যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া পরম সার্থকতার অধিকারী হইতেছেন। কত মনীষী, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক, স্বদেশ-প্রেমিক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অপূর্ব্ব চেতনা লাভ করিতেছেন,—তাঁহাদের বোধরাজির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইতেছে, যাহার ফলে স্ব-স্ব সংস্কার ও বৃত্তি অনুযায়ী প্রত্যেকে বিভিন্ন কর্ম্মে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জ্জন করিতেছেন। প্রত্যেকের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কতই না উৎকণ্ঠা! একটী ভাইকে একদিন বলিতেছিলেন—"তোরা যে আমার কত আশার মাণিক, হয়ত তা' তোরা

জানিস্ না! তোদের ব্যর্থতা যেমন আমার মনকে শ্মশানে পরিণত করে—সার্থকতায় তেমনি স্বর্গ ও সমৃদ্ধি এনে দেয়। আমি কাতর চক্ষে—আশার আশ্বাসে—চেয়ে আছি তোদের পানে—দেখ্‌ব আর পা'ব ব'লে—যেমন চাই তেমনি ক'রে। তোদের সেবা, তোদের ব্যবহার—তোদের বলা, চলা—তোদের কর্ম্মকুশলতার কথা শুন্‌লে আমি যেন পাঁচ হাত হ'য়ে পড়ি। তোদের সার্থকতা দেখ্‌লে, তোদের উন্নতি দেখ্‌লে আমার মনটা যেন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে, কবে তোরা প্রত্যেকে দশজনের একজন হ'বি—দশের বোঝা বহন কর্‌বার যোগ্য হ'বি—দিনরাত্রি শুধু এই চিন্তাই করি।"

মাতৃজাতির উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা! নারীর অমর্য্যাদা তিনি বিন্দুমাত্রও সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলেন,—"যে মা লাঞ্ছিতা, অবমানিতা—তাঁ'র গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ কর্‌বে সে ঐ লাঞ্ছনা ও অবমাননার ছাপ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হ'বে, ফলে দেশ দুর্ব্বলদেহ হীনবৃত্তিসম্পন্ন সন্তানে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে, জাতি ছারখারে যা'বে। মা-ই ত' এ দুনিয়ার সব-কিছু। মায়ের সন্তান হ'য়ে মাতৃজাতির দুঃখ বা অবমাননা সহ্য কর্‌ব কেমন ক'রে?" নারীমাত্রেরই এতটুকু ব্যথা, দৈন্য, অবসাদ তাঁহার প্রাণে শেলের মত বিদ্ধ হয়। তাই মাতৃজাতিকে উন্নত করিবার জন্য তিনি কত কষ্টই না করিয়া থাকেন! আশ্রমবাসী শত শত মায়েরা দিবারাত্র প্রত্যেকের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কত খুঁটিনাটী বিষয় লইয়া তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া থাকেন! অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি সবারই কথা সর্ব্বদা মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতেছেন এবং যথাযথ সময়োচিত উপদেশ ও সাহায্য দান করিয়া তাঁহাদিগকে তৃপ্ত ও শান্ত করিয়া বিদায় করিতেছেন। এজন্য কতদিন কত বিনিদ্র রজনী তাঁহাকে যাপন করিতে হয়, কত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয় তাহার অবধি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রীতিকর ব্যাপারে তাঁহার বিরক্তি বা অবহেলার বিন্দুমাত্র চিহ্নও লক্ষ্য করা যায় না—অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার সহিত কতকাল ধরিয়া এমনি ভাবেই অন্যের দুঃখের প্রলাপ তিনি শুনিয়া যাইতেছেন।

মেয়েরা যাহাতে স্বামী-ভক্তি ও সন্তান-প্রতিপালন শিক্ষা করিতে পারে, পরিবার, পরিজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সরল ব্যবহার প্রদর্শন করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সুখে সংসার করিতে পারে, প্রত্যেকে ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হইয়া নানা শিল্পব্রতের অনুষ্ঠান করতঃ আর্থিক সচ্ছলতার সহিত পারিপার্শ্বিকের সেবায় ব্রতী হইতে পারে, কুমারীরা যাহাতে পুরুষের উচ্চ বর্ণ, বংশ, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্টপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া যথোপযুক্তভাবে যোগ্য

বরকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে—ইত্যাদি নারীজাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা গল্প, আলাপ, আলোচনা, সাহায্য, সহানুভূতি, উপদেশ-প্রদান, কুটিরশিল্পের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে কি অপরিসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে নিয়ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃ-নামে অস্থির। তিনি বলেন—"নারীকে মাতৃভাবে উপভোগ করার মত সুখ আর কিছুতেই নাই। 'মা' মন্ত্রটী কি জাগ্রত! 'মা' ব'লে ডাক্‌লেই যেন নারীর নারীত্ব মুক্তি পে'য়ে অবাধ হয় আমাদের কাছে। ছোট ছোট মেয়েগুলিকে 'মা' ব'লে ডাক্‌লে তা'রা কত খুসী হয়! তা'দের 'মা' ব'লে কোলে নিয়ে দে'খেছি, যেন নিজের অহঙ্কার সব ভুলে যাই, একদিন যে শিশুটী ছিলাম তাই যেন হ'য়ে যাওয়া যায়। 'মা' ব'লে কিছুক্ষণ ডাক্‌লেই মনটা ভারী থাক্‌লে তা'ও যেন কত হাল্‌কা হ'য়ে যায়!" শ্রীশ্রীঠাকুর কোন রমণীকে যখন 'মা' বলিয়া সম্বোধন করেন, নিজের মায়ের প্রতি সন্তানের যেমন-যেমন ভাব—তাহা এত গভীর ও পরিপূর্ণভাবে সকল সত্ত্বা দিয়া তিনি বোধ করেন, যেন তখন তিনি সেই মা-টীর নিকট সত্যিকারের তারই সন্তানটী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই মা-টীকে নিজেরই গর্ভধারিণী জননী-ছাড়া আর-কিছু ভাবিতে পারেন না, আর তাঁহার চালচলন, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারের প্রতিটী-ব্যাপারে যেন তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত্ত, স্পষ্ট ও জ্বলন্ত হইয়া উঠে।

মুক্তকণ্ঠে অন্যের প্রশংসা করা শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী অদ্ভুত স্বভাবসিদ্ধ গুণ। শিশু, যুবক, নর-নারী যিনি যখনই যাহা-কিছু আনিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দেন, তিনি যেন আহ্লাদে আট-খানা হইয়া পড়েন। ক্ষুদ্র শিশু কত-কিছু অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ দ্রব্যাদি জোড়াতালি দিয়া খেলার সামগ্রী তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছে, তাহাদের শিশু-রাজ্যের কত অবান্তর কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেছে—তিনি কেমন মনোযোগ ও ধৈর্য্যের সহিত সকল কথা শুনিয়া যাইতেছেন, আবার তাহাদের ভাষায় তাহাদেরই মতন করিয়া কত গল্প করিয়া তাহাদিগকে আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছেন ছোট ছোট বালক-বালিকারা নিজ-নিজ বাগানের ফুল, ফল, শাকসব্জী তুলিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছে, তিনি কত খুসী হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের জন্য বা প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগের কার্য্যের প্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত্র আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কি স্ফূর্ত্তি! কোন মহিলা খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর আহার করিয়া কত খুসী

ন, তাঁহার কত সুখ্যাতি করেন! বৈজ্ঞানিক আসিয়া তদীয় গবেষণা-কার্য্যের ফলের বিষয় তাঁহাকে সংবাদ দিতেছেন, কবি আসিয়া তাহার স্ব-রচিত কাব্য পড়িয়া শুনাইতেছেন, কারখানার মিস্ত্রি আসিয়া তদীয় আরব্ধ কর্ম্মের কৃতকার্য্যতার কথা বলিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের সে দান যত ক্ষুদ্র, যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন আনন্দ ধরে না! কর্ম্মীরা প্রত্যেকে স্ব-স্ব কার্য্যে অচিরেই যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া যশস্বী হইবেন ইত্যাদি কত প্রশংসার কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে কেমন অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেন! প্রচারকার্য্য-রত কোন কর্ম্মীকে বলিতেছেন—"এ কালে বিবেকানন্দের মত ভীমকর্ম্মা হবে।" কাহাকেও বলিতেছেন—"তোর যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং উদার প্রাণ, একটু চেষ্টা কর্‌লেই একদিন তুই অনায়াসে দাশদার (দেশবন্ধুর) মত নেতা হ'তে পারিস্।" আবার কাহারও সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আপনার এত গুণ, এই সামান্য দোষটুকু যদি না থাকৃত তা'হ'লে আপনিও একজন ছোটখাট হিট্‌লার হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌তেন।" গুণমুগ্ধ তিনি এইভাবে সবাইকে অনুপ্রাণিত করিয়া, সবাইকে বল-ভরসা দিয়া, সবারই প্রাণে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া—তিনি চলিয়াছেন সবাইকে নিয়া।

অন্যের প্রশংসায় তিনি শতমুখ, কিন্তু নিজের প্রশংসাবাদ একবিন্দুও সহ্য করিতে পারেন না। কেহ কোনদিন তাঁহার প্রশংসার কথা কিছু বলিলে এত অস্বস্তি বোধ করিয়া থাকেন বলিবার নয়। অহরহঃই দেখিতে পাই, আগন্তুক ব্যক্তিগণ আশ্রমের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যখনই বলিতে আরম্ভ করেন—"আপনার প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া—" অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর বাধাপ্রদান করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান কর্ম্মীদিগকে দেখাইয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিয়া উঠেন—"এই এঁরাই ক'রেছেন কত কষ্ট ক'রে, আমি কিছু নই দাদা।" কতদিন পূর্ব্বে দেশবন্ধুকে আশ্রমে আসিবার জন্য যে পত্র খানা দিয়াছিলেন, তাহাতেও এই মর্ম্মেই তিনি লিখিতেছেন—"আপনি এলে সবাই সুখী হবে। এঁদের বহু-কষ্টের প্রতিষ্ঠানগুলিও ধন্য হ'বে দাদা! কত নিন্দা, কত কলঙ্ক, কত অনটন-অপবাদের পাহাড় ঠেলে, অকৃতজ্ঞতার নদী সাঁতরিয়ে, এগুলি ক'রেছেন এঁরা—আপনি এলে সার্থক হ'বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌বে—বুকে আগুন চাপা দিয়ে কাজে লেগে যাবেন এঁরা বোধ হয়।"

যাঁহার একার চেষ্টায় বাংলার কোন্ সুদূরে এক নগণ্য পল্লীর বুকে একটী এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, যিনি সহস্রাধিক নর-নারীকে মনের

এবং দেহের খাদ্য দিয়া প্রত্যহ প্রতিপালন করিতেছেন, ভারত-ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ যাঁহাকে ইষ্টজ্ঞানে নিয়ত শ্রদ্ধা ও পূজা করিতেছেন, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারে তাহা বুঝিবার কাহারও বিন্দুমাত্র সাধ্য নাই। আভরণ-সম্বল একখানি সাদা ধব্‌ধবে উপবীত, পরণে একখানা সরুপাড় সাদা ধুতি, পায়ে এক জোড়া কাল চটিজুতা, সর্ব্বদা অনাবৃত দেহ—মাত্র শীতকালে কোন কোন দিন গায়ে একখানা লংক্লথের ফতুয়া ও উত্তরীয়। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সর্ব্বক্ষণ সকলের সমক্ষে রহিয়াছেন, রাত্রিতেও ঘরের বাহিরে পদ্মাতীরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে শয়ন করিয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ সকলের মধ্যে থাকিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। যিনি যখন আসিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছেন। অবসর তাঁহার একটুও নাই, তবুও তিনি সকল সময় সবারই পক্ষে অতিশয় সহজ-প্রাপ্য। সবারই পূজ্য—সবারই শ্রদ্ধেয় তিনি, কিন্তু কেহ কোনদিন শুনে নাই কাহাকেও হুকুম করিয়া তিনি কোন কাজ করাইয়াছেন। কখনও কিছু করার প্রয়োজন হইলে, কর্ম্মীকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কার্য্যের যুক্তিবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করতঃ তাহার মনে ঐ কাজ করার প্রবৃত্তি এবং আবশ্যকতা-বোধ জাগাইয়া তুলেন এবং "লক্ষ্মী আমার," "যাদু আমার" "ধন আমার" ইত্যাদি প্রিয়-সম্বোধনে তাহাকে এমন কোমলকণ্ঠে আব্দারের সঙ্গে কার্য্য-সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করেন—কাজটী সে করিলে তিনি যেন কত কৃতার্থ হইবেন! তাঁহার মধুর, প্রাণস্পর্শী, অমিয় আহ্বান শুনিবামাত্র কর্ম্মীদের মনে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে থাকে—কাজটী সুসম্পন্ন করিবার জন্য কি বিপুল উৎসাহ এবং আগ্রহের সহিতই না সে অগ্রসর হয়!

তেমনি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হন। প্রতিষ্ঠান গড়িবার এবং আশ্রমবাসী নর-নারীর ভরণপোষণের বিপুল ব্যয়ভার শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষাদ্বারাই দীর্ঘকাল যাবত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ভিক্ষা যাজ্ঞা করিবার তাঁহার কি স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব্ব ক্ষমতা!—না দেখিলে তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না। ছলছল-নেত্রে কি করুণ চাহনি—কি দরদ-মাখা ব্যথার কাঁদুনি—কি প্রাণ-জুড়ান মন-ভোলান মধুর সম্ভাষণ! সে মর্ম্মস্পর্শী কোমল-করুণ আকুতিমাখা প্রার্থনা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া পৌঁছে, শুনিবামাত্র তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সবারই মনে কি তীব্র আকুলতা আসে! তাঁহাকে দিয়া সকলে কি সুখ, কি তৃপ্তিই না পায়! তাঁহার চাওয়ার পরিমিত অর্থ সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলের শশব্যস্ত ছুটাছুটির বিরাম থাকে না,—

মাতৃঅঙ্কে শায়িত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

কিছুতেই তাহারা সোয়াস্তি পায় না। সবারই উদরের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিরাট ক্ষুধার নিত্য আহার্য্য যোগাইতেছেন তাঁহারই চরণাশ্রিতা কতকগুলি দরিদ্রা রমণী আর অভাবগ্রস্ত গুটিকয়েক ভাই। শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী 'সৎসঙ্গের' কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে একস্থানে এ-সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

—" * * * আশ্রমবাসিনী একটী দীনদরিদ্রা নারী আসিল। লোকের কাজ করিয়া তাহাদের কিছু কিছু দানে তাহার নিজের ও একটী কন্যার দিনপাত হয়। সে বলিল—'আজ দরিদ্রনারায়ণের সেবা হ'বে, ঠাকুর আশ্রমে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছেন। আমার কাছে এসে ভিক্ষে চাইলেন—শান্তির মা, ভিক্ষা দে। আমার কি আছে যে দে'ব? ঠাকুর তা' জানেন, তবু শুনলেন না, বল্লেন—দিতেই হ'বে তোকে, তুই নিজের জন্য ভিক্ষে করিস্ রোজ, আজ দরিদ্রনারায়ণের জন্য ভিক্ষে চে'য়ে এনে আমায় ভিক্ষে দে। এ ঠাকুরের লীলা, আমি ভিখারিণী, আমার কাছেও ভিক্ষে নেবেন। তাই কি করি, ঠাকুরকে ভিক্ষা দেবার তরে আমিও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইতে বেরিয়েছি'।" মাননীয়া লেখিকা অতঃপর মন্তব্য করিতেছেন—

"যা'র দারিদ্র্য সম্বন্ধে চেতনা শুধু নিজেতেই আবদ্ধ ছিল, তা'র আত্মা আজ সেই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াইয়া একটুখানি প্রসারতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ করিল।"

প্রাণের কত কাতর নিবেদন জানাইয়া, অন্তরের কি স্নেহকরুণ মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করতঃ, কত জনের কত অভাব ও চাহিদা-পরিপূরণের জন্য, দীন ভিক্ষুকের মত, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া প্রিয়জনের দ্বারে তিনি উপস্থিত হন, তাহারই একখানা ছবি দেখিতে পাই নিম্নের উদ্ধৃত চিঠিখানায়। যথা:—

"ওরে তোর কি এমনতর কেউ নেই যার কাছে—ভিক্ষুক আমি—তুই আমায় গলায় বেঁধে দীনের মত করজোড়ে দাঁড়ালে,—চাওয়ার ভাবে অবনত হ'য়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইলে—তার দেওয়ার আকুতি থর-থর ক'রে কেঁপে তোকে আলিঙ্গন করে?

"দ্যাখ্ রে দ্যাখ্,—আমায় নিয়ে দাঁড়া, কে আছে তোর—নে রে নে —একবার তা'র সাড়া নে, আর বল্ আমার তাঁ'কে কি তোমার রক্ত-জলকরা ক্ষুন্নিবারণের উপার্জ্জন থেকে কিছু দেবে না?—তোমার গলগ্রহ ত' অনেকেই আছে, কেবল আমার সে-ই কি বঞ্চিত হ'বে? সে যে চায় তোমারই ক্ষুধার মতন—দাও, তুমি যদি খাও তাঁ'কে না-দিয়ে খে'য়ো না,—আরও বলিস্ এ-দানটা যেন তোমার যতদিন খাওয়া থাকে ততদিন ধ'রে সে পায়। তোমার থাকা-খাওয়া যেন চিরদিন থাকে—তাঁ'র পাওয়াও যেন তোমার কাছে চিরদিন থাকে।

"নিয়ে চল্ আমায় সেই মহানের কাছে, তোর আর্ত্তচক্ষু, বেদনার বাণী তাঁ'কে পূজা করুক্,—এ দৃপ্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হোক তাঁ'র দানে,—আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁ'র উপর পুষ্পবৃষ্টির মতন অবিরল ধারায় সিক্ত ক'রে তুলুক—ফুল্ল ক'রে তুলুক।"

এই ভিক্ষা চাহিবার উপলক্ষেও কি মহৎ শিক্ষা দান করিয়া তিনি সকলকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করিয়া তোলেন, নিম্নের আলোচনায় তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি :—

একদিন সকালে তিনি অর্থ-সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন, প্রায় দুইশত টাকার দরকার, ডিস্পেন্সারীর ঔষধের ভিঃ পিঃ রাখিতে হইবে। প্রত্যেকের নিকট হইতে হাত পাতিয়া টাকা নিতেছেন আর বলিতেছেন—"টাকার মতন প্রেমের পরখ্ আর নেই! আদর্শে কে কতখানি যুক্ত তা' এই দেওয়ার ভিতর দিয়ে বেশ বোঝা যায়। মুখে মুখে ইষ্টপ্রাণতার গান গাওয়া খুব সোজা। তা'তে কোন nerves-এর motor action নেই। Sensory nerves দিয়ে যা'-কিছু feeling আমাদের ভিতরে হোক না কেন, যদি তদনুযায়ী motor action না হয় তবে brain-টা কতকগুলি good wishes দিয়ে ভরা হয়। তা'র ফলে জীবনটা কতকগুলি thoughts-এর বোঝায় ভাবাক্রান্ত হ'য়ে দুর্ব্বিসহ হয়—মানুষ impractical and imaginative হ'য়ে পড়ে। যখনই কোন ভাল ইচ্ছা ভিতরে জাগ্‌বে তখনই কাজে তা'র expression দিতে চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। তা'হ'লেই তা' habit-এ পরিণত হ'বে। Actual field-এ না গিয়ে বাড়ী ব'সে ব'সে কাজের plan আঁটা কাজ পণ্ড হওয়ার উপায়। কাজ কর্‌তে কর্‌তে বুদ্ধি জু'টে যা'বে। শুধু plan আঁট্‌লে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু field-এ নে'মে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে ক'রে অগ্রসর হ'লে কাজ প্রায়ই পণ্ড হয় না, মনের সাহসও বাড়ে, from lesser experience to greater experience-এ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে শে'খে, তখন তা'র কাজ কর্‌তে বিশেষ ভয় হয় না।"

তাঁহার ন্যায় এমন আশাবাদী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। শত দুঃখ, দৈন্য, ঝঞ্ঝা তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র নিরাশার রেখাপাত করিতে পারে না। বাল্যাবধি কৃতকার্য্যতা-লাভের উজ্জ্বল আশা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়াই তিনি জীবনপথে চলিয়াছেন। ৺রজনীকান্ত সেনের রচিত "কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে" গানটী শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রায়শঃ গাহিতে শুনিয়াছি। কিন্তু কখনও তিনি "পাব জীবনে না হয় মরণে" গানের এই চরণটী গাহিতে পারেন নাই, ইহার পরিবর্ত্তে তিনি নূতন পদ যোজনা করিয়া গাহিয়া থাকেন,

--"পাব জীবনে, এই জীবনে।" "না" কথাটী উচ্চারণ করিতেও যেন তাঁহার কত কষ্ট! উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, অনন্ত জীবনের অধিকারী, এই জীবনেই আমাদিগকে সেই অমৃতের সন্ধান পে'তে হ'বে। এ জীবনে না হ'লে অন্য জীবনে পা'ব এরূপ ভাব্‌তে আমার ভাল লাগে না—আমার যেন এক মুহূর্ত্ত দেরী সইতে ইচ্ছা করে না।"

চির-শুভদর্শী তিনি। হয় না, জানি না, পারি না—ইত্যাদি "না"-সূচক কথা শুনিতে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন —"আমার এখনও অনেক কাজ কর্‌বার বাকী আছে, আপনারা সকলে সেগুলি তাড়াতাড়ি সে'রে ফেলুন—না কর্‌লে তা'র জন্য কিন্তু আপনারাই দায়ী। হ'চ্ছে না, হ'চ্ছে না,—এ ভাবটা আমি আদৌ পছন্দ করি না। আমি নিজে অমন ক'রে কখনও trained হই নাই। যে-টা মনে হ'য়েছে কর্‌ব, যে-টা ভাল ব'লে মনে ক'রেছি, সে-টা ক'রেছি তবে ছে'ড়েছি। যদি দরকার হয় মনে করি, তা'হ'লে এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে তুফান উ'ঠেছে এমতাবস্থায় এই পদ্মানদীও সাঁতরায়ে পার হ'য়ে যে'তে পারি। এমনও হ'য়েছে গরম বালিতে পায়ে ফোস্কা প'ড়েছে তবুও তা'রই উপর দিয়ে চ'লে গিয়েছি, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করি নাই।" সৎসঙ্গের প্রেস, কারখানা, গৃহনির্ম্মাণ-বিভাগ যেখানেই যখন কোন কাজ চলিতে থাকে, দেখিয়াছি কাজটী সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন না-হওয়া-পর্য্যন্ত তিনি কত উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি বোধ করেন। কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে চাহেন না, যে কয়দিন জোরে কাজ চলে শ্রীশ্রীঠাকুর আহার, নিদ্রা, বিশ্রামাদি প্রত্যহ সেই কর্ম্মস্থলেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রকাণ্ড বাঁশবন ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বিরাট 'প্যাণ্ডেল' তৈয়ারী, সৎসঙ্গের নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য অসংখ্য গৃহাদি-নির্ম্মাণ, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ঔষধ-প্রস্তুত, বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য্য, গ্রন্থরাজির বাণী-প্রদান ইত্যাদি শত শত ব্যাপারে তাঁহার এই ক্লান্তিহীন, বিশ্রামহীন, অটুট ধৈর্য্য সকলে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখনও মনে পড়ে সে কথা,—প্রতিষ্ঠানের জন্য ইট কাটিবার সময় আশ্রমের সম্মুখে পদ্মার চরে ভীষণ শীতের কয়মাস শ্রীশ্রীঠাকুর সারারাত্রি জাগিয়া থাকিয়া কি ভাবে সেই বিরাট যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন! সেই-সময়ের অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রস্রবণের দৃশ্যটী আজও যেন চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে। কোথাও মাটী-কাটা হইতেছে, কোথাও কাদা-প্রস্তুত হইতেছে, কয়েকদল কর্ম্মী সেই কাদা বহন করিয়া যথাস্থানে নিয়া যাইতেছেন, কেহ-কেহ ইট প্রস্তুত করিতেছেন, অপরেরা তাহা চত্বরে সাজাইয়া রাখিতেছেন। সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত

বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে এই ভাবে এক-টানা কাজ চলিয়াছে। কর্ম্মীদে
সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরও বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, রাত্রির আহারাদি তি
মাঠেই সম্পন্ন করিয়াছেন। পরদিন মধ্যাহ্নের রৌদ্রে পূর্ব্বরাত্রের-তৈয়ারী ই
শুকাইয়াছে। বিকালে ইট গাদা করিয়া রাখিয়া প্রাঙ্গন পরিষ্কার ক
হইয়াছে। আবার সন্ধ্যায় কর্ম্মোৎসব আরম্ভ হইয়া সারারাত্র চলিয়াছে
এইভাবে দিনের পর দিন কাজ চালাইয়া তিনমাসে তুইটী প্রকাণ্ড পাজা
কয়েক লক্ষ ইট তৈয়ারীর কাজ শেষ হইয়াছে। মাটী-কাটা এবং কাদা-প্রস্তু
প্রভৃতি অধিকতব শ্রমসাধ্য কার্য্য পুরুষ কর্ম্মীরা করিয়াছেন, অবশিষ্ট কা
মায়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হইযাছে। সন্ধ্যাব প্রার্থনা শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইযা স্ত্রীপুরু
সকলে মিলিয়া সেই প্রান্তরেই সমাপন করিয়াছেন। কর্ম্মিগণ কাদা-মাটী
মাখা শরীরে কেহ-বা কোদালী কেহ-বা ঝোড়া হাতে লইয়া কর্ম্মনিব
অবস্থায় যে যেখানে যে অবস্থায থাকিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিনতি-পাঠে
সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ যোগদান করিয়া মঙ্গলাচরণান্তে ধ্যাননিরত হইতেন
যথারীতি প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে পুনরায় যে যাহার কাজে লাগিয়া যাইতেন
যে কয়মাস কাজ চলিয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ সারারাত্রি একবার এখা
একবার সেখানে—সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কর্ম্মীদিগের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগ
কর্ত্তব্য-সম্পাদনে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কত স্ফূর্ত্তির গ
করিয়াছেন। আশ্রমবাসী বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রীপুরুষ সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহি
সেই কর্ম্ম-মহোৎসবে যে বিপুল আনন্দ ভোগ করিযাছেন তাহা প্রত্যে
চিরকাল স্মরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

দুরূহ, কষ্টসাধ্য, বিপদ-সঙ্কুল, সমস্যাপূর্ণ কোন কঠিন কায্য সম্মুখে উপস্থি
হইলে, ভয় বলিযা তিনি কিছু বোধ করেন না। তখন তাঁহার কর্ম্মশক্তি
বুদ্ধিবৃত্তি আরও শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভীতি, অবসাদ বা অধৈর্য্যের বিন্দু
মাত্র অবকাশ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। বিপুল বিক্রমে
তুমুল উদ্যমের সহিত সে-কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি উঠিয়া-পড়িয়
লাগিয়া যান, আর তাহা সম্পন্ন না-হওয়া-পর্য্যন্ত তাঁহার তিলার্দ্ধও বিশ্রাম থাবে
না। পাবনায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় এবং সৎসঙ্গের জমি-'একোয়ার'
ব্যাপারে যে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বি
অপূর্ব্ব সাহস, বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে আশ্রমবাসী সকলের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্র
রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কেহ কোনদিন ভুলিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :—

বহুদিনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন যৌবনের প্রারম্ভ। রাজদ্রোহ

গুপ্তসমিতির দুইটী ষড়যন্ত্রকারী যুবক শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাহাদের দলভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাঁহাকে পদ্মার চরে লইয়া যায়। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, সর্ব্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। এমন সময় চরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া বিপ্লবপন্থী যুবক দুইটীর একজন একটী রিভলভার ও অন্যজন একটী সুতীক্ষ্ণ শাণিত ছোরা উত্তোলন করিয়া বলিল—"তুমি যদি আমাদের দলে যোগদানের শপথ গ্রহণ ক'রে নাম দস্তখত না কর, তা'-হ'লে এই মুহূর্ত্তে তোমায় হত্যা করব।" জীবনমরণ-সমস্যার এই ভীষণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র ভীতির উদয় হইল না। এই অবস্থায় তিনি তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হো হো করিয়া এমন এক অপূর্ব্ব উচ্চ তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিলেন, যুবক দুইটী তাঁহার সেই ভৈরব বিকট অট্ট-হাস্য শুনিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, অস্ত্র দুইটী তৎক্ষণাৎ তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা তুলিয়া লইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"দেখ, আমারও একটী দল আছে, তাহা অতি পবিত্র ও নির্ম্মল; ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্মই তাহার উদ্দেশ্য—তোমরা যদি তাহাতে যোগদান কর, আমিও তোমাদের কথা বুঝ্‌তে চেষ্টা করব।" যুবক দুইটী বলিল—"আমরা এ বিষয়ে বিবেচনা ক'রে পরে সাক্ষাৎ করব।" এই বলিয়া চলিয়া গেল—বলা বাহুল্য ইহারা আর কোন দিন তাঁহার নিকট আসে নাই।

সকল ধর্ম্মকে তিনি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সকল প্রেরিত ও অবতার পুরুষকে তিনি অন্তরের সহিত অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করেন। একদিন (১৪ই জুলাই ১৯৩৬ সন) বিকাল বেলা কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক আশ্রম দেখিতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন,—তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা এখানে কি হিন্দু-মুসলমান ব'লে কোন ভেদ আছে?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিলেন,—"ও সব ভেদবুদ্ধি এখানে কিছুই নাই। ও-সব ভেদ ত' মানুষের তৈরী-করা, আসলে ত' ওর অস্তিত্ব কিছুই নাই। যা'রা এক খোদা এক পরমপিতাকে মানে না, তা'রাই ঐ সব ভেদ মানে এবং তা' নিয়ে গোলমাল করে। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে, সে সকল ধর্ম্ম এবং সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ক'রে থাকে। একজন তা'র পিতাকে কত শ্রদ্ধা করে, কত ভালবাসে! আমি যদি তা'র পিতাকে অবমাননা ক'রে কথা বলি এবং আমার নিজের পিতাকে তা'র কাছে বড় ব'লে প্রতিপন্ন করতে যাই তবে কি তা'র মনে আঘাত লাগ্‌বে না? পবিত্র কোরাণেই ত' আছে—অতীতকালের মহাপুরুষদিগের প্রতি সম্মান

প্রদর্শন করতে হ'বে। এমন-কি যে সকল মহাপুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে আস্‌বেন তাঁ'দের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের কথা কোরাণে উল্লেখ আছে। আজ আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ই আপন আপন আদর্শ ভু'লে কি কামড়া-কামড়িই-না করছি! তা'রই ফলে এই বিভেদের সৃষ্টি হ'য়েছে, বস্তুতঃ কিন্তু সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষগণই মানবমাত্রেরই নমস্ত, পূজ্য এবং পরম শ্রদ্ধার পাত্র।"

তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবকে কি ভাবে পূজা করিতে হয় তাহাই শিক্ষা পান। তাঁহার উদার বাণীসমূহ পাঠ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক তৎতৎ ধর্ম্মমতের তথা প্রচলিত অন্যান্য মতবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা যথাযথ অনুসরণ করিবার সুসঙ্কেত লাভ করেন, এবং ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া পরস্পরে পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হন। হিন্দুগণ তাঁহাকে আর্য্যসভ্যতাব মূর্ত্ত আদর্শ-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অষ্ট্রেলিয়াবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় 'সৎসঙ্গ' পরিদর্শন করিয়া সেদিন মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন—"যদি এই মুহূর্ত্তে যীশুর আবির্ভাব হইত তবে তিনিও ঠিক ঠিক শ্রীশ্রীঠাকুব অনুকূলচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রণালী অনুসারেই মানবজাতির সেবা করিতেন স্থানীয় খৃষ্টান মিশনারীগণ এবং সৎসঙ্গের পরিদর্শনকারী বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধর্ম্মের অবতার বলিয়া অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মুসলমান জনসাধারণেরও অপরিসীম শ্রদ্ধা। এখানে তৎসম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৩৩৭ সনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরেব দীর্ঘকালব্যাপী পীড়াবশতঃ* পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসর আশ্রমে তাঁহার জন্মোৎসবের

* এগার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ম পায়ে দিয়া হাঁটিতে গিয়া একদিন হঠাৎ পড়িয়া যান। ইহাতে তাঁহার পা মচ্‌কিয়া যায়। অনেক দিন নানাপ্রকার ঔষধপত্র ব্যবহার করায়ও তাহা আরোগ্য হইল না। আস্তে আস্তে তাঁহার চলৎশক্তি বন্ধ হয়। ক্রমে পায়ের ফুলা ও বেদনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হইয়া তাহা ১০৪°।১০৪২° পর্য্যন্ত উঠে। পরে দেখা গেল স্ফীত স্থান পাকিয়াছে। অবস্থা দিন দিন আশঙ্কাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়ার প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়কে আনান হইল। তিনি রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে অনতিবিলম্বে কলিকাতা লইয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে ১৩৩৫ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে মেডিক্যাল কলেজের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রচিকিৎসক Dr. Connar-কে দেখান হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের গাঁইট হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ভীষণভাবে ফুলিয়া এরূপ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে কয়েকজন বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক

আয়োজন হয় নাই। সে-বৎসর স্থানীয় মুসলমানগণ নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করতঃ তাঁহার শুভ জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহারা যে নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা :—"আগামী ৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ জন্মদিবস। ঐ তারিখ হইতে কতিপয় দিবসের জন্য আমরা তদীয় জন্মভূমি হিমাইতপুর গ্রামে আনন্দোৎসবের আয়োজন করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে আমরা শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সমবেদনা, রোগে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা, বিপন্ন হইলে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়া থাকি। তিনি আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতা না হইলেও স্বকীয় ভ্রাতাপেক্ষাও অধিক স্নেহপরায়ণ; তিনি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিলেও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বহু উর্দ্ধে থাকিয়া প্রত্যেককে স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত আচার-অনুষ্ঠানে আত্মোন্নয়নে উৎসাহিত করেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমির শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য বহু সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। * * * * তাঁহার অপার গুণগ্রাম স্মরণ করতঃ তদীয় গুণমুগ্ধ আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছি।"

ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্ম্মতৎপর হওয়ার জন্য তিনি সর্ব্বদা সকলকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃই উপদেশছলে বলিয়া থাকেন —"কর্ম্মে গতি, ধর্ম্মে প্রাপ্তি এবং ভক্তিতে স্থিতি।" একদিন ১৯৩০ সনের ২৪শে এপ্রিল সকালবেলা অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, এমন

উহাকে Malignant tumour বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং পায়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তখন স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক Dr. Younan-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র ঔষধ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল—নতুবা কি অবস্থা ঘটিত তাহা কল্পনাও করা যায় না। Dr. Younan-এর চিকিৎসায় শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বর কমিয়া গেল, ঘাও ভরিয়া আসিতে লাগিল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাতীরে আশ্রমের মুক্ত বায়ুতে আসিয়া থাকিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে চিকিৎসকগণের পরামর্শমত ১১ই শ্রাবণ (১৩৩৫ সন) তিনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি জ্বর কমিতে কমিতে একেবারে ছাড়িয়া গেল, সাধারণ স্বাস্থ্যও বেশ উন্নতিলাভ করিল, কিন্তু পায়ের ফুলা ও ঘা যাহা সামান্য অবশিষ্ট রহিল তাহা কিছুতেই সারিতে চাহিল না। এজন্য নানারকম চিকিৎসা এবং ঔষধ-প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হইল। অবশেষে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন ঘায়ের ভিতর হইতে খুব ছোট একখণ্ড অস্থি বাহির হইয়া আসে। ইহার পরে কিছুদিন মধ্যেই ফুলা এবং ঘা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠে, শ্রীশ্রীঠাকুরও তদবধি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে সক্ষম হন।

সময় একখানা গীতা খুলিয়া, "যজ্ঞার্থং কুরু কর্ম্মাণি"—এই কথা কয়টী পড়িয়া, নিজেই ইহার ব্যাখ্যাদান-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—"যজ্ঞ মানে সেবা। তুমি যদি পারিপার্শ্বিকের সেবা কর, তা'রাও তোমাকে সেবা দিবে। যাহাতে being and becoming accelerated হয় অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি অধিকতর সম্বেগশালী হয় তাহাই সেবা আর তাহাই সৎকর্ম্ম। তুমি যদি environment-এর বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন কর, environment-ও তোমার বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করবে। কর্ম্ম করতে করতেই ব্রহ্মে পৌছান যায়, কর্ম্ম না করলে জীবনধারণ করাই যে কঠিন। আবার দেখুন, কর্ম্ম না করলে সংস্কার দূর হ'বে কি ক'রে? তবে সব কর্ম্মই যে ভাল তা' নয়। আদর্শের প্রীত্যর্থে যা' করা যায় তাই সৎকর্ম্ম, নতুবা অন্য কর্ম্মে বন্ধন আনে। আদর্শের জন্য যা' করা যায় তা'তে আর কোন নূতন সংস্কারের সৃষ্টি হয় না। কারণ তা'তে জীবনের যা'কিছু অভিজ্ঞতা তা' আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুণ সার্থক হ'য়ে উঠে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হ'য়েও কর্ম্ম করতেন—যুদ্ধ করতেন, রাজ্যপালন করতেন। ভগবান্‌কে চাই অথচ activity মানি না—এমন attitude থাকলে কিন্তু কখনই ভগবান্ মিলে না তা'তে মানুষ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে পড়ে, individual বা জাতি হিসাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিয়ে না ক'রে কাম সাধন করলে যেমন ধ্বংস ও মৃত্যু অনিবার্য হ'য়ে উঠে, কিন্তু সতী স্ত্রীর সঙ্গে কাম সাধন করলে প্রেম ও রস উথলে উঠে, তেমনি প্রেমের বৃদ্ধি ও স্থিতির জন্য ক্ষেত্র চাই, সদ্‌গুরু চাই, আর তাঁ'র প্রীতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্ম করা চাই।"

কতদিনের কথা! পদ্মাতীরে ছোট ছোট ভাঁটিবনের মধ্যে এখানে সেখানে সামান্য-বিস্তৃত পরিষ্কৃত স্থান—শ্রীশ্রীঠাকুর কত সকাল-সন্ধ্যায় তথা একাকী পাদচারণা করিতেন—কতদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত—চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু ঝিল্লীরব শুনা যাইত—আকাশের বুক-চিরে এক অপূর্ব্ব আভাযুক্ত আলোকের বিচ্ছুরণ নামিয়া আসিয়া আকাশ, বাতাস ও পদ্মানদীর জল যেন আনন্দে উচ্ছল করিয়া তুলিত। সেই আলোক-সম্পাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক অপূর্ব্ব অমৃত-ধারায় স্নাত হইতে থাকিত। দিগন্ত-বিসর্পী প্রান্তরের দিকে স্থির উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মানবের মুক্তি-কামনায় তিনি কত কি ভাবিতেন আর তাহা মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে তাঁহার প্রাণের মধ্যে কত উৎকণ্ঠা, কত আকাঙ্ক্ষা তোলপাড় করিত!

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পদ্মাতীরস্থ এই পল্লীগৃহে লোক-হিতৈষণা ও সেবার যে তীর্থক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন তাহা বাংলায় অভূতপূর্ব্ব

"ধনী আসিয়া তাঁহার সংস্পর্শে ধনমত্ততা দূর করিতে পারে, নির্ধন আসিয়া তাঁহাব সংস্পর্শে দৈন্য ও দারিদ্র্য-দোষহীন হইয়া উঠে, রোগী আসিয়া তাঁহার সংস্পর্শে ও সেবায় সুস্থ নিরাময় হইয়া উঠে। শোকমগ্ন তাঁহার প্রেমময় সহানুভূতি-উচ্ছল ব্যবহারে আনন্দময় হইয়া উঠে, অবসন্নের হতাশ মনে তাঁহার অনুকম্পী ব্যবহারে আশার লহর খেলিতে থাকে, বৃদ্ধ আসিয়া পায় নূতন জীবনের আশা-উদ্দীপনাময় অপূর্ব্ব ভরসা। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতি-প্রত্যেককে এমনই করিয়া স্বার্থে, আনন্দে, ভরসায়, উদ্দীপনায় নিরাময় করিয়া জীবন্ত ও কর্ম্মকুশল করিয়া তুলিতেছেন! সহস্র সহস্র নবনারী যুবক বৃদ্ধ আজ তাঁহার ব্যক্তিগত সেবার সংস্পর্শে নূতন জীবনের আস্বাদ পাইয়া নিজ নিজ সামর্থ্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহার সেবার পরমতীর্থক্ষেত্রকে দেশব্যাপী করিয়া তুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিচিত্র সেবায় সর্ব্বদেশকে, দেশের প্রতি-প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে শ্রী ও সমৃদ্ধিতে নূতন জীবনে উদ্ভিন্ন করিযা তুলিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন।"

যাঁহারাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহাতে কি মিষ্টতা, কি মৃদুতা, কি অসাধারণ তাঁহার মেধা, কি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, কত গভীর তাঁহার প্রেম, কি তাঁহার সেবাপটুত্ব, কি তাঁহার প্রাণজুড়ান, মর্ম্মান্তিক-দুঃখ-ভুলানো বাণী! অবস্থা-বিশেষে মানুষ কি ভাবে চলিবে, কেমন দরদপূর্ণ ব্যবহারে তাহা তিনি হাতে-কলমে প্রত্যহ সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া কত অবৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক হইয়াছে, মূর্খ পণ্ডিত হইয়াছে, হতাশা মানব আশার উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকাব সন্ধান পাইয়াছে, পশুমানব দেবমানবে পরিণত হইয়াছে! তাঁহার অবিরাম চেষ্টায় হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ-অরণ্যপূর্ণ একটী নগণ্য গণ্ডগ্রাম আজ সহস্রাধিক মানবের স্থায়ী বাসভূমিতে পরিণত হইয়া ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি মানবসভ্যতার এক আদর্শ কেন্দ্রে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। ফাঁকা আন্দোলনের হৈ-চৈ এবং অর্থপ্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়া কিংবা কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি এ-সকল কিছুই করেন নাই। বাল্যাবধি প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি, অফুরন্ত ভালবাসা ও সহানুভূতির অন্তর লইয়া এই দীন পল্লীর অবসাদগ্রস্ত প্রাণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় অপূর্ব্ব সেবামাহাত্ম্যে সকলের হৃদয় জয় করিয়া আজ তিনি এই অপার কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। সহস্র লোকের মন বুঝিয়া সকলকে প্রয়োজনমত সর্ব্বপ্রকারে তুষ্ট করিবার তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি, সবারই সঙ্গে অবাধ গতিতে চলিবার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা, সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা,

তাঁহার সমবেদনা, তাঁহার সহজ সরল চলার ভঙ্গী প্রভৃতি তাঁহার অনাবিল, পরিশুভ্র, শুচিতাপূর্ণ, অপার্থিব চরিত্র-সম্পদই তাঁহার এই বিরাট কৃতকার্য্যতা-লাভের একমাত্র কারণ।

দেশ-বিদেশের কত লোক নিত্য তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেছেন। আগন্তুকেরা কেহ বলেন—"তিনি 'লেনিন্'—কিন্তু 'লেনিনে'র নিষ্ঠুর হত্যা এবং ঘৃণা তাঁহাতে নাই"; কেহ বলেন—"তিনি অহিংস 'মুসোলিনী'—জাতির পুনর্গঠনের জন্য তাঁহার সমাজ-বিধান কেমন সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ"; কেহ বলেন—"তাঁহাব মতবাদে 'বর্গসন্' এবং 'অয়কেনের'-এর অদ্ভুত সমন্বয় রহিয়াছে"; কেহ বলেন—"দর্শনে তিনি 'পিথাগোরাস্'"; কেহ বলেন—"সক্রেটিসের মত তাঁহার আশ্চর্য্য কথোপকথন-শক্তি"; কেহ তাঁহাকে 'সুইডেন্বার্গের' সহিত তুলনা করেন; কেহ তাঁহাকে 'হিট্লারের' মত সমাজ ও ধর্ম্মনেতা বলিযা মনে কবেন—কিন্তু তাঁহাতে রক্তপাতের স্পৃহা নাই—ভূপর্য্যটকগণ তাঁহার আশ্রমকে—'আত্মোন্নতি এবং আত্মসংযমের সুন্দর ক্ষেত্র—যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই'—এরূপ মনে করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য এযাবৎকাল যাহা যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, লোকশিক্ষার জন্য তাহার প্রত্যেকটি স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইতেছেন। প্রাতরুত্থান, মলমূত্রেব বেগ ধারণ না করা, পবিত্র শুচিতার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, মিতাহার, স্বল্পনিদ্রা প্রভৃতি শরীরপালনের অতি সাধারণ খুঁটিনাটি নিয়মপালন হইতে আরম্ভ করিয়া পারিপার্শ্বিক প্রতি-প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধির জন্য স্বীয় জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্তে অনুসন্ধিৎসু কর্ম্মতৎপর সেবা, পারিবারিক জীবনে আদর্শ পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, পিতা, প্রভু ও প্রতিবেশীর ব্যবহার; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির গঠনমূলক আদর্শ কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জনমঙ্গল ও উদ্বর্দ্ধনকারী প্রাণবান্ জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টি, স্বীয় জীবনের কর্ম্ম ও দৃষ্টান্তদ্বারা সমাজসংস্কার সাধন ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহাদি প্রবর্ত্তন, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দীক্ষাদান, কল্যাণকর কিছু মনে উদিত হওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তন্মুহূর্ত্তে তাহা কার্য্যে পরিণত করা, ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতিগত সর্ব্বসমস্যা ও বিরোধ-মীমাংসার জন্য নিজের জীবন-চল্নায় সর্ব্বধর্ম্ম ও মতবাদের একমাত্র পূর্ণ পরিপূরণের বাস্তব প্রকাশ—ইত্যাদি শত শত সহস্র সহস্র ব্যাপারে তাঁহার প্রচারিত বাণী ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের

আচরণে কোথাও এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের বিন্দু পরিমাণ ব্যতিক্রম কেহ কোন দিন আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বভাবগত রুচি ও অভ্যাসের বিষয়ে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

কোন কার্য্য—ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন না-হওয়া-পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহা মনঃপূত হয় না। বিছানায় চাদরখানা পাতিতে হইবে বা খাটের উপর মশারীটী টানাইতে হইবে তাহাও কোন স্থানে একটু ঢিলা বা কোনদিকে সামান্য উঁচু, নীচু, কুঞ্চিত বা অসমান হইলে তাঁহার অস্বস্তি বোধ হয়—শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং সমতার অভাব তাঁহাকে ভীষণভাবে পীড়া দান করে। সামান্য তামাক-সাজা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক-গবেষণা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপারেই লক্ষ্য করিয়াছি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাজ্জিতরুচি-সম্পন্ন ও ছিম্‌ছাম্ কাজ তিনি সবিশেষ পছন্দ করেন। শুচিতা-জ্ঞান তাঁহার অসাধারণ। নিজের বা অন্যের শরীরের কোথাও সামান্য একটু ময়লা লাগিলে, কোন কারণে নাকে বা মুখে হাত দিলে, কোন-কিছু অপবিত্র দ্রব্য হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ জলদ্বারা সে-স্থান ধৌত করা, কোন স্থানে নোংরা কিছু চক্ষে পড়িলে তন্মুহূর্ত্তে তাহা পরিষ্কার করান— তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস। প্রত্যেকেরই পোষাক-পরিচ্ছদ ও গৃহসজ্জাদি যথাযথ পরিপাটী, সুবিন্যস্ত, শুদ্ধ ও নির্ম্মল দেখিতে তিনি খুবই ভালবাসেন। কাহারও গৃহে বা প্রাঙ্গনে ময়লা, দুর্গন্ধ, অপরিষ্কার, আবর্জ্জনা বা কোনপ্রকার অপবিত্রতা দর্শন করিলে তাঁহার মনে যারপরনাই অস্বচ্ছন্দ ভাবের সৃষ্টি হয়। আশ্রমবাসী নরনারী সকলেই যাহাতে সুরুচিসম্পন্ন হইয়া দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতঃ পবিত্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এজন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজের আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিতে কতই না চেষ্টা করিয়া থাকেন!

যে-কোন প্রয়োজনে যখনই শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরদরজা, আসবাবপত্র বা কোন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করান, তাহা যতদূর সম্ভব সাধ্যমত উৎকৃষ্ট উপকরণদ্বারা সর্ব্বোত্তমভাবে তৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দায়-সারা-ভাবে কোন জিনিষ তৈয়ার করা—তাহা যেজন্যই হউক বা যতদিনের জন্যই হউক—তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আবার কোন-কিছু যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত করিলেও অধিক দিন তিনি

সে দ্রব্য ব্যবহার করেন না, কিছুকাল পরেই সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতেই তাহা পরিত্যাগ করেন; আবার যে জিনিস একবার ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন তাহা যথেষ্ট মূল্যবান্ ও নিতান্ত প্রিয় হইলেও কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তৎপ্রতি আর দৃষ্টিপাত করেন না। কোন একস্থানে একই গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রায়শঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিতে তিনি খুবই ভাল বাসেন। এই সকল ব্যাপারে কার্য্যসম্পাদনে তাঁহার চৌকষ, পছন্দসই ও অভিজ্ঞ রুচি, ভোগে নির্লিপ্ততা, ত্যাগে নিস্পৃহতা এবং একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনের পরিবর্ত্তে চিরনূতন বৈচিত্র্যে তৃপ্তিবোধ প্রভৃতি উন্নত মনোবৃত্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সূক্ষ্মভাবে তাঁহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে কত ঘটনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ কত অসংখ্য উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বলিবার নয়। স্থানাভাববশতঃ আমরা এসম্বন্ধে আর দুই একটী মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করতঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

কর্ম্মনিরত অবস্থায় চলমান কিছু দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই তৃপ্তি পান। অচল, গতিহীন, নিথর কিছু তাঁহার মনে অবসাদের সৃষ্টি করে। তাই ইঞ্জিনের কল-কব্জা চালাইয়া কেহ কোন শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিলে তিনি খুবই আরাম বোধ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার যন্ত্রপাতিগুলিকে কত ভালবাসেন বলিবার নয়। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিতেছিলেন—"Crank, shaft, wheel প্রভৃতি নিয়া সমগ্র যন্ত্রটী যখন কাজ করে তখন আমার মনে হয় আমারই কোন প্রেয়সী যেন নড়াচড়া করছে, তারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ —হাত, পা, মস্তক, দন্তপাটী যেন যন্ত্রটীর বিভিন্ন অংশে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে, আর তা' দে'খে আমার এমনই তৃপ্তিবোধ হয় যে, যন্ত্রটীকে আমারই সেই প্রিয়ের একটী সচল জীবন্ত মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারি না।"

সর্ব্বক্ষণ মুক্ত হাওয়ায় থাকিতে তিনি খুব পছন্দ করেন। আবদ্ধ গৃহে বাস করিতে হইলে তাঁহার প্রাণ যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় কখনও গৃহের বারান্দায়, কখনও বৃক্ষতলে, কখনও বাহিরে ঘরের ছায়ায়, কখনও শ্যামল অঙ্গনে থাকিয়া অতিবাহিত করেন, রাত্রেও দিগন্ত-বিস্তৃত পদ্মার ধারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় বলিতেছিলেন—"ছোটবেলা থেকেই ভাব্‌তাম, আমি যেন তারার বিছানায় শু'য়ে থাকি, তারার বালিশ মাথায় দিই; সেই অবধি আমার কেমন একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে, বিছানায়

শু'য়ে যদি আকাশে তারার দিকে চেয়ে থাক্‌তে না পারি আমার কিছুতেই ঘুম আসে না।"

এইবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-চলনার পরমসত্য, সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের বক্তব্য সমাপ্ত করিব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটী কার্য্যের কারণ-সূত্রটীর দিকে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সমগ্র জীবনের এই অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রস্রবণের মূল উৎস ছিলেন তাঁহার জননীদেবী। জননীকে খুসী করা, তাঁহাকে তৃপ্ত করা—ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। শৈশবের দুরন্তপনা, বাল্যের খেলাধূলা, স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় লিখিত কবিতায় মায়ের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় টানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে দেখিতে পাই। এক-কথায় বলিতে গেলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব জীবন-মাহাত্ম্যের একমাত্র অন্তর্নিহিত কারণ, তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি। তাঁহার বাল্যের মধুময় প্রেমিক-চরিত্র, যৌবনের উদ্দাম-কর্ম্মোদ্দীপনা—জীবনব্যাপী পারিপার্শ্বিকের সেবায় প্রাণশক্তির যত-কিছু অপূর্ব্ব লীলা—সবই মাকে কেন্দ্র করিয়াই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। মা-ই ছিলেন তাঁহার জীবন-চলনার আদর্শ মূর্ত্ত প্রতীক, মার ভিতরেই তিনি রক্তমাংসসঙ্কুল ইষ্টের জীবন্ত বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতেন। 'তাঁহার গুরু কে' জিজ্ঞাসা করায় একদিন তিনি বলিতেছিলেন—"সরকার সাহেবই আমার গুরু। মায়ের গুরু হুজুর মহারাজকেও ছোটবেলা অবধি খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। তাঁ'দের কাউকে আমি কখনও দেখি নাই, এজন্য মনে কখনও কখনও খুবই কষ্ট হয়, তখনই মায়ের দিকে তাকিয়ে শান্তি পাই। আমার মা-ই যেন সরকার সাহেব, হুজুর মহারাজ ও অন্যান্য মহাপুরুষের প্রতীক—মা-ই আমার আদর্শ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সারাজীবন প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি ব্যাপারে জননী দেবীকে যেরূপ মান্য করিয়া চলিয়াছেন, নিত্য-নৈমিত্তিক প্রতি-ব্যাপারে যে অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন তাহা পরম উপভোগ ও শিক্ষার সামগ্রী। কত দিনের কত ঘটনায় তাঁহার এই অলৌকিক মাতৃনিষ্ঠার অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—এ জীবনে তাহা কোন দিন ভুলিতে পারিব না। প্রতিবৎসর নববর্ষ, দোলযাত্রা,

বিজয়াদশমী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীদেবীকে প্রণাম করিবার দৃশ্যটী এখনও চক্ষে লাগিয়া আছে। বিজয়াদশমী দিবসের কথাই বলিতেছি। আশ্রমের পার্শ্বেই পদ্মানদীর ধারে নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের কত প্রতিমা আনীত হইয়াছে, তীরে মেলা বসিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কখন নিরঞ্জন হইবে, কখন শ্রীশ্রীঠাকুর জননীদেবীকে প্রণাম করিবেন, কখন সহস্র সহস্র আশ্রমবাসী মাতৃদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া পরস্পরে স্নেহালিঙ্গনের উদ্দাম আনন্দে মাতিয়া উঠিবে—এজন্য সকলে কতই না ব্যগ্র! একে একে যখন সব কয়টী প্রতিমারই বিসর্জ্জন হইয়া গেল, তখন জননীদেবী তাঁহার প্রাণাধিক সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে ধান্যদূর্ব্বাহস্তে পদ্মার ধারে গৃহের বারান্দায় বসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া মাতৃচরণ বন্দনা করিতে আসিলেন। মাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নতজানু হইয়া তাঁহার পাদমূলে স্বীয় মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—অগণিত বার প্রণাম করিয়াও যেন তাঁহার সাধ মিটিতেছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববিহ্বলের মত কখনও মায়ের চরণোপরি মস্তক স্থাপন করিয়া দুই হস্তে পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন, কখনও মায়ের চরণ দুইটী দিয়া নিজের মস্তক অসংখ্যবার বোলাইয়া দিতেছেন, আবার কখনও বা পুলকাশ্রুসিক্ত-বদনে জননীদেবীর পদকমল মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিয়া আনন্দের আতিশয্যে অধীর হইতেছেন! এইভাবে ভক্তি-আপ্লুত-হৃদয়ে মাতৃচরণ-বন্দনায় তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া যাইত। সে স্বর্গীয় দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! যাঁহাদের স্বচক্ষে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাঁহারাই শুধু ইহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইয়াছেন!

এমন মাতৃগত-প্রাণ সন্তান কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি না জানি না। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন তখনও দেখিয়াছি, নিতান্ত শিশুর মত সর্ব্বক্ষণ মায়ের কোলের কাছে থাকিতে ভালবাসিতেন, মা কাছে বসিয়া অন্নব্যঞ্জন মাখিয়া না দিলে তাঁহার আহারে তৃপ্তি হইত না, মায়ের হাতের রান্না না খাইলে তাঁহার পেট ভরিত না, একদণ্ড মা-ছাড়া হইলেই যেন হাঁপিয়া উঠিতেন—মাকে যেন নিমেষে হারাইয়া ফেলিতেন। জননীদেবীর জীবিত-সময়ে প্রায়শঃ শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি,—"মা-ই যেন আমার জীবত্ব। মনে হয়, মা না থাকলে এ দুনিয়ায় থাকতেও পারব না, তাই মার জন্য এত ব্যস্ত হই, মার কাছ ছে'ড়ে বেশীদিন থাকা আমার পক্ষে মুস্কিল।" মা-ছাড়া নিজের অস্তিত্ব তিনি যেন কল্পনায়ও আনিতে

স্বামীজী মহারাজ

হুজুর মহারাজ

মহারাজ সাহেব

সরকার সাহেব

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ

পারিতেন না, তাই মা একটু দূরে গেলে বা মার শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহার প্রাণান্ত কষ্ট হইত। একবার জননীদেবীর চর্ম্মরোগ হওয়ায়, রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য তাঁহাকে কলিকাতা পাঠান হইয়াছিল। মার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন উৎকণ্ঠিত হন, সেই সময়ের একখানা চিঠিতে তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্ঘভ্রাতা ডাঃ প্যারীমোহন নন্দীকে লিখিতেছেন—"আমার যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —তাঁ'রই সেবার ভার তোমার উপর দিয়েছি—প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে—তুমি যেন তাঁ'কে আরোগ্য ক'রে, চিরজীবী ক'রে এনে, আমার পর্ণ পজার ঘরখানা কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে আলোকিত ক'রে দিতে পার—আমি দিন গুণি আর পথ-চেয়ে থাকি—সে কবে—পিতা! আর কত দিন। রোজই যেন তোমাদের দুশ্চিন্তাহরা একখানা ক'রে চিঠি পাই—আমার এই দীন অনুরোধ রক্ষা করতে কি ক্রুটী করবে ভাই ?"

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। কলিকাতায় অবস্থানকালীন জননীদেবী মরণাপন্ন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় সর্ব্বদা রোদন করিতেন, যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেন, জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন, আর বলিতেন,—"আমার মা বুঝি বাঁচিবেন না, মাকে আপনারা বাঁচাইয়া তুলুন।" যতদিন মায়ের অসুখ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেন; খাদ্য, পানীয় ও ব্যবহারের কোন ভাল জিনিস স্পর্শ করিতেন না, উদর পূর্ণ করিয়া একদিনও আহার করিতেন না। তখন তাঁহার সেই বিষাদমাখা মুখখানা দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইতে বা তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে একটা কথা বলিবার পর্য্যন্ত কাহারও সাহসে কুলাইত না। তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা, সেই ছট্‌ফটানি, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাসে বিনিদ্ররজনী-যাপন—সেই মর্ম্মান্তিক নিদারুণ অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণাধিক জীবনসর্ব্বস্ব—তাঁহার এ দুনিয়ার ধ্যান-ধারণার যাহা-কিছু—সেই মাতৃদেবী আজ আর ইহধামে নাই। একমাত্র আশ্রয়-সম্বল মাকে হারাইয়া আজ তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই—তাঁহার সেই প্রাণান্তকর শোচনীয় অবস্থা কে বর্ণনা করিতে যাইবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই করুণ বিলাপ—'নিরাশ্রয়', 'নিরাশ্রয়' বলিয়া শিরে করাঘাত—'দয়াল', 'দয়াল' বলিয়া মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ —'কোথায় আমার মা', 'কোথায় আমার মা' বলিয়া করুণ রোদন—মায়ের

শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ব্যবহৃত শয্যা-আঘ্রাণ—তাঁহার মস্তকের বালিশটী বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল ক্রন্দনে বক্ষ-ভাসান—মায়ের কত-স্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ—কতদূরের শ্মশানের দিকে চাহিয়া 'মা, তুই এলিনা', 'মা, তুই এলিনা' বলিয়া আকুল আহ্বান—কত-দিনের হৃদয়-বিদারী এইরূপ কত দৃশ্য, মর্ম্মন্তুদ কত কাহিনী যে দেখিয়াছে, যে শুনিয়াছে সেই জানে! শ্রীশ্রীঠাকুর এখন জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন, মাতৃ-বিহনে সবই ফাঁকা—সবই মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁহার কাছে। সহস্র সহস্র মানবের যত-কিছু ব্যথা-বেদনার বোঝা নিত্য যিনি অম্লান বদনে মাথায় করিয়া চলিযাছেন—সেই পরম প্রেমিক, অক্লান্ত কর্ম্মী, বিরাট পুরুষ আজ ক্ষণে ক্ষণে অসহায় শিশুর মত 'মা' 'মা' বলিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার মর্ম্মভেদী হাহাকার গগন বিদীর্ণ করিতেছে। আর সর্ব্বদা শুধু এই কথাই কত আক্ষেপ করিয়া কতভাবে কত বার কত জনকে বলিতেছেন,—"যা'র জন্য করিতাম সেই আমার আজ নাই, জীবন-মৃত্যু আমার কাছে আজ একই কথা।"

জননীদেবীর পীড়ার সময় তাঁহার ব্যবহারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সৎসঙ্গ-ভবনের দ্বিতলখানা জল, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, সেনিটারী পায়খানা, খাট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় আসবাব দ্বারা অতিশয় যত্ন-সহকারে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, মা খোলা বাতাসে সেখানে আরামে বাস করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, মায়ের অসুখ ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি আর সে গৃহে বাস করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ-কষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের বুকে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মাতৃহীন নিঃসহায় সন্তান উক্তগৃহের প্রাচীর-গাত্রে শ্বেত-মর্ম্মরপ্রস্তরের একখানা স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে নিম্নলিখিত ভাষায় মনের আবেগ প্রকাশ করিয়া মাতৃ-অভাব-জনিত নিদারুণ শোকে শান্তি লাভের জন্য কি ব্যাকুল প্রার্থনাই না জানাইয়াছেন! যথা :—

রাধাস্বামী

মা !

বড় আকুল আগ্রহে উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা নিয়েই এই ঘর আর তার আসবাব যা'-কিছুর কাজ সমাধা কচ্ছিলাম—আশা ছিল তুমি থাক্‌বে—ব্যবহার কর্‌বে—ধন্য হব আমি—তা' হ'ল না—তুমি চ'লে গেলে—পার্থিব শরীরের পতন হ'ল—আমার হতভাগ্য অদৃষ্ট কালের নিষ্ঠুর শ্লেষমলিন ধিক্কারে—মৃত্যুর মত জীয়ন্ত হ'য়ে রইল—

মনীষীরা ব'লে থাকেন মানুষ পার্থিব শরীর ছেড়ে' গেলেও আমান যেমন ছিল সূক্ষ্ম শরীরে তেমনই প্রাণ নিয়েই বেঁচে থাকে, আবার জাতিস্মর হ'য়েও নাকি সেই মানুষ জন্মাতে পারে—

মা !

মা আমার !

দয়াল যদি তাই করেন—তুমি যদি কখনও জাতিস্মর হ'য়ে এ দুনিয়ায় আবার ফিরে এস—তোমার অনুকূলকে মনে পড়ে—নিরাশ্রয় ব'লে যদি বেদনা-অনুকম্পাজড়িত হৃদয় তোমার আমাকে খোঁজই করে—তুমি এসো—এসে এখানেই থেকো—এই সব ব্যবহার কো'রো—

তোমারই

হতভাগ্য

দীন সন্তান

অনুকূল ।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া বুঝিলাম—মা-ই এ-দুনিয়ায় জীবের যথাসর্ব্বস্ব,—মাতৃ-নিষ্ঠা ছাড়া জীবন-বৃদ্ধির অমৃত-সম্ভোগ অসম্ভব; মাকে ভুলিয়াই আজ মানবের যত দুর্দ্দশা! তাই প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষা জাগে,—বিশ্বের কোটী কোটী সন্তান প্রত্যেকে মাতৃগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আজ যদি গাহিয়া উঠিত, 'জয়তু জননী মে'—বুঝি ধরায় স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিত!

উপসংহার

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে শিশু বাংলার কোন্ নিভৃতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতির স্নেহশীতল ক্রোড়ে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আশৈশব যিনি লোকসঙ্গ ভালবাসেন এবং আজীবন যিনি মানব-মনের কত বিচিত্র রহস্যের ভেদ করিয়া তাহার অপূর্ব্ব মীমাংসা দান করিতে প্রাণপাত করিতেছেন, যে দীনদরিদ্র পল্লীসন্তান আজ সেবা ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে অগণিত মানবের হৃদয়রাজ্যে তাহাদের স্ব-প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে একচ্ছত্র-সম্রাটের আসন অধিকার করিয়া আছেন, বিশ্ববাসী মানবকুলের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি-বলে নখদর্পণে রাখিয়া যিনি অনুক্ষণ নিঃসংশয়িতভাবে দৃঢ়কণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছেন এবং এই অধঃপতিত দেশের জাতীয় জীবনের সমস্যা-সমাধানকল্পে তাহার মূর্ত্ত বিকাশ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন—আর্য্যসভ্যতার মূর্ত্ত জীবন্ত-প্রতীক, জীবন-বৃদ্ধির অমৃতমন্ত্রের দ্রষ্টা—সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবন-কাহিনীর কত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশ এবং তাহার যথার্থ বিবরণের কত অণুব অণু পরিমাণ যে দীন গ্রন্থকারের দুর্ব্বল লেখনী প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। কত মানব—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, ভারতীয়-অভারতীয় নিত্য যাঁহার সঙ্গ করিতেছেন—সহস্র সহস্র মানবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া যিনি তাহাদের অন্তরে জ্ঞানালোক পাত করিতেছেন—কত-জনে কত-প্রকারে যাঁহার অজস্র করুণা সতত উপলব্ধি করিয়া জন্ম সার্থক করিতেছে—নানা-সমস্যানিপীড়িত, ব্যথিত, বিক্ষুব্ধ সমগ্রদেশবাসীর বক্ষে যাঁহার নূতন জাতীয় আন্দোলন নবীন জাগ্রত-চেতনার বিপুল প্লাবন আনয়ন করিয়াছে—ক্ষুদ্র আমি তাঁহার সন্ধান কি করিয়া পাইব?—কেহই কোন দিন পাইবে কি? প্রার্থনা আমার, স্ব-মহিমায় অত্যুজ্জ্বল-জীবন মানবের এই দরদী বন্ধু অজর, অমর, চিরায়ুষ্মান্ হইয়া মানবকুলকে অনন্ত শান্তি দান করুন। আর আসুন, জীবনের সেই চির-বাঞ্ছিত চরম-লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সঙ্কল্পে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণীর প্রতিধ্বনি করতঃ আমরাও যুক্তকরে প্রার্থনা করি—

"দদাতু জীবন-বৃদ্ধী নিরন্তরং স্মৃতিচিদ্যুতে"

শান্তি। শান্তি॥ শান্তি

পরিশিষ্ট

প্রথম স্তবক

বাল্য-রচনা

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্কুল-জীবনে রচিত অসংখ্য কবিতা, গান ও নাটকাদি হইতে নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল। রচনাগুলি তাঁহার তৎসময়ের স্বহস্ত-লিখিত একখানা জীর্ণ খাতায় যেমন পাওয়া গিয়াছে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকল তাহাই প্রকাশিত হইল।

১

It was written when my sister died

কোথা কোথা মোর প্রাণের ভগিনী
কোথায় লুকায়ে আছরে তুমি
দাদা কি তোমার এতই পাপী
তাই দেখিবে না জীবনে তুমি।
দেখিব না কিরে ও চারু বয়ান
দেখিব না কিরে জীবনে আর,
শুনিব না কিরে ও সুধা বচন
জুড়াবে না কিরে জীবন মোর ?
সর্ব্বদা বহিছে জীবনে আমার
কি ভীষণ আহা দুঃখের শ্রোত
থামিবে না কিরে জীবনে আমার
সে ভীষণ আহা দুঃখের সোঁত্
থামিবে না কেন ? থামিবে না আর।
জুড়াইয়া যাইত মনের ব্যথা
থামিয়া যাইত জীবনের মত
শুনিতাম যদি চাঁদের কথা।
শুনিব না আর জ্বলিবে সদাই
ভবের পারে জীবন আমার
জুড়াবে না আর জ্বলিবে সদাই
ভবের অনলে পরাণ আমার।

২

It was written when my mother chid me.

কেন গো মা হেন ভাব সন্তানের প্রতি,
কি দোষ করেছি মাগো চরণ কমলে ?
সদাই কেন গো হেন কোপ মম প্রতি,
সদা গালাগালি কেন কর বরিষণ ?
আমি কি গো পুত্র নয় তোমার জননী,
গর্ভে কি গো ধরনি মা অভাগা সন্তানে ?
আর আর যত তব পুত্রদের প্রতি,
সদাই সন্তোষ ভাব দেখাও জননী।
তারা যদি কাছে এসে ডাকে মা মা বলি,
প্রশান্ত হৃদয়ে মাগো উত্তর প্রদান।
আমি যদি কাছে এসে ডাকি মা মা বলি,
মোর ভাগ্যে শুধু ছাই দন্ত কড়মড়ি।
পিতার নিকটে যদি যাই গো জননী,
মিষ্ট কথা শুনিবারে মনের উল্লাসে,
তিনিও কঠোর বাক্য প্রয়োগি আমারে,
দূর ক'রে দেন মোরে সে স্থান হইতে।
মিষ্ট কথা ভালবাসি আমি গো জননী,
তাই সাধ যায় মম মিষ্ট শুনিবারে।
যেই গো জননী মোরে বলে মিষ্ট ভাষ,
অমনি তাহার আমি হই পদানত।
ঈশ্বরের কেন গো মা এ কঠিন রীতি
যে-জন যাহা চায় তাহা নাহি পায় কেন ?

৩

পিতৃমাতৃহীন বালক

একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়িয়ে হেথা
দেখ মোর মনোব্যথা
সান্ত্বনা করহ মোরে একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।
হের মোর মুখখানি
ভরা যেন দুঃখ খনি

তুলে দেও দুঃখগুলি একটু দাঁড়াও,
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

মায়ের মুরতি যেই
তোমার মুরতি সেই
মা ব'লে ডাকিব তোমা একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

মা বলিতে বড় সাধ
তাহাতে না সেধ বাদ
পুরাইব সাধ আজি একটু দাঁড়াও,
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

পুত্র বলি ডাক মোরে
শুনে ভাসি সুখ নীরে
মিটে যাক্ আশা মোর একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

ওকি দেবী গেলে চলে
দাঁড়ালে না পুত্র ব'লে—
যেও না যেও না দেবী একটু দাঁড়াও,
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

শুন মরমের বাণী,
কণ্ঠাগত মোর প্রাণী
পায় ধরি দেবী তব একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

বাল্যাবধি মা আমার
ছেড়ে গেছে অভাগার
মা বলার কেহ নাই একটু দাঁড়াও,
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

তাই সাধ দেবী তব
একবার মা ডাকিব
আহ্লাদে ভাসিবে প্রাণ একটু দাঁড়াও,
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।

৪

ভালবাসা চাই কভু এ কথাটী বল না
ভালবেসে অবশেষে পথে পথে কেঁদ না :
ভালবাসা বিষে ভরা
নাই এতে শান্তিধারা
প্রলোভনে ভুলে কভু কেও ভালবেস না
এতে শুধু অশ্রুজল
থাকে নাক হৃদে বল
অবশেষে হৃদিমাঝে পাবে শুধু যাতনা।

৫

মাতাপিতাই দেবতা

দেখিতে কি পাও জীব এ মহীমণ্ডলে
ঈশ্বর কাহার নাম ? লোকে যারে বলে।
তুমি যদি সে ঈশ্বরে দেখিতে নারিলে
কেমনে ফেলিবে ফুল সে পদ-কমলে ?
আমি বলি ভ্রম এ বিশ্বাস।
মাতা পিতা দেব দেবী এই ধরাতলে,
পূজ জীব তাঁদের তুমি ভক্তিফুলদলে।
তাঁদের পূজিলে যাবে মনোবিকার
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে অনিবার।
যেইজন মাতৃপূজা করে ধরা মাঝে,
কি করিবে শোকে, দুঃখে আর মায়া সবে
নিয়ত প্রফুল্লচিত্ত থাকিবেক তার
স্থাপহ হৃদয় মাঝে মূরতি তাঁহার,
মাতৃপূজা কর জীব কর্ম্ম যাবে কাটি
অনায়াসে পাবে স্বর্গ বলিলাম খাঁটি।
ধরণী উপরে তুমি যেদিকে চাইবে,
পিতামাতা ভিন্ন তুমি কিছু না দেখিবে।
পিতামাতা সর্ব্বময় দেখ নিরখিয়া,
পূজহ তাঁদের জীব খুলে দিয়া হিয়া।
মাতা স্বর্গ মাতা ধর্ম্ম মাতাময় সব
মাতা ভিন্ন এজগতে সকলই শব।

স্বজন পালন তাঁরা করেন জগতে
তাঁরা ভিন্ন এ জগতে কে পারে রক্ষিতে ?
জ্বালহ প্রদীপ জীব হিয়ার মাঝারে,
সমস্যা সকল তুমি ফেলে দাও দূরে।
যদি জীব ঘরে বসে চাও সিদ্ধ হতে
মা-রবটী কর সার এ ছাব জগতে।
মা ব'লে পরাণ ভরে ডেকে দেখ দেখি
ইহা ছাড়া কিছু নাহি চাবে প্রাণপাখী।
যতই ডাকিবে জীব প্রাণ যাবে গলে,
মনে হেন বোধ হবে হাতে স্বর্গ পেলে।
মা-রবটী প্রাণভরে কর উচ্চারণ
যাতনা সকল যাবে ছোঁবে না শমন।
সশরীরে দেব দেবী থাকিতে মহীতে,
নিরাকার দেবে জীব চাও গো পূজিতে ?
এখনও বলি গো তোরে ওবে ভ্রান্ত মন,
ভ্রান্তি-অতলগর্ভে পড়ো না কখন।
মাতৃপদ কর সার এ ছাব জগতে
যদি তুমি সুখালয়ে চাও গো যাইতে।
মা মা বলে প্রাণ-খুলে ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
শমন তোমার কাছে রবে যোড়করে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যত দেবগণ
মা-রব তাদের কাছে অমূল্য রতন।
এ হেন সাকার দেবে নাহি পূজে যেই
নিকট শমন তার জানে যেন সেই ॥

৬

আর কি আসিবে পুনঃ
যে গেছে চলে।
ভাসাযে আমাবে গেছে
নয়নজলে ॥
তুষানল সম জলে
হিয়াখানি পলে পলে
আর কি পাব গো তারে
শান্তির জলে।

এই যে মধুর নিশি
দশ দিশ হাসি হাসি
অভাগীর হাসি নাই
সে গেছে ছলে ॥
মধুর বিহঙ্গ গান
শুনে কেন জ্বলে প্রাণ
কে দিবে গো শান্তি দান
সে গেছে ভুলে ॥
মিছে কাঁদাকাটি করা
এ কপালে দুঃখ ভরা
শুধু ভাসে আঁখিতারা
নয়নজলে ॥

৭

আমি কত আর কি গাহিব রে—
সংসারে দুদিন রব—
কত হাসিব খেলিব—
কত নাচিব কাঁদিব—
কত সুখ দুখ সহিব রে ॥
কত তপন কিরণ
কত নিশির স্বপন
কত মনেরি মলিন
ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাবে রে ॥
কত প্রশান্ত হৃদয়
কত সুখেরি আলয়
কত কত হিমালয়
কালেরি সাগরে যাবে মিশে রে ।
কত হৃদয়ের আশা
কত কত ভালবাসা
কত চির সুখ আশা
গাহিবে সুতান ধরিয়া রে ॥

[illegible]

By

Anukul

Ch. Chakravarty

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাল্যরচনার হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

(১৩১০ সন)

৮

(আমি) যাহারে ভালবাসিয়াছি
সেই ত আমার ছলেছে হিয়া।
কতই বলেছে "আমি যে তোমারি"
ব্যথার সময় গেছে পলাইযা ॥
যারে চুমেছি আকুল পরাণে
সেই ত ছিঁড়েছে মর্ম্মটা টেনে।
বক্ষে আবেগে তুলেছি যাহারে
সেই ত গেছে পদ প্রহারিয়া ॥
(ওগো) প্রিয় কভু চাহিনি তোমায
তাই বলে তুমি ছাড়নি ত হায়।
মোর না চাওয়ায় স্থখে দুখে হায
তুমি ত কখন যাওনি ফেলিয়া ॥
তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারি
বেদনায় তুমি আরও যে আমারি
সকলেই ছেড়ে গিয়েছে আমারে
তুমি ত কখন যাওনি ছাডিয়া ॥

দেবযানী নাটক

প্রথমাঙ্ক,—১ম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—ইন্দ্রের মন্ত্রণাভবন ॥ ইন্দ্র, যম, বায়ু, বরুণ ও অগ্নি।

ইন্দ্র। মৃত্যুপতি! কতদিন আর
সহিতে হইবে এ ভীষণ অপমান।
দৈত্য-রণে বার বার পরাজিত
মোরা। দেবকুল এতই দুর্ব্বল?
হায় মৃত্যুপতি! ইচ্ছা হয় মোর
ছাড়িয়ে স্বরগ-রাজ্য যাই চলে
নিবিড় কাননে। এ ভীষণ অপমান
সহ্য নাহি হয় আর। দেব ব'লে
অহঙ্কার কোরেছিনু (একদিন)
তাও এবে গেল খর্ব্ব হ'য়ে। হায়
চক্রধর, দেবগণে এতই বিরূপ?

হায় বংশীধারী, কিবা দোষে
দেবগণ দোষী। বার বার কত
কষ্ট দিয়াছ দিতেছ তবু
কিহে মিটে নাই সাধ ?

যম। ক্ষান্ত হও সহস্রলোচন
বিপদে ধৈর্য্য ধর।
করহ মন্ত্রণা এবে
কেমনে হ'বে ধ্বংস
দৈত্য নিশাচর।

ইন্দ্র। মৃত্যুপতি! কি মন্ত্রণা
করিব আবার।
কিছুই না হইবে সফল
সকলি নিষ্ফল হবে।
ছত্রভঙ্গ দৈত্যদল হবে না
কখন। কেহ না মরিবে
কভু, যত দিন শুক্র-
দেব আছেন তথায়।
তাই বলি মৃত্যুপতি,
স্ব-স্ব কার্য্য ছেড়ে দিয়ে মোরা
চল সবে যাই চলে
নিবিড় কাননে॥
হায় বিধি! কেনই বা
হয়েছিনু অমর আমরা ?

বায়ু। ভীম পরাক্রমে মোরা
পশিনু সমরে, কিন্তু
দেবরাজ, সকলি নিষ্ফল
হলো, অবশেষে প্রাণ
লয়ে আইনু চলিয়ে।

বরুণ। দেববাজ, কি বলিব আর।
ভাসানু সমর ক্ষেত্র
জলের কল্লোলে
তাতে নাহি দৈত্যদল
টলিল তিলেক,

অবশেষে কিছুক্ষণ
করি ভীম রণ, ভঙ্গ
দিয়া আইনু চলিয়া হেথা।
দেবরাজ! হের প্রাণে
নাহি আর সাধ।
ইচ্ছা হয় যাই চলে
নিবিড় কাননে।

অগ্নি। বলবীর্য্য সব চলে
গেছে দেবরাজ,
প্রাণ মোর কণ্ঠাগত,
উপায় বিধান এবে
কর শচীপতি।

যম। দেবগণ! বিপদেতে
এতই দুর্ব্বল, মন্ত্রণা কি
নাহি জান কেহ?
চল মোরা যাই সবে
রক্ষ-দল পাশে,
পায় ধরি ঘাট
মাগি মোরা।
হায়রে, দুর্ব্বল দেবকুল!

ইন্দ্র। কেন মৃত্যুপতি!
বৃথা আর গঞ্জনা
দিতেছ? হয় নাই
কিহে এবে গঞ্জনার শেষ!

যম। কেন শচীপতি?
শুক্রদেব সঞ্জীবনী
জানেন মন্ত্র। যদি
মোরা কোন মতে
পারি শিখে নিতে
সেই মন্ত্র শুক্রদেব পাশে,
তাহা হলে জেন শচীপতি,
অনায়াসে পাবে ধ্বংস সেই রক্ষ-দল।
কেমন হে দেবগণ?······

দ্বিতীয় স্তবক

সংকীর্ত্তন গান

পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্ত্তনের সময়ের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। তখন এক-একদিন সকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সারারাত্র কীর্ত্তন চলিত। শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্ত্তনের মধ্যে অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গিমায় আত্মহারা হইতেন, সঙ্গিগণও সকলে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। দিবাভাগে বেলা ক্রমে বাড়িতে থাকিলে মাটী অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত কিন্তু কীর্ত্তনের বেগ কিছুতেই মন্দীভূত হইত না, বরং বৃদ্ধি পাইত। ইহাতে জননীদেবী প্রায়শঃ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহার আদেশে কীর্ত্তনের উঠানে জল ঢালিয়া দিয়া তাহা সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত করা হইত। এক-একদিন গভীর রাত্রিতে কীর্ত্তন অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাব-বিহ্বল অবস্থায় বিশ্রাম করিতেন। তখন কোন-কোন দিন তাঁহার লোমকূপ হইতে পিচ্‌কারীর মত আলোকরাশি বিচ্ছুরিত হইতে থাকিত এবং তাহাতে গৃহখানা অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সেই কীর্ত্তনের যুগে নিকটবর্ত্তী বহুগ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরেব চেষ্টায় অনেকগুলি কীর্ত্তনের দলের সৃষ্টি হয়। তাঁহার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সকলেই কীর্ত্তনে এমন মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, কীর্ত্তনের উৎকর্ষ লইয়া দলগুলির মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত চলিত! শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সময় বিভিন্ন গ্রামের কীর্ত্তনের দলের জন্য যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১

এস পতিত-পাবন গুরু গো
ভক্তি-মুক্তি-করে।
এস গো গুরু, বস গো গুরু থাক হৃদয় 'পরে॥
অজ্ঞান-আঁধার ঘুচাযে দাও গো
জ্ঞানাঞ্জন কর দান
(তোমার) প্রেম-পুলকে ভাসাও হৃদয়
নাচিয়া উঠুক্ প্রাণ ;
তুমি জ্যোতির্ম্ময়রূপে হাস গো
হৃদয় আকাশে ভাস গো
আজি তোমারি দীন হীন তনয়
ডাকিছে আবেগ ভরে॥

২

জাগরে মন জাগরে মন
ঘুমায়ো না আর।
একবার ভুলিয়ে সকল,
প্রেমে হইয়ে বিহ্বল,
হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ বল,
(ও মন) হরে-কৃষ্ণ ভুলে তুমি ঘুমাযো না আর ॥
কেমন মধুমাখা নাম,
শান্তি ঝরে অবিরাম,
যেমন জ্বালা হোক্ না হরি-নামেতে আরাম,
ও মন হরে-কৃষ্ণ মধুর নামটী ভুল নাক আর ॥
ও মন মরার মত আর,
ঘুমে থেক না অসাড়,
জেগে হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ বল অনিবার,
মনরে হরে-কৃষ্ণ নাম বিনা জীবের শান্তি কোথা আর ॥
তুমি যাদের ভাব রে আপন,
তারা কেহ নয় আপন,
স্বপন ভাঙ্গলে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তখন,
তখন হরে-কৃষ্ণ নাম বিনা ভবে বন্ধু নাই রে আর ॥

৩

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ
গোবিন্দ বলে সদা ডাক রে।
ছাড় রে মন কপট চাতুরি
বদনে বল হরি হরি
রাধে গোবিন্দ নামটী বদনে লইয়ে
নয়ন-নীরে সদা ভাসরে।
ছাড়রে মন ভবের আশা
অজপা নামে কর রে নেশা,
হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম্ম
অধর্ম্ম কুকর্ম্ম ছাড় রে।

৪

আজি এত দিন চলে গেল উন্মেষ নাই,
কাহার অমিয় নামে প্রাণ জাগাল ভাই।
শুনিয়া প্রেমমাখা হরে-কৃষ্ণ নাম,
পরাণ কেমন করে নাহি আরাম,
নাহিক নয়নজল মরার বিশ্রাম,
হরি যত বলি তত বলি চাই ॥
হৃদয় আকুল মম প্রাণ বিকল
হরিবল বোল বিনে মন চঞ্চল,
কে আছিস্ কোথায় তোরা হরি হরি বল
হরি বিনে আর সম্বল ত নাই ॥
পাপী তাপী তোরা কেন হতাশ
হরি হরি বল পূরিবে আশ
আকুল প্রাণে বল হরি ঘুচিবে ফাঁস,
আনন্দে আনন্দে ভাসিবি ভাই ॥
কিশোরীর ভীতি দেখে বলেন হরনাথ
কাঁদিয়া কেন প্রাণে করিস্ আঘাত,
আমি তোর অনুকূল জন্ম মরণের সাথ
হরি হরি বল কোন ভয় নাই ॥

৫

হরে-কৃষ্ণ নামে উঠ রে মাতিযা।
বল বম্ বম্ হরে কৃষ্ণ হরি,
দিযে করতালি নাচিয়া নাচিয়া ॥
ভীষণ গভীর ভৈরব তানে,
গাহ হরে-কৃষ্ণ সবে প্রাণে প্রাণে,
জড় ও চেতন যে আছে যেখানে,
ত্রিভুবন নামে উঠুক ধ্বনিয়া ॥
প্রতি প্রাণে নাম উঠুক জ্বলিয়া,
শ্মশান মশান উঠুক কাঁপিয়া,
গাহ হরে-কৃষ্ণ তাণ্ডব নাচিয়া,
ভূত প্রেত সনে থিয়া থিয়া ॥

নর কপালে তোরা দেরে দেরে তালি,
ঠোকাঠুকি হোঃ হোঃ হাস হাস খালি,
হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ বল কালী কালী,
হরে-কৃষ্ণ বলি পড় রে ঢলিয়া ॥
ভীম অট্টহাসে গগন বিদারি,
ঈশ-সিংহাসন ফেলুক আলোড়ি,
সজোরে ছিনাযে লয়ে আসুক হরি,
থাকুক বিশ্ব স্বরগ হইয়া ॥
জ্বলুক ধক্ ধক্ ঘোর-রবা জ্যোতিঃ,
বিশ্ব ঝলসিযা ফেলুক সে ভাতি,
নতুবা হবে না সত্ত্ব পানে মতি,
বজ্রানলে পাপ যাউক পুড়িয়া ॥
আয় কে বা দিবি মহাবীর প্রাণ,
হৃদপিণ্ড নামে আহুতি প্রদান,
তবেই জাগিবে বিশ্বের প্রতি প্রাণ,
নতুবা যে গেছে সে গেছে ডুবিয়া ॥
হরনাথ বলে শুনরে কিশোরী,
বল প্রাণ খুলে হরে-কৃষ্ণ হরি,
কবালেব বক্ষ ফেলরে বিদারি,
থিয়া থিয়া বিশ্ব নাচাও নাচিয়া ॥

৬

দুনিয়াদারীর খেলা ভাব্‌লে পাগল হয়ে যাবে।
আজ যে নেশায় বিভোর হয়ে আপন ভু'লে র'বে
কাল সে নেশা ছুটে গিয়ে অকূলে ভাসিবে।
আজ যে খাটে ফুলরাণী কোলে নিয়ে ঘুমাবে,
কাল হয়ত সে কোলের কাছে শ্মশান দেখ্‌তে পাবে।
আজ যে তোমার ননীর গোপাল আদরে নাচাবে,
কালকে তাহার পচা মাংস শেয়াল শকুনি খাবে।
আজ যে সুন্দরী রূপের গৌরব করিয়ে বেড়াবে,
কাল দেখ্‌বে সে খাঁদা কুৎসিৎ ভিক্ষা মেগে খাবে।
আজ যে সুন্দর রূপটী দেখে (আদরে) কোলে তুলে নেবে,
কালকে পচা কুষ্ঠ দেখে (নাকে) রুমাল দিয়ে পালাবে।

তাই বলি ভাই হরি বল কাজ কি আর গরবে
অ—বলে কিশোরী তোর সবই মিছে ভবে,
হরে-কৃষ্ণ বল রে যদি সুখে ভব পারে যাবে।

৭

আমি বেদ-বিধি ছাড়ি বেদনাহারী
হরিনাম সদা গাইরে।
হয় হোক মম লক্ষ জনম
তাহে কোন ক্ষতি নাই রে॥
ঘনাম্বুনিন্দিত শান্ত সুনীল
মূর্ত্তি যেন ভুলি নাক তিল,
নিত্য নৃত্য করে যেন মোর
চিত্ত যমুনা-পুলিনে রে॥
সন্ধ্যা আমার বন্ধ্যা হউক
তাহে নাহি কোন শোক,
তর্পণ-জল অর্পণ বিনা
রোধুক পিতৃলোক,
ঘোষুক জগতে নিন্দা খ্যাতি,
তোষুক রোধুক স্বজন জ্ঞাতি,
আমি কিছুতেই বিমল ভাতি
ভুলিতে নারিব ভাই রে॥
ক্ষুব্ধ পরাণ চাহে গোবিন্দ-
নামামৃতে সদা ভাসিতে
মুগ্ধ মানসে আত্ম ভুলিয়ে
হরি হরি বলে নাচিতে।
চাহি নাক আর শৌর্য্যবীর্য্য
চাহে না পরাণ বিশাল রাজ্য
ধর্ম্ম অর্থ কাম সকলই ত্যজ্য
মোক্ষের মুখে ছাই রে॥

৮

এত ডেকে গেল তোরা ফিরে চাহিলি না।
ভীষণ মোহের ঘোরে আঁধারে অবশ রলি,
জ্যোতিঃ এল চেয়ে দেখিলি না॥

আসিল গো সে আমার লয়ে প্রেম-প্রীতিহার
পরাতে গলায় আহা মুছে অশ্রুজল।
(তোরা) কি ঘোর আবেশে রলি, দিলি নাক কোলাকুলি
প্রিয়তমে বুঝেও বুঝিলি না ॥
জরামৃত্যু পাপভার নিয়ে গেল সে আমার,
দিয়ে হরিনাম-সুধা নিল রে গরল।
যে নাম স্মরণ-ফলে, স্তুতি গায় রিপুদলে,
পাপ তাপ কিছু থাকিল না ॥
তোদেরই রোদন-ধ্বনি শুনে কেঁদেছিলেন তিনি,
দুখে পরিত্রাণ দিতে তাই এসেছেন।
আহা কেঁদে পায় ধরে, দিল প্রেম ঘরে ঘরে,
(আর) তোরা তাবে প্রেম করিলি না ॥

৯

(ওরে) যেতে হবে আর দেরী নাই।
পিছিয়ে পড়ে রইবি কত সঙ্গীরা তোর গেল সবাই ॥
আয়রে ভবের খেলা সেরে
আঁধার করে এসেছে রে
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্ রে ভাই ॥
খেল্‌তে এলে ভবের হাটে,
নূতন লোকের নূতন খেলা,
হেথা হোতে আয়রে সরে
নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নাবিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা
আর এক দেশে চল্ রে সোজা,
সেথা নূতন ক'রে বাঁধ্‌বি বাসা নূতন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই

১০

আয়রে আয়রে আয়রে আয়
আয়রে কোলে আয়।
দেখে সজল নয়ান করুণ বয়ান পরাণ ফেটে যায়
(আমার হৃদয় ফেটে যায়) ॥

(আহা) অমল ধবল সরল হিয়ায়
তোদের কত ব্যথা লেগেছে হায়,
আয় বুকে নিই, আঁখি মুছে দিই,
(আহা ওরে) পেট জ্বলে বুঝি গেছে ক্ষুধায়,
ছাতি ফেটে বুঝি গেছে তৃষায় ॥
কত ডেকেছিস্ তাও আসি নি,
চোখে রেখেছি সাড়া দিই নি,
আমার প্রিয় মোর আয় চিতচোর
তোদের বুকে নিলে ওরে প্রাণ জুড়ায় ॥
জীবন-সম্বল পরাণ-পুতুলি
আর কেন দুঃখ আকুলি ব্যাকুলি !
সব ব্যথা যাবে চির শান্তি পাবে
দেখিস্ সুখে দুখে যেন না ভুলায় ॥

১১

তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
তোমারই ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে
ভেঙ্গে চূরে যাক্ যতেক বাসনা,
তীব্র গতিতে চলুক্ সাধনা।
(মম) মানস নয়ন জেগে থাকে যেন ধ্রুবতারা তব সাথে ॥
শত পদাঘাত সহিয়া বক্ষে,
আসিযাছি পিতা তব সমক্ষে,
হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে অবহেলা উৎপাতে ॥
(তাই) এসেছি অমৃত তোমারই দ্বারে
(মোর) ঝরে আঁখিজল শতেক ধারে
পাপী তাপী বলে ঘৃণাই পেয়েছি, আশীষ্ পাইনি মাথে ॥
জেনেছি দয়াল প্রেমপরাৎপর
(তোমার) পাপীর ব্যথায় আঁখি ঝর ঝর
দুহাত প্রসারি হে অমৃত প্রেমী লহ কোলে রাখ সাথে ॥

১২

মহাশক্তি ঘুমায় তোর হৃদয়ে
তুই কেন রে মড়ার মত ;
একবার রাধা-নামের ধ্বনি দিয়ে
শক্তিটাকে জাগিয়ে নেত।

ভাবসমাধি-স্থানের অন্যতম দৃশ্য

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহনের বাড়ীর আম্রবৃক্ষতল)

(আমার) মন্দাদৃষ্ট বলে কেন
(তুই) থাকিস্ ওরে বসে হেন,
(ও তুই) রাধা বলে ডাক্‌তিস্ যদি
ভাগ্যলিপি বদ্‌লে যেত।
(তুই) যা না ওরে আপন ভুলে
ডাক্ না রাধা পরাণ খুলে
দ্যাখ্ তোর ধ্যানে রাধা জ্ঞানে রাধা
মন রাধা-ছাড়া করিস্ না ত।
(তুই) হৃদাকাশে দেখ্ না চেয়ে
(হায় রে) কালমেঘে গেছে ছেয়ে
ও তুই রাধা-নামের শিঙ্গে ফুঁকে
মেঘখানি গলিয়ে দেত।
মধুর প্রেম-ভক্তির বৃষ্টি-ধারায়
দেখ্‌বি জগত কেমন ভাসায়
ওই মেঘখানি সব বর্ষে গিয়ে,
হবে বিশ্বপ্রেমে পরিণত।
হরনাথ* বলে কিশোরী রে,
থাকিস্ না আর ঘুমের ঘোরে।
সবার অনুকূল সেই শক্তি,
জাগ্‌লে ভয় থাকে না ত।

* অনেকগুলি গানের ভণিতায় "হরনাথের" নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্ত্তনের যুগে "ঠাকুর হরনাথের" নাম বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতের নানাপ্রদেশের বহুলোক তখন এই মহাপুরুষের শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কীর্ত্তনের দলের মুখ্য ব্যক্তিগণ—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন, যদুনাথ পাল, কোকন, তরণী প্রভৃতির অন্তরে ইষ্ট-নিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত করিবার মানসে যুবক অনুকূলচন্দ্র সর্ব্বদা বিশেষভাবে তাহাদিগের নিকট ঠাকুর হরনাথের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তাঁহার উপদেশাবলী ও কুমারনাথের গীতা পড়িয়া শুনাইতেন, এমন কি হরনাথের সঙ্গ করিবার জন্য তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় 'হরনাথের' নাম যোজনা করিয়া স্বরচিত অনেকগুলি সঙ্গীত প্রচার করিয়াছিলেন। কোন কোন সঙ্গীতে 'হরনাথের' নামের সঙ্গে তাঁহার নিজ নাম "অনুকূল" কথাটারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিশোরীমোহন-প্রমুখ উক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ ঠাকুর হরনাথের সঙ্গ করিতে করিতে তাহার নিকট অনুকূলচন্দ্রের অপরিসীম গুণগ্রামের সন্ধান জানিতে পারিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং অবশেষে তাঁহাকে শ্রীগুরুপদে বরণ করেন।

তৃতীয় স্তবক

শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু-আবির্ভাব মহামহোৎসবের আহ্বান-পত্র

সদসদ্ ভেদাতীতং পরমপুরুষমেকং।
তারয়িতুমবতীর্ণং নিখিল মানবকুলং ॥
ধৃত-সহজ-সমাধি-আনন্দ-ঘনমূর্ত্তিম্।
প্রেমবিগলিত-চিত্তং বিশ্বগুরুং তং নমামঃ ॥

বহুস্থানে বহুরূপে অংশ মাত্র যাঁর
ঘোষিত হতেছে এবে বলি অবতার,
নিখিল মানবকুল উদ্ধার কারণ
যে নরবিগ্রহে তাঁর পূর্ণ প্রকটন।
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব উচ্চ সমাধি মগন
হ'য়ে যেই করে ভাব-বাণীর ঘোষণ ;
পরমপুরুষ সেই সর্ব্বভেদাতীত,
জীব তরে হ'য়ে প্রেমে বিগলিত চিত ;
ঘনানন্দ মূর্ত্তি ধরি কৈল আগমন,
পাপী পায় শান্তি যাঁরে করি দরশন ;
হেন সে শ্রীবিশ্বগুরু বিগ্রহ মূরতি
সাষ্টাঙ্গে শ্রীপদে তাঁব করিগো প্রণতি ॥

বর্ত্তমানকালে ত্রিতাপক্লিষ্ট জগত শান্তি শান্তি করিয়া ব্যাকুল হইয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মের সাধক মনীষিগণ এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছেন যিনি এই ধরাধামে শান্তি-বারি সেচন করিবেন। খ্রীষ্টান বলিতেছেন যীশু আসিবেন, মুসলমান বলিতেছেন ইমাম মেহেদি আসিবেন, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ বলিতেছেন মৈত্রেয় আসিবেন, হিন্দু বলিতেছেন কে আসিবেন জানি না—তবে এক মহাপুরুষের আগমনের পূর্ব্ব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতেছে বটে। কোনও কোনও সাধক এমনও বলিতেছেন যে, তাঁহার আগমন হইয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি গোপনে আছেন, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবেন। ইহার স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কেহই করিতে পারিতেছেন না।

কিন্তু আমরা জানি তিনি এবার আর একাধারে নহেন—সমস্ত পৃথিবীর জন্য বহুভাগে বিভক্ত হইয়া বহু স্থানে বহু মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীবিবেকানন্দ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে 'যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা' দেখিয়া 'তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব' করিতে বলিয়াছিলেন, আজি বিশ্বমানবের সেই পরিপূর্ণ মহাশক্তির পূর্ণ লীলা-দর্শনের সময় উপস্থিত। উহা আর কল্পনার বিষয় নাই, এই বাস্তব জগতে উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। পুণ্যালোকোদ্ভাসিত কোটী-কোটী-সূর্য্যকিরণ-সমুজ্জ্বল আনন্দময় দিব্যধামে গমনের স্বর্ণ সোপান প্রস্তুত—দিব্যধাম-নিবাসী দূতগণ দ্বারে দণ্ডায়মান, দয়ালু মহর্ষিগণ পতিতোদ্ধারে প্রসারিত-হস্ত, সত্যলোকবাসী মুক্ত পুরুষগণ, দ্বারে দ্বারে প্রেমসুধা বিতরণে নিযুক্ত। যদি এই মহাপ্রেমের আকর্ষণে আকর্ষিত না হও, যদি ব্রহ্মর্ষির প্রসারিত-হস্ত উপেক্ষা কর, যদি দ্বারে-প্রস্তুত রথ প্রত্যাখ্যান কর—তবে তোমার গভীর যন্ত্রণায় সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য একটীও প্রাণী বিদ্যমান থাকিবে না। হয়ত খর্ব্ব-নিখর্ব্ব যুগব্যাপী অজ্ঞানতার ক্রোড়ে মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিবে এবং কে জানে কত যুগ-যুগান্তর, ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত হইবে। বহুস্থানে বহুভাগে আবির্ভূত মহাপুরুষগণের নেতৃত্ব-গ্রহণের জন্য শ্রীভগবান্ যে নরাকার-বিশিষ্ট দেহাবলম্বন করতঃ মহাভাব বা সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থা হইতে ভাববাণীর দ্বারা মহাপুরুষগণের পথ-নির্দ্দেশ এবং জীবসাধারণের মুক্তি অনায়াসলভ্য করিয়া বিশ্বকে মহাকর্ষণে কেন্দ্রমুখী করিতেছেন, সেই পরমপবিত্র শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর চিন্ময়-দেহ এই ধরাধামে অবতরণের তিথিতে আমরা মহামহোৎসব জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছি। হে মানব! যদি ইহা বিশ্বাস করিতে, ইহা ধারণা করিতে অক্ষম হও,—তথাপি বলি আইস—তোমার সন্দিগ্ধ চিত্ত লইয়াই শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর চরণতলে উপস্থিত হও এবং যতদূর সাধ্য পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর—কিন্তু স্মরণ রাখিও সাধনশক্তি সহায়ে গুরু পরীক্ষা করিতে হয়। শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু পরীক্ষা করিতে কত অধিক সাধনশক্তি আবশ্যক তাহাও মনে করিও। আমরা নগণ্য, ক্ষুদ্র, সাধনসম্পদহীন জীব হইয়াও তাঁহার অহেতুকী কৃপালাভে ধন্য হইয়াছি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি যে, যাঁহার সাধনশক্তি যত অধিক, তিনি শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুকে তত অধিক পরিমাণে চিনিতে ও জানিতে পারিবেন। অতএব আইস ভাই সকল, আইস বন্ধুসকল, যাঁহার যেভাবে ইচ্ছা আইস, সহজ সরল বিশ্বাসে আইস—যুক্তি তর্ক বিচার লইয়া আইস—অন্ধ বিশ্বাসে আইস বা সাধনশক্তি লইয়া পরীক্ষা করিতে আইস—যেভাবে ইচ্ছা একবার তাঁহার সমীপস্থ হও এবং মহাভাব বা সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থা দর্শন ও তদবস্থায় ঘোষিত ভাববাণী শ্রবণ কর,—তৎপর যেরূপ অভিরুচি হয়

করিও। একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ হইয়া থাকে তবে—এই অতিমানব-প্রেমসাগরের নিকটস্থ হইলে তুমি প্রেমে বিহ্বল হইয়া যাইবে—হাসিবে, কাঁদিবে, নাচিবে, গাহিবে, কত কি করিবে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় কে জানে কোথায় তিরোহিত হইবে। পরিশেষে চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে চিরনিমগন হইতে হইবে। ইতি—

মহোৎসবের স্থান—কুষ্টিয়া, ই, বি, আর, (নদীয়া)
তারিখ—২৮শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর; ২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর;
বার—শনি, রবি; সন—১৩২৫।
কার্য্য-বিবরণী—কীর্ত্তন, ধর্ম্মবক্তৃতা, আলোচনা, আবৃত্তি এবং ভোজ্য, পানীয় ও বস্ত্রাদি দ্বারা দরিদ্রনারায়ণ সেবা।

বিনীত নিবেদকগণ

শ্রীহরিশচন্দ্র রায়, উকীল
শ্রীগোকুলচন্দ্র মণ্ডল, এল্‌-এম্‌-এস
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সেন, উকীল
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, মোক্তার
শ্রীসতীশচন্দ্র জোয়ারদার, এল্‌-এম্‌-পি
শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, মোক্তার
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, বি-এল
শ্রীপ্রমথনাথ শিকদার, বি-এল্‌
শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা, উকীল
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরাজ, বি-এ

চতুর্থ স্তবক

"অমিয়বাণীর"* ভূমিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয়

এই "অমিয়বাণীর" বক্তা কে, অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উঠিবে। তাঁহার পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম, একথা অকপটচিত্তে স্পষ্টভাবে স্বীকার করাই ভাল। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাও নিঃসঙ্কোচে স্পষ্টভাষায় বলিতে পশ্চাৎপদ হইব না। কেহ বলেন তিনি মহাপুরুষ, কেহ বলেন অবতার, কেহ বলেন জগদ্‌গুরু; কেহ বলেন তিনি নাজারেথের যীশু, কেহ বলেন তিনি নদীয়ার গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, কেহ বলেন তিনি রামকৃষ্ণ। আমরা এইরকম কিছু-একটা বলিয়া তাঁহাকে বড় বা ছোট করিতে চাহি না। আমরা দেখিতেছি তিনি আমাদেরই মত একজন মানুষ। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাই না। অবতার বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন। পূর্ণাবতার, অংশাবতার, আবেশাবতার ইত্যাদি অনেক শ্রেণীর অবতার আছেন। কেহ বা প্রথম জীবনে সাধক থাকিয়া পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া অবতারত্ব লাভ করেন; কেহ বা আজন্ম পূর্ণ থাকিয়াও লোকশিক্ষার্থ অশেষবিধ সাধন করিয়া থাকেন; কেহ বা জন্মাবধি পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধনভজনের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন না, আবার কেহ বা সাধকভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মধামে উপনীত হইয়া আবার মানুষের পদবীতে অবরোহণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আবার কাহারও কাহারও মতে পূর্ণব্রহ্মের অবতার হওয়া অসম্ভব। কাহারও মতে সকল অবতারই পূর্ণাবতার, অংশাবতার অসম্ভব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সকল মানুষই অবতার। অবতার সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মত যখন প্রচলিত, তখন আমাদের এই মানুষটীকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার সার্থকতা কোথায়, আর তাহাতে লাভই বা কি? সে কারণে "অমিয়বাণীর" বক্তাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া অবতারের অর্থ ও স্বরূপ লইয়া অশেষবিধ যুক্তিজালের অবতারণপূর্ব্বক একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিবার কিছু প্রয়োজন আছে বলিযা মনে করি না। বহু মানুষ নিত্য তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেছেন, এবং বহু জনে তাঁহাকে বহুভাবে দেখিতেছেন।

* শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মহাশয় ১৯২১ সনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত কতকগুলি বাণী সঙ্কলন করতঃ এই গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভূমিকার লেখক প্রথম দর্শন ও প্রথম পরিচয় লাভ করিয়া মনে করিয়াছিল, ইনি নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, আবার নূতন কলেবরে আসিয়াছেন। তারপর এই তাণ্ডবনৃত্যকীর্ত্তন-প্রচারক ভাববিহ্বল মানুষটীকে নদীয়াবিহারী গৌরাঙ্গ ঠাকুর বলিয়াই ভ্রম হয়। পরে কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার ভিতরে পরমপিতার প্রিয়পুত্র যীশুর অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, পুনশ্চ ঘন পরিচয়ে বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধ ও চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ বলিয়াই ভ্রম হয়। আমার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধারণার মূল্য কতটুকু তাহা কতক পরিমাণে বুঝিয়া এখন নিরস্ত হইয়াছি।

আসল কথা, তাঁহার পরিচয় দিবার ক্ষমতা বা ভাষা আমাদের নাই। তবে একটা কথা না বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না। তিনি আমাদেরই মত মানুষ ; কিন্তু তিনি অতি অদ্ভুত প্রকারের মানুষ। যে কোন একজন সাধারণ মানুষকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া তাহার পরিচয় দেওয়াই যখন আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার, তখন এই অদ্ভুত মানুষটীর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় আমি কেমন করিয়া দিব ? যাঁহাকে চিনিতে গিয়া, ধরিতে গিয়া পদে পদে নিজ বুদ্ধির উপরে ধিক্কার আসিয়াছে—যাঁহার ভাবে, পরমসুন্দর মুখাবয়বে, নয়নযুগলের চাহনীর ভঙ্গীতে, কার্য্যকলাপে, নিত্য নূতন রসের সঞ্চার দেখিয়া অবাক হইতেছি, কি বলিলে তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় তাহা সত্যই আমি জানি না। যিনি কখনও জননীর মত স্নেহভরা বুকের ভিতরে আমাদিগকে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন, এবং আবেগপূর্ণ শতচুম্বনের পুণ্যবর্ষণে আমাদিগের পাপতাপ বিধৌত করেন, কখনও পিতার অধিক যত্নে গম্ভীর অথচ করুণ উপদেশে আমাদিগকে যেন হাত ধরিয়াই সত্যের পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যাকুল—যিনি কখনও ছোট ভাইয়ের মত আব্দারে মনপ্রাণ কাড়িয়া লন, কখনও প্রভুর মত সেবা গ্রহণ করেন, কখনও দাসানুদাসের মত আমাদের পদ ধৌত করিয়া দেন, কখনও প্রাণপ্রিয় সখার মত নিবিড় আবেষ্টনে বাঁধিয়া বালকের মত ক্রীড়ারত হন—যিনি কখনও শিশুর মত চপল লীলাভঙ্গী করেন, আবার কখনও বা জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠের মত তত্ত্বকথার গম্ভীর আলোচনায় রত থাকেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া আমাদের বুক হইতে টানিয়া দূরে সরাইবার চেষ্টা করিলে আমরা অবশ্য প্রতিবাদ করিব। তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা, তিনি আমাদের চতুর মন্ত্রী, আমাদের পরমগুরু ; তিনি আমাদের ভ্রাতা, তিনি আমাদের প্রাণপ্রিয় সখা, নিতান্ত আপনার জন।

যিনি সকল প্রকার অলৌকিকতা হইতে সতত দূরে অবস্থান করিতে চাহেন—যিনি নিজে অতিপ্রাকৃত কিছু করিতে না চাহিলেও, যাঁহার সংস্পর্শে

আসিয়া কত তথাকথিত অধমজনে কত অলৌকিক অসাধ্য সাধন করিতেছেন —প্রেমের বন্ধনে আমাদের সহিত একাত্ম হইয়া যিনি আমাদের অন্তরের সকল কথা, সকল ভাব, সকল ভঙ্গীই সহজভাবে জানিতেছেন—যাঁহার দর্শনে হৃদয় হইতে সকল দুর্ব্বলতা দূরে পলায়—যাঁহার নবনীতকোমল চন্দন-শীতল অঙ্গস্পর্শে সকল শোকতাপ নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়—যাঁহার ভুবনবিজয়ী হাসিতে আর চাহনীতে কত সহস্র মানুষ বাসনাসক্তির দৃঢ় পাশ হেলায় ছিন্ন করিয়া সংস্বরূপের দিকে বেগে আকৃষ্ট হইতেছেন—যিনি কৃতবিদ্য না হইয়াও পরাবিদ্যাগৌরবে নিখিল শাস্ত্রযুক্তির অধিকারী—যাঁহার কথায় সকল সংশয় ছিন্ন হয়—সাধু, অসাধু, দাতা, কৃপণ, ত্যাগী, লোভী সকল মানুষেরই অবস্থার অনুভূতির সহিত যাঁহার সম্যক্ পরিচয়—ভাষায় এরূপ অদ্ভুত মানুষের পরিচয় কেমন করিয়া দিব ?

আমরা এই মানুষটীকে অবতার খাড়া করিয়া একটা দল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। এই অদ্ভুত মানুষটীকে—এই নূতন যুগের নূতন মানুষটীকে—আমরা অবতার পুরুষগণের সহিত একাসনে বসাইব না। যাঁহার বাণী প্রকাশিত হইতেছে, তিনিও নিজেকে অবতাররূপে প্রচার করিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় কোন দিন দেন নাই। বরং তাঁহাকে এ সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ তীব্র প্রতিবাদ করিতেই শুনিয়াছি। এই মহাযুগের প্রথম প্রভাতে নূতন ভাবে নূতন মানুষ গঠন করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন মাত্র। তাঁহার ভাব, তাঁহার কথা অতি স্পষ্টভাবে অতি সহজভাবেই তিনি বলিতেছেন—সে ভাব ও ভাষার ভিতরে নিখিলতত্ত্বই নিহিত আছে, কিন্তু তাহার ভিতরে শাস্ত্রদর্শন-সুলভ জটিলতার লেশমাত্র নাই। আমরা তাঁহার বাণীর, তাঁহার দ্বারা প্রচারিত সত্যের প্রচারেই ব্রতী হইয়াছি। তিনি মানুষ হউন, অতি-মানুষ হউন, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আর যদি "অবতার" শব্দের একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের নির্দ্দেশ করিয়া সেই অর্থে তাঁহাকে কেহ অবতার বলেন, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। তবে আমাদের প্রাণের কথাটা এই যে, তাঁহাকে সহজ মানুষরূপে গ্রহণ করিতে কোন মানুষের কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না, এবং নিজ জীবনে তিনি যে আদর্শ দেখাইতেছেন, সেই আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সকলেরই লাভ হইবার সম্ভাবনা। * * *"

পঞ্চম স্তবক

আধুনিক রচনা

কয়েকখানা চিঠি

১

মাণিক মেয়ে,

যার বর্দ্ধন-উদ্‌গ্রীব-বিজন দীপ্তি তার আকাঙ্ক্ষিতকে নিতান্ত একান্ত করিয়া যাহা-কিছু সব দিয়া সবের ভিতর ঊর্দ্ধগ উজ্জ্বলে প্রতিষ্ঠা করে—আর তাহাই যার সহজ প্রিয়-উপভোগ, সেই তো মেয়ে, সেই ত নারী—আবার সেই হ'ল জননী হবার উপযুক্ত পাত্রী।

লক্ষ্মী আমার মানুষের চাওয়ার চলাই যে তাব স্থান নিজেই সৃষ্টি ক'রে নেয়—স্থানের চিন্তায় তাকে বিব্রত থাকতে হয় না। আমার রাধাস্বামী জান্‌বি, আর যাঁরা যাঁরা জান্‌লে সুখী হন জানাবি। ইতি—

তোদেরই আদুরে "আমি"

২

স্মরজিৎ!

প্রিয় আমার—আমার অভ্যুত্থানের সহযাত্রী—অক্লান্ত সৎসঙ্গ-সেবক যতীন রায় ত গেল—সে গেল একটা জীবনব্যাপী মহা ঝঞ্ঝার সাথে লড়াই করতে করতেই—তার কৃতার্থ হবার মুকুট পরা আর হল না। যদি অভিষেকের সমারোহকে সেবা করতে পার—তা তোমরাই পার।

কিন্তু সে আমার মাথায় তার পরিবার পরিজনের গুরুভার চাপিয়ে গেছে। চাপে হয় ডুববো, না হয় হজম করবো।

ভাই স্মরজিৎ, আমি তোমার কাছে প্রতি মাসে পাঁচটী টাকা করে' চাইছি, তুমি যতকাল এ দুনিয়ায় বেঁচে থাক আমায় দেবে। দেবে না স্মরজিৎ? যদি দাও ঠিক নিয়মমত দিও এই আমার ভিক্ষা। রাধাস্বামী জেনো।

তোমারই অপটু ভারাক্রান্ত "আমি"

৩

লক্ষ্মী আমার,

তুমি কাহারও পয়সার চাকরাণী হও এ আমার মোটেই ইচ্ছা করে না—আর্য্যনারী চিরদিনই প্রাণের চাকরাণী, পয়সার নয়। কেন, তা কেন হ'তে

যাবে? কারণ প্রকৃত আর্য্যনারীই যে স্বয়ং লক্ষ্মীরই নানা মূর্ত্তির আবির্ভাব—সে লাখ জন্ম বিকট দুঃখে নিষ্পেষিত হলেও তার বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করতে কিছুতেই রাজী নয়। তুমি বিনা বেতনে লাখ খেটে যাও—আমার মাথার মুকুট উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তোমার মা বাবা যদি বেতন নিয়ে চাকরী করতে বল্লেন আমার আপত্তি নেই—দুঃখিত হব না—অপমানিত হলেও—ভাব্‌ব আমার এই-ই প্রাপ্য। বাধাস্বামী জেনো, সবাইকে দিও। ইতি—

৪

কল্যাণীয়া,

জীবন যার যজ্ঞ, পূজা যার প্রাণ, স্তুতি যার স্তোত্র, সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি করাই যার বৈশিষ্ট্য, বাধা ও বিপদকে শুভে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইষ্ট আরাধনাই যার তৃপ্তিময়ী বৃত্তি—সে কি দূরে থাকে? কল্যাণ কেন তাকে পূজা করবে না? সে যে মর্ত্ত্যেই স্বর্গের পারিজাত।

তোমারই নিতান্ত দীন "আমি"

৫

কল্যাণী।

দেখ্‌তে ইচ্ছা করে successful তোমাকে—অতি নমনীয়া—অতি কমনীয়া—বিদ্যাবুদ্ধির অভিমানের লেশমাত্রও দেখা যায় না—একটা সামান্য অশিক্ষিত বা বালক বালিকার কাছেও যেন এত সহজ, এত সম, এত গ্রহণ-উদ্‌গ্রীব, জ্ঞানগরিমাশূন্য—দেখে যেন অবাক না হয়েই উপায় নেই—তবুও আদর্শপ্রাণনে, তদ্‌গরিমায়, তদ্‌স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় মহান্ শক্তিশালিনী, জ্ঞানবৃদ্ধা, অটুট ও আপ্রাণ—বজ্রাদপি কঠোর, ফুলের চাইতেও কোমল—এমনতরই তার চরিত্র, এমনতরই তার চল্‌না—আবার এরই ভিতর সে বিদ্যুতের মতনই চপল ও ক্ষিপ্র, বজ্রের মতনই দক্ষ ও নির্ঘাত তথাপি অরোরার মতন বা স্থির সৌদামিনীর ন্যায়ই সুন্দরী হয়েও সতীত্বের সর্ব্বহারা কূট ও কঠোর, নিষ্ঠুর সদর্পী, মানুষের বাঁচাবাড়ায় যেন প্রত্যক্ষ নরনারায়ণী! মানুষের আশা কি এত-ও ভাব্‌তে পারে।

তোমারই আশাপথ-চাওয়া "আমি"

কতিপয় বাণী

১

তোমার অপকর্ম্মের জন্য অন্যের ঘাড়ে লাখ দোষ চাপাও, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না ; কিন্তু যতক্ষণ না তুমি দোষদর্শিতাকে উপেক্ষা করতঃ সেবা ও অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণে উন্নতচরিত্র হইতেছ, তোমার অভ্যুত্থান তমসাচ্ছন্ন।

২

ভক্তি, আনতি বা আসক্তি সেইখানেই সার্থক ও সন্দীপশালিনী, যেখানে তা' প্রেষ্ঠের অভাবনীয় ও অবাঞ্ছনীয় দুরূহ দুর্ব্ব্যবহারেও প্রেষ্ঠস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতায় অটুট, শতদায়িত্বপূর্ণসন্ধিৎসামুখর সানুকল্পী শ্রদ্ধাবনত প্রেষ্ঠপ্রাণসেবাপ্রবণতা-সমুজ্জ্বল, প্রশ্নশূন্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ !

৩

তুমি যদি তোমার দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবনের অকল্যাণ হইতে যথাসম্ভব নিষ্কৃতিই লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার পারিবারিক উদরান্নসংস্থিতি-আহরণী হইতে তোমার ঋত্বিক ও যাহারা তাঁর হইয়া তোমার দৈনন্দিন জীবন-বৃদ্ধির উৎকর্ষে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁদের ভরণপোষণের অনুকল্পে অন্ততঃ একটী পূর্ণরৌপ্যমুদ্রা বা তদনুপাতিক ভরণীয় দ্রব্যসম্ভার প্রতিমাসে তোমার প্রিয়পরমকে তাঁর যথেচ্ছ-নিয়ন্ত্রণকামনায় নিবেদন করিতে কিছুতেই কুণ্ঠাবোধ করিও না—আর ইহা ততদিন পর্য্যন্তই যতদিন তাঁহারা বাক্ ও বাস্তবকর্ম্মে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপন্ন থাকিবেন। এই বাস্তবদান-সংস্রবী সম্বন্ধের ভিতর দিয়া দেখিও তোমার দৈনন্দিন জীবন কি সঞ্জীবিত চলনায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে !

৪

তোমার প্রেষ্ঠ বা আদর্শের প্রতি কোন অন্যায় বা অপঘাতকে তুমি বুঝ্‌তে পারলে না অথবা বুঝেও কঠোর প্রতিবাদ না ক'রে একটা সমর্থনসূচক উস্‌কানি ভণ্ড প্রতিবাদ ক'রে এলে—নিশ্চয় জানিও অন্যায় বা অপঘাত-বুদ্ধি তোমার ভিতরেও আছে,—তুমি নিজেও সে দোষে দোষী।

৫

যে নিজে দোষ ক'রেও অন্যকে দোষারোপে নিজের ভালত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়—সবাই বুঝ্‌লেও, অন্যায়ে অনুতপ্ত না হ'য়ে নিজের মূর্খ

দুঝমান ফন্দীবাজি তৎপরতায় জিদের সহিত তা' অস্বীকারে আক্রোশ-পরবশতায় আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল—সন্দেহ করিও ঘৃণ্য ও পৈশাচিক চরিত্র লুক্কায়িত সেইখানে।

৬

যে দুর্ভাগিনী সশ্রদ্ধ সম্মানে তার পূজনীয়া সপত্নীর স্বামীতুল্য সেবা-সম্বর্দ্ধনার সহিত আদেশ-পালনরতা হইয়া কল্যাণবাহিনী না থাকে তার ইহ এবং পর দুই কালই জীয়ন্ত যন্ত্রণানরকে দুর্ব্বহ হইয়া থাকে।

৭

তুমি কোন বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার আদ্যোপান্ত ধৈর্য্যসহকারে না শুনিয়া ও বুঝিয়া কোন পক্ষকেই সমর্থন করিও না। আর বুঝিতে হইলেই বিচার করিয়া দেখিও, তাহার কতখানি তোমার ইষ্টানুকূল। ইহা স্থির করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুকম্পার সহিত নিরপেক্ষই থাকিও। তারপর সমর্থনযোগ্য হইলে যেখানে যেমন করিয়া করিলে শ্রেষ্ঠপূরণী, শোভনীয় ও সুন্দর হয় তাহাই করিও। জানিও, ইহার ব্যত্যয়ে অনেক জায়গায়ই মানুষ অকারণ অসঙ্গতি ও সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণই করিয়া থাকে।

৮

তোমার নিকট খাতির পাবার প্রত্যাশা যার লেশমাত্রও মনে উঁকি মারে না অথচ তোমাকে খাতির দিয়ে ধন্য হইবার পাগল-করা ঝোঁকে সে নতুন নতুন ফুরসুৎ খুঁজে বেড়ায় ও নিরন্তর সত্যি সত্যি তা কাজে ফলিয়েই তোলে—নিশ্চয় বুঝিও, সেই তোমাকে ভালবাসে।

৯

অন্যের দোষ দেখ্বার প্রবৃত্তি যত আগ্রহাতিশয্য সৃষ্টি ক'রে তোমাকে তৃপ্তিআতুর ক'রে তুল্বে—নিশ্চয় জেনো নিজদোষ-নিয়ন্ত্রণ-উপেক্ষা তোমাকে তত কঠোর বিড়ম্বনায় দীনতার আসনে সমাসীন কর্বে।

১০

সমবেদনাপূর্ণ স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহের সহিত তোমার অসুবিধা নিরাকরণে যেই হোক না কেন—কিঞ্চিৎমাত্র অসুবিধাকে সহ্য করিয়াছে বা করিতেছে তুমিও তার জন্য তোমার সাধ্যানুপাতিক, যত পার, তার সুবিধাপ্রযত্নে তৎপর থাকিয়া যাহাতে অসুবিধা নিরাকরণ করিতে পার তা করিও-ই ;—কৃতজ্ঞতা দেদীপ্যমান আগ্রহে তোমাকে অভিনন্দিত করিবে—কৃতার্থ হইবে।

১১

অযুতঝঞ্ঝার উল্লম্ফীবুকে দুর্দ্ধর্ষ জীবনে উৎসরণশীল হ'য়েই যদি চল্তে চাও, তবে তোমার বাঁচার একমাত্র প্রলোভনই হোক শ্রেষ্ঠ-প্রয়োজন ; আর

তুমি তোমার পরিবার, তোমার পারিপার্শ্বিক, তোমার সেবা, সম্বর্দ্ধনা, আয় ব্যয় ইত্যাদি যাই-কিছু হোক—সবই যেন সম্যকাগ্রহে স্বতঃনিয়ন্ত্রণে অকাট্য সাহস-সচ্ছল-আবেগ-উৎকণ্ঠার সহিত তাঁতেই নিয়োজিত হয়, কৃতকার্য্যতার পুষ্টিপূরণী তৃপ্তি-অর্ঘ্য নিয়ে—তোমার ভরদুনিয়ায় তাঁর চাইতে যেন কেহই থাকে না, কিছুই থাকে না—জীবনের বেগ ঝড়কেও অতিক্রম করিবে।

১২

যেখানে বা যাঁহাকে দিবার প্রবৃত্তি আগ্রহমুখর হ'য়ে ওঠেনি বা যাঁহাকে পোষণ, পুষ্ট ও তুষ্ট করা তোমার জীবনে অকাট্য হ'য়ে ওঠেনি—ঠিক বুঝিও, সেখানে বা তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ প্রকৃতই হ'য়ে দাঁড়ায়নি—আবার সম্বন্ধের এই প্রকৃতত্বের উপরই মানুষের বাস্তব চলনা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে।

১৩

অভাব, অনটন ও দুর্দ্দশার কঠোর নিষ্পেষণ তা'দিগকেই সচ্ছল করতঃ শ্রেষ্ঠ আসনে সম্বর্দ্ধিত ক'রে থাকে, যা'রা ওদের অভাবনীয় অত্যাচারেও স্বতঃস্বেচ্ছ সহানুভূতিপূর্ণ সেবাপ্রবণতার সহিত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতার বাস্তব কর্ম্মে অটুট ও উচ্ছলনিষ্ঠাসম্পন্ন।

১৪

বিয়ে ক'রে তা'কে ভরণপোষণ না কর্‌লে যেমন পাপ হয়,—যে পাপের ফলে দুর্ব্বৃত্তির সৃষ্টি, এমন-কি বংশলোপ হওয়া পর্য্যন্ত সম্ভব, তেমনই দীক্ষা নিয়ে তাঁকে যথাসম্ভব ভরণপোষণ না করলে উন্নতি গতায়ু হইয়া দুরদৃষ্ট সৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বনাশে সর্ব্বহারা ক্রমনিঃশেষে চল্‌তে থাকে।

১৫

যদি বড়ই হইতে চাও বা বড়ই থাকিতে চাও তবে ছোট, অসহ্য, অপারগ ও আশ্রিতদের সহ্য কর, সামলাও। প্রীতি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণের সহিত উপযুক্ত পালন-পুষ্টিতে তা'দিগকে সক্ষম ও শ্রেষ্ঠ ক'রে ইষ্টপ্রাণতায় অক্ষুণ্ণ ক'রে তো'ল! আর, আচরণ যেখানে এমনতর যত বেশী স্বাভাবিক বড়ত্বের আধিপত্যও সেখানে তত অটুট।

১৬

তুমি সেবা দিয়ে যাচ্ছ অথচ পারিপার্শ্বিক তোমাতে অনুরাগী হ'য়ে তোমাকে তা'দের মুখ্য করে ধর্‌ছে না,—তখনই নজর ক'রে দেখো তোমার সেবা যা'তে প্রত্যেকের ভিতর সঞ্জীবিত থাকে এমনতর ইষ্টানুরঞ্জনী ব্যবহার বা যাজন-উদ্দীপনা, না হয় সময়তঃ প্রয়োজনপূরণ ইত্যাদির যথোপযুক্ততার ভিতর কোথায়ও না কোথায়ও গলদ আছেই।

RS

SATSANG
PHILANTHROPY

SATSANG PABNA

Dated 26 / 1937

[illegible]

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আধুনিক রচনার হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

১৭

যে সাংসারিক জীবনে অকৃতকার্য্য সে যতই ধর্ম্মের ভাব ধারণ করুক্ না কেন, তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষু যে তমসাচ্ছন্ন ইহা অতি নিশ্চয়।

১৮

সপারিপার্শ্বিক জীবন যা'র কৃতকার্য্যতার সমুন্নতিতে চলৎশীল, তা'কে যেমনই দেখা যাক্ না কেন—তা'র আধ্যাত্মিক জীবন যে আশীর্ব্বাদময় অনুভূতিপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯

যেখানে সাংসারিক কৃতকার্য্যতা বিমলিন, আধ্যাত্মিকতা অবসাদ-অবমাননায় সেখানেই লজ্জিত।

২০

আমাদের প্রবৃত্তি-সৃষ্ট দুষ্কর্ম্ম যা' দুরদৃষ্ট সৃষ্টি ক'রে চলেছে—তা'কে এড়িয়ে তাঁ'র করুণামুগ্ধ হ'তে চাই না—তাই জীবনে তৃপ্তিও নাই।

নববর্ষের শুভ আশীর্ব্বাদ

"এই উষা—আমাদের নববর্ষের নবীন উষা, এখনও তার জাগরণ এলেও ঘুম-বিলোল আবিল আলস ভাঙ্গেনি, পাখীগুলি এখনও তাহাদের প্রভাতের সামগান সুরু করেনি—মাঝে মাঝে নিবিড় নিস্তব্ধতা-ভাঙ্গা সামতানে কেবল এক-আধটী তাদের গেয়ে উঠ্ছে। আদিত্য তার বালরশ্মি বিকীর্ণ ক'রে আঁকৃড়ে ধর্ছে যেন তার জননী উষাকে। ঊর্দ্ধে তাকাও—প্রত্যেকটী জ্যোতিষ্ক তার নিজ সত্তায় আলোকজাল দিয়ে চুম্বন আলিঙ্গনে ঐ বালরশ্মিজালকে আলিঙ্গন কর্ছে—তা'তে তাদের প্রশ্নহারা সত্তা যেন একটা বিরাট বিবর্দ্ধন হ'য়ে সব নিজত্বগুলি দিয়ে ঐ আদিত্যকেই সার্থক ক'রে ক্রম-বিবর্দ্ধনে আরোতর ক'রে তুল্ছে,—তারা এই দৃষ্টির সম্মুখে থেকেও যেন আপনহারা সত্তাহারা কোন্ আলোক অন্তরালে হারিয়ে গেল—যদিও যায়নি, আছে—ঐ পরম আদিত্য-একত্বে।

"প্রার্থনা করি আমার তাঁরই কাছে—তোমরা প্রত্যেকে ঐ জ্যোতিষ্কেরই মতন ঐ অমনতর ভঙ্গীতেই পরম আদিত্যকে আঁকৃড়ে ধ'রে তোমাদের নিজত্বের সুর তাঁর জ্যোতিঃর লহরে মিলিয়ে সার্থক হ'য়ে সার্থক ক'রে তোল সবাইকে—যারা তোমার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেক হ'য়ে তোমারই চেতনাকে চেতিয়ে তুল্ছে। মঙ্গল আনো, আশীর্ব্বাদ আনো, অমৃত আনো, শান্তিজল ছিটিয়ে দাও—প্রত্যেক অন্তরকে অমৃতবাহী ক'রে তোল।"

ষষ্ঠ স্তবক

সাধন-তত্ত্ব

মানুষের জীবনের মূলে রহিয়াছে কতগুলি চাওয়া বা অভাব। এই অভাব দূর করিতে পারিলেই মানুষ আনন্দ পায়। আনন্দই জীবের একমাত্র কাম্য। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে হইলে এই অভাবের হাত হইতে একদম পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন,—আর একমাত্র কারণকে জানিলেই মানুষের যত-কিছু বাসনার শেষ হয়। তাই কারণকে জানিবার চেষ্টা করাই পরম শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

বেদে কথিত আছে, ভগবান্ আদিতে একা ছিলেন। স্ব-ইচ্ছায় তিনি বহুতে বিভক্ত হইয়াছেন—এই অনন্ত সৃষ্টি তাঁহারই এক-একটী ভাবের প্রকাশ। সেই আদি কারণকে জানা মানে, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগত হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা এবং এই জগদতীত সেই সর্ব্বকারণের আদি-কারণ যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের উদ্ভব হইয়াছে তৎসমুদয়কেই জানা। এই চরম কারণকে জানিবার জন্য মহাত্মাগণ যুগে যুগে কত তপস্যা করিতেছেন। বহুর জ্ঞান লাভ করিতে করিতে এককে জানা এবং এককে ধরিয়া বহুকে জানা এই দুই উপায়ে মনীষীগণ এই তত্ত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। বহুর মধ্য দিয়া এককে জানিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ দেহটা সৃষ্টিরই অনুরূপে গঠিত। সৃষ্টির যাহা-কিছু সমুদয়ই দেহের মধ্যেও ক্ষুদ্রাকারে রহিয়াছে, এজন্য ইংরাজীতে সৃষ্টিকে Macrocosm এবং দেহকে Microcosm বলা হয়। যেহেতু সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে দেহের মধ্যদিয়া ছাড়া হওয়ার অন্য উপায় নাই, সেইজন্য সাধকগণ দেহতত্ত্বের অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যেরূপ জলে পরিবর্ত্তিত হয় এবং জল ঘনীভূত হইয়া বরফে পরিণত হয়, সেইরূপ শুদ্ধচৈতন্য-সত্তাও নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই জড়রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার এক-একটী পরিবর্ত্তনকেই এক-একটী স্তর বলা হয়। সাধারণতঃ স্তর বলিতে যেমন কোন-কিছুর একটীর পর আর একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থার ধারণা আমাদের মনে আসে, এ স্তর-ভেদ কিন্তু সেরূপ নয়। একখণ্ড বরফের ভিতর ইহার সর্ব্বত্র জুড়িয়া যেমন জলত্ব ও বাষ্পত্ব ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, তেমনি এই জড়ের ভিতরেও তাহার সূক্ষ্ম এবং কারণভাব উভয়েই একই সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সাধনা দ্বারা এই এক-একটী স্তর বা অবস্থার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাকেই স্তর-ভেদ বা চক্র-ভেদ করা বলা হয়।

দেহের যেমন তিনটী অবস্থা—দেহ, মন ও আত্মা; সেইরূপ সৃষ্টিকেও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন অবস্থাভেদে প্রধানতঃ তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

১। স্থূল—জড়রাজ্য—material division.

২। সূক্ষ্ম—মনোরাজ্য—mental division.

৩। কারণ—চৈতন্যরাজ্য—spiritual division.

সৃষ্টির ন্যায় মনুষ্য-দেহের তিনটী বিভাগের নাম যথা :—পিণ্ডদেশ, ব্রহ্মাণ্ডদেশ ও দয়ালদেশ বা নির্ম্মলচৈতন্য-দেশ। সাধকগণ পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া সাধারণতঃ পিণ্ডদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ইহার সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। যিনি কারণের দিকে যত বেশী অগ্রসর হইতে পারেন, তিনি তত অধিক জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ষট্‌চক্র-ভেদের অর্থ—পিণ্ডদেহ বা স্থূলদেহের অন্তর্গত ছয়টী স্তরের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। এই ছয়টী স্তর এবং তাহার অবস্থান-ক্ষেত্র যথা :—

১। মূলাধার—গুহ্যদেশে, ২। সাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলে,

৩। মণিপুর—নাভিদেশে, ৪। অনাহত—হৃদয়ে,

৫। বিশুদ্ধাখ্য—কণ্ঠে, ৬। আজ্ঞা—দুই চক্ষের মধ্যস্থলে।

এই ছয়টী স্তর বা চক্র মানুষের মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত।

জড়রাজ্যের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কারণ-রাজ্যেও এইরূপ ছয়টী করিয়া স্তর রহিয়াছে। মনোরাজ্য বা সূক্ষ্ম-দেহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ছয়টী স্তর যথা :—

১। শিবলোক, ২। ব্রহ্মলোক, ৩। বিষ্ণুলোক,

৪। সহস্রদল কমল, ৫। ত্রিকূটী, ৬। দশম দ্বার (শূন্য)।

চৈতন্যরাজ্য বা কারণ-দেহের অর্থাৎ দয়ালদেশের অন্তর্গত ছয়টী স্তর যথা :—

১। ভ্রমরগুফা, ২। সত্যলোক, ৩। অলখ লোক,

৪। অগম লোক, ৫। অনামী লোক, ৬। রাধাস্বামী ধাম

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটী প্রধান বিভাগের মধ্যে কারণরাজ্য বা দয়ালদেশে শুদ্ধনির্ম্মল-চৈতন্য বিরাজমান, সেখানে মায়ার লেশমাত্র নাই। ব্রহ্মাণ্ডদেশে নির্ম্মল-চৈতন্য সূক্ষ্মমায়াযুক্ত হইয়া আছেন এবং পিণ্ডদেশে এই নির্ম্মল-চৈতন্য স্থূলমায়াযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। এই সকল স্তরভেদ

মনের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। মনঃসংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধকগণ এই সকল বিভিন্ন ধামের অবস্থা অবগত হইয়া থাকেন। এইভাবে কেহ বা 'সহস্রদল কমলে' পৌঁছিয়া তথাকার তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন, কেহ বা তদূর্দ্ধের সংবাদ দিয়াছেন। সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে যে-সাধকের যে-স্তরে গিয়া তাঁহার জানা শেষ হইয়াছে অর্থাৎ লয় হইয়াছে, তিনি সেই অবস্থাকেই চরম বলিয়া তদীয় অনুসরণকারীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। এইভাবে যদিও একই পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানে সকলেই অগ্রসর হইতেছেন, তথাপি সাধকের নিজ-নিজ শক্তির তারতম্যানুসারে প্রাপ্তিরও বিভিন্নতা ঘটিতেছে এবং তদ্দরুণ মতেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবে যে-যে একই প্রকার বিশেষ বিশেষ ধাম পর্য্যন্ত যাঁহাদের গতি হইয়াছে তাঁহাদের অনুভূতির কোন পার্থক্য নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। এই হিসাবে যিনি যত উর্দ্ধে উঠিয়াছেন তিনি তন্নিম্নের সাধকের অনুভূতির বিষয় জ্ঞাত আছেন এবং যিনি সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছেন তাঁহার নিকট সকল অবস্থাই সম্যক্ পরিজ্ঞাত; আবার সমুদয় কারণকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন বলিয়া কোন মতবাদের সহিত তাঁহার বিরোধ নাই, বরং সকলেরই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে সার্থকতা লাভ করিবার পক্ষে তিনিই একমাত্র পরিপোষণ-কর্ত্তা।

পিণ্ডদেশ ও ব্রহ্মাণ্ডদেশ মায়ার রাজ্য এবং দয়ালদেশ সম্পূর্ণ মায়াতীত বলিয়া পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডদেশ অতিক্রম করতঃ দয়ালদেশ বা চৈতন্য-রাজ্যে না-পৌঁছান-পর্য্যন্ত মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, কাজেই জন্ম-মৃত্যুরও অতীত হওয়া যায় না। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তফাৎ এই যে, জড়রাজ্যে অর্থাৎ পিণ্ডদেহে মৃত্যু সত্বর ঘটে এবং সূক্ষ্মরাজ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে তাহা অধিকতর বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। পিণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে উপনীত হইলেও জন্মমৃত্যু থাকে, এই কারণেই দেবতারাও জন্মমৃত্যুর অধীন। যথা—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" আবার মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডেরও লয় হইয়া যায়। যথা—"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" এই লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরও লয় হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাধনা দ্বারা দয়ালদেশে পৌঁছিতে না পারিলে জীবের জন্ম ও মৃত্যুর অধিকার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পক্ষে কোনই উপায় নাই, সুতরাং এই দয়ালদেশে উপনীত হওয়াই জীবের একমাত্র কাম্য। গীতায় ও আছে—'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে', 'যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য,—দয়ালদেশের স্তরবিশেষপ্রাপ্তি সম্বন্ধেই এই সকল উক্তি। দয়ালদেশেরও বিভিন্ন স্তর আছে তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের

ধাম তন্মধ্যে অন্যতম, বৈষ্ণবেরা ইহাকে 'গোলক' বলিয়া থাকেন। এই দয়ালদেশের দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত যাঁহারা পৌঁছিয়াছেন হিন্দী ভাষায় তাঁহাদিগকে সন্ত বলা হয় এবং শেষ অষ্টাদশ স্তর পর্য্যন্ত যাঁহাদের গতি হইয়াছে তাঁহাদিগকে পরমসন্ত বলা হয়। পরমসন্ত ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ণ স্তরভেদ আর কাহারও বিদিত নাই। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষের মনের উন্নতি হইতেছে তাই সাধকগণের মধ্যেও ক্রমোর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমান যুগ চরম-প্রকাশের যুগ বলিয়া মনীষিগণের অভিমত।

সাধনা দ্বারা সৃষ্টির এই পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য পশ্চিমদেশীয় মহাত্মা কবীর, গুরু নানক, তুলসী সাহেব, জগজীবন সাহেব, দাদু সাহেব, দরিয়া সাহেব, কেশবদাসজী, চরণদাসজী, পলটুসাহেব, স্বামীজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ, মহারাজ সাহেব, সরকার সাহেব এবং মুসলমানদিগের মধ্যে মৌলানা রুম, হাফেজ, সরমদ্ শা ও শমস্‌তব্‌রেজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে সাধন-পদ্ধতির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম 'সুরতশব্দ-যোগ'।

গীতা বলিতেছেন—দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাকেই হিন্দী ভাষায় 'সুরত' বলা হয়। এই 'সুরত' বা চৈতন্য-ধারায় মানুষের মন সঞ্জীবিত হয়, আবার সুরত-ধারাযুক্ত মনই ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্জীবিত করে, তাহাতেই স্থূল দেহের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই 'সুরত'ই আমাদের দেহ-জগতের প্রাণ, ইহাই জ্ঞান ও আনন্দের আকর। সাধনা দ্বারা মন ও 'সুরত'কে আয়ত্ত করতঃ বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়া তৎ-তৎ স্থানের আনন্দের আস্বাদ অনুভব করা যায়। আবার 'শব্দ' অর্থে বুঝায় 'অনাহত নাদ'। আদি-কারণ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া নাদ অর্থাৎ শব্দ-রূপেই নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই আদি-নাদ স্তরভেদে রূপান্তরিত হইয়া কোথায়ও 'ররং', কোথায়ও 'ওঁ,' কোথায়ও 'ক্লীং' কোথায়ও বা 'হ্রীং' ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আদি-কেন্দ্র হইতে দূরত্ব এবং তদ্দরুণ স্থূল ও সূক্ষ্ম মায়ার আবরণের তারতম্যেই এই সকল বিভিন্নতার সৃষ্টি। 'সুরত' সেই আদি-কারণ হইতে নির্গত হইয়া নিম্নগামী হইতে হইতে নানা স্তরের সৃষ্টি করতঃ পিণ্ডদেহে নামিয়া আসিয়া দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই অনাহত নাদের আবার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ—এই দুইটী শক্তি রহিয়াছে। মানুষ এই বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছে। 'সুরত'কে নাদের অর্থাৎ শব্দের এই আকর্ষণী শক্তির সহিত যুক্তকরতঃ ইহাকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া পুনরায় আদি স্থানে পৌঁছানই সাধকের লক্ষ্য, তাই এই সাধন-পদ্ধতির নাম "সুরতশব্দ-যোগ"। এই সাধন-মার্গের তিনটী প্রধান অঙ্গ। যথা—সদ্‌গুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি যাঁহার যেমন হয়, তিনি ততটুকু জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইজন্য যাঁহারা উচ্চ ধামের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহারাই সাধারণতঃ গুরুপদবাচ্য। এই সকল তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুগণের মধ্যে স্ব-স্ব অনুভূতির তারতম্যানুসারে পার্থক্য রহিয়াছে। যিনি পিণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি গুরুপদবাচ্য হইলেও তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রকৃত সদ্‌গুরু কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই বলা যাইতে পারে, যাঁহারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয় দেশ অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল-চৈতন্যদেশে গমন করিয়াছেন। নির্ম্মল-চৈতন্যদেশের অনুভূতি-সম্পন্ন দ্রষ্টাদিগকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—প্রথম, তত্ত্বপুরুষ; দ্বিতীয়, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ। তত্ত্বপুরুষকে অবতার, গুরু-পুরুষোত্তম ও Foreman ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা পরমধাম হইতে সর্ব্ব গুণ, জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া নরদেহে ধরায় অবতীর্ণ হন এবং তত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণভাবে অধ্যবসায়-সহকারে আপন-আপন চেষ্টা, সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা তত্ত্ব উপলব্ধি করতঃ জ্ঞান লাভ করেন। এই সদ্‌গুরু আদি-কারণের সাকার মূর্ত্তি এবং একমাত্র তিনিই Absolute. সদ্‌গুরু ভিন্ন আর কেহই জীবকে পরমধামে লইয়া যাইতে পারেন না। এই নরদেহধারী সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্ যখন সংসারে আগমন করেন তখনই জীবের প্রকৃত উদ্ধার সম্ভব হয়। সদ্‌গুরুর ভিতর সেই আদি-কম্পনের শক্তি থাকে। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করেন তাঁহাদের মধ্যেও সেই কম্পনধারা সঞ্চারিত হয়। এই সদ্‌গুরুই মানুষের একমাত্র উপাস্য। এই সদ্‌গুরুর প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তির ফলে জীব সমস্ত তত্ত্বই অবগত হইতে পারে। আর এই বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করিবার উপায়—তাঁহার নাম জপ করা, তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করা ধ্যানের তন্ময়তায় শব্দযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজন করা, তাঁহার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার প্রীতিজনক কার্য্য করা, তাঁহার মহিমা ও গুণ কীর্ত্তনকরতঃ তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করা।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনামত সৃষ্টিতে বা দেহে সর্ব্বমোট যে অষ্টাদশ স্তরের কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিস্তরেই একটী করিয়া অনাহত নাদ বা বীজ আছে। সৃষ্টির আদি-স্তরের যে নাম বা বীজ তাহাই 'সৎনাম'। এই আদি বীজ হইতেই নিম্নের অন্যান্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং আদি-নামের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। সদ্‌গুরু-উপদিষ্ট প্রণালীমতে বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে এই নাম-সাধন কর্ত্তব্য।

যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ আছে তাহাই সৎ। জগতের প্রতি-পদার্থেরই

অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে সৎ বলা যাইতে পারে। কিন্তু জাগতিক সমুদয় পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল, কাজেই সৎ হইলেও তাহা পরিবর্ত্তনীয়-সৎ। বলা বাহুল্য, যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত—একমাত্র সেই আদি-কারণকেই সৎ বলা যাইতে পারে। সুতরাং 'সৎসঙ্গ' বলিলে—তাঁহারই সঙ্গ—অর্থাৎ সেই আদি-কারণের সহিতই সঙ্গ করা বুঝায়। আবার শাস্ত্রে আছে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি'—সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সঙ্গ করাই প্রকৃত সৎসঙ্গ, কারণ তাঁহাতেই সেই আদি-চৈতন্যের বিশেষত্ব সম্যক্ প্রস্ফুটিত; সদ্গুরুই সেই আদি-কারণের—সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-সত্তার মূর্ত্ত জীবন্ত বিগ্রহ। সাধকের নিজের চৈতন্যকে বিশেষত্বে পরিণত করিতে হইলে জীবন্ত সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণকরতঃ তাঁহাতে যুক্ত হইয়া তাহার নিজের ভিতর সেই ভাবের স্ফুরণ করিতে হইবে। সদ্গুরুকে যিনি যত ভালবাসিতে পারিবেন তিনিই আদি-কারণকে তত বেশী জানিতে পারিবেন।

'সুরতশব্দ-যোগে'র এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলে দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে তদীয় বিজ্ঞানসম্মত, সার্ব্বজনীন, অভিনব, আদর্শ সাধনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভারতের স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, সহস্র সহস্র নরনারী এই সহজ, সরল, বিঘ্নশূন্য, অপূর্ব্ব সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরম মঙ্গলের অধিকারী হইতেছেন। সৃষ্টি-রাজ্যের আদ্যন্ত তাঁহার স্মৃতিতে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকায়, সেই আদি-কারণের সঙ্গে নিতান্ত সহজভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া তিনি সংসারে চলিয়াছেন। নির্ম্মল-চৈতন্যদেশ পর্য্যন্ত এই সকল বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি এবং তৎতৎ-স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রূপ ও শব্দের বিস্তৃত বিবরণ প্রায়শঃ তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকি। সম্প্রতি 'কথাপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুভূতি-রাজ্যের যে সকল অনির্ব্বচনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ একটীমাত্র বর্ণনা (সহস্রদল কমলের) উদ্ধৃত করিয়াছি। তৎপ্রদত্ত যাবতীয় ধামের সেই সকল সুদীর্ঘ বিশদ বর্ণনার সারসঙ্কলন করতঃ আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা :—

স্তর বা মণ্ডল	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	রূপ	শব্দ
মূলাধার	পৃথ্বী বীজ	কাঁচাহলুদের রং	লং
সাধিষ্ঠান	বরুণ বীজ	পাত্‌লা লাল্‌চে রং	বং
মণিপুর	অগ্নি বীজ	অগ্নির রং সঙ্গে অন্যান্য রং মিশ্রিত	রং
অনাহত	বায়ু বীজ	ঘোর রক্তবর্ণ	যং বা ক্লীং
বিশুদ্ধ	গগন বীজ	ধূম্র	হং
আজ্ঞাচক্র	হ্রীং বীজ	শুক্ল	হ্রীং
সহস্রদল কমল	নিরঞ্জন পুরুষ	জ্যোতিঃ	ঘণ্টা ও শঙ্খ

বঙ্কনাল—সহস্রদল কমল এবং ত্রিকূটীর মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ, অন্ধকারময় বাঁকা রাস্তা

ত্রিকূটি	প্রণব বা ওঁকার পুরুষ	গোলাপী রাগোদ্দীপ্ত প্রভাতসূর্য্য-সদৃশ	ওঁ অন্তর্গত মৃদঙ্গ ও মেঘগর্জ্জন
শূন্য বা দশমদ্বার	ররং পুরুষ	পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ প্রকাশমান	ররং অন্তর্গত কিংগরী সারঙ্গ, সেতারা, খরতাল ধ্বনি।
মহাশূন্য	অক্ষর পুরুষ	অন্ধকার কুণ্ডলী	এখানে শব্দ গুপ্ত
ভ্রমরগুফা	সোহং পুরুষ	মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য-সদৃশ	সোহং অন্তর্গত মুরলী (বংশী) ধ্বনি।
সত্যলোক	সত্যপুরুষ	কোটী কোটী চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ প্রকাশমান	বীণাধ্বনি
অলখ লোক	অলখ পুরুষ	ঐ	অনির্ব্বচনীয়
অগম লোক	অগম পুরুষ	ঐ	ঐ
অনামী লোক	অনামী পুরুষ	ঐ	ঐ
রাধাস্বামী ধাম	রক্তমাংস-সঙ্কুল ইষ্ট রাধাস্বামী অনামী পুরুষ	ঐ	রাধাস্বামী

সপ্তম স্তবক

পরিদর্শকের মন্তব্য

From His Excellency's reply to the Pabna address:—

"* * * The Satsang is doing excellent work in Education, Art, Social Service and Religion."

" . . . I am sure the Asram is a force with great potentialities for the moral and physical betterment of Bengal and I wish it every success in surmounting the difficulties which face it. As far as it may lie in my power to do so I shall be glad to assist in this connection."

15-8-35. Sd/ JOHN ANDERSON,
Governor of Bengal.

"* * * I have personal knowledge of the Institution, it deserves public support. I hope the public will give the workers every possible help. I wish them every success."

27-1-25. Sd/ C. R. DAS.

"* * * Of the surroundings of the Asram I carried a very good impression."

29-5-25. Sd/ M. K. GANDHI.

"The Asram will prove a real force in the province for combating unemployment and improving the condition of the people both materially and morally. I shall be glad to give the Asram all the help in my power."

20-4-36. Sd/ F. W. ROBERTSON,
Commissioner, Rajshahi Division.

"The Satsang is a pride for the Bengalees as it appears to me from what I have seen there with my own eyes."

5-8-27. Sd/ BEPIN CHANDRA PAL.

"I was much impressed by all that I saw."

19-9-27. Sd/ C. A. BENTLY,
Director of Public Health, Bengal.

"I was much impressed with the enterprising social and development work going on under the inspiration of its founder. I gladly pledge sympathy and help of the department of Industries within its capacities and resources in the future."

16-9-28. Sd/ A. D. WESTON,
Director of Industries, Bengal.

"I have been greatly interested in my visit to the peaceful settlement on the banks of the Padma. The Founder and those who follow him have impressed me by the earnestness of devotion and variety of their enterprise. The settlement manifests an unusual combination of the spiritual and the material and there seems much promise in the various activities and schemes. There seems to be also every striking evidence of spiritual strength."

23-9-28. Sd/ W. S. URQUHART,
Vice-Chancellor, Calcutta University

" * * * Cosmopolitanism is one of the distinctive features of the Asram. It aims at establishing peace and unity between the Hindus and Mahomedans. * * * I am glad to note that the efforts of Pabna Asram are appreciated by both the communities. Let us hope that their efforts will be crowned with success."

Sd/ WAHED HOSSAIN,
Advocate, High Court, Calcutta.

"Those that are gasping for breath in the whirlpool of the bustle of their everyday life—to save them—even in this province of Bengal, there lies an Island of bliss full of pilgrims for the land of truth. It is the Satsang Asram at Pabna."

5-8-27. Sd/ SARALA DEVI.

"Lived in the Satsang for two days * * * was much pleased to know the ideals and objects of the institution. The management of the various works and the schools for girls and boys is in the hands of enthusiastic workers of spotless character. I was highly gratified to find so large a number of men and women leading their secular and spiritual lives in harmony, gathering inspiration from the ideals of the founder."

10th Feb., 1928. Sd/ S. N. MAJUMDER,
Editor, Ananda Bazar Patrika.

"We have been deeply interested as we have inspected the Satsang at Pabna.

We consider it the very finest example of self-improvement and self-control seen in any part of the world.

The educational and scientific work in progress is indeed a revelation and a credit to the Founder of the Institution.

*   *   *   *   *

The good fellowship and comradeship on the compound so obvious is quite refreshing and is in our opinion a demonstration of true Christianity.

We congratulate the leader and the members of the community on their high standard of living and their extreme devotion to their laudable ideals. We wish them God-speed."

Box 6, P.O. New Town, Sd/ WILLIAM WHITE
Sydney, A. S. W.

22, Nelson Road, Sd/ REV. A. BUTLER.
Homebush, Sydney.

16, Burack Street, Sd/ ALFRED WHITE, F. C. P. A.
Sydney, Australia.

"I visited the 'Satsang' this afternoon and was shown all over the various departments of this unique Institution. It is a most interesting enterprise and seems to be flourishing in spite of the difficulties which it must have necessarily

encountered. The objects which it has in view are worthy of all praise and encouragement and I wish it every success."

23-1-1930. Sd/ J. F. GRAHAM,
Judge, High Court, Calcutta.

This is to certify that "Satsang Engineering Works" carried out works of sinking tube-wells and of borings in the bed of River Ganges in the season 1933-34 in connection with the Hardinge Bridge Protection Works to the value of over Rs. 35,000/-. Their work was carried out expeditiously and in a workman-like manner, and they gave complete satisfaction.

The largest tubewell put down by them was 3″ dia., but 4″ dia. borings were made under water. They appeared to be capable, however, of doing bigger things if called upon to do so.

20th May, 1935. Sd./ H. LANGLEY,
Sub-division Officer, I.,
Hardinge Bridge, Paksey.

". . . . I may say without hesitation that in it my conception of duty finds a full realisation. I am deeply impressed with what I have seen to-day and I take it that the Satsang is a symbolical representation of industry and spiritual life."

Sd./ M. N. ROYCHOUDHURY
President, Legislative Council, Bengal.

". . . . The spirit of love and self-sacrifice which animates all the workers is wonderful and when all India is similarly served by men and women with the same spirit of love and service to humanity, India will be an example to the world."

10-1-39. Sd./ D. M. HAMILTON
Sd./ MARGARETE HAMILTON.
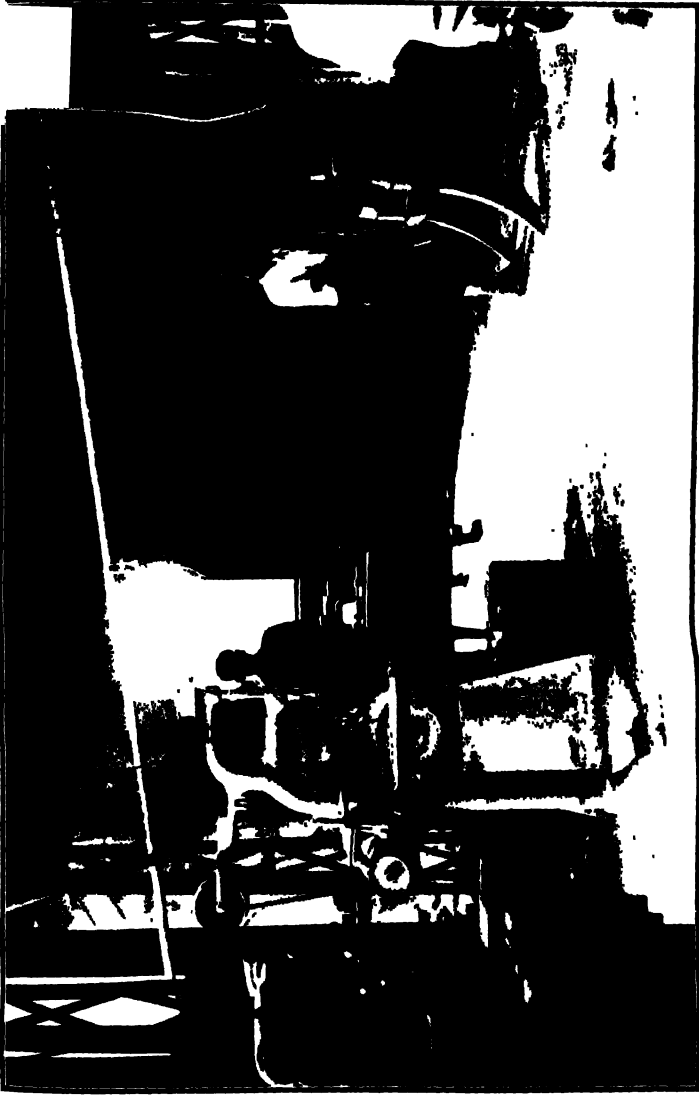
সৎসঙ্গ মেকানিক্যাল্ ওয়ার্কসের অভ্যন্তর-ভাগের একাংশ

"পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শন করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষার ব্যর্থতার কথা চিন্তা করিলে আমি শিহরিয়া উঠি। যে শিক্ষা বালক-বালিকারা স্কুল-কলেজে পাইয়া থাকে তাহা কি প্রকারে সুফলপ্রসূ হইতে পারে আমি বহু চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াও তাহার উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়াছি। এমন সময় সৎসঙ্গ আশ্রমের কার্য্যকলাপ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশে তপোবন শিক্ষাগারটীকে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ইউনিভারসিটী-পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্ম ও কর্ম্মশিক্ষার প্রত্যক্ষ বিনিময় নাই বলিয়াই বর্ত্তমান শিক্ষায় এত বিষোদ্গারণ হইতেছে। দেশে এই প্রতিক্রিয়ার সময়ে সৎসঙ্গ আশ্রমের যে চেষ্টা তাহা প্রয়োজনের তাড়নায় জন্মাইতেছে বলিয়া কখনই ইহা ব্যর্থ হইবে না। আশ্রমের প্রত্যেক বিভাগেরই সৃষ্টি এই প্রয়োজনীয়তার মূলে। * * * * এই প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা অনাবিল ও সত্য-উদ্ভাসিত হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইযাছে বলিযাই, ইহার এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি এবং এত সুন্দর পরিণতি!"

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

২রা আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল মহারাজা, কাশিমবাজার

"পঠদ্দশায় সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত শাস্ত্র যখনই আলোচনা করিয়াছি তখনই প্রাণে একটা ভাব জাগিয়া উঠিত—এই পবিত্র আর্য্যভূমিতে প্রাচীন ভারতীয় সেই আশ্রমগুলি কোথায় যাইল? ভারতের কোন্ দুরদৃষ্টে পবিত্র গার্হস্থ্যের পূর্ণতম আদর্শ সেই আশ্রমপ্রথা ভারত হইতে তিরোহিত হইল। ছাত্রজীবন ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রাণের নিভৃত প্রদেশে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছি। যখনই খুঁজিয়াছি তখনই হতাশ হইয়াছি। আজ সৎসঙ্গে আসিয়া এই হতাশ প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইল। যতটুকু দেখিবাব অবকাশ পাইলাম তাহাতে বুঝিলাম আবার ভারতে নবযুগের অভ্যুত্থানের সূচনা দেখা দিয়াছে। প্রাচীনের গৌরবস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নবীন জগতে আশ্রমপ্রথা কিরূপে কার্য্যকরী করা যাইতে পারে সৎসঙ্গ সে বিষয় সৎপথ দেখাইয়াছে।"

৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সন মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী

এই আশ্রমে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে সত্য সত্যই অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছি। প্রথমতঃ নারী-স্বাধীনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত স্বাধীনতা আছে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। নারীকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও কিরূপে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী, ভগিনী, কন্যা ও মাতৃরূপে ফুটাইয়া তুলিয়া সাংসারিক জীবন সুখময় ও শান্তিময় করা যাইতে পারে—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতবাসীর নিকট স্থাপন করা হইয়াছে। নারী এখানে জগদ্ধাত্রীরূপে সেবায়, যত্নে ও মাতৃত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কর্ম্মশীলতায় অতুলনীয়া হইয়াছে। ইহা যাঁহার অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহাকে নারীর এই প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার জন্য নারী-হৃদয়ের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৭ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সন — শ্রীকমলা দেবী

"* * * এই যে সুবৃহৎ একটী পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ইহা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। ইহার কার্য্য-পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদের প্রাণ আছে। এই প্রাণের পরশটুকুই পল্লীটার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পুরাতন বটবৃক্ষের মত ইহা নানাদিকে শিকড় মেলিতেছে। তাহার কতকগুলি এখনই দেখা যায়। আর কতকগুলি এখনও কল্পনায় রহিয়াছে। সকলগুলি যখন শাখাপল্লব মেলিবে, তখন তাহার বিশাল ছায়ায় শত শত নরনারী জুড়াইতে পারিবে। ইহাই আমি বিশ্বাস করি এবং ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।"

২রা এপ্রিল, ১৯৩৩ সন — শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)

"* * * আশ্রমের বিধিব্যবস্থা ও কর্ম্মকুশলতার মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শকে কর্ম্মে অনূদিত করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং নারীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান, শক্তি ও মৈত্রীভাবের বিকাশের ও স্বাবলম্বন শিক্ষার চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি ও সফলতা প্রার্থনা করি।"

১৬ই চৈত্র, ১৩৩৯ সন — শ্রীকামিনী রায়

"এই স্থানের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। নানাস্থান হইতে আগত কর্ম্মিগণ তাঁহাদের গুরুদেবকে কেন্দ্র করিয়া একটী বৃহৎ পরিবারের মতন বাস করিতেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীরও বিশেষত্ব আছে। বালক-বালিকাগণ শিক্ষকবর্গের সহিত বৃক্ষছায়ায় বসিয়া

নানা বিষয় জ্ঞানালোচনা করে। প্রাচীন তপোবনের গুরুশিষ্যের শিক্ষা-ধারাকে ইঁহারা পুনরায় উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ছেলেরা নিজহাতে গৃহনির্ম্মাণ করেছে, রাস্তা তৈয়ারী করেছে, পুকুর কাটছে। ইঁহারা এইরূপ সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানা প্রবর্ত্তন করেছেন,. প্রেস করেছেন। এই সকল কারখানার কর্ম্মিগণ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে Matric পাশ করছে। মহিলাগণ এখানে আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া স্বামীদের কার্য্যে সহকারিণী হয়েছেন।

প্রেসে দেখিলাম একদল মহিলা কম্পোজের কাজ করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন।

কর্ম্মিগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া কলকারখানার সাহায্যে যাহা উপার্জ্জন করেন সেই আয় সমগ্র colony-র সমষ্টিগত কল্যাণকল্পে ব্যয় করেন।

ইঁহাদের অধ্যাত্ম জীবনের সাধনাকে কর্ম্মে ও সমাজ-সেবায় রূপদান করিবার এই শুভ প্রচেষ্টার অন্তরালে যাঁহার প্রেরণা রহিয়াছে তাঁহার মহত্ব গভীরভাবে অনুভব করিয়া আনন্দিত হইযাছি।"

২৪।৪।৩৫ শ্রীকালীমোহন ঘোষ
শ্রীনিকেতন, বোলপুর

"ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে কর্ম্মযোগ মুখ্যভাবে অঙ্গীভূত করিয়া সৎসঙ্গ হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। আবার ইহাও বলিব যে, এই কর্ম্মের মধ্যে পল্লীসংস্কারের ন্যায় দুরূহ কার্য্য বাছিয়া লইয়া তাহারা আরও সৎবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। সৎসঙ্গের সংকল্প সার্থক হউক ভগবানের চরণে ইহাই প্রার্থনা। * * * * *

এখানে দেখিলাম একটা কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার বিরাট চেষ্টা! দেশমাতৃকার অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিবার একটা মস্ত বড় কেন্দ্র এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। জগন্নাথের চাকা এখানে বেগবান্ হইয়া ঘুরিতেছে। আমি এই আশ্রমকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে চাই না, সমগ্রভাবে দেখিলে মনে হয়, এখানকার কাজ যেমন অগ্রসর হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহা ভারতে একটা প্রধান আশ্রম বলিয়া পরিগণিত হইবে। সৎসঙ্গে যাহা দেখিয়াছি জাপানেও আমি তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি। সৎসঙ্গের আদর্শে এই বাংলা কেন সমগ্র ভারত এই আদর্শে গড়িয়া উঠিবে।"

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়,
প্রতিষ্ঠাতা, অমৃত সমাজ

* * * এখানে একটী সমাজ গড়িয়া তুলিবার যে ধারা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় জনহিতকর বলিয়া মনে করি। বিদ্যা ও অর্থকরী শিক্ষার সহিত সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সমবায় স্থাপন করিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। যিনি অনুষ্ঠানটীকে প্রাণ দিয়াছেন আমার বিশ্বাস তাঁহার প্রেরণা এইটীকে শক্তিমান করিয়া দেশের ও জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।

২রা এপ্রিল, ১৯৩৩ শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

"বাংলার স্থানে স্থানে আমি যতদূর ঘুরিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্রই অসীম দুর্দ্দশার অবস্থাই দেখিয়াছি। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিনপাত করিতেছে। এমতাবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য, দুর্দ্দশাগ্রস্ত যাহারা তাহাদিগকে ধরিয়া তোলার চেষ্টা করা।

সৎসঙ্গে আসিয়া আমি সেই কর্ত্তব্যেরই উদ্বোধনের প্রচেষ্টা দেখিতে পাইতেছি। মনে হইতেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে আমরা প্রাণে প্রাণে যাহার অনুসন্ধান করিয়াছি তাহা হাতে-কলমে আরম্ভ করা হইয়াছে এই সৎসঙ্গে। আমি দেখিতেছি সৎসঙ্গের আদর্শ প্রকৃত মুস্লিমেরই আদর্শ। তাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই সৎসঙ্গের এই আদর্শে নিজের চরিত্র গঠন করা উচিত। আমার যদি বয়স থাকিত তবে আমি সৎসঙ্গের মেম্বর হইয়া সৎসঙ্গের সেবাই করিতাম কিন্তু আমার বয়স চলিয়া গিয়াছে। তথাপি আমি publicly ঘোষণা করিতেছি, যদি আমাদ্বারা সৎসঙ্গের কোন প্রকার সেবা বা সহায়তা করা সম্ভবপর হয় তাহা আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব।

আমি সৎসঙ্গের এমন কি অধমাধম কর্ম্মীকেও একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অপেক্ষা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মনে করি। আমি সামান্য একজন সৎসঙ্গের সেবককে যতখানি সম্মান করি, একজন গভর্ণমেণ্টের খেতাবীযুক্ত লোককে ততটা পারি না। সৎসঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষ যে আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিবার এবং তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ দিয়াছেন তাহাতে আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।"

১লা অক্টোবর, ১৯৩৬ মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক,
(অধুনা) প্রধান মন্ত্রী, বাঙ্গালা গবর্ণেণ্ট

অষ্টম স্তবক

কোষ্ঠী-বিচার

(প্রাচ্য মতে গণিত)

শকাব্দ—১৮১০।৪।২৯।৫।২০

বঙ্গাব্দ—১২৯৫ সাল ৩০শে ভাদ্র

খৃষ্টাব্দ—১৮৮৮ সন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৭টা ২৮ মি স্থানীয়।

চৈতন্যাব্দ—৪০৩

সংবৎ—১৯৪৫

বার—শুক্র, লগ্ন—কন্যা,

তিথি—শুক্লা নবমী, রাশি—ধনু,

নক্ষত্র—মূলা বর্ণ—ক্ষত্রিয়,

যোগ—সৌভাগ্য, গণ—দেবারি,

করণ—কৌলব করণ দশা— { অষ্টোত্তরী—শনি / বিংশোত্তরী—কেতু }
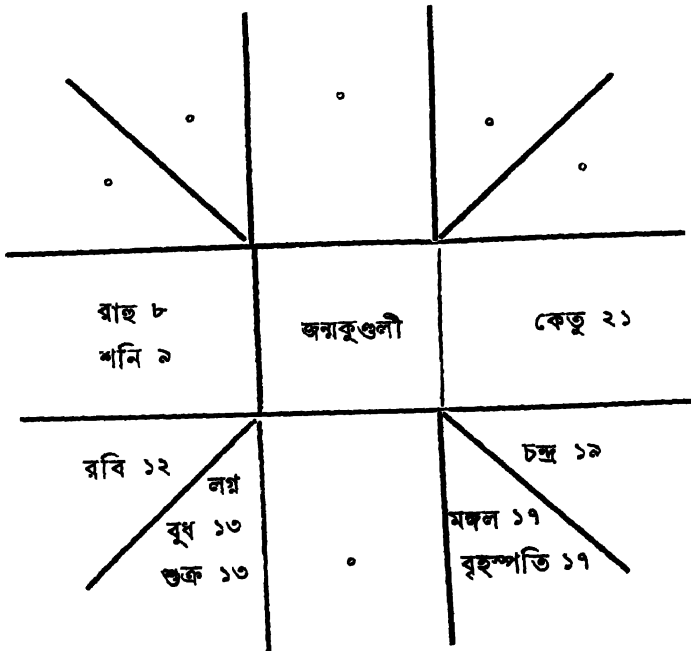
সায়ন গ্রহস্ফুট	নিরয়ণ গ্রহস্ফুট	পূর্ব্বাহঃ			জাতাহঃ		
র—৫।২২।৪	র—৪।২৮।৫৬	৫	১৮	২	৬	৯	১৪
চ—৯।১২।২৮	চ—৮।১১।৩৭	৮	১১	৪	৯	৭	৫০
ম—৮।২।২৫	ম—৭।১০।২৮	২৯	১	৫৬	২৪	২৭	৪৭
বু—৬।৮।৫৫	বু—৫।১৮।১০	৫৭	০	২৯	৩৬	৩	৩০
বৃ—৮।০।২২	বৃ—৭।৯।১						
শু—৬।৯।৪০	শু—৫।১৭।৪০						
শ—৪।১৫।২২	শ—৩।২৫।৩৯						
রা—৩।২৭।৩২	রা—৩।৭।১৬						

(পাশ্চাত্য মতে গণিত)

শকাব্দ—১৮১০।৪।২৯।৩।৩৯।৫৭।৩০

নক্ষত্র—পূর্ব্বাষাঢ়া ; গণ—নর

দশা— { অষ্টোত্তরী—বৃহস্পতি
বিংশোত্তরী—শুক্র }

রাশিচক্রে—চন্দ্র ২০, তিথি, লগ্ন, রাশি প্রভৃতি পূর্ব্ব-বর্ণিত মত।

ষড় বর্গ

ক্ষেত্র—বুধ,	নবাংশ—চন্দ্র,
হোরা—রবি,	দ্বাদশাংশ—শুক্র,
দ্রেক্কাণ—শুক্র,	ত্রিংশাংশ—শনি

গণনার উপাদান	সায়ন মাধ্যাহ্নিক গ্রহস্ফুট	নিরয়ণ গ্রহস্ফুট
দ্রাঘিমা—৮৯।১৩	র—৫।২২।৪	র—৪।২৮।২৩।১০
দেশান্তর—২৭।০	চ—৯।১২।২৯	চ—৮।১৪।১৬।১০
সূর্য্যোদয়—৫।৪৮।১	ম—৮।২।২৭	ম—৭।১০।৫১।১০
দিবামান—৩০।৩৯।৫০	বু—৬।৯।১	বু—৫।১৫।৫৯।১০
অক্ষাংশ—২৪।১।০	বৃ—৮।০।২৭	বৃ—৭।৮।৫।১০
র, ক্রা, উ—০।২২।	শু—৬।৯।৪২	শু—৫।১৬।৩২।১০
বিষুব কাল—১১।৩২।৪২	শ—৪।১৫।১৬	শ—৩।২৩।৫।১০
প্রভেদাঙ্ক—০।২২।	রা—৩।২৭।৩৭	রা—৩।৫।১৭।৪০
অয়নাংশ—২২।১৭।৫০	কে—৯।২৭।৩৭	কে—৯।৫।১৭।৪০

ভাবস্ফুট	সন্ধিস্ফুট
তনু—৫।২০।৫৮।৬	তনু —৬।৬।৩।৬
ধন—৬।২১।৮।৬	ধন—৭।৬।১৩।৬
সহজ—৭।২১।১৮।৬	সহজ—৮।৬।২৩।৬
বন্ধু—৮।২১।২৮।৬	বন্ধু—৯।৫।২৩।৬
পুত্র—৯।২০।১৮।৬	পুত্র—১০।৫।১৩।৬
রিপু—১০।২০।৮।৬	রিপু—১১।৫।৩।৬
জায়া—১১।২০।৫৮।৬	জায়া—০।৬।৩।৬
নিধন—০।২১।৮।৬	নিধন—১।৬।১৩।৬
ধর্ম্ম—১।২১।১৮।৬	ধর্ম্ম—২।৬।২৩।৬
কর্ম্ম—২।২১।২৮।৬	কর্ম্ম—৩।৫।২৩।৬
আয়—৩।২০।১৮।৬	আয়—৪।৫।১৩।৬
ব্যয়—৪।২০।৮।৬	ব্যয়—৫।৫।৩।৬

ফল-পরিচয়

১। যোগ ফল

সৌভাগ্যজন্মা সুভগো মনুষ্যঃ শ্লাঘ্যো জনানাং ধনবান্ গুণজ্ঞঃ
উদারচিত্তো বলবান্ বিবেকী মহাভিমানী প্রিয়ভাষণশ্চ।

সৌভাগ্য যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মহাভিমানী, ভাগ্যবান, ধনবান, গুণবান, উদারচেতা, প্রিয়ভাষী, বলবান, বিবেকী ও সাধারণের শ্লাঘ্য হইয়া থাকেন।

২। করণ ফল

বাগ্মী বিনীতো নিতরাং স্বতন্ত্রঃ প্রাগলভ্যযুক্তো মনুজো মহৌজাঃ।
সুসঙ্গতঃ স্যাদ্বিদুষাং কৌলবাখ্যং করণং প্রসূতৌ॥

কৌলবকরণে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বাকপটু, বিনীত, স্বাধীন, তেজস্বী ও পণ্ডিতদিগের উপর্যুক্ত পাত্র হইয়া থাকেন।

৩। ক্ষেত্র ফল

নিত্যোৎসাহী হৃষ্টপুষ্টো গুণবান্ বলদর্পকঃ।
দাতা ভোক্তা ভবেদ্ধীরো বুধক্ষেত্রে ভবেন্নরঃ॥

বুধের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক নিয়ত উৎসাহান্বিত, হৃষ্টপুষ্ট-দেহবিশিষ্ট, গুণবান্, দাতা, ভোক্তা, বলদর্পকারী এবং নম্রপ্রকৃতি হইয়া থাকেন।

৪। দ্রেক্কাণ ফল

দ্রেক্কাণে ভৃগুনন্দনস্য সুতনুর্মন্ত্রী ধরিত্রীপতেঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ স্বজনানুরাগঃ কুশলো দাতা সত্যপালকঃ॥
মুক্তারত্নবরাঙ্গনাত্মজযুতঃ শ্রীপূজিতশ্চার্থবান্।
স্ফীতঃ শান্তমতিঃ প্রসন্নহৃদয়ো ধর্ম্মানুরক্তো নরঃ॥

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে জাতক সুন্দর-দেহী, রাজমন্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞ, স্বজনানুরাগী, দাতা, সাধুপালক, মুক্তা রত্ন ভার্য্যা ও পুত্রযুক্ত, রাজপূজ্য, ধনী, স্থূলদেহী, শান্ত, প্রফুল্লহৃদয় ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকেন।

৫। নবাংশ ফল

ভবতি কণককান্তি র্নাতি দীর্ঘঃ ন খর্ব্বঃ
প্রবিরলতনু লোমাঃ চারুকেশাঃ সুমূর্ত্তিঃ
বহুজনপরিপূর্ণো ধর্ম্মশীলো গুণজ্ঞো
বিষয়সুখঃ সুবেশঃ শীতরশ্মের্নবাংশে

চন্দ্রের নবাংশে জন্ম হইলে জাতক সুবর্ণসদৃশ-কান্তিবিশিষ্ট, নাতিদীর্ঘ, ও নাতিখর্ব্ব, সূক্ষ্ম ও অল্প লোমবিশিষ্টদেহ, সুন্দর-কেশকলাপসম্পন্ন, সুন্দরমূর্ত্তি, বহু পরিবারযুক্ত, ধাম্মিক, গুণী, বিষয় ভোগে সুখী এবং সুপরিচ্ছদধারী হইয়া থাকেন।

৬। দ্বাদশাংশ ফল

শূর বহুধনভোগী, নৃত্যগীতপ্রিয়ঃ সদা।
শুচির্দ্দান্তঃ ক্ষমাবন্তঃ দ্বাদশাংশে ভৃগোরভূৎ॥

শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে জাতক বলিষ্ঠ, ধনী, ভোগী, নৃত্যগীতপ্রিয়, আচারযুক্ত, দান্ত ও ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন।

৭। চন্দ্রের কেন্দ্র ফল

মিত্রোপকারী বিভবাতি যুক্তো বিনীতমূর্ত্তিঃ স্মৃতিশাস্ত্রশীলঃ।
প্রাপ্নোতি কান্তাং শুভযুক্তাং চন্দ্রোঽপি কেন্দ্রী চিরকালজীবী॥

চন্দ্র কেন্দ্রে থাকিলে জাতক বন্ধুবর্গের পরম উপকারী, বিভবশালী, বিনীতমূর্ত্তি, স্মৃতিশাস্ত্রশীল, দীর্ঘায়ু হন ও অতি মনোহর স্ত্রী লাভ করিয়া থাকেন।

৮। বুধের কেন্দ্র ফল

অপারবুদ্ধিঃ বহুদারযুক্তঃ বিদ্যানুরাগী গুরুদেবভক্তঃ।
সুশীলাভার্য্যাশ্চ বুধোঽপি কেন্দ্রী বিপ্রার্চ্চনে সাধুজনে চ রক্তঃ॥

জাতকের বুধ কেন্দ্রে থাকিলে তিনি অসীম বুদ্ধিশালী, বহুস্ত্রীসংযুক্ত, সুশীলাভার্য্যান্বিত, বিদ্যানুরাগী, দেব-গুরু-রাজ-ভক্ত এবং সাধুজনের অতিশয় ভক্ত হইয়া থাকেন।

৯। শুক্রের কেন্দ্রফল

সুখী সুবেশঃ স্বজনানুরাগী সুদারযুক্তো গুণবান্ ধনাঢ্যঃ।
সুবুদ্ধিশীলশ্চ কুলপ্রদীপঃ শুক্রোঽপি কেন্দ্রী চিরকালজীবী॥

শুক্র কেন্দ্রে থাকিলে জাতক অতিশয় সুখী, আত্মীয়স্বজনানুরাগী, সুবেশসম্পন্ন, সুস্ত্রীযুক্ত, গুণবান, বহুবিভবযুক্ত, সুবুদ্ধিশীল, কুলপ্রদীপস্বরূপ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন।

১০। চন্দ্রপ্রভাযোগ ফল

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্দ্রে চন্দ্রপ্রভাযোগ ইতি প্রণীতঃ
রাজাধিরাজো গুণবান্ বিলাসী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ॥

নবম স্থানের অধিপতি কেন্দ্রে থাকিলে জাতকের চন্দ্রপ্রভাযোগ হইয়া থাকে, এজন্য তিনি রাজাধিরাজ অথবা রাজতুল্য, গুণশালী ও বিলাসী হইয়া থাকেন।

১১। ক্ষেত্রসিংহাসনযোগ ফল

দশম ভবনাথঃ কেন্দ্র কোণে ধনে বা
বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাসনে বা
স ভবতি নরনাথো বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তির্ম্মদ—
কলিতকপোলৈঃ সদগজৈঃ সেব্যমানঃ।

জন্মসময়ে দশমাধিপতি কেন্দ্রে ও লগ্নে অবস্থান করিলে জাতক জগতে মনীষিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার ও জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবার যোগ পাইয়া থাকেন।

১২। গুরুমঙ্গলযোগ

যত্র যত্র স্থিতো ভৌমো গুরুযুক্তো ভবেদ যদি
তত্রোচ্চ ফলমাখ্যাতিঃ স্যাদুচ্চে দ্বিগুণং ফলং

মঙ্গল গুরুযুক্ত হইয়া উচ্চ ফলদাতা হন। এইজন্য গুরুমঙ্গল-যোগে জাতকের উচ্চ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

১৩। লগ্নে বুধশুক্রযোগ

সৌম্যেন যুক্তো ভৃগুজো বিলগ্নে নরং প্রসূতে নৃপকার্য্যদক্ষম্।
নৃপেন্দ্রপূজ্যং বহুশাস্ত্ররক্তং ধনান্বিতং সত্যসমন্বিতঞ্চ।

লগ্নে শুক্র বুধ যুক্ত হইলে জাতক বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও নৃপপূজ্য হইয়া থাকেন।

১৪। লগ্নস্থ বুধফল

বিদ্যা-বিত্ত-তপঃ-স্বধর্ম্মনিরতো লগ্নস্থিতে বোধনে

লগ্নে বুধ থাকিলে জাতক বিদ্বান, বিত্তবান, তপঃপরায়ণ, স্বধর্ম্মনিরত হন।

১৫। লগ্নস্থ শুক্রফল

বাচালঃ শিল্পবিদ্যশ্চ ধনী ভোগী মহামতিঃ
কাব্যশাস্ত্রবিনোদী চ ধাম্মিকো লগ্নগে ভৃগৌ

শুক্র লগ্নে থাকিলে জাতক বাকপটু, শিল্পবিদ্যাবিৎ, ধনী, ভোগী, মহামতি, কাব্যশাস্ত্রবিনোদী ও ধাম্মিক হইয়া থাকেন।

১৬। রাজযোগ ফল

সম্বন্ধো দশমাধিপস্য নবমাধীশেন যেষাং জনুঃ
কালে পঞ্চম ভাবপেন চ বলোপেতস্য তুল্যেন চেৎ।
প্রস্থানে সতি লীলয়া তনুভৃতাং বশ্যারিঃ-বিশ্বম্ভরা
গর্জ্জদ্ ঘোটকমত্তবারণ ঘটাক্রান্তা সমন্তাদ ভবেৎ॥

পঞ্চমপতি শনি এবং নবমপতি শুক্রের সহিত বলবান দশমপতি বুধের সম্বন্ধ হইলে জাতক শত্রুজয় এবং তাহাদিগকে বশীভূত করার প্রবল যোগ প্রাপ্ত হন।

১৭। রাহুর অবস্থানফল

মৃগপতিবৃষকন্যা কর্কটস্থোঽপি রাহুর্ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজারাজাধিপো বা
হয়গজনর নৌকা মেদিনী মণ্ডলানাং রিপুকুলতৃণবহ্নিঃ রাহুস্তঙ্গিশ্চিরায়ুঃ।

রাহু কর্কটরাশিতে অবস্থান করিলে জাতক রাজাধিরাজ, অশ্ব, মনুষ্য, লোকাদির অধিপতি এবং শত্রুকুলরূপ তৃণের হুতাশন স্বরূপ হইয়া থাকেন।

১৮। সুকর্ম্মযোগ

কর্ম্মেশে লগ্নভাবস্থে লগ্নেশেন সমন্বিতে
কেন্দ্রত্রিকোণগে চন্দ্রে সৎকর্ম্ম নিয়তো ভবেৎ

কর্ম্মাধিপতি লগ্নস্থানে অবস্থান করিলে এবং লগ্নাধিপতি যুক্ত হইলে এবং কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থ চন্দ্র থাকিলে এই যোগ হয়। এই জাতকের বুধ ও চন্দ্রের দ্বারা এ যোগ হইয়াছে। এই যোগে জাতক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

১৯। বুধতুঙ্গী ও বুধকেন্দ্রীযোগ

স্বোচ্চরাশি গতশ্চান্দ্রী কেন্দ্রকোণসমন্বিত।
বিদ্যাবাহনসম্পত্তিং করোতি বিপুলং ধনং

বুধগ্রহ উচ্চস্থ হইলে বা কেন্দ্রী ত্রিকোণগত হইলে জাতক বিদ্যা, যান, বাহন ও সম্পত্তিযুক্ত হইয়া বিপুল ধনের অধিকারী হন। এই জাতকের রাশিচক্রে বুধ চারিটী শক্তিযুক্ত (তুঙ্গী, স্বগৃহী, মূলত্রিকোণস্থ ও কেন্দ্রী) সুতরাং ঐ ফল পূর্ণভাবে হইয়াছে।

২০। লক্ষ্মীযোগ

কেন্দ্রমূলত্রিকোণস্থে ভাগ্যেশে পরমোচ্চগে।
লগ্নাধিপে বলাঢ্যে চ লক্ষ্মীযোগ ইতীরিতঃ॥
গুণাভিরামো বহুদেশনাথো বিদ্যামহাকীর্ত্তিরনঙ্গরূপঃ।
দিগন্তবিশ্রান্ত নৃপালবন্দ্যো রাজাধিরাজ বহুদারপুত্রঃ॥

লগ্নাধিপতি বলবান হইয়া কেন্দ্রস্থানে, ত্রিকোণস্থানে বা ভাগ্যস্থানে উচ্চস্থ হইয়া অবস্থান করিলে জাতক লক্ষ্মীযোগ প্রাপ্ত হন। এই জাতকের লগ্নাধিপতি বুধ কেন্দ্র, মূল, ত্রিকোণ এবং উচ্চস্থানে অবস্থান করায় তিনি লক্ষ্মীযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যোগ প্রাপ্ত হইলে জাতক বহুগুণযুক্ত, বহু দেশের উপর কর্তৃত্ব, বিদ্বান্, উচ্চকীর্ত্তিমান্, অনঙ্গতুল্য রূপবান, দিগ্‌ব্যাপী শান্তিদায়ক, রাজগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, রাজাধিরাজতুল্য, অনেক পত্নী ও বহু পুত্রযুক্ত হইয়া থাকেন।

২১। পারিজাতযোগ

বিলগ্ননাথস্থিত রাশিনাথ। স্থানেশরাশী শতদংশ নাথ॥
কেন্দ্রত্রিকোনোপ গতো যদি স্যাৎ। স্বতুঙ্গগোবা যদি পারিজাতঃ॥
মধ্যান্তসৌখ্যঃ ক্ষিতিপালবন্দ্যোযুদ্ধপ্রিয়ো বারণবাজিযুক্তঃ।
স্বকর্ম্মধর্ম্মাভিরতো দয়ালুর্যোগোনৃপঃ স্যাদ্ যদি পারিজাতঃ॥

এই জাতকের বুধতুঙ্গী ও মূলত্রিকোণস্থ কেন্দ্রগতি বুধ হওয়ায় পারিজাত যোগ হইয়াছে। পারিজাতযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি মধ্য ও অন্তকাল সৌখ্য বা শুভযুক্ত, রাজন্যবৃন্দবন্দিত, যুদ্ধে হর্ষান্বিত, বাজিকর্ম্মে নিবৃত্ত, স্বীয় কর্ম্মে ও ধর্ম্মে রত, দয়াযুক্ত হইয়া থাকেন।

২২। ভাগ্যবানযোগ

যত্র কুত্র স্থিতো ভৌমো। গুরুযুক্তোভবেদ্ যদি॥
তদাস্যাদ্বিপুলা লক্ষ্মীঃ। শুভদৃষ্টৌ বিশেষতঃ॥

এই জাতকের স্বগৃহী মঙ্গল সুখপতি বৃহস্পতির সহিত যুক্ত থাকায় ভাগ্যবান যোগ ও রাজযোগ হইয়াছে। এই যোগে জাতকের বিপুল ভাগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

২৩। দরিদ্রযোগ

লগ্নস্য দশমে শূন্যে রবেরেকাদশে তথা।
কুজস্য চাষ্টমে শূন্যে ত্রিশূন্যে চ দরিদ্রতা ॥

এই জাতকের রাশিচক্রে লগ্নের দশম (মিথুনের গৃহ) শূন্য, রবির একাদশও (মিথুন গৃহ) শূন্য, মঙ্গলের অষ্টমস্থানও (মিথুনের গৃহ) শূন্য থাকায় প্রকৃত দরিদ্রযোগ হইয়াছে। এইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উক্ত তিনটী নির্দ্দিষ্ট লগ্ন ও গ্রহের শূন্য স্থান একই স্থানে সন্নিবিষ্ট প্রায়ই দেখা যায় না।

২৪। ধনবানযোগ

ধননাথো যদা ধর্ম্মে দশমে লগ্নকে সুখে।
বিক্রুরে সবলে সৌম্যে ধনবান ধর্ম্মবাগ্‌ ভবেৎ ॥

ধনাধিপতি নবমে, দশমে, লগ্নে বা সুখস্থানে ক্রুরবর্জ্জিত হইয়া বলবান অবস্থায় অবস্থান করিলে ধনবান যোগ হয়। এক্ষেত্রে ধনপতি শুক্র লগ্নে (কেন্দ্রী) থাকায় ধনবান যোগ হইয়াছে। এ-যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধনবান ও ধর্ম্মবক্তা হইয়া থাকেন।

২৫। নন্দযোগ

যুগ্মে যুগ্মে ভবেত্রীনি একৈকঞ্চ ত্রিষু স্থিতং
নন্দযোগঃ সবিজ্ঞেয়ো চিরায়ুশ্চ সুখপ্রদঃ ॥

রাশিচক্রে যুগ্ম (দুইটী দুইটী) গ্রহযুক্ত হইয়া তিনটী স্থানে থাকিলে নন্দযোগ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ণভাবে তাহাই হইয়াছে। এযোগ প্রাপ্ত হইলে জাতকের সুখপ্রদ দীর্ঘায়ু লাভ হইয়া থাকে।

২৬। সুখজীবনযোগ

লগ্নেশে কর্ম্মরাশিস্থে, কর্ম্মেশে লগ্নসংযুতে।
তাবুভৌ কেন্দ্রগৌবাপি, সুখজীবনভাগ্‌ ভবেৎ ॥

লগ্নাধিপতি কর্ম্মস্থানে অবস্থান করিলে এবং কর্ম্মাধিপতি লগ্নস্থানে অবস্থান করিলে এবং উভয় কেন্দ্রগত হইলে জাতকের সুখজীবন যোগ লাভ হয়। এ যোগটী এক্ষেত্রে তুঙ্গী (উচ্চ) বুধের দ্বারা সংঘটন হইয়াছে। এ যোগে জাত ব্যক্তি সুখজীবন অতিবাহন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বর্ত্তমান বাসভবনের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য

নবম স্তবক

শ্রীশ্রীভৃগুসংহিতা-বিবরণ

সৌভাগ্যক্রমে বিশেষ চেষ্টার ফলে বিগত ১৩৪০ সালে কাশীধাম 'ভৃগুকার্য্যালয়' হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোষ্ঠীর ভৃগু-বিচার পাওয়া গিয়াছে। 'ভৃগুসংহিতার' প্রত্যেকটী উক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে এমন আশ্চর্য্যরকমে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে যে, আর্য্যঋষির ঈদৃশ অভ্রান্ত দর্শনের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ভৃগু-উক্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিবার স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা ইহার কিয়দংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সমগ্র 'ভৃগু'র মূল সংস্কৃত বচন ও বঙ্গানুবাদ দেওয়ার জন্য উক্ত কার্য্যালয়কে অনুরোধ জানান হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা 'পূর্ব্বজন্মকথন' এবং 'তনুভাবাদি' নয়টী ভাবফলের মূল সংস্কৃত বচন এবং কর্ম্ম, আয়, ব্যয় এই তিনটী ভাবফলের বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাংলা বচনগুলি যেরূপ পাওয়া গিয়াছে অবিকল তাহাই যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বজন্ম-কথন

শ্রীশ্রীশুক্র উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বভূতহিতে রত। ব্রুহি মে কৃপয়া দেব জীবস্যেদং শুভাশুভং ॥
পূর্ব্বজন্মনি জীবাহসৌ কিং কর্ম্ম কৃত্বা শুভাশুভং। কথং মর্ত্ত্যে সমায়াতঃ ইতি নিশ্চিত্য মে বদ ॥
কথং পাপং কথং তাপং কথং ত্রিপাপ খণ্ডনং। কেনোপায়েন তন্নাশো অধুনা বক্তুমর্হসি ॥
ইতি পুত্রোদিতং বাক্যং নিশম্য মুনিসত্তম। ক্ষণমাত্রমৃষি তস্থৌ ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ ॥

শ্রীশ্রীভৃগু উবাচ।

রামচন্দ্র ধরা ক্ষেপা কন্যা লগ্নে চ যো ভবেৎ। তথাঙ্গে তারকাপুত্র তথা পুলোম নন্দনঃ ॥
বিক্রমে চ সুরেজ্যশ্চ তথাঙ্গে অবনীসুত। তুর্য্যে চ শর্ব্বরী কর্ত্তা রুদ্রে চৈব বিধুন্তুদ ॥
তথাঙ্গে দ্যুমনিপুত্রঃ ব্যয়ে লোকপ্রকাশকঃ। প্রবন্ধে চ শিখীপ্রোক্তঃ গ্রহামান সমন্বিতঃ ॥
প্রোক্তং গ্রহানুমানেন যোগেহয়ং সিদ্ধিসাগরঃ। নাগর্য্যা খ্যেতু যো জাতঃ পূর্ব্ব জন্মনি ভার্গব ॥
শুভাশুভং ফলং বক্ষ্যে শৃণু চাস্য বিচেষ্টিতং। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেন শ্রেয়োভাক্ যত্বতঃ কবে ॥
আসীৎ পূর্ব্বভবে কশ্চিৎ মূর্দ্ধজ বঙ্গ খণ্ডকে। স্বর্ধুনী সমীপে তাত শ্যামাঙ্গ নাতি দীর্ঘকং ॥
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ বিদ্যাহীনঃ মহামতি। গীতনাদে পরাপ্রীতি জনকেনৈব তাড়িতঃ ॥
অনশনে কদাচিৎ তু সতদা দুঃখ পীড়িতঃ। দদর্শ চান্তিকে তাত বিধি প্রেরিত ইবানগ ॥
সজ্জন সৌমকান্তিশ্চ করুণা পুরিতেক্ষণঃ। তস্য কৃপাবিশেষেণ কচিৎ সাধ্বী প্রযত্নতঃ ॥
ভৈরবী কৃপয়া শর্ম্মণ্ রাজদ্বারে দেবগৃহে। পূর্ব্বভাগ্যবশাৎ কাব্য বিষ্ণুকৃপাপ্রভাবতঃ ॥

অংশাজ্জাতঃ যত শ্রীমান্ প্রাক্ সংস্কার গৌরবাৎ। স্বল্পযত্নে দৈবীকৃপা প্রাপ তূর্ণং মহামুনে॥
তত্ত্বজ্ঞানী ষোড়শাচ্চ খনেত্রাৎ মুনিসত্তম। মহাতত্ত্ব সুখং প্রাপ্য সর্ব্ব আশা বিনির্মুখঃ॥
পরমহংস পদারূঢ় জন্মজন্মান্তরার্জ্জিতঃ। সমদর্শী মহাভাগঃ অভেদঃ লোষ্ট্রী কাঞ্চনে॥
বিত্তমধ্যে রুচির্নৈব দারপক্ষাৎ পৃথক্ পুনঃ। পিত্রোপক্ষাৎ পৃথক্চৈব সংসারাচ্চ পৃথক্ অভূৎ॥
নারীচিন্তা ন বৈ স্বপ্নে মাতৃবৎ পশ্যতি স্বতঃ। মাতৃভাবাৎ মহাসিদ্ধি বহু শিষ্য সুবেষ্টিতঃ॥
অপূর্ব্ব তস্য চেষ্টাপি মূর্খোপি তত্ত্বভাষকঃ। স্বল্পধ্যানে মহাপ্রাজ্ঞঃ গূঢ়তত্ত্বার্থ তত্ত্ববিৎ॥
সমাধৌ চ যথা তাত প্রমদা কাঞ্চনাদিভিঃ। স্পর্শমাত্রে বিকৃতাঙ্গ শূলবিদ্ধবৎ তদা॥
এবং বিচেষ্টিতং তস্য কদাপি সময়ে মুনে। ব্রহ্মবার্ত্তা দদৌ শূদ্রে অচানক্ স্নেহযোগতঃ॥
শক্তিহীনোঽভবৎ তস্মাৎ গলরোগাৎ মৃতোত্তরে। যাবজ্জীবং যোগীশ্রেষ্ঠ ভূপাৎ তাত শনৈঃ সুখং॥
রামাৎরামে যথা তেজঃ এবং তস্য মহামুনে। পুনর্জ্জন্ম ধরাপৃষ্ঠে বিস্মৃত্য পূর্ব্বগৌরবঃ॥
মূর্দ্ধজস্য কুলে জন্ম দার পুত্র নিসেবিতঃ। অযুতং দ্বিগুণং বাপি বহু শিষ্যাদি সেবিতঃ॥
কুলপতি ইবাত্রাহি শব্দব্রহ্মাদিভাষকঃ। আদৌ বৈ কাঞ্চনত্যাগী অধুনা ন চ কষ্টভাক্॥
ত্যাগী ভোগী মহাত্যাগী উত্তরে দৈব যোগতঃ। শিষ্য ধী বর্দ্ধনে যত্ন পুত্রবৎ পালতেঽনঘ॥
পূর্ব্বপাপাৎ মহাভাগ কদাচিৎ লোভ সংযুতঃ। বহুশিষ্যাদিভিঃ সৌখ্যং অন্নভির্জায়তে ন চ॥
*…১……পত্নী…২…মার্গীচ সর্ব্বেষাং রঞ্জনে সুখং। মাতা তস্য ভবেৎ…৩…সমাচ…৪…
ভ্রাতৃমূলাৎ মহাচিন্তা পরস্ত্রীমতি বৈ কচিৎ। রাজদ্বারে ব্যয়ং দীর্ঘং দীর্ঘাপবাদ সম্ভবঃ॥
তথাপি যোগীনাং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপরঃ। প্রাক্সংস্কারাৎ মহাভাগ স্থিত প্রজ্ঞোপি বৈ কবে॥
রাজদ্বারে ব্যয়ং দীর্ঘং ব্যসনে চ ধনক্ষতিঃ। ঋণযোগেঽপি জায়তে ন ত ভ্রাতৃমূলাৎ ভয়ং কচিৎ॥
……বিভবাদৌ……নিমগ্নেঽপি গতিস্তস্যাপি শাশ্বতী। মাতৃভক্তি প্রসাদেন ব্রহ্মচিন্তা প্রভাবতঃ॥
যাবৎ যাবৎ বয়ো যাতি জ্ঞানবৃদ্ধি নিরন্তরং। ধর্ম্মধ্বজোপি জায়তে কুলপতি ইবানঘ॥
শিষ্যানাং পালনে যত্ন বর্দ্ধনে রক্ষণে তথা। শিষ্যার্থে জন্ম বৈ তস্য শিষ্যার্থে বৈ পুনর্জ্জনি॥
নামব্রহ্মো কদা সৌখ্যং শব্দ ব্রহ্মে কদা মতি। কদাপি সময়ে তাত শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ত্ততে॥
জ্ঞানপ্রার্থী ন কস্মাচ্চ স্বয়ং তাত স্বতন্ত্রতা। বন মধ্যেঽপি বৈ তস্য রাজবৎ বিভবাদিকং॥
ভোগমধ্যে ধর্ম্মচিন্তা সমদর্শী যদা কদা। আশ্চর্য্যং কৃচ্ছ্র যোগোঽপি মহাজ্ঞানী স্বতোভবেৎ॥
মায়াকর্ম্মাদি মধ্যে চ মায়াযুক্ত স্বতোত্তরে। শিষ্যানাং জ্ঞানবৃদ্ধার্থে উত্তরে সর্ব্বত্যাগকৃৎ॥
মধ্যে মহাভোগাদ্দিকং পাকে রাজদ্বারে ভয়ং কচিৎ। অপবাদাদিকং চিন্তা ললনা পক্ষতঃ মুনে॥
তাপাৎ সঞ্জায়তে তাপঃ তাপাৎ তাপস্য খণ্ডনঃ। মুক্ততাপ অথ পশ্চাৎ নির্ম্মলঃ শুদ্ধ সত্যযুক্॥
গলিতা বাসনা সর্ব্বে মুক্তবারি যথানঘঃ। অষ্টসিদ্ধির্নমন্তেত আত্মস্থ আত্মনির্ভরঃ॥
পরমহংসোপি জায়তে সর্ব্বথা সাধু চেষ্টেতঃ। সত্যলক্ষ্য মহাপ্রাজ্ঞঃ শত্রুমিত্র সমানয়োঃ॥
সোঽয়ংরূপ গুণৈর্যুক্তঃ মূর্দ্ধজান্বয়া বিভূষণঃ। ভাদ্র মাসে সিতে পক্ষে ॥
যুগান্তে মাতৃগর্ভাৎ সমুদ্ভবঃ। পুনরাগত বৈ উর্ব্বী শিষ্যানাং জ্ঞানহেতবে॥

অথ তনুভাব ফলং

অঙ্গনায়াং ভবেজ্জন্ম তদীশে কণ্টকে কবে। বিপ্রবংশাবতংস স্যাৎ তীব্রপ্রজ্ঞা উদারধী।
লগ্ননাথে গতে লগ্নে অব্জো দীর্ঘজীবিনঃ। বলভোঽতি সুমূর্ত্তিশ্চ ভূধনং বর্দ্ধতে গৃহে॥

* ১, ২, ৩, ৪ চিহ্নিত স্থান কীটদষ্ট। এই চারিটী স্থানে যথাক্রমে সৎ, শুভ, সৌম্যা ও প্রিয়বাদিনী এই চারিটী শব্দ স্থাপন করা যাইতে পারে। ভৃগু কার্য্যালয়।

ধনাধিশে গতে লগ্নে লক্ষ্মীকৃপা বিচক্ষণঃ। শ্রীপতি বিশ্রুতি লোকে প্রার্থী তন্ত্রান্তিকে সদা॥
ভাগ্যাধীশে গতে লগ্নে গুরু দেবার্চ্চনে রতঃ। বিচক্ষণঃ ধনাধীশঃ রাজপূজ্য কদা কদা॥
রাজ্যেশে তনুগে চৈব মাতৃপিতৃ সুসেবকঃ। মাতৃভক্তি বিশেষণ মাতা পুরুষবৎ কচিৎ॥
তারাপুত্রে যদা মূর্ত্তৌ বেদবিদ্যা বিচক্ষণঃ। সর্ব্বোপরি সভামধ্যে রাজতে নিরজঃ পুমান্॥
বহুশাস্ত্র প্রবক্তা চ ভিষক্ শাস্ত্র বিচক্ষণঃ। ধনীতি বহু শাস্ত্রীয় গূঢ়তত্ত্বার্থ তত্ত্ববিৎ॥
দৈত্যনাথে তনৌ যস্য সদ্রূপং সৎসথাপ্রিয়ঃ। সহস্রং সৎক্রিয়াযুক্তঃ বিদ্যাভরণভূষিতঃ॥

* * * * *

বিদ্যাবান্ কীর্ত্তিমান্ শ্রীমান্ ধনাঢ্যো বহুশ্রুতবান্। সার্ব্বভৌম শিষ্যমধ্যে বহুদেশে চ কীর্ত্তিভাক॥
মন্ত্রবাদী শব্দভেদী পিশাচোচ্চাটনে পটুঃ। মৃদুভাষী সুবিদ্বাংশ্চ দয়াবান্ ক্ষমাবান্ তপা॥
সপ্তবিংশতি বয়োর্দ্ধে ধর্ম্মশ্রী বহুলাভবান্। দেহারোগ্যং দেহজ্যোতিঃ চিত্রমূর্ত্তিঃ সুভালকং॥
অঙ্গহীন শাস্ত্রপাঠী সজ্জনদ্বেষী বৈ কদা। শ্রেষ্ঠলোকাৎ সমুৎপন্নঃ শ্রেষ্ঠলোকে গমিষ্যতি॥
ধর্ম্মবুদ্ধি শাস্ত্রবিচ্চ গণিতশাস্ত্রবিৎ তথা। অপঠনাদপি শাস্ত্রজ্ঞঃ রসায়নাদি সিদ্ধিভাক॥
দীর্ঘায নারীপ্রীতিশ্চ বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত। গুণবান্ রূপবান্ সৌম্য যানবাহন সৌখ্যসুক্॥
মহারাজা যদি বেচ্ছা রাজমান্যশ্চ ধর্ম্মবী। শ্রেষ্ঠযোগী নাদসিদ্ধঃ ব্রহ্মবিৎ বেদ বিদাম্বর॥
সর্ব্বসত্ত্বা সমাপন্ন সর্ব্বদোষাৎ প্রমুচ্যতে। লোকনিন্দা ন মন্যেত আর্ত্তোদ্ধারণে বৈ মুনে॥
অন্তর্দৃষ্টি তথা শান্তঃ শমনঃ পূর্ণ পূর্ণকঃ। কদা মায়া কর্ম্মচিন্তা তস্মাদপি প্রমুচ্যতে॥
লক্ষ্মীকৃপা বিশেষেণ উদ্যানং যন্ত্রবাটিকা। রাজবৎ বিভবং চাস্য রাজবৎ শিষ্য বৈ বহু॥
তপঃ জ্যোতিঃ ধ্যানী জ্ঞানী শাস্ত্রগূঢ়ার্থতত্ত্ববিৎ। নাদব্রহ্মাৎ পরং যাতি শব্দব্রহ্মাতিরিচ্যতে॥
কলাহীনঃ যথা চন্দ্রঃ শনৈঃ বৃদ্ধিঃ লভেৎ কবে। ভাগ্যবৃদ্ধি তথাচাস্য আদৌ নৈব সুখং বহু॥
যৌবনান্তে সুখং পূর্ণং প্রৌঢ়ে রাজ্যভীতি কদা। সমত্বং সুখে দুঃখে চ তাপে নাপি তদা কবে॥
প্রাপ্তে পরিণতে বর্ষে বার্দ্ধক্যে শ্রেয়মাপ্নুয়াৎ। শুভ লক্ষণে যুক্তোপি ভয়ভীতিশ্চ প্রৌঢ়কে॥

* * * * *

তথাপি ধর্ম্মবুদ্ধিঃ স্যাৎ তাপে নাপি চ নির্ম্মলঃ। সর্ব্বে মলিমসাং ত্যক্ত্বা মেঘমুক্ত দিনেশবৎ॥
সর্পবেদাৎ চন্দ্রবাণে মহাসৌখ্যং চ সর্ব্বথা। ধর্ম্মবৃদ্ধি কর্ম্মবৃদ্ধি মহাতত্ত্বসুখং লভেৎ॥
বেদবাণান্তরে তাত দেহত্যাগে প্রযত্নতা। তদাদৌ নিষ্ফলং চেষ্টা শিশুমূলাৎ সুরক্ষিতঃ॥
যদি মৃত্যু নিবর্ত্তেত স্বেচ্ছয়া মুনিসত্তম। ইচ্ছামৃত্যু অয়ং শ্রীমান্ মিতাযঃ অমিতায়ুঃ হি॥
তনুভাবং ফলং বক্ষ্যে যাবজ্জীবং সুখং কবে। ভোগমধ্যে মহাত্যাগী উত্তরে মুনি সত্তম॥
তস্য চেষ্টাদিকং সম্যক্ দুর্জ্ঞেয় মুনিপুঙ্গব। জ্ঞানাগ্নৌহবনাৎ তাত সর্ব্বকর্ম্মাণি নিষ্ফলঃ॥

ইতি শ্রীশ্রীভৃগুসংহিতায়াং শ্রীশ্রীভৃগুশুক্রসংবাদে যোগধ্যায়ে তনুভাব ফলং সমাপ্তং। শ্রীরস্তু।

ধনভাব ফলং

ধনভাব ফলং বক্ষে সিদ্ধনাগর সম্ভবঃ। তৌলিকাক্ষে ভবেৎ ভাবঃ ব্যয়ে দৈত্য পুরোহিতঃ॥
চন্দ্রপুত্রেণ সংযুক্ত গগনে চার্কী বিধুন্তুদৌ। বিত্তে জীব তথা ভৌমঃ ভ্রতুগে রজনীপতি॥
তূর্য্যে ভুজঙ্গমঃ প্রোক্ত রুদ্রেচৈব দিবসপতি। প্রোক্তং গ্রহানুসারেণ ধনভাব ফলং কবে॥
শিষ্যেভ্যোপি ধনং চাস্য বেদবিংশৎ পরং শনৈঃ। পুত্রযোগাৎ মহাভাগ লক্ষ্মীকটাক্ষকৃৎ শনৈঃ॥
বহুবিংশাৎ পুনর্বৃদ্ধি রসরামাৎ মহোদয়ঃ। আরাম বাটিকাযন্ত্র যানবাহনমুত্তমং॥
ভেষজাগার কর্ত্তা চ প্রতিষ্ঠা তড়াগাদিকং। দেবপুরোদিকং পাকে বাল্যে কষ্টং ধনৈঃ জনৈঃ॥
পিতৃপশ্চাৎ মহাখ্যাতি শনৈঃ বৃদ্ধি দিনে দিনে। শিষ্যানাং মণ্ডলে সৌখ্যং যশাপ্তি ধনবৈভবং॥

অভ্রবেদাৎ মহাসৌখ্যং চন্দ্রবেদাৎ পরং ভয়ং। রাজদ্বারে তদা চিন্তা উদ্বেগং চ ধনক্ষতিঃ ॥
বেদাবেদান্তরে চিন্তা শত্রুপীড়া বিশেষতঃ। রাজরোষাদিকং পাকে তথাপি ধনদা দশা ॥
দ্বিরদানাং যথা দন্তঃ বহিঃ প্রকটিতো যদা। পুনর্মধ্যে ন বৈ যাতি লক্ষ্মীরূপা তপানঘ ॥
শিষ্যানাং কারয়েৎ যোগং সহজানন্দ দায়কঃ। পরমার্থ ধনং চাস্য করামলকবৎ মুনে ॥
মহাতত্ত্বসুখং লাভং সর্পবেদাৎ মহামতে। হবনং সর্ব্বকর্ম্মাণি ব্রহ্মাগ্নৌ নিয়লং তদা।
পুত্রধনাদিকং চিন্তা তৎপাকে ইন্দুবাণাবধি। বেদাবাণান্তরে তাত দেহত্যাগাদি চিন্তনং ॥
সর্পবেদাবধি মন্ত্রাৎ শিষ্যেভ্যোপি সুরক্ষিতঃ। ইচ্ছামৃত্যু ভবেৎ তস্য জ্ঞানরত্নং প্রযচ্ছতি ॥
প্রার্থীভ্যঃ যত্নতঃ শ্রীমান্ করুণার্দ্র বিলোচনঃ। জীবানাং কল্যাণে চিন্তা নিশ্চিন্ত সর্ব্বভাবতঃ ॥
ধর্ম্মার্থে ধাষাতে জন্ম দুজ্জেয়ং ব্যবহারাদিকং। ভোগমধ্যে বহিশ্মগ্নো অন্তরে খমনো কবে ॥
আকাশাভ্যন্তরে সর্বং নির্লিপ্ত তথাপি নভঃ। এবং বিচেষ্টিত তস্য ধনভাবাদি বৈ মুনে ॥
যাবজ্জীবং সুখং বাচ্যং ভোগধন্য সমাযুতঃ। জীবন্মুক্তেব চেষ্টা বহিনৈব প্রকাশ্যতে ॥
রাজবৎ মন্দিরে বাসঃ রাজবৎ পানভোজনং। রাজবৎ সর্ব্বচেষ্টাপি রাজপূজ্য মহামুনে ॥
তস্যাপি সদৃশং লোকে দুর্লভং নাত্র সংশয়ঃ উত্তরেঽপি স্থিত প্রজ্ঞ সর্ব্বকালে সুখাপ্নুয়াৎ ॥
যাবজ্জীবতি ভূভাগে তাবৎ কালান্তরে সুখং। জীবন্মুক্ত মহামগ্ন সাধুবৎ সর্ব্বচেষ্টাযুক্ ॥
অপবাদাদিকং পাকে তত্র রক্ষা বিধীয়তে। ধনভাব ফলং চাস্য রাজবৎ সর্ব্ব বৈভবং ॥

ইতি শ্রীশ্রীভৃগুসংহিতায়াং ধনভাব ফলং।

পুত্রভাবফলং

* * * * *

বিদ্যাভক্তি অথ বক্ষে শৃণু পৌলমাত্মজ। সর্ব্ববিদ্যাসমাপন্নঃ ভার্গব পঠনং বিনা ॥
ধনীতি ভেষজে বিজ্ঞানী মন্ত্রবিৎ খলু। মগ্নবৎ ভোগমধ্যেঽপি ঋষিমধ্যে মহর্ষিবৎ ॥
রাজবিদ্যাবিদ্যদায়ী তথাপি সর্ব্ববিদ্যাযুক্। সর্ব্বদ্রষ্টাথ মৌনীত্ব জ্ঞাত্বা কিঞ্চিন্নভাষতে ॥
এবং বিচেষ্টিতং তস্য স্বল্পকালেচ ধ্যানতঃ। আত্মবিস্মৃতি বৈ মধ্যে তদা সুপ্ত মৃগেন্দ্রবৎ ॥
আশ্চয্যং তস্য চেষ্টাপি মাতাপি বুদ্ধতে ন চ। পুত্রবাৎসল্য যোগেন কি পুনঃ অন্যেষাং কথা ॥
ধ্বান্তমধ্যে কদাচার্ক পুনর্মুক্তঃ প্রকাশকঃ। এবং বিচেষ্টিতং চাস্য কদাকামা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
বেদবেদে সর্পবেদ নেত্রবাণাগ্নয়াবধি। মহাপ্রকাশঃ বৈ শর্ম্মণ্ পূর্ণমন্ত্র কৃতে শ্রুতৌ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্ম চিন্তাপি আর্ত্তানাং পালনে মতিঃ। নীচশ্রেষ্ঠৌ সমং প্রীতি জাতিভেদং না চান্তরে।
পাপাত্মা চৈব পুণ্যাত্মা সমং তস্যাপি চান্তিকে। আর্ত্তত্রাণে মহাযত্নঃ পাতকোদ্ধরণে মতি ॥
পরমহংসোপি জায়েত উত্তরে দ্বন্দ্ব নৈব চ। বিকারী জায়তে নৈব সর্বে মলিমসাক্ষয়ঃ ॥
তদন্তরে সুতোৎপত্তি রসনেত্রে পুনঃ সুতঃ। অধুনাপি প্রজীবেত অস্যযোগেঽপি নিষ্ফলঃ ॥
সুতাসৌখ্যং পুনঃ পাকে ত্রিপুত্রকন্যাকাদ্বয়ং। কচিৎ যোগমৃতিং বাচ্যং নেত্রদারী চ পুত্রবান্ ॥
স্বমন্ত্রাৎ মুনি শার্দ্দূল বহুদারী ন বৈ মুনে। ভক্তিজ্ঞানসমাপন্ন ইচ্ছামৃত্যু লভেন্নরঃ ॥
পুনরাবর্ত্তনং চাস্য জীবোর্ব্বী শিষ্য হেতবে। পরিত্রাণায় জীবানাং আর্ত্তানাং চ বিশেষতঃ ॥
সামান্য জনেব বৈ ভাতি মহাপ্রকাশ পূর্ব্বকে। আদৌ জানাতি বৈ তস্মিন্ স্বল্পসংখ্যক মানবাঃ ॥
ভোগমধ্যে মহামগ্নো ভোগত্যাগেন ক্লেশভাক্। সর্ব্বাবস্থা সমং বেত্তি দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বং ন মন্যতে ॥

ইতি শ্রীশ্রীভৃগুসংহিতায়াং পুত্রভাব ফলং

অথ দারভাব ফলং

শ্রীশ্রীভৃগুরুবাচ—

ধর্ম্মমন্ত্রী জায়তে নূনং শিষ্যেভ্যোপি ধন সঞ্চয়ঃ। সদ্বিত্তোপজীবকঃ শ্রীমান্ গলিতা বাসনোত্তরে॥
লগ্ননাথে গতে ভাগ্যে ভাগ্যাধিপেন বৈ সহ। লগ্নেশো দারভাবস্য রাজ্যাধীশোপি বৈ যতঃ॥
ভাগ্যেশোপি বিগুনাপ ধনাঢ্য খণ্ডনায়কঃ। বহুনি তস্য শিষ্যানি সংখ্যা সংজ্ঞা ন মন্যতে।
প্রাক্‌জন্মাৎ অত্র জন্মেঽপি পুনঃ জন্মান্তরেঽপি চ। শিষ্য প্রশিষ্য যোগাদি তেষাং জ্ঞানদাতা প্রভু।
আত্মগুপ্তি বিশেষেণ হকস্মাৎ চ প্রকাশয়েৎ। তত্ত্ববার্ত্তা হিতার্থে চ চান্তবার্ত্তা প্রকাশকঃ।
অধুনা নাদবার্ত্তাদি শূন্যবার্ত্তা তথাপরে। নিশ্বাস শ্বাস যন্ত্রাদি শূন্যবার্ত্তা তথা স্থিতিঃ।
দ্বাদশর্কাণাং ভেদাদি শনৈঃ তাত প্রকাশয়েৎ। শূন্য পূর্ণ মহাধ্যানং শাম্ভবী স্থিতিরেবচ।
অন্তর্ব্বহি গ্রন্থী ভেদং প্রকৃতি বোধনং তথা। তত্ত্বাতীতাদি জ্ঞানঞ্চ মহাতত্ত্বাদি বোধয়েৎ।
কচিৎ জন্মে মহাবাহো সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতঃ। যবনানাং জ্ঞানদাতা তেষাং মাননীয় তদা।
ক্ষাত্রবিট্ শূদ্র দ্বিজানাং তজ্জন্মে চাপি জ্ঞানদ। তেষাং মধ্যে মহা দ্বন্দ্ব মৃত্যু পশ্চাৎ মহামুনে।
দারবিত্তাদিনাং বার্ত্তা অধুনা বক্ষ্যে মানদ। পুত্রে রাহু তথা গৌরী ষষ্ঠেচৈব প্রভাকরঃ।
রোহিণী নন্দনং দ্যূনে তথাদৈত্য পুরোহিতঃ। রাজ্যে চ শর্ব্বরী কর্ত্তা রন্ধ্রে শিখী ব্যবস্থিতঃ।
শুভাঙ্গী সুশীলা দারা পতিব্রতা সমানঘা। ঘন বর্ষান্তরে শর্ম্মণ্ উদ্বাহে ভামিনীং লভেৎ।
ধর্ম্মশীলা ভবেৎ দারা পতিভাগ্য করা শুভা।

* * * * *

অথ রন্ধ্রভাব ফলং

অজ লগ্নোদয়ে ভাবঃ ভাবাধীশোপি চাষ্টমে। বিপ্রবংশে পূর্ণযোগী গার্হস্থ্যোপি মহামুনে।
পূর্ব্বজন্মে দারত্যাগী অধুনা গৃহমেধী কবে। লোকশিক্ষা হিতার্থে চ গার্হস্থ্যে স্থিতি চাধুনা।
অন্তরে উদাসীনোপি বিষয়ে বাহ্য বেষ্টিতঃ। বহু হস্তাৎ ধনঽচাস্য লোকযাত্রা অনিন্দিতং।
মাস্য ধনজনৈঃ গণ্য ধৃতি বিংশষ্ট বিংশকে। সর্ব্বসৌখ্য সমাপন্ন যাবজ্জীবতি রাজবৎ।
রাজবৎ সর্ব্বচেষ্টাপি বিষয়ে বিষয়ী ন চ। উদাসীন গৃহীঃ পুংসঃ বাল্যে কষ্টং ভূশং কবে।
যৌবনে প্রৌঢ়কে সৌখ্যং মহাতত্ত্ব সুখং লভেৎ। দেহত্যাগী ন বৈ চেৎস অত্র জন্মনি সিদ্ধিদঃ।
তস্যাপি ধ্যানমাত্রেণ বহুশিষ্য ভবিষ্যতি। তস্যাপি দর্শনাৎ সৌখ্যং গূঢ়বার্ত্তা প্রকাশকঃ।

* * * *

তৎপাকে মাতৃচিন্তাপি সৌখ্যং মাতৃসহায়তঃ। মাতৃমূলাৎ প্রতিষ্ঠা চ মাতৃভক্ত্যা সুখং লভেৎ।
মাতৃধ্যানাৎ সুখং পূর্ণং আদর্শং জনহেতবে। মাতৃপূজা বিশেষেণ রাজবৎ সর্ব্বকালকে।
ভোগমধ্যে মহাভোগী রাজানঃ পাদপূজকাঃ। যোগীমধ্যে মহাযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ উদার ধী।
রসরামান্তরে তাত পিতৃকৈবল্যমাপ্নুয়াৎ। হুমন্নাৎ মাতৃচিন্তাপি বেদবেদাষ্ট বেদকে।
বাল্যে কৈশোরকে কষ্টং দেহকষ্টং ধনাত্মকং। যৌবনে সুখভাক্ নূনং প্রৌঢ়ে কীর্ত্তি বিশেষতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানী বিশুদ্ধাত্মা মহাতত্ত্ব সুখং লভেৎ। দেহত্যাগী ন বৈ চেৎস ইচ্ছয়া লীলয়া মুনে।
মহাপ্রকাশঃ জায়েত হকস্মাৎ মুনি সত্তম। তত্র বিঘ্নং শিষ্যমূলাৎ তেষাং কর্ম্ম প্রভাবতঃ।
তূর্য্যবাণ খভে ষষ্ঠে রন্ধ্রে ভাগ্যে খভে গ্রহাঃ। সর্ব্বে গ্রহানুমানেন নেত্রাদি প্রমিতং বয়ঃ।
স্বজন পুত্র বিত্তাদি চিন্তা চন্দ্রবাণান্তরে। বেদবাণান্তরে শর্ম্মণ্ কায়ব্যূহাদি যত্নতঃ।
দেহত্যাগেঽপি তাত শিষ্যমূলাৎ মহামুনে। তেষাং রোগাণি পাপানি আদায় অকালে মৃতি।
ইচ্ছামৃত্যু অয়ং পুংসঃ শিষ্যসৌখ্যহিতে রতঃ। * *

ভাগ্যভাব ফলং

ভাগ্যেশে বিক্রমে শর্ম্মণ্ তথাঙ্গেচ বিধুন্তুদঃ। ভাগ্য ভাবস্থ ভাগেষু শিখী তাত ব্যবস্থিতঃ॥
বিপ্রবংশে শুভাঙ্গশ্চ পরমহংস পুনঃ পুনঃ। কিঞ্চি সংস্কারমাশ্রিত্য ধর্ম্মার্থে জায়তে জনিঃ।
বাল্যে মুনি মহাভক্তঃ প্রৌঢ়ে কিঞ্চিৎ মলিনতা। জ্ঞানমার্গে রতিস্তত্র প্রমদাম্বিষ যোগতঃ।
স্বল্প কান্তান্তরে সৌখ্যং মুক্তবারি যথা ঘন। ভোগার্থে প্রার্থনামূলাৎ মধ্যে ধ্বান্তে কচিৎ শশী।
ব্রহ্মচিন্তা শীর্ষদানাৎ তথা সংযমনাৎ সুখং। পঞ্চরসায়ণং কুর্য্যাৎ আত্মদানাদিকং ততঃ।
ব্রহ্মাগ্নৌ হবনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মাদিকং পুনঃ। নিঃসঙ্গোপি ততঃ কাব্য বহু সঙ্গেন ভার্গব।
কর্ম্মমধ্যে মহাযোগী অধুনাপি যোগরূঢ়ঃ। যাবজ্জীবতি বৈ ভূমৌ ধর্ম্মমার্গপরায়ণঃ।
বিত্তেশে পুত্রগে চৈব ধর্ম্মভাবস্থ ভার্গব। ধর্ম্মবিত্তং লভেৎ শ্রীমান্ শিল্পেভ্যোপি ধনঞ্জয়।
বাল্যে কৈশোরকে কষ্টং যৌবনে প্রৌঢ়কে সুখং। ভূমি মল্লাদিকং রম্যং আরামং কেন্দ্রবাটিকা।
পরার্থে বহু যন্ত্রাদি আতুর নারীরক্ষণে। দেবাগার প্রতিষ্ঠাতা সেবাগারাদি শিল্পভূ।
বেদবেদাৎ সর্পবেদ জ্ঞানং জ্ঞানং নিরন্তরং। স্থিতপ্রজ্ঞা মহাজ্ঞানী সংস্কারাৎ পূর্ব্বজন্মতঃ।
কলিকালে ভাবব্যক্তা জ্ঞানলোকাদি সত্যতঃ। জ্ঞানপ্রার্থী ন বৈ কস্মাৎ ব্রহ্মচিন্তা বিনা কবে।
অতঃপরং মহাবৃদ্ধি সিদ্ধাদি নহি গণ্যতে। ধ্বনিরভ্যন্তরে জ্যোতিঃ তত্র স্থানৌ মনোলয়ঃ।
পুনঃ ঋদ্ধিঃ পুনঃ স্বস্তি সর্ব্বত্যাগেঽপি ভোগকৃৎ। সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বজ্ঞানী দুঃখং বৈ ভ্রাতৃহেতবে॥
ভেষজাৎ যন্ত্রশিল্পাদৌ বঙ্গবিত্তাদি গণ্যতঃ। ভূমিতঃ রাজতঃ সৌখ্যং শিল্পেভ্যোপি ধনঞ্জয়ঃ॥

* * * * *

রসবেদাৎ পরং শর্ম্মণ্ যাবজ্জীবতি বৈ ভূমৌ। ধর্ম্মবিত্তং স্থিতপ্রজ্ঞা মহাতত্ত্ব সুখং লভেৎ॥
পরমহংস মহাযোগী ভেদবার্ত্তাদিকং ন চ। সমত্বং সর্ব্বভূতেষু তথাচ লোষ্ট্র কাঞ্চনে।
ত্যাগী ভোগী তথা শান্তিঃ সর্ব্ব আশা বিনির্ম্মুক্তঃ। গলিতা বাসনা সর্ব্বা শুদ্ধ সত্ত্বোপি রাজতে॥
উর্দ্ধদৃষ্টিরধোদৃষ্টিঃ শাম্ভবী স্থিতিমাপ্নুয়াৎ। অষ্টমে চ যদা চন্দ্র ভাগ্যে শিখী দ্যূনে গুরু॥
তথাঙ্গে ভূমিপুত্রশ্চ বিক্রমেচ শনৈশ্চরঃ। স্থিতিপ্রাণে তথা নাদে শূন্যে লয়ে তত পুনঃ॥
লোকমধ্যে মহামগ্ন মহাধ্যানে সদৈব হি। স্মৃতিধ্বংস কর্ম্মধ্বংস পাপপুণ্য বিবর্জ্জিতঃ॥
শান্তঃ শান্তঃ সদাস্বস্থঃ তথা সংস্কার উত্থিতঃ।

ইতি ভাগ্যভাব ফলং।

দশমভাব ফল

হে দানবার্চ্চিত!' এক্ষণে রাজ্যভাব বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর—

মিথুন লগ্নে যাহার দশম ভাব হয় এবং ভাবাধিপতি যদি চতুর্থে শুক্রের সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে ২৪।২৮ পর হইতে বিশেষতঃ পিতৃমৃত্যুর পর হইতে ক্রমশঃ রাজতুল্য সুখ, ঐশ্বর্য্য, মান, ধন, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। জাতক বাল্যে দরিদ্র ও ইহার পিতার অবস্থা মন্দ হইবে।

জাতক ব্রাহ্মণকুলে জাত ও চিত্রবর্ণ এবং বহুরূপধারী হইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে ভিন্নরূপে দেখিবে এবং দুষ্টজন কর্ত্তৃক এই ব্যক্তি অপবাদগ্রস্ত হইবেন।

হে তাত! অন্য নারী হইতে ইহার ক্ষোভ, আশঙ্কা ও অপবাদের কারণ হইলেও লগ্ননাথ ও চতুর্থপতি পঞ্চম ব্যয়পতির সহিত যুক্ত হওয়ায় জাতক মাতৃভক্তিপ্রসাদে সমস্ত বাধা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, পরন্তু রাজদ্বারে দীর্ঘ ব্যয়াদি হইবে।

দশম ভাবের দ্বিতীয়ে কর্কটে রাহু ও শনি থাকায় জাতকের ১৪—২৮।৩০ হইতে ক্রমশঃ এবং ৩৬।৩৯ হইতে ক্রমশঃ বিত্তবৃদ্ধি, রাজবৎ ঐশ্বর্য্য-সুখ, বহু শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে সুখ বৃদ্ধি এবং রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিও ইহার পাদপূজক হইবে। এবং ৪৬—৪৮ পরে যাবজ্জীবন জাতক সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইবেন। ঐ সময়ে জাতক সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, বিষয়ে বীতরাগ ও ভোগত্যাগে যত্নশীল হইবেন। তাঁহার শান্তি ও পরমার্থবিত্ত লাভ হইবে। হে তাত! এক্ষণে ৪৬ মধ্যে জাতকের বহু শত্রু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এমন-কি শিষ্যমধ্যেও বহু শত্রু হইবে এবং জাতকের বহু রিষ্ট ও গৃহে শোকাদি দেখা যায়। এই সময়ে কায়ব্যূহাদি শান্তি, ব্রহ্মচিন্তা, পদ্মলাভ সঞ্জীবনাদি শান্তি প্রশস্ত।

৪৬—৪৮ পুনঃ ৫১—৫৬ জাতক মহাশান্তি লাভ করিবেন। ঐ সময় তাঁহার জনসঙ্গে অরতি, তৃষ্ণাচ্ছেদনে যত্ন, মহাতত্ত্বসুখ ও পূর্ণ বিকাশ হইবে।

* * * * *

দশম ভাবের চতুর্থে শুক্র ও বুধ থাকায় জাতক মাতৃপ্রসাদে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবেন। হে তাত! যাবৎ নরগণ পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় আন্তরিক ভাবে জ্ঞান করিয়া পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অর্চ্চনা, বন্দনা ও প্রদক্ষিণাদি করিবে, হে তাত! তাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমার অনুশাসনে তাহাদের কোন ক্লেশই হইবে না ও দিন দিন আত্মপ্রসাদ ও ধর্ম্মপথে নিশ্চয়ই গতি বৃদ্ধি হইবে।

দশম ভাবের পঞ্চম পতি শুক্র চতুর্থে থাকায় জাতক সুপুত্রবান হইবেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যাসুখ হইবে, অন্য যোগ-সুখে বিঘ্ন আছে। কিন্তু জাতক ইচ্ছা করিলে অন্য পুত্রসুখ লাভ করিতে পারেন। জাতকের বহু শিষ্য প্রশিষ্য পুত্রবৎ হইবে। জাতক পুত্রভাগ্য প্রসন্নাত্মা হইবেন। ২৪ ও ২৬ বর্ষে পুত্রযোগ দেখা যায়।

দশম ভাগের ষষ্ঠে বৃহস্পতি ও মঙ্গল থাকায় জাতকের ৪৪ মধ্যে পুনঃ ৪৪—৪৬ বহু শত্রু হইবে। জাতক বাল্যকালে বহু দুঃখে কাল যাপন করিবেন। জাতক পরাবশথশায়ী ও পরপিণ্ডভুক হইবেন। অনন্তর কিছু প্রাপ্ত বয়সে (২৪—২৮ হইতে) সাধুকৃপায় তাঁহার সকল প্রকার অভ্যুদয়, নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা হইবে।

দশম ভাগের সপ্তমে চন্দ্র থাকায় জাতকের ১৬ বর্ষ পশ্চাৎ বিবাহ হইবে।

ঐ পত্নী সুলক্ষণা ও বংশের সুখবিধানকারিণী হইবেন। অধুনা ৪৪।৪৬ অবধি জাতকের পরিবারে বহু ভয় দেখা যায়।

দশম ভাগের অষ্টমে কেতু থাকায় জাতক বহু হস্ত হইতে বহু বিত্ত ও বিভবাদি লাভ করিবেন। জাতক ধর্ম্মসহায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অর্থতৃষ্ণা-নিবৃত্ত হইবেন। জাতকের বহু পরস্বাপ্তি-যোগ আছে।

রাজ্যভাবের নবমপতি শনি দ্বিতীয়ে থাকায় জাতক মহাভাগ্যবান ও বিত্তশালী হইবেন। জাতক শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা হইবেন এবং সম্প্রদায়কর্ত্তা, শত্রুজয়ী ও ধর্ম্মধ্বজ হইবেন। সত্যধর্ম্ম ও অদ্বৈতবাদ ইঁহার মূল লক্ষ্য। জাতক নাদসিদ্ধ ও যোগীঋষিগণার্চ্চিত হইবেন।

রাজ্যভাবের দশমপতি বৃহস্পতি ষষ্ঠে মঙ্গলযুক্ত হওযায জাতক রাজবৎ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজেন্দ্র বা, রাজতুল্য ব্যক্তিগণেরও অর্চ্চিত হইবেন। রাজ্যভাবের লাভাধিপতি ষষ্ঠে থাকায় জাতকের বহু বিত্ত, ভূসম্পত্তি, কীর্ত্তি, দেবায়তন, বিদ্যাগার হইবে ও জাতক বহু মঙ্গলকার্য্যাদি কবিবেন। কিন্তু তাঁহার বহু শত্রুযোগ আছে। দেশে বা জনপদে বহু শত্রু হইবে ও তাহারা জাতকের কার্য্যে বহু বিঘ্ন দিবার চেষ্টা করিবে ও জাতক সময় সময় তাহাদের দ্বারা নির্জ্জিতবৎ (সমাজ নির্জ্জিতবৎ) হইবেন। অন্তে শত্রুনাশ হইবে ও বহুশত্রু তাঁহার উপাসকবৎ হইবে।

রাজ্যভাবের ব্যয়াধিপতি চতুর্থে থাকায় জাতক স্থানশোভা (দেশের বা বাসস্থানের) ও উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিবেন। কিন্তু দুর্গ্রামী হওযায় ও দুষ্ট শত্রু থাকায় ইঁহার শুভ সংকল্পে বহু বিঘ্ন হইলেও জাতক অটল, অচল, হিমাদ্রিবৎ থাকিবেন। ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৫ অবধি সর্ব্ববিধ সৌখ্যসম্পন্ন হইবেন। ইচ্ছামৃত্যুসমর্থ এই জাতক পরার্থে দেহত্যাগ না করিলে দীর্ঘায়ু হইবেন।

ইতি কর্ম্মভাব সমাপ্ত।

একাদশভাব ফল

হে মুনে! এক্ষণে লাভভাব বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

লাভভাবের নবমাধিপতি বৃহস্পতি পঞ্চমপতিযুক্ত হইয়া লাভস্থানকে দেখিতেছেন এবং লাভাধিপতি পরাক্রমে নাথযুক্ত হইয়া ভাগ্যস্থান দর্শন করায় জাতকেব করামলকবৎ মোক্ষলাভ দেখা যাইতেছে। জাতক সভ্রাতৃক ও স্বসাসহ মোক্ষলাভ করিবেন এবং তাঁহার পরিজন বর্গেরও মোক্ষলাভ হইবে—যেরূপ রাঘবের সপরিবাবে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছিল। কিন্তু রিষ্টমধ্যে আয়ু রক্ষা না হইলে পুনর্জ্জন্ম দেখা যায়।

লাভভাবের লগ্নে রাহু ও শনি থাকায় জাতক লক্ষ্মীরূপা নারীসহ শাশ্বতী গতি লাভ করিবেন। জাতক ব্রাহ্মণ কুলে জাত হইলেও চতুর্ব্বর্ণের সমন্বয়ে প্রয়াস পাইবেন। তাঁহার ধর্ম্মের নাম সতৈক ধর্ম্ম। জাতকের জীবদ্দশায় সকলে তাঁহার ধর্ম্ম-মর্ম্ম সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারিবে না। মৃত্যু-পশ্চাৎ শত্রুমিত্র সকল জাতিই ইহার জন্য ক্রন্দন করিবে।

লাভভাবের দ্বিতীয়ে রবি থাকায় জাতক স্বদেশে থাকিয়াই বহু বিত্তবান হইবেন। ১৪-২৮ পরে ইঁহার ক্রমশঃ ভাগ্য ও লাভ বৃদ্ধি হইবে।

লাভভাবের তৃতীয়ে শুক্র ও বুধ থাকায় জাতক ভ্রাতা হইতে অসুখী হইয়াও নিজগুণে ও পুণ্যে ভ্রাতার উন্নতি ও শান্তিবিধান করিবেন। উত্তরে জাতকের ভ্রাতৃরক্ষা প্রভাবে ভ্রাতার অতিশয় উন্নতি হইবে।

লাভভাবের চতুর্থপতি শুক্র মিত্রসহ অবস্থিত হইয়া শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় জাতকের মাতা হইতে উন্নতি হইবে। মাতার বহু ভ্রমণ ও বহু শিষ্যাদি যোগও আছে। জাতকের জন্য মাতার সম্মান এবং মাতার জন্য জাতকের সম্মান হইবে। জাতকের পিতা ৩৬ মধ্যে মৃত। কখন কখন পিতা মাতৃপক্ষে কচিৎ বিরক্ত হইবেন। পিতা ধর্ম্মাত্মা ও উদাসীন-প্রকৃতি হইবেন, তিনি অন্তর্যজনশীলাঢ্য হইবেন।

লাভভাবের পঞ্চমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল থাকায় জাতকের ২৪ ও ২৬ মধ্যে দুইটী সুপুত্র লাভ হইবে কিন্তু পুত্ররক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। পুত্র ধনী, মানী, প্রতাপী ও ভূমিপতি খণ্ডনায়ক হইবে।

লাভভাবের ষষ্ঠে চন্দ্র থাকায় জাতকের অধুনা মন স্বস্থ থাকিবে না ও মধ্যে শ্লেষ্মাদির জ্বর পীড়নাশঙ্কা আছে এবং শত্রুবৃদ্ধি হইবে। জাতকের বাতাদি প্রভাবে পদে বিঘ্নও দেখা যায়।

লাভভাবের সপ্তমে কেতু থাকায় জাতকের স্ত্রী ভাগ্যবতী হইবেন।

লাভভাবের অষ্টমপতি লগ্নে থাকায় জাতক একস্থানে স্বীয় গৃহে থাকিয়া বহু বিত্তের নায়ক হইবেন। কিন্তু ৪৬ পুনঃ ৪৮ জাতকের দেহত্যাগের বহু কারণ হইবে। জাতকের ইচ্ছামৃত্যু আছে।

লাভভাবের নবমপতি পঞ্চমে থাকায় জাতকের ধর্ম্মবিত্ত লাভ ও মোক্ষ করতলগত। অধুনা যেমন বয়োবৃদ্ধি ভাগ্যবৃদ্ধিও সেইরূপ ভাবেই হইবে। জাতক ইচ্ছা করিলে উত্তরে রাজতুল্য বা রাজাও হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার রুচি থাকিবে না। তাঁহার রাজশিষ্য বা রাজতুল্য শিষ্য থাকিবে। জাতকের বহু শিষ্য দেশভক্ত হইবে এবং একজন রাজতুল্য হইবে।

লাভভাবের দশমপতি মঙ্গল পঞ্চমে জীবযুক্ত হওয়ায় জাতক সম্যক জ্ঞানী, মহাভাগ এবং ধ্যানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। জাতক চিকিৎসা

শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। শত শত চিকিৎসক তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে থাকিবে। জাতক বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশল হইবেন।

লাভভাবের একাদশপতি শুক্র তৃতীয়ে থাকায় জাতক বহু কর্ম্মে বহু শিষ্য সহায়ে বহু প্রতিষ্ঠা ও বিত্তলাভ করিবেন।

ইতি লাভভাব সমাপ্ত

দ্বাদশভাব ফল

হে মুনে! এক্ষণে ব্যয়ভাব বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

সিংহ লগ্নে ব্যয়ভাব এবং ব্যয়ভাবের ধনস্থানে বুধ শুক্র ও ব্যয়-ভাবের দ্বাদশে রাহু শনি ও চতুর্থে বৃহস্পতি, মঙ্গল আছে; পঞ্চমে চন্দ্র ও ষষ্ঠে কেতু থাকায় জাতকের সৎকর্ম্মে দীর্ঘ ব্যয় হইবে। জনগণের হিত সাধনে যন্ত্রাদি (উত্তম গৃহ) রচনে, যন্ত্রশিল্পাগার প্রতিষ্ঠায়, বিদ্যাগার, আতুরাশ্রম ও দুর্গ্রাম সকলকে সুগ্রাম করণের জন্য জাতকের বহু অর্থ ব্যয় হইবে।

জনহিতকর কার্য্যে ইঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয় হইবে। জাতক বাসস্থানের, গ্রামের, জনপদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন। এক্ষণে জাতকের দেহকষ্ট, নিরন্তর বাতব্যাধি বা শ্লেষ্মাপীড়ায় জাতককে অভিভূত করিবে। হে তাত! জাতক শিষ্যের কঠিন ব্যাধি গ্রহণ করিয়া নিজে স্বদেহে ভোগ আনয়ন করিবেন। এই সকল যুগকল্মষ স্বরূপ শিষ্যগণকে ধিক্ যাহারা গুরুদেহে ব্যাধি প্রদান করিয়া নিজেরা স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করিতে চায়! এই সময় জাতকের পুত্রকন্যার জন্য শান্তি করা কর্ত্তব্য।

* * * *

৪৬ অবধি পুনঃ ৪৮ অতীত হইলে এই ব্যক্তি শাশ্বত শ্রী ধারণ করিয়া জীব ও পৃথিবীর বহু উপকারে সমর্থ হইবেন। হে ভার্গব! চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ব্যঞ্জনাহীন, শিষ্যাপরাধ-ক্ষমাশীল, দোষে ও পাপেও অনাসক্ত এই ব্যক্তির স্থিতি প্রার্থনীয়। অন্যথা (নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল জন্য মোক্ষ না হওয়ায়) পুনর্জ্জন্মে ইঁহার পুনরুদয়ে মহী পুনঃ পবিত্র হইবে। ইঁহার মোক্ষ করতলগত হইলে জীব ও উর্ব্বীর জন্য ইঁহার পুনঃ পুনঃ গতাগতি। হে তাত! গভীর কর্দ্দম হইতে উত্থিত গজরাজ যেরূপ শোভা পায় ইঁহারও সেইরূপ হউক ইহাই প্রার্থনা কর। আমিও যেরূপ জীবের কল্যাণ জন্য এই গ্রন্থকর্ত্তা, এই ব্যক্তির ভিতরেও সেই জীব-উদ্ধারের ভাব গভীরভাবে অঙ্কিত।

ইতি ব্যয়ভাব ফল সমাপ্ত।

শ্রীরস্তু! শ্রীরস্তু!! শ্রীরস্তু!!!
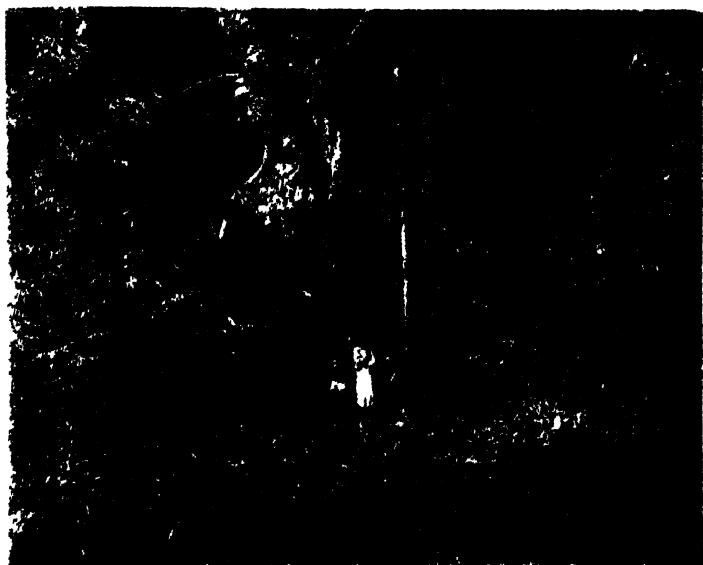
গুনাইগাছা-গ্রামে পিতামহের বাস্তুভিটা।

গুয়াখাড়া-গ্রামে পিতৃদেবের পরিত্যক্ত বাসস্থান

দশম স্তবক

বংশ-পত্রিকা

পিতৃকুল ও মাতৃকুল

পিতৃকুল

গোত্র—শাণ্ডিল্য, প্রবর—শাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ

* (১) ইনি আদি পুরুষ, ইঁহার স্ত্রীর নাম আকৃতি। (২) ইনি স্বয়ম্ভূ মুনির দ্বাদশ মানস পুত্রের অন্যতম। (৩) ইনি প্রথম শাণ্ডিল্য-গোত্রের প্রবর্ত্তন করেন। (৪), (৫) রাঢ়ীয় মতে ক্ষিতীশ এবং বারেন্দ্র মতে ভট্টনারায়ণ প্রথম মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। (৬) ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। (৭) ইহার এক পুত্র মণিসাগর আচার্য্য হইতে রাঢ়ীশ্রেণী এবং অন্য পুত্র জয়সাগর হইতে বারেন্দ্র শ্রেণী আরম্ভ হয়।

১৭ দিগম্বর লাহিড়ী বা বেদগর্ভ
১৮ সনাতন ওঝা
১৯ টুট্টু ওঝা
২০ বল্লভ আচার্য্য বা বলি আচার্য্য
২১ কেশাই বা কেশব লাহিড়ী
২২ গোঁকাই বা শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী
২৩ সারঙ্গধর বা সারঙ্গাই

২৪ নন্দাই লাহিড়ী
২৫ শঙ্কর লাহিড়ী
২৬ মধুস্দন লাহিড়ী
২৭ ভরতচন্দ্র পণ্ডিত
২৮ বাসুদেব মিশ্র
২৯ শিবরাম লাহিড়ী
৩০ মনোহর চক্রবর্ত্তী *
৩১ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
৩২ কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী
৩৩ জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী
৩৪ ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী
৩৫ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৬ শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৩৭ **ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র** শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র

৩৮ অমরেন্দ্রনাথ বিবেকরঞ্জন বিশ্বরঞ্জন নিখিলরঞ্জন মানসরঞ্জন অলখরঞ্জন

৩৯ অশোকরঞ্জন অলোকরঞ্জন

—

* 'চক্রবর্ত্তী' পাণ্ডিত্যের একটী শ্রেষ্ঠ উপাধি। ইঁহার পর হইতে এতদ্বংশীয়েরা 'চক্রবর্ত্তী' আখ্যায় পরিচিত।

মাতৃকুল

গোত্র—কাশ্যপ, প্রবর—কাশ্যপাপসারনৈধ্রুবাঃ

বীতরাগ (১)

১ সুষেণ মুনি (২)
২ ব্রহ্ম ওঝা
৩ দক্ষ
৪ পীতাম্বর
৫ হিরণ্যগর্ভ
৬ বেদগর্ভ
৭ জিগ্নি মহামুনি
৮ স্বর্ণরেখ (৩)
৯ সিদ্ধ ওঝা
১০ গরুড় (৪)
১১ ক্রতু (৫)
১২ সঙ্কর্ষণ
১৩ ভল্লকাচার্য্য
১৪ যোগেশ্বর (৬)
১৫ পুণ্ডরীকাক্ষ
১৬ বৃহস্পতি আচার্য্য
১৭ উদয়নাচার্য্য (৭)
১৮ পশুপতি
১৯ গঙ্গাই

* (১) ইনি কান্যকুব্জের কলাঞ্চগাম-নিবাসী ছিলেন। (২) ইনি মহারাজ আদিশূর কর্তৃক যজ্ঞার্থ আনীত পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। (৩) বারেন্দ্রমতে ইহা হইতে বারেন্দ্র শ্রেণী এবং তদীয় ভ্রাতা ভবদেব হইতে রাঢ়ী শ্রেণী আরম্ভ হয়। (৪) ইনি দত্তক ছিলেন, ইঁহার সময়েই সর্ব্বপ্রথম দত্তক নেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। (৫) বল্লাল সেনের প্রবর্ত্তিত কৌলিন্যপ্রথা মতে ইনি ভাদুড়ী-কুলীন এবং তাঁহার অপর ভ্রাতা মৈত্রেয় মৈত্র-কুলীন উপাধি লাভ করেন। (৬) ইনি ভাদুড়ী-গাঞি এবং তাঁহার অপর ভ্রাতা দিবাকর করঞ্জ-গাঞি ছিলেন। (৭) 'কুলশাস্ত্র-দীপিকা' মতে উদয়নাচার্য্য সুষেণ হইতে সপ্তদশ পুরুষ, কিন্তু 'বিশ্বকোষে'র (২য় সংস্করণ, চতুর্থ ভাগ) আলোচনা-মতে ইনি উনবিংশ পুরুষ। উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি 'কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপাদন করেন। ইনি কাশীধামে কল্লুকভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধাচার্য্য জিষ্ণুণির সহিত বিচার করতঃ তাঁহাকে পরাভূত করেন। উদয়নাচার্য্য একজন কৃতবিদ্য, ধীশক্তিসম্পন্ন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহা কর্তৃক কুলীনদিগের 'পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা' ও 'করণ' এবং শ্রোত্রীয়দের 'ফোটা' ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। উদয়নাচার্য্য স্বয়ং এই কার্য্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া লীলাবতী নামক আপন বিদুষী দুহিতাকে বল্লভাচার্য্য লাহিড়ী নামক একজন কুলীনের সহিত বিবাহ দেওয়ার উপলক্ষে করণ ও পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা সৃষ্টি করিলেন। উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'কুলশাস্ত্র-দীপিকা' এবং 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১) ইনি ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাশীধাম যাত্রা করিবার সময় পথিমধ্যে হরিপুর গ্রামে ৺উমানন্দ নিয়োগী মহাশয়ের গৃহে অতিথি হন। নিয়োগী মহাশয়ের একটী বয়ঃস্থা কন্যা ছিল; তিনি তাহাকে মোহনবল্লভের হস্তে সম্প্রদান করেন। অতঃপর মোহনবল্লভ সাঁতালের রাজা রামকৃষ্ণের নিকট হইতে নাজিরপুর পরগণা প্রাপ্ত হইয়া গ্রাম নাজিরপুরের পার্শ্ববর্ত্তী পাবনা সহরের সন্নিকটে (পাবনার ভূতপূর্ব্ব ষ্টীমার-ষ্টেশন বাজিতপুর-ঘাটের অন্তঃপাতী) হিমাইতপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মোহনবল্লভের এই করণে তাঁহা হইতে এই বংশে 'কাপের' সৃষ্টি হইল। (২) ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখর ঢাকার নবাব সরকারে 'মুন্সীর' কার্য্য করিয়া "চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি হিমাইতপুর গ্রামের এতদ্বংশীয়েরা 'চৌধুরী' আখ্যায় পরিচিত।

গ্রন্থ-সমাপন

এ পর্য্যন্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুই যে বলা হইল না। কতই যে বলিবার আছে। কোন্ কথা রাখিয়া কোন্ কথাই-বা বলিব ঠিক পাই না। অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহার কথা বলা চলে না। তাঁহার সবই অদ্ভুত, কাহারও সঙ্গে তাঁহার কোন মিল দেখিতে পাই না। ছোট-বেলায় মায়ের কোলে উঠিয়া যখন পাড়ায় বেড়াইতে যাইতেন, তাঁহার এক-একটী অদ্ভুত ভবিষ্যত-বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া যাইত। যাঁহারা সাধক, মহাপুরুষ প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সকলের পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটা সাধনার যুগ আছে দেখিতে পাই। কেহ পর্ব্বত-গুহায়, কেহ নির্জ্জনে কেহ-বা গৃহের কোণে জীবনের কোন অংশ সাধনায় অতিবাহিত করিয়া সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে আসন-প্রাণায়ামাদি তথা-কথিত বাঁধা-ধরা কোনপ্রকার সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে কেহ কোনদিন দেখেন নাই, বরং শুনিয়াছি মাতৃগর্ভে থাকিতেই তিনি 'নাম' করিতেন, কারণ 'নামই' তাঁহার একমাত্র Basis. ছোট বালকটী যখন, তখন হইতেই সাধন-জগতের চরমাবস্থার যত-কিছু সত্যিকারের অনুভূতি কেমন সহজ-সরলভাবে তাঁহার জীবনে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে! নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত, এই ধরাধামে অবতরণের সময় তাঁহাকে 'স্বাগতম্'-অভিনন্দন, মানব-মাত্রেরই ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান-প্রসঙ্গ যিনি কত সময় কতভাবে বলিয়া থাকেন তাঁহাকে কি বলিব? তাঁহার কথা কি লিখিব? আর কেমন করিয়াই বা লিখিব?

তাঁহার বাল্য-লীলা চমকপ্রদ! দেবদেবীরা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন। মায়ের তাড়নায় বনের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছেন, জগদ্ধাত্রীদেবী স্বয়ং আসিয়া স্বীয় উজ্জ্বলরূপে বন আলোকিত করতঃ তাঁহাকে কোলে লইযা স্তন্যপান করাইয়া সান্ত্বনা দান করিতেছেন—নারিকেলের বোঝা লইয়া চলিতে পারেন না, যাঁতা বহন করিয়া আনিতে কষ্ট হইতেছে—কালীমাতা আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন, দক্ষিণেশ্বরে বেড়াইতে গিয়াছেন, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, কালীদেবী সদ্য-প্রস্তুত কত সুমিষ্ট মিঠাই আনিয়া তাঁহাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন, —ইত্যাদি কত কাহিনী বলিব? বাল্যাবধি সকলের প্রতি একাত্মবোধ, প্রাণীমাত্রেরই দুঃখে তীব্র ব্যাকুলতা এবং তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ছিল তাঁহার চরিত্রের সহজ বৈশিষ্ট্য। এমন প্রাণবান্ বালক ধরিত্রীর বুকে কোন দিন জন্মিয়াছে কি?

প্রকৃতির কোলে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণের সহিত আপন-ভোলা ব্যবহার, নিজের সবটুকু দিয়া অপরের দুঃখমোচন, অন্যের সুখ ও তৃপ্তি-সাধনে অদ্ভুত ত্যাগ-মাহাত্ম্যের কত জলন্ত দৃষ্টান্তই না দেখিলাম! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া পবিত্র অন্তরটী লইয়া সকলের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। মানুষ তাঁহার প্রাণের জিনিষ, মানুষ ছাড়া কোন দিনই থাকিতে পারেন না! বাল্যের খেলার সাথীদের কাছে তিনি "রাজা-ভাই", স্কুল-জীবনে সমপাঠীদের লইয়া কত নাটক-যাত্রার অভিনয় করিলেন—দরিদ্রের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন, সকল কাজে তিনিই দলের পাণ্ডা। কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে গেলেন, সেখানে তিনি কুলীদের রাজা—তাহাদের প্রাণের প্রভু! সারাদিনের খাটুনীর পর রাত্রে যখন কর্ম্মক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিতেন, দরিদ্র কুলীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, তাঁহার কাছে কত সুখদুঃখের গল্প করিত, তাঁহার অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য তাহাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়া কত চেষ্টাই না করিত! চিকিৎসক হইয়া দেশে আসিলেন, সেই মানুষ লইয়াই ক্রীড়া চলিতে লাগিল। আপনা হইতেই রোগীর বাড়ী যাতায়াত করেন, তাহাদের কত সেবা করেন—কত যত্ন লন। লোকে ত দেখিয়া অবাক! তিনি যদি কাছে বসিলেন, রোগীর রোগযন্ত্রণার শান্তি হয়। এমন মানুষকে লোকে না ভালবাসিয়া পারে? দেখিতে দেখিতে তিনি হইয়া উঠিলেন পারিপার্শ্বিকের সবারই প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু। দেহরোগের চিকিৎসা করিতে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ছিলেন, কিন্তু সকলে এখন মনোরোগের কথাও তাঁহার কাছে বলিতে লাগিল। তাঁহার কাছে বলিবে না ত কাহার কাছে বলিবে? এমন সুহৃদ তাহাদের আর কে আছে? যৌবনের উদ্দাম আবেগে সেবায় আত্মহারা হইলেন। কত চোরের সঙ্গ করিলেন, কত দুর্বৃত্তের সুহৃদ হইলেন, গ্রামের প্রাচীনেরা এজন্য তাঁহার চরিত্রেই বা কত সন্দেহ করিল, কতজনে দুঃখ করিল, পিতামাতা কত শাসন করিলেন, কিন্তু দরদী তিনি—তাহাদের কি ছাড়িতে পারেন? অন্যের ক্ষতগুলিকে নিজের ক্ষত বলিয়াই তিনি মনে করিতেন, আর তাহাই সারাইতে কি আপ্রাণ পরিশ্রমই না করিতেন! এইভাবে শত শত পতিতের উদ্ধার কার্য্যে তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী কত বেগই যে পাইতে হইল তাহার অবধি নাই। অবশেষে অহর্নিশ তুমুল সংকীর্ত্তনের প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিয়া পাপাচারের নিত্য-ক্রীড়াভূমিকে পবিত্র পুণ্য আবহাওয়ায় পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেন। সে-সকল অসংখ্য অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিলে বিরাট মহাভারতের সৃষ্টি হইবে, কাজেই বাধ্য হইয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

দেশবাসীর জন্য তিনি কত-কি করিলেন, কোন দিন তাহার হিসাব-নিকাশ

পাওয়া যাইবে কি? যেখানে নীতি ছিল না, শিক্ষা ছিল না, সমাজ-বন্ধন ছিল না—এমনই ব্যভিচারের লীলা-স্থানকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র-রূপে বাছিয়া লইয়া তিনি আবির্ভূত হইলেন, আর সেখানে মরুভূমিতে মরুদ্যান সৃষ্টির ন্যায়, নরকে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার ন্যায় কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই না আনয়ন করিলেন! তাঁহার চেষ্টায় হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীর ভিতর মানব-সভ্যতার কত বিচিত্র প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বাংলার বিশিষ্ট পরিবার যেখানে যে-কয়টী পাইলেন অলৌকিক প্রেমমাহাত্ম্যে তাহাদের টানিয়া আনিলেন—সকলেই তাঁহার আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্য ঘরবাড়ী করিয়া তাঁহার কাছে বাস করিতে লাগিলেন।

সৎসঙ্গের কর্ম্ম-কেন্দ্রগুলি দেখিয়া কেহ অনুমান করেন এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে আজ পর্য্যন্ত পাঁচ লক্ষ টাকার কম ব্যয় হয় নাই, কেহ বলেন, আরও অধিক টাকা লাগিয়াছে। যথেষ্ট অর্থব্যয় ত হইয়াছেই, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর এত টাকা পাইলেন কোথায়? প্রতিষ্ঠান গড়িবাব গোড়া হইতেই তাঁহার সঙ্গে আছি, কিন্তু কোন দিন ত দেখিলাম না, বাহিরের কেহ তাঁহাকে এককালীন কয়েক শত টাকা দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন! মানুষ অলৌকিক দেখিতে ভালবাসে, ইহার পর আর অলৌকিক ব্যাপাব থাকে কোথায়? মোটা লাল চালের ভাত আর পদ্মার ঘোলা জলের মত ডাল খাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কর্ম্মীরা তখন পরমানন্দে কাজ করিত। মানুষ শুনিয়া বিশ্বাস করিবে কি,' বুভুক্ষু আশ্রমবাসী এবং তাঁহারই অনুসরণকারী দীনদরিদ্র নরনারীর নিকট হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তিল তিল করিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িবার যত-কিছু লোয়াজিমা আহরণ করিয়া থাকেন। দুঃস্থকে তিনি কেমন করিযা বাঁচাইয়া রাখেন এবং তাহাকে সঞ্জীবিত করিযা সেবাদানের যোগ্য করিয়া তুলেন, এ রহস্য যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান যাইবে না। কতলোক এখানে বাস করে, কতজনে কত অপরাধ করে,—অপরাধ ত করিবেই, তিনি যে মানসিক-ব্যাধিগ্রস্তদের জন্যই এই হাসপাতাল খুলিয়াছেন। তাঁহার কাছে না আছে কোন শাসন, না আছে কোন ভীতি-প্রদর্শন। যাহার যেমন খুসী সে তেমনই চলিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার প্রভাব, কাহারও চরিত্রে যত-কিছু ক্রটীই থাকুক্ না কেন, সে যত অযোগ্যই হউক না কেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুসী করিবার একটা প্রবল আগ্রহ কিন্তু প্রত্যেকরই মাথায় সর্ব্বক্ষণ লাগিয়াই আছে। তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই সদয় ব্যবস্থায়, সকলের অন্তরের সশ্রদ্ধ বিন্দু বিন্দু দান—কর্ম্ম ও অর্থ-সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের আজ এই বিপুল সমৃদ্ধি।

এই যে এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, ইহাতে আন্দোলনের কোন হৈ চৈ নাই, সভাসমিতি করিয়া কোনদিন বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই। ' শ্রীশ্রীঠাকুর

কি অপূর্ব্ব কৌশলের সঙ্গে, সকলের কেমন অজ্ঞাতসারে, তাঁহার ভাবধারাগুলি কর্ম্মিগণের মাথায় আস্তে আস্তে সহজভাবে ঢুকাইয়া দেন, তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। কত ব্যাপারেই ত তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। ইট কাটিবার প্রয়োজন হইল, এক জন দুই জনের নিকট হয়ত স্বীয় অভিপ্রায় কোন দিন ব্যক্ত করিলেন। ধীরে ধীরে তাহা সকলের মধ্যে চারাইয়া যাইয়া এমনই ব্যাপক ভাবে ক্রিয়া করিল যে, দেখিতে পাইলাম একজন বালক-বালিকা পর্য্যন্ত বাকী রহিল না, যে ইটখোলায় গিয়া কাজে না লাগিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ইট তৈয়ারী হইল। পুরুষের কথা নাই-বা বলিলাম, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান হইলেও তাহারা ত পুরুষ। কিন্তু দেখিলাম, বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ, যাঁহারা আজীবন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে লালিত তাঁহাদের দ্বারাও শ্রীশ্রীঠাকুর কত কাজ করাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা, স্ত্রীলোক মাত্রেরই minimum qualification হইবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। যাঁহারা তিন চারিটী সন্তানের জননী, এমন বয়স্কা মহিলাদের লইয়া ক্লাস খোলা হইল। ইংরাজী বর্ণমালা পর্য্যন্ত ইঁহাদের অনেকেরই জানা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগকে Matric পাশ করাইতে হইবে। শিক্ষিত আমরা বলিয়া উঠিলাম, দশ বৎসর লাগিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, তিন বৎসরই যথেষ্ট। শিক্ষাদান-কার্য্য চলিতে লাগিল। ক্লাস বসিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি কোন্ বিষয় কিভাবে পড়াইতে হইবে বি-এ, এম্-এ, উপাধিধারী অভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে তিনি তাহার সহজ পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখাইতে লাগিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী ব্যাকরণ যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সহজে আয়ত্ত করা যায় তজ্জন্য তাঁহার উপদেশ ও বুদ্ধিমত অভিনব chart তৈয়ারী করা হইল। মনস্তত্ত্ব বিচার করিয়া কখন কোন্ বিষয়টী কি ভাবে শিখাইতে হইবে নিজে rehearsal দিয়া তাহাই শিক্ষকগণকে বুঝাইয়া দিলেন। দেখিলাম, মেয়েরা অনেকেই তিন বৎসরেই পাশ করিল। এই পদ্ধতি পরে তপোবন বালক-বিদ্যালয়েও গৃহীত হইল। অদ্যাবধি এই তিন বৎসরের course পড়িয়াই সৎসঙ্গের বালক-বালিকাগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কত চেষ্টার কথাই শুনিতে পাই। এখানে তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য যথেষ্টই আছে বলিয়া আমার মনে হয়।

অল্পপরিসর আশ্রম-কেন্দ্রটী, কিন্তু তাহাতে শিক্ষনীয় বিষয়ের অভাব নাই। একটা বড় নগরে থাকিয়া লোকে যাহা শিখিবার সুযোগ না পায়, এখানে সে ব্যবস্থা আছে। এখানে একই স্থানে বিজ্ঞানকেন্দ্র,

ঔষধ-প্রস্তুতাগার, মুদ্রণ-কার্য্যালয়, কুটীর-শিল্পালয়, চিত্রশালা, গৃহ-নির্ম্মাণ-বিভাগ, বৈদ্যুতিক কারখানা প্রভৃতি কত-কিছু প্রতিষ্ঠান থাকায় সকলে এইগুলির সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা অনায়াসেই আয়ত্ত করিতেছে। তাহা ছাড়া সবচেয়ে বড় শিক্ষার কেন্দ্র হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং। গ্রহণেচ্ছু হইয়া শ্রদ্ধার সহিত কিছুকাল তাঁহার সঙ্গ করিলে কেহ যে বাস্তব জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, বহুকাল গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়াও তাহার শতাংশের একাংশও তিনি জানিবার সুযোগ পাইবেন কি না সন্দেহ। শিক্ষানীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জ্ঞানের এমন কোন বিষয় নাই যাহা তাঁহার নিকট প্রায়শঃ আলোচিত না হইতেছে, আর এমনই সহজ সরলভাবে গুরুতর বিষয় গুলি তিনি বুঝাইয়া দেন যে, বালক এবং নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

তারপর, তাঁহার নিজের সহজ চল্‌নাটাই যে একটা বিরাট শিক্ষার জিনিষ। কত লোক কত ভাব লইয়া তাঁহার নিকট আসিতেছেন, কেহ হাসিতামাসার গল্প করিতেছেন, কেহ দুশ্চিন্তার কথা বলিতেছেন, কেহ অর্থাভাবের কথা তুলিয়াছেন, কেহ-বা ভীষণ বিপদের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কোন্ অবস্থায় কাহার সহিত কেমনভাবে ব্যবহার করেন, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চাহিদা কেমনভাবে মিটাইয়া দেন তাহা মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিলে কত যে শিখিবার ও কত যে জানিবার আছে তাহা বলিবার নয়! তাঁহার রুচি এবং অভ্যাসগুলিই বা কেমন মার্জ্জিত! কেমন নিঁখুতভাবে সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া চলেন, কত ক্ষিপ্রগতিতে সকল কাজের মীমাংসা করেন, কেমন পবিত্র তাঁহার হাসিটী, কেমন দরদপ্রাণে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিভাবে শাসন করেন, আদর করেন কেমন করিয়া, ইত্যাদি প্রত্যেকটী জিনিষই মানুষের পরম শিক্ষা ও উপভোগের সামগ্রী। এমন সহজ সরল সত্যিকারের অভিব্যক্তি, ভাব-প্রকাশের এমন খাঁটি ধরণটী মানুষ কোথায় পাইবে? সবারই মনোভাবের সাড়া নেওয়ায় গ্রহণক্ষম এমন সহজ প্রাণবান্ আদর্শ মানুষ থাকিলে ত পাইবে!

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা লইয়া এখানে কিছুকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যাহারা বাস করিবেন, তাঁহাদের ভাল না হইয়া ও জ্ঞানী না হইয়া উপায় নাই। একজন ইষ্টপ্রাণ সৎসঙ্গ-সেবক সাধারণ মিস্ত্রী বা কোন বালক-বালিকার সহিত কেহ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ মিস্ত্রী ত শুধু হাতুড়ি নিয়াই কাজ করে না, এ যে কত পণ্ডিত!—ছাত্রছাত্রীরা অল্পবয়স্ক হইলেও কত যে জ্ঞানের অধিকারী! তখনই মনে হয়, পূর্ব্বকালের ঋষির আশ্রম বুঝি এমনই

ছিল। বিদ্যার্থী গুরুসন্নিধানে বাস করিয়া যখন গৃহে ফিরিতেন, এমনই ভাবেই বুঝি ঋষির অভিজ্ঞতার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরাশি আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেন। এ যুগে আবার তাহা দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিল। সৎসঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র তপোবন বিদ্যালয়ের গুটিকযেক ঘবদরজা এবং কতিপয মুষ্টিমেয় ছাত্র মাত্র; দেশের কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কত বড় বড় ঘরবাড়ী, কত শত শত ছাত্রসংখ্যা। কিন্তু তপোবন বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টানুরাগ-মূলক যে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতির পত্তন করিয়াছেন তাহা একদিন ভারতের তথা জগতের শিক্ষাব আদর্শ হইবে, আর যতদিন না হইবে, ততদিন শিক্ষা-সমস্যারও সমাধান হইবে না, একথা আজ অনেকের মুখেই শুনিতেছি।

শিক্ষা আন্দোলনের ন্যায় বলিতে পারি, তাঁহার সকল আন্দোলনই সর্ব্বকালেব এবং সর্ব্বমানবের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে নীতির প্রবর্ত্তন কবিয়াছেন, তাহাও শুধু বাংলা বা ভারতের জন্য নহে। সমগ্র মানবসমাজের যেখানেই এই সনাতন নীতির অনুসরণ হইবে সেখানেই তাহা কল্যাণপ্রসূ হইবে, তেমনি যেখানেই ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে সেখানেই সমাজদেহে ভাঙ্গন ধরিবে, ইহা বলিলে, অতি সত্য কথাই বলা হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-মাহাত্ম্যের অতি গৌরবময় কীর্ত্তি—'আপনি আচরি ধর্ম্ম,' কিভাবে অপর সকলকে সেই নীতি তিনি শিক্ষা দিতেছেন—এই অধঃপতিত সমাজের পুনরুত্থানের জন্য তিনি যে অপূর্ব্ব মহনীয় দান করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি।

সমাজে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির আমূল সংস্কারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কত কাল অবধি চেষ্টা করিতেছেন! কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রাণহীন আচারের একনিষ্ঠ সেবক মৃতপ্রায় দেশবাসীর মনে তাঁহার উদার ভাবরাজি যাহাতে সত্বর কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিশ্রমের অন্ত নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন দেশে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব জানাইয়া খুবই দুঃখ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর সমাজ-গঠনে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা-প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছিলেন যে, বিধিমত বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে দেশে এমন কতকগুলি প্রাণবান তাজা মানুষ জন্মগ্রহণ করিবে যাহাদের দ্বারা সত্যিকারের কাজ সম্ভব হইবে। যাবতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিবাহ-সংস্কারের আন্দোলনই যে আমাদেব সর্ব্বাগ্রে করণীয় এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে প্রত্যেককেই সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

• আর্য্য আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করায় ভারতভূমি যে

আজ লেলিহান কুক্কুরের মত পরপদানত ঘৃণিত সন্তানের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্য-বিবাহের উচ্চ আদর্শ—বিবাহে নারী ও পুরুষের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য—সমাজ-জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা—গার্হস্থ্যজীবনে স্ত্রী ও পুরুষের ইষ্টনিষ্ঠার আবশ্যকতা—নারীর একগামিনীত্ব ও পুরুষের বহুগামিত্ব—বিবাহসংগঠনে পুরুষের প্রতি নারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিই যে একমাত্র ঘটক ইত্যাদি ভাবরাজি প্রচার করতঃ এই সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিয়া আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্ত্তন দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কি মহতী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেশবাসী অনেকেই হয়ত তাহার সন্ধান রাখেন না। মরণোন্মুখ জাতির দেহে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলে যুগোপযোগী আদর্শ বিবাহপদ্ধতিরূপ যে অমৃত দান করিয়াছেন তাহা জাতির শরীব বিধানে যাহাতে সত্বর ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, মৃতপ্রায় জাতি আবার যাহাতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে—চবিত্র, স্বাস্থ্য ও প্রতিভা-সম্পদে বলীয়ান অযুত সন্তানে দেশ ভরিয়া যায়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অহর্নিশ কি প্রাণপাত চেষ্টা!

কোন্ অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষ ও নারীর সমস্যা লইয়া কত দ্বন্দ্ব চলিতেছে! শ্রীশ্রীঠাকুর আজ তাহার সহজ সরল মীমাংসা দান করিয়া দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—মানবের মুক্তি-সাধনায় নারীই একমাত্র সহধর্ম্মিণী—অমৃতের সহযাত্রী। যতদিন নারী আপন বৈশিষ্ট্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর দাড়াইয়া সংসারে চলিতে না শিখিবে, ততদিন জাতির ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই দীর্ঘকাল ধরিযা নারীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নানা গ্রন্থ-প্রকাশ এবং অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ-আলোচনা দ্বারা কত উপদেশই যে দিতেছেন তাহার অবধি নাই। গার্হস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য কিসে—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে—বিবাহের আদর্শ ও উদ্দেশ্য—বিবাহে পাত্রের বর্ণ, বংশ, প্রতিষ্ঠা ও বয়স বিচারের আবশ্যকতা—হীনচরিত্র সন্তান হওযার কারণ—প্রতিভাবান্ ক্ষণজন্মা সন্তান লাভের উপায়—সুপ্রজননে নারীরই একমাত্র দায়িত্ব—কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কোথায়—ইত্যাদি নরনারীর মিলন সম্বন্ধীয় সকল সমস্যার মীমাংসা-বাণী তিনি সর্ব্বক্ষণ সকলের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক কতকাল ধরিয়া প্রচার করিতেছেন! নারী-চরিত্রের আদর্শ কি এবং পুরুষের জীবনের লক্ষ্যই বা কেমন হইবে তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা যথাস্থানে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা

করিয়াছি। বিবাহ-ব্যাপারে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্যও তিনি কম চেষ্টা করিতেছেন না! সমাজের আজ এমনই অবস্থা যে, অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা মোটেই কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। সমাজ-গঠনে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের অপলাপ হওয়ায় এই আর্য্য-সমাজটা যে কতখানি disintegrated into lumps হ'য়েছে, eugenic uplift-এর দিক দিয়া newer blood-এর nurturing না পে'য়ে সমাজের individuals গুলি যে কতখানি সবদিক দিয়ে দৈন্যের অধিকারী হ'যে উ'ঠেছে, তা' কেউ লক্ষ্য করেন না, without the supply of filtered progressive newer blood জাতির আয়ু, বুদ্ধি, বল, বর্ণ ইত্যাদি সবই যে deteriorate করতে থাকে তা কারুরই ভে'বে দেখ্‌বার আজ অবসর নাই।"

বিবাহ ও সুপ্রজনন সম্বন্ধীয় এই সকল আর্য্য ভাবরাজি শ্রীশ্রীঠাকুর দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচার করায় তাহা সৎসঙ্গবাসী, সৎসঙ্গের সহিত যুক্ত নানাদেশবাসী এবং অন্যান্য বহু স্থানের ভদ্র পরিবারের নরনারীর মনের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। যে সকল নারী বিবাহিতা তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত বাণীর ভাবধারা অনুসরণ করিয়া নিজেদের সংসারকে সুখশান্তিময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠা, অনুরক্তি ও ভাবভক্তিতে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বামীকে সৎ ও সুস্থভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া যখনই নারী আনত করাইবেন, সেই হইতেছে প্রকৃষ্ট লক্ষণ যে, তিনি সৎ, সুস্থ ও দীপ্তিমান সন্তানের জননী হইবেন, তেমনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার ভবিষ্যত-বিধানে জননীরই একমাত্র দায়িত্ব, স্বামীর প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যাহাদের হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহার সেই আদিম মঙ্গলকামী পিতামাতার প্রতি সেবাপরায়ণ হওয়া, স্বামীর বিপথ-গমনে ও আদর্শহীনতায় স্ত্রীর কর্ত্তব্য, সংসার-জীবনে শিল্প-ব্রতানুষ্ঠানের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা—প্রভৃতি শত শত বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত বাণীগুলি কত স্থানের কত মহিলা নিজেদের জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করতঃ তাহা চরিত্রগত করিয়া লইবার জন্য তুমুল আগ্রহ ও আপ্রাণতার সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুমারী মেয়েরা যোগ্যবর-নির্ব্বাচনে নিজেদের ভীষণ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন। শ্রেষ্ঠকে বরণ করিবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং তৎসহ আর্য্য বিবাহপদ্ধতির মূলগত আদর্শের যত-কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের অনেকেরই চরিত্রগত হইয়া পড়িল। গভীরভাবে এ বিষয়ে অহর্নিশ অনুধাবনা করিবার ফলে অসংখ্য পরিবারের নারীদের

মধ্যে এই ধারণা আজ এমনই বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, সর্ব্বাংশে উন্নত এবং আদর্শচরিত্র ভিন্ন কাহাকেও যে স্বামীত্বে বরণ করা যায় তাহা তাঁহারা কল্পনায়ও ভাবিতে পারেন না। এইরূপ আবহাওয়ায় চলিতে চলিতে পাত্রের বর্ণ, বংশ ও প্রতিষ্ঠার উৎকর্ষ-চিন্তায় কতকগুলি নারীর মস্তিষ্ক এমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আবিষ্ট হইল যে, তাঁহারা সকল দিক বিবেচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকেই সর্ব্বতোভাবে একমাত্র আদর্শ পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বমনপ্রাণে দেখিতে পাইলেন, সুতরাং তাঁহাকেই স্বামীপদে বরণ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তখন পর্য্যন্ত এই বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। এই সকল ভাবধারা অস্থিমজ্জাকে আক্রমণ করতঃ তাঁহাদিগকে এমনই ভাবে উদ্বুদ্ধ ও আপ্রাণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এই স্থির সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। এইবার তাঁহারা নিজ নিজ অভিবাবকের নিকট স্বীয় মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রসম্মত যুক্তিতর্ক ও আলোচনাপূর্ব্বক কত অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া তাঁহাদিগকে অবশ্যকরণীয় এই পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্মত করিতে কত চেষ্টা করিলেন। কাহারও কাহারও (শ্রীমতী পারুলবালা দেবী এম-এ, শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী ও শ্রীমতী বনলতা দেবীর) অভিবাবক ইহাতে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, একদিন এই সকল নারীদের কাহারও মাতা, অপর দিন কাহারও পিতা, কোনদিন বা কোন নারীর পিতামাতা উভয়ে স্বীয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে বলিলেন—"বাবা, আমাদের এই কন্যাকে আপনাকে দান করিলাম।" শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবিলেন—লোকে ঠাকুর-দেবতার নামে কোন মূল্যবান জিনিষপত্র, বিষয়সম্পত্তি কিংবা কোন প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করিয়া থাকে, ইহা তেমনি একটা-কিছু ব্যাপার। দিন যাইতে লাগিল, কালক্রমে এই সকল বাগ্‌দত্তা কন্যাদিগের অভিবাবকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলেন,—"মেয়েকে ত আপনাকে দান করিয়াছি, আপনাকেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, সে যে আপনাকেই স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অন্যত্র তাহাকে পাত্রস্থ করিবার উপায় নাই।" শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা ভট্টাচার্য্য বি, এস্ সি-ই বহুকাল পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সর্ব্ব-মনপ্রাণে বুঝিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য ব্রত নাই। সুতরাং বর্ণ, বংশ, প্রতিষ্ঠা ও চরিত্রে মহীয়ান এই পুরুষ-প্রবরকেই স্বামীত্বে বরণ করতঃ জীবন সার্থক করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন, কিন্তু তাঁহার অভিবাবকগণ শুনিবা মাত্রই তীব্র আপত্তি উপস্থিত করিলেন। সংকল্প-সিদ্ধির জন্য বিরুদ্ধ

ভাবাবলম্বী অভিবাবকগণকে রাজী করাইতে এই মহিলাকে যে ভীষণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা তাঁহার জ্বলন্ত আদর্শনিষ্ঠার অপূর্ব্ব পরিচায়ক। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সকল প্রস্তাবের বিষয় শুনিয়া হতভম্ব হইলেন। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না, বিবাহ-সংস্কারের আদর্শ সম্বন্ধে এতদিন তিনি যে আন্দোলন চালাইয়াছেন, ইহা তাহারই ফল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তখন সমস্যাপূর্ণ ভীষণ-সঙ্কটমুহূর্ত্ত উপস্থিত! এতদিন তিনি যে আদর্শবাদ সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কেমন করিয়া? আবার যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদেরই জীবনের একমাত্র আশ্রয়-সম্বল ভাবিয়া স্বামীত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাহাদের দশাই বা কি হইবে? যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুর এই বলিয়া অসম্মতি জানাইলেন, তাঁহার সহিত দুর্দ্ধর্ষ জীবনের সঙ্গী হইতে হইলে যে তাঁহাদিগকে প্রতিপদে কত শত শত অপবাদ, লাঞ্ছনা ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, চিরজীবন কত দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, সহজ সরল পারিবারিক জীবনের নিরাবিল সুখ-সম্ভোগ ত দূরের কথা, পারিপার্শ্বিকের অনুসন্ধিৎসু সেবাব অতি গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আজীবন কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবন যাপন করিতে হইবে! বলা বাহুল্য, কর্ত্তব্য-সাধনে ইহাদের এমনই অটুট ও আপ্রাণ নিষ্ঠা যে, কোন বিরুদ্ধ যুক্তিই তাঁহাদিগকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। এই অবস্থায় তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহাকেও এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝাইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। প্রাচীন যুগের সেই আর্য্য আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির প্রতি এই সকল নারীদিগের ঈদৃশ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার পরিচয়ে জননীদেবী মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকিয়া ইহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা যে তাঁহার পক্ষে কতখানি অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দান করিলেন। মাতৃদেবী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইহ জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। অবশেষে তিনি মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই সকল স্বয়ংবরা কন্যাগণকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তদবধি ইঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া তাঁহারই সহধর্ম্মিণীরূপে তদীয় আদর্শ-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এতদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে প্রচারিত আর্য্য আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির বাস্তব রূপ দান করিতে আজ যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিলেন,

এই প্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধার সহিত নারীকুল-বরেণ্যা সেই মহীয়সীদিগকে অভিবাদন জানাইতেছি। তাঁহারা যে অপরিসীম ত্যাগ, যে জ্বলন্ত ইষ্টনিষ্ঠা, যে অপূর্ব্ব সংসাহস, আর্য্যকৃষ্টির প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নাম জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। আদর্শ আর্য্যনারী দেবী পার্ব্বতী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য যেমন দুশ্চর্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন, আজ তেমনি ইঁহারাও বৈষয়িক হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রতা, অধুনা-প্রচলিত চাহিদামত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, উচ্চ চাকুরীজীবী ধনাঢ্যসন্তান, নব্যযুবকের প্রণয়িনী হওয়ার যাবতীয় প্রলোভন—কামকাঞ্চনভোগ ও সৌখীন জীবন-যাপনের সম্পূর্ণ অভাব, পারিবারিক জীবনে সপত্নীর সহিত সংসার করিবার মত ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি কত-কিছু দুঃখ মাথায় করিয়া লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে আদর্শবান পুরুষশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, আর সেই স্বামীদেবতার প্রারব্ধ লোকসেবারূপ মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন। পরম গৌরবের সঙ্গে শ্রদ্ধা-বিনম্র-চিত্তে আজ আমি মাতৃকুল-বন্দনীয়া সেই মহিলাগণের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অরণ্যকে নগরতুল্য করিয়াছেন, নানা সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান-বাণী দান করিয়া জাতির জন্য অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন, যে Life-research-এর গবেষণা করিয়া পণ্ডিতপ্রবর Alexis Carrel নোবেল প্রাইজ পাইলেন তৎসম্বন্ধে কতকাল পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট কত অভিনব তথ্যের আলোচনা শুনিয়াছি, জ্ঞানের কত বিভাগে তিনি কত কার্য্য করিতেছেন এবং আরও কত-কিছুই করিবেন, তাঁহার কৃত সকল আশ্চর্য্যের মধ্যে—তৎপ্রদত্ত সকল মহৎ দানের মধ্যে আমার মনে হয় বিবাহ-পদ্ধতির বাস্তব সংস্কারকার্য্যে নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সঙ্গে কোন-কিছুরই তুলনা হয় না, কারণ জাতির কাছে সুপ্রজননের দায়িত্ব ও [illegible] হইতে আর কিছুই বড় নহে। অন্ধ-কুসংস্কারের বিষে জর্জ্জরিত, গলিত, পচা, দুর্গন্ধময় সমাজদেহে যে সংস্কারকার্য্য প্রবর্ত্তন করিতে তিনি সক্ষম হইলেন তজ্জন্য এই জাতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। যদি কোনদিন জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি, শ্রীশ্রীঠাকুর জনসাধারণের নিকট এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কি বিপুল সম্বর্দ্ধনাই না পাইতেছেন, দেখিয়া কত তৃপ্তি পাইব! তাঁহার সেই আদি-যুগের সংকীর্ত্তন-লীলা, এই সে-দিনের প্রতিষ্ঠান গড়িবার এবং বিদ্যাচর্চ্চার ধূম, বর্ত্তমানের ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, ইষ্টযাজন প্রভৃতি যত-কিছু

আন্দোলনের মতনই দেখিতে দেখিতে তৎপ্রবর্ত্তিত এই আর্য্য বিবাহ-সংস্কারের ভাবধারাও সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে কেমন চারাইয়া যাইতেছে! অতি ক্ষুদ্রাকারে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার যত-কিছু প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়, কিছুকাল যাইতে না যাইতেই পরিবেষ্টনীর আকাশ-বাতাস সে ভাবধারায় রঙীন হইয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে তাহা নানাদিকে সংক্রামিত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করতঃ শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। এই বিবাহ ব্যাপারেও বর্ত্তমান নারী-প্রগতির যুগে সেই প্রাচীন যুগের আর্য্যনারীর মহীয়সী চরিত্রের দৃষ্টান্তের পুনরভিনয় এবং নানা স্থানে এই আর্য্যনীতি সকলে কেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি।

আর্য্য অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের কথা যত চিন্তা করি, সমাজ-দেহের উপর ইহা কিরূপ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতে পারে যতই ভাবি, ততই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইযা যাই। দেখিতেছি, এই নীতি অমান্য করা মানে, নিজেব অস্তিত্বের ও উন্নয়নের মূলে কুঠারাঘাত করা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দেশে নানা সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যে একতা-বন্ধনেব জন্য আজ কত কাল যাবত চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু কোথায়ও মিলন সম্ভবপর হইল না। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণায় সমাজদেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আর্য্যের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন প্রচলিত ছিল তখন ত এমনটী ছিল না! এখনও যদি সমাজের বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিবারগুলি বিধি-মাফিক অনুলোম অসবর্ণ-বৈবাহিক-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে কেমন সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের মিলনের অটুট বন্ধন স্থাপিত হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক-বিরোধ-সমাধানের এই সকল অতি প্রয়োজনীয় কথা শ্রীশ্রীঠাকুর দিন নাই রাত্রি নাই কত জনকে কতভাবে বুঝাইতেছেন!

সমাজের সংস্কার-সাধন অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। কোন্ সংস্কারে দেশের কল্যাণ হইবে আর কিসেই বা অনিষ্ট হইবে, তাহা স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। ঋষির দর্শন না থাকিলে যে কোন সত্যিকারের মঙ্গল সাধন করা যায় না তাহা বলাই বাহুল্য। অনেকে মনে করেন বর্ণভেদ বলিয়া কিছু নাই, সব মানুষই এক জাতীয়, অনুলোম-প্রতিলোম বলিয়া কোন কথাই নাই! পুরুষ হইলেই সে যে-কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিলোম-সংশ্রব জাতিকে জাহান্নমে লইয়া যাইবার পক্ষে কেমন পিচ্ছিল বর্ত্ম তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত

যে বাণী দান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে যে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! অথচ এই সর্ব্বধ্বংসকারী ব্যবস্থাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া আজ অনেকে অনুসরণ করিতেছেন। দেশের এই ত অবস্থা! যুগপ্রবর্ত্তক দ্রষ্টাপুরুষ বুঝি যুগে যুগে এমনি ভাবেই আপন সময়ের অতীত বস্তু হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন! প্রসঙ্গটী ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই, তাঁহার কথা যত বলি ফুরাইতে চাহে না, যাহা হউক এইবার আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব।

একটা কথা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার নিকট শুনিয়া আসিতেছি। তিনি বলেন—পূর্ব্বতনকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর এমনই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয় এমনটী বুঝি আর কোথাও সম্ভব হয় না! ছোট-বেলা অবধি অজ্ঞানতাবশতঃ মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া আজ অন্তরের সহিত বুঝিতে পারিতেছি, মহম্মদ ও যীশুর প্রচারিত ধর্ম্মও কত সুন্দর, জীবন-বৃদ্ধির কেমন অনুকূল! শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহচর্য্যে যতই দিন যাইতেছে, জগতের মহাপুরুষগণের চরণে মস্তক ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িতেছে। মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য হইয়াও আমি পরমদয়াল হজরত, মহাপ্রাণ যীশু, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধাসম্পন্ন দীন সেবক। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া বুঝিতেছি এই সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের প্রত্যেকেরই জীবনের মহান্‌ ব্রত সম্যকভাবে উদ্‌যাপন করিবার জন্যই আজ তাঁহার আগমন হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মূলগত উদার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিয়া, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল কি করিয়া, নানা সম্প্রদায়ের ভিতর কখন কেমন করিয়া গলদ ঢুকে, অহং-সেবী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা কি ভাবে একে অন্যের নিন্দা করিয়া নিজেদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য ধর্ম্মের নামে নানা বিভেদের সৃষ্টি করেন, যুগপ্রবর্ত্তক মহা-পরিপূরণকারী অবতার পুরুষের আগমনের ফলেই বা কিভাবে সকল দ্বন্দ্ব ও সমস্যার নিরাকরণ হয়, ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কাছে সুদীর্ঘ আলোচনা শুনিতে শুনিতে মনে হয়, তত্ত্বপুরুষ না হইলে এমন উদারতার সহিত, কার্য্য-কারণসম্বন্ধ সহ এ-সকল সমস্যার এমন সার্ব্বজনীন মীমাংসা কেহ দান করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি, শ্রীশ্রীঠাকুরকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, জগতের সর্ব্বধর্ম্মমত, সকল অবতার ও

প্রেরিত পুরুষগণকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবার অভ্যাস প্রত্যেকের জীবনে কেমন সহজভাবে চরিত্রগত হইয়া পড়িয়াছে! সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব-স্থাপনের প্রকৃষ্ট বাস্তব পন্থা ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে জানি না।

মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি পরিষ্কার ধারণাই না আজ তাঁহার নিকট পাইয়াছি! জীবন-চল্‌নার সঙ্গে রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্ম প্রভৃতির পরস্পরের সম্বন্ধ কোথায়, তাহার কি অপূর্ব্ব মীমাংসাই তিনি প্রদান করিয়াছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, ধর্ম্মই বল, কর্ম্মই বল, স্বর্গই বল, আর মুক্তিই বল, মানব মাত্রেরই জীবন-চল্‌নার মূল-সূত্র একটা, আর তাহা এই—প্রতি-মানবের থাকিবেন একজন জীবন্ত আদর্শ, তাঁহার প্রতি অকাট্য টানের সম্বেগে প্রত্যেককে সংসারে চলিতে হইবে, মানুষের জীবনের যত-কিছু বৃত্তি এই আদর্শকে সার্থক করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে; স্বাস্থ্যই বল, শিক্ষাই বল, শিল্পই বল, বাণিজ্যই বল, বিজ্ঞানই বল, আর স্বাধীনতাই বল, প্রত্যেককেই সব-কিছু অর্জ্জন করিতে হইবে ঐ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে—তাঁহারই প্রীতি-সম্পাদনের জন্য; আদর্শপ্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,—প্রয়োজন হইলে তোমার শত মনোবৃত্তি-অনুসারিণী পত্নী হউক, তাঁহারা তোমাকে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিবেন, তোমার শত শত আদর্শপ্রাণ চরিত্রবান সুপুত্র হউক, তাহারা দিকে দিকে তোমার ইষ্টের জয়গান ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে পারিপার্শ্বিকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করিবে, তোমার প্রচুর অর্থ হউক—দুনিয়ার সবাইকে ইষ্টস্বার্থে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য—ইষ্টের প্রীতিকামনায় লোক-হিতৈষণা-ব্রতে সে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইবে। এই ভাবে মূর্ত্ত আদর্শের সহিত প্রতিটী মানব যাহার যত কিছু বৃত্তি লইয়া যতদিন-না একনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইতে পারিবে, তত দিন দুনিয়ায় প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে না, যত নীতিবাদেরই প্রবর্ত্তন হউক না কেন, রাষ্ট্র-পরিস্থিতির যত-কিছু পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বজীনন ভ্রাতৃভাব-স্থাপন ততদিন আকাশ-কুসুম মাত্র! জীবন-চল্‌নার এইরূপ অপূর্ব্ব মূল্যবান পাথেয় তাঁহার নিকট কত পাইয়াছি, প্রত্যহ কত পাইতেছি, তাহা কোন দিন লিখিয়া শেষ করিতে পারিব কি?

অন্ধ আমি যাঁহার কৃপায় দৃষ্টি পাইয়াছি, দুঃস্থ আমি যাঁহার করুণায় বাঁচিয়া আছি, দুর্ব্বল আমি যাঁহার দয়ায় চলিতেছি, সেই আমার যথাসর্ব্বস্ব প্রিয়পরম সদ্‌গুরুরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমৎঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের রাতুল-চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করতঃ কোটী কোটী প্রণিপাত জানাইয়া বলিতেছি—

"সদসৎ ভাবাতীতং পরমপুরুষমেকং। তারয়িতুমবতীর্ণং নিখিলমানবকুলং ॥
ধৃতসহজসমাধিমানন্দঘনমূর্ত্তিং। প্রেমবিগলিত চিত্তং নমাম্যনুকূলচন্দ্রং ॥"

সংশোধন

এই গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় ২৬ লাইনে লিখিত 'জনৈক ষড়যন্ত্রকারী…' হইতে ৩০ লাইনের '……বিবৃত করিলেন' পর্য্যন্ত ছত্র-কয়টীর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অংশটুকু পাঠ করিতে হইবে ! যথা :—

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত হিসাবে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার সঙ্গ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবঞ্চনাশীল আলোচনার ভিতর দিয়া পরোক্ষভাবে নানা কায়দায় এই কথাটীই সকলকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্তিত্ব-লোপের প্রয়োজন হইয়াছে এবং এইরূপ মতবাদ বুঝাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অপসারণ-কার্য্যে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে প্রয়াস পান। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটী কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি এমনতরভাবে অনুরক্ত ছিলেন যে, প্রাযশঃ নির্ব্বিচারেই তাঁহার কথা মানিয়া লইতেন—এই চরিত্রই তাঁহাকে অমনতর উদ্দেশ্য সাধনে পাইতে প্ররোচিত করিয়াছিল। যখনই কৃষ্ণচন্দ্র ঈদৃশ হীন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া ঐ ভদ্রলোককে শ্রীশ্রীঠাকুরের হত্যার বাস্তব-কার্য্যে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল—শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে (কৃষ্ণচন্দ্রকে) এত ভালবাসেন, অযচ্ছলভাবে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য এমন আপ্রাণ প্রচেষ্টাপরায়ণ, আর তাঁহাকেই নাকি এই ভক্তপ্রবর (কৃষ্ণচন্দ্র) ইহলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য এমন জঘন্য-ভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছেন—তাঁহার বুকে ছুরি মারিয়া কিম্বা বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়া না ফেলিতে পারিলেই ইহার তৃপ্তি নাই!—এতখানি অনুগত প্রাণে পরোক্ষ-আলোচনায় অজ্ঞাতসারে সেই ভদ্রলোকের মনে যতখানি সঙ্কোচ আসিয়াছিল এক মুহূর্ত্তে সমস্তই চূরমার হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—যাঁহার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা, এত অনুরাগ—যাঁহার এতটুকু অনভিপ্সীত কিছু ঘটিলে শুনিয়া একদম বিষাক্ত হইয়া উঠে—সেই মানুষটী এমন হীন ষড়যন্ত্রকারী! ভাবনারও অতীত—এত বিশ্রী! তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়িল, তাঁহার এত বড় বিপদ, এই মুহূর্ত্তে কি যে ঘটিতে পারে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না!—এই সকল চিন্তায় তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, অবশ মাতালের মত চলিয়া আসিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অন্যান্য সকলের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিলেন।